Janmabhumi Registered No C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

[৩৫শ বর্ষ] ১৩৩৬, বৈশাখ, [১ম সংখ্যা]

১। পেঁড়োর মন্দির—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বি, এ. তত্ত্বনিধি ... ৩
২। মনোভাব—রচয়িতা—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ ... ১৬
৩। শাঁখা ও সিন্দূর—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে ... ১৭
৪। ছায়াদেহ ও স্থাবরসংশ্লেষ—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী ... ২৭
৫। কুমুদ—শ্রীমতী শৈলবালা বসু বি, এ, ... ২৮
৬। কি চাই—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ৩১
৭। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের কতিপয় ঘটনা
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ... ৩৫
৮। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৬
৯। সাধক-সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সরকার বিরচিত ... ৩৯
১০। সমালোচনা। ... [illegible]

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

জ্বরের ... শ্রীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য
একদিনে ... ! পথ্যের বিচার নাই।
মূল্য ৮০, ... ৲ গ্রোস ৪ ... পাইকারী দর আরও সুলভ।
ডাঃ ... ন লিমিটেড, কলিকাতা।
... B, মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতেশ্বরী ও ভারত সম্রাট।

রাজপরিবার।

Engraved and Printed at the Fine Art Printing Syndicate.—Jorasanko, Calcutta.

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

৩৫শ ভাগ
১৩৩৬

২২০/৩৫

কলিকাতা হাটখোলা দত্তবাটী
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে
সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

Printed by N. Dutta at the
"JANMABHUMI PRESS."
39, Manick Bose's Ghat Street.
CALCUTTA.
1930.

[বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা] [ডাঃ মাঃ।৵০ ছয় আনা]

পঞ্চত্রিংশ বর্ষের সূচীপত্র।

সংখ্যা—বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
১। অবেলায়	শ্রীমতী শৈলবালা বসু বি, এ	১৪৩
২। অভিমান ও উপবাদ	শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে	৩৪৩
৩। অশান্ত জীবন	শ্রীমতী সরসীবালা রায়	৩৫০
৪। আত্মসমর্পন	শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী	৫২
৫। আসার আশায়	„ ভবানী চৌধুরী	৩৭৯
৬। কি চাই	„ অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী	৩১
৭। কেতকী	„ রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১১৬
৮। কুমুদ	শ্রীমতী শৈলবালা বসু বি, এ	২৮
৯। খেয়াঘাটে	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ	২৯৪
১০। গৃহলক্ষীর প্রতি	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৮১
১১। গুরুদর্শন	„ আশুতোষ ঘোষ	৩২০
১২। গিরিশচন্দ্র সঙ্গীতাচার্য্য	„ দেবকণ্ঠ বাগচী সরস্বতী	১১১
১৩। ছায়াদেহ ও স্থাবরদেহের	„ রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী	২৭
১৪। ডবলিউ, সি, বন্দোপাধ্যায়ের জীবনের কতিপয় ঘটনা	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল	৩৬, ১১৩, ১৪৫, ২৫৪, ৩১৩
১৫। তখন	শ্রীমতী শৈলবালা বসু বি, এ	১০০
১৬। তুমি হে করুণাসিন্ধু	„ নগেন্দ্রনন্দিনী দাসী	১৪৮
১৭। দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ	শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ	৩৬১
১৮। নবদ্বীপের দশভুজা	... ...	১৮৩
১৯। দিবস ও রজনী	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮৫
২০। নিবেদন	„ হরিদাস মিত্র	৯৩, ৩৮৭
২১। নিঃস্বার্থ পরোপকার	রায় „ জলধর সেন বাহাদুর	৩২৩
২২। পার্ব্বতীক্ষেপার দূতী	শ্রীযুক্ত ভবানী চৌধুরী	২৮৩
২৩। পারিজাত	„ কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ	২৬৮
২৪। প্রেম	„ সুরেন্দ্র নাথ দাস	১৮৮
২৫। পোঁড়োর মন্দির	„ ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বি. এ	৯, ৭৩, ৮৩
২৬। প্রহ্লাদ	„ রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর	১৩৮
২৭। বংশীরবে	... ...	১৮৯
২৮। বৈষ্ণবাপরাধ সমস্যানির্ণয়	„ রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ	১৬৭
২৯। বসন্ত ও তাহার প্রতিকার	রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন কবীন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	১৩২, ১৮৯, ২২৪, ২৫১
৩০। বাংলার প্রাণীসঙ্ঘ	ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্র নাথ ঘোষ এম, ডি এম, এস, সি, এফ, জেড, এস	৪১
৩১। বিবিধ	....	৩৮৯
৩২। বিবাহে পণ প্রথার কারণ ও তাহার প্রতিকার	শ্রীযুক্তা রত্নমালা দেবী	৬৩
৩৩। বন্দনা	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২২০
৩৪। ব্যাথার ব্যথী	শ্রী—	৩৯০
৩৫। বৃহস্পতি-কথা	„ রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৯২
৩৬। ভরত-মিলন	„ রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী	৯৪
৩৭। ভগবান বুদ্ধদেব	„ কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ	৬৮
৪৮। মনোভাব	„ আশুতোষ ঘোষ	১৬
৩৯। মহারাজাধিরাজ স্যার রামেশ্বর সিংহ জি, সি, আই, ই, কে, বি, ই		৬০
৪০। মনের কথা	শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৩৮৮
৪১। মায়ের আসা যাওয়া	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	১৭৭
৪২। মায়াবীর মায়া	শ্রীমতী শৈলবালা বসু বি, এ	৩৩৯
৪৩। যাত্রা	শ্রীযুক্ত উমানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ	২০৭, ২৩৮, ৩০২, ৩১৮, ৩৩২
৪৪। যৌবন	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নাথ রায়	২০২, ৩৩১

সংখ্যা—বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
৪৫। লালগোলার মহারাজের জীবন কথা	শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৭০, ২৯৬, ৩২৮, ৩৪৫
৪৬। লাইব্রেরী ও তাহার উপকারীতা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস বি, এল	২৯০
৪৭। শ্রীমদ্ বালানন্দজীর জীবনী ও উপদেশাবলী	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫, ২০৯, ২৪১, ২৭০, ৩০৫, ৩৩৭, ৩৫৯
৪৮। শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ কাব্যরত্নাকর	১৫৮, ২৩৪, ২৬০, ২৮৪, ৩৩২, ৩৫০, ৩৮০
৪৯। শাঁখা ও সিন্দুর	শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী দে	১৭, ৫৩, ১০১, ১২৩, ১৫৪
৫০। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও আলক্ষ্মী তত্ত্ব	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৬
৫১। শান্তি	„ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল	১১৮
৫১। শান্তি	„ আশুতোষ ঘোষ	১৫৭
৫৩। শোক গীতি	শ্রীমতী সরসীবালা রায়	৩৫৯
৫৪। সাধক সঙ্গীত	শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ সরকার	৩৯
৫৫। সমালোচনা	... ...	৪০, ৮০
৫৬। স্বপ্ন	শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন ভট্টাচার্য্য	১৩৩
৫৭। সন্তান বিক্রয়	„ রামরঞ্জন রায়	১৭৩
৫৮। সাথী	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ	১০৩
৫৯। সুলভ গার্হস্থ্য ঔষধাবলী	ডাঃ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ এল, এম, এস,	১০৩
৬০। সাধক সঙ্গীত	শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বেন্দু চট্টোপাধ্যায়	৩৬৮

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫শ বর্ষ | ১৩৩৬ সাল, বৈশাখ। | ১ম সংখ্যা।

বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ।

সর্ব্বমঙ্গলময় পরমপিতা পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসাদে আমাদের "জন্মভূমি" মাসিক-পত্রিকা চতুস্ত্রিংশবর্ষ অতিক্রম করিয়া এই ১৩৩৬ সাল, নববর্ষের প্রথম মাসে পঞ্চত্রিংশ বর্ষে প্রবেশ করিল। বর্ষপ্রবেশের মঙ্গলাচরণে সেই মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণিপাত। গ্রহবৈগুণ্যবশে গতবর্ষে রোগে শোকে নানা বিঘ্ন সংঘটনে আমরা এক প্রকার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম; পরীক্ষাক্ষেত্রে বিঘ্নবিনাশন বিশ্বপিতার অপার করুণায় সেই নিদারুণ পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি। সামাজিক ব্যবহার অনুসারে আমরা ঢাক বাজাইয়া বর্ষ বিদায় করি, ঢাকের বাদ্য কর্কশ হইলেও এ সময় সেই বাদ্যকে আমরা মঙ্গলবাদ্য জ্ঞান করিয়া থাকি, বর্ষ শেষে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে আমাদের উৎসব হয়, সেই উৎসবের মূলাধার উৎসবসাগর বিশ্বমূলাধার, সেই কারণেই আমরা সমস্ত উৎসবে মানস-দর্পণে সেই বিশ্বরূপের রূপচ্ছবি অবলোকন করি, মঙ্গলাচরণে পুনরায় বিশ্ব-মঙ্গলময়ের শ্রীপদকমলে শরণাপন্ন হইলাম। সানুনয় প্রার্থনা এই যে, বর্ত্তমান নববর্ষের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যেন আমরা সর্ব্বপ্রকার শুভানুষ্ঠানের সঙ্কল্পব্রতে মঙ্গলফল লাভ করিয়া সফলকাম সুখী হইতে পারি।

১৩৩৫ সালকে আমরা দুর্ব্বৎসর বলিয়াই মনে করি। গত বৎসরে কি ভারতবর্ষে আর কি অন্যান্য প্রদেশে দৈবদুর্ব্বিপাক বড় অল্প ঘটে নাই। সকল ঘটনার আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, তবে সর্ব্বাপেক্ষণ প্রধান একটি ঘটনার উল্লেখ করাকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তাহা আমাদের মহামান্য বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের পীড়া। গত বৎসর শীত ঋতুর প্রারম্ভে ভারত-সম্রাট মহোদয় দারুন প্লুরিসিরোগে আক্রান্ত হইয়া বহুদিবসাবধি শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় করুণাময়ের অপার করুণায় তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। জন্মভূমির নববর্ষাগমে মহামান্য ভারত-সম্রাটের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিরা মাননীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় ভারত-সম্রাট সপ্তম এড ওয়ার্ড এবং বর্ত্তমান মাননীয় ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের পুত্র কন্যাগণ সহ প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল।

প্রাণপণ যত্নে দৃঢ়সঙ্কল্পে "জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকার পুষ্টি সাধনার্থ আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক নানা বিষয়ের যথানুক্রমে সাধ্যমতে আলোচনা করিয়াছি, ঐ উভয় বিষয়ের আলোচনায় যাহাতে জন সাধারণের চিত্তরঞ্জন হয়, সাধ্যমতে তৎবিষয়েও প্রয়াস পাইয়াছি, কৃতকার্য্যতা লাভ কতদূর হইয়াছে—তাহার বিচারকর্ত্তা গুণগ্রাহী পাঠক মহোদয়েরা।

আমাদিগের অনুগ্রাহক, গুণগ্রাহক, গ্রাহক ও লেখক মহাশয়েরা গতবর্ষে আমাদিগকে যে প্রকার উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, বর্ত্তমান পঞ্চত্রিংশ বর্ষেও সেই প্রকার উৎসাহ রূপঅনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত থাকিব না, সর্ব্বান্তঃকরণে সেইরূপ আশা রাখি। সঙ্কল্পিত ব্রতে যাহাতে আমরা কিছুমাত্র বিচলিত না হই, সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করুন! জয় জগদীশ্বর!

—*—

জনক রাজা মহাতেজা, কিসে তার ছিল ত্রুটী,
ও সে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী॥

সংগ্রাহক——শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

পেঁড়োর মন্দির।

লেখক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি।

১। আশ্রমের পথে।

বিশাল বনভূমি। বহুদূর পর্য্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘনবিন্যস্ত বিটপীশ্রেণী চলিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল গগন স্পর্শ করিবার জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। বৃক্ষসকলের গাত্র হইতে শতাধিক লতা অজগর সর্পের ন্যায় ঝুলিতেছে। স্থানে স্থানে লতাগুলি বৃক্ষশাখা এমনই আঁকড়াইয়া আছে, দেখিলে মনে হয় যেন কোন্ আদিম কাল অবধি উহারা এই অবস্থায় আছে। বনভূমি সর্ব্বত্র সমতল নহে, কোথাও বা অনেকটা সমতল চলিয়াছে, আর কোথাও বা উচুনীচু অসমতল জমি; স্থানে স্থানে এক একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর কে জানে কত কাল ধরিয়া বৃহৎকায় হস্তীর মত শুইয়া আছে। দূরে একটা অত্যুচ্চ পাহাড় অরণ্যের লতাপাতার ভিতর দিয়া উকিঝুঁকি মারিতেছে।

বনভূমির ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ বন্যপথে তিনজন অশ্বারোহী চলিয়াছেন—সকলেই নীরব। মধ্যে মধ্যে যখন পাথুরে মাটির উপর ঘোড়ার পা পড়িতেছে, তখনই টকাটক্ শব্দ হইয়া প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে; সময়ে সময়ে অশ্বগণের হ্রেষারব বনের পশুপক্ষীদিগকে সচকিত করিয়া তুলিতেছে। যেখানে ভূমি সমতল, পথ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, সেখানে অশ্বারোহীরা পাশাপাশি যাইতেছেন; যেখানে পথ বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে, সেখানে অশ্বারোহীরা পরস্পরের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভ মলিন কিরণ তাঁহাদের মুখের উপর পড়িয়া কতপ্রকার খেলাই না খেলিতেছিল। বেলা অবসান হইয়া আসিলেও অশ্বারোহীদের মুখে ভয় বা উদ্বেগের কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অশ্ব তিনটীর ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিলে মনে হয় যে, তাহারা অনেকটা পথ চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অশ্বারোহীদের শরীরে অবসাদ বা মুখে ক্লান্তির কোনই লক্ষণ ছিল না; বরঞ্চ বনের ছায়া ও মৃদু

মধুর পার্ব্বতীয় পবন তাঁহাদের পথশ্রম দূর করাতে তাঁহাদিগকে বেশ প্রফুল্লই বোধ হইতেছিল। তাঁহারা যে পথ ধরিয়া চলিতেছিলেন, সেই পথের এক পার্শ্ব দিয়া একটী নাতিবিস্তৃত পার্ব্বত্য নদী অজগর সর্পের মত আঁকাবাঁকা ভাবে চলিয়াছে। অশ্বারোহীগণ কখনও বা নদীর ধার দিয়া, কখনও বা কিছু দূরে সেই সঙ্কীর্ণ পথে চলিয়াছে। অশ্বগণ যেন মনের সুখে স্বেচ্ছামত কখনও বা দ্রুত কখনও বা ধীরে ধীরে চলিতেছে।

অশ্বারোহীদের পরস্পরের মুখে বেশ একটা মিল ছিল, দেখিলেই তাঁহাদিগকে তিন সহোদর ভাই বলিয়া মনে হইত। তাঁহাদের বেশভূষা হইতে বোঝা যায় যে, তাঁহারা সম্ভ্রান্তবংশীয় বীর পুরুষ। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুই জন সহোদর ছিলেন, তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহাদের খুড়তুতো ভাই।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই হিন্দুরাজ্য, কেবল পঞ্জাব ও দিল্লীর চারি পার্শ্বের ভূখণ্ড পাঠান বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। মোগলদিগের অস্তিত্বই তখন সাধারণ ভারতবাসীর অজ্ঞাত ছিল। যে দেশের কথা আমরা বলিতেছি, সে দেশ তখনও পাঠানের করতলগত হয় নাই, তখনও সে দেশের রাজা হিন্দু, প্রজা হিন্দু-অতি অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ। রাজা নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও বৌদ্ধ বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি কোন অত্যাচার করিতেন না; এমন কি মুসলমান কেহ আসিলেও তাহার যথোচিত আদর অভ্যর্থনার অভাব হইত না। অতিথি-রূপে কেহ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা গ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিবে, সরল ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরাজার অন্তরে এ ভাবই প্রবেশ লাভ করে নাই।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অশ্বারোহী তিন জন সেই পথের ধারে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। অশ্বারোহীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব এই মন্দিরেই আছেন।" অন্য দুইজনও অশ্ব হইতে নামিলেন এবং উষ্ণীষের দ্বারা নিজ নিজ অশ্বকে নিকটস্থ বৃক্ষে বাঁধিলেন। পরে পাদুকা, তরবারি প্রভৃতি উন্মোচন করিয়া নির্ঝরিণীর ধারে গিয়া হস্তপদমুখ প্রক্ষালন করিলেন। কনিষ্ঠ খুড়তুতো-ভাই জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা! এ মন্দিরে কোন্ দেবতা আছেন?"

দাদা। ভগবতী কল্যাণেশ্বরী! সম্মুখের এই নির্ঝরিণী কিছু দূরে প্রশস্ত হইয়া "বরাকর" নদীতে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এমন সুদৃশ্য স্থান বড়ই বিরল।

মধ্যম। গুরুদেব কি বারো মাসই এখানে থাকেন?

জ্যেষ্ঠ। না, তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। তবে এই কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে তিনি মধ্যে মধ্যে আসেন এবং বৎসরের বেশী ভাগই এই মন্দিরে যাপন করেন। সম্প্রতি তিনি শ্রীক্ষেত্র হইতে এখানে আসিয়াই আমাদের তিনজনকে ডাকিয়াছেন। জানি না, কি আদেশ হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহারা তিনজন নদীকূল হইতে উঠিয়া মন্দিরের অভিমুখে চলিলেন। মন্দিরের দ্বারে গৈরিকবেশধারী এক যুবক তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে সকলে প্রণাম করিলেন। জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব কোথায়?"

যুবক। আশ্রমে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

যুবক আশ্রমের একজন পরিচারকের প্রতি তখন অতিথি তিন জনের পরিচর্য্যার ভার দিয়া সকলকে লইয়া আশ্রমের ভিতরে মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

২। মন্দিরে।

অনতিপ্রশস্ত খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী বরাকর বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিমপ্রান্ত ধৌত করিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়া দামোদর নদে মিলিত হইয়াছে; এই উভয় নদের সংযোগস্থলের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে বরাকর নদীর পূর্ব্বতটে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের অনতিদূরে কল্যাণ পাহাড়। মন্দিরটী বহু পুরাতন—দেখিলেই বুঝা যায় যে, কোন বৌদ্ধ মন্দির বঙ্গদেশে শাক্ত ধর্ম্ম প্রবল আকার ধারণ করিলে শাক্তমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। মন্দির প্রাঙ্গনে প্রস্তরনির্ম্মিত যূপে কত যে মেষ মহিষ ছাগ, এমন কি নরনারী পর্য্যন্ত বলি দেওয়া হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

প্রাঙ্গনটী বেশী বিস্তৃত নয়। তাহার উত্তর দিকে মন্দির, অপর তিন দিকে অনতিপ্রশস্ত কক্ষসমূহ। যুবকের সঙ্গে আগন্তুকত্রয় প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া কল্যাণেশ্বরীর উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিতেই তাঁহাদের গুরুদেব স্বামী সত্যানন্দ পরমহংসকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি লইলেন। সত্যানন্দ স্বামী তাঁহাদের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে ক্ষুদ্রতর একটী প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই মন্দিরের পরিচারক সেই প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে একখানি অজিনাসন এবং কয়েকখানি

কম্বলের আসন পাতিয়া রাখিয়াছিল। গুরুদেব অজিনাসনে বসিয়া অতিথিদ্বয়কে কম্বলাসনে বসিতে বলিলেন।

স্বামী সত্যানন্দকে দেখিয়া তাঁহার বয়স নিরূপণ করা অসম্ভব ছিল। তাঁহার উন্নত সরল দেহ ও উজ্জ্বল দীপ্ত চক্ষু দেখিলে, এবং তাঁহার সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিলে মনে হইত যে তাঁহার বয়স এখনও পঞ্চাশ অতিক্রম করে নাই। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ, দুগ্ধফেণনিভ শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রুগুম্ফকেশ ও প্রশস্ত ললাটের বলিরেখা দেখিলে তাঁহাকে অশীতিপর বৃদ্ধ মনে হইত। চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের বৃদ্ধেরা বলিতেন যে,তাঁহারা বাল্যকাল অবধি স্বামীজির একই ভাব দেখিতেছেন।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে স্বামীজি তাঁহাদের নিজ নিজ এবং রাজ্যের কুশলসম্বাদ লইলেন। যুবকটীকে আগন্তুকদিগের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। গুরুর আদেশে যুবক জ্ঞানানন্দ বাহিরে গেলেন। ইতিমধ্যে মন্দিরে সান্ধ্য আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজি ধ্যানমগ্ন হইলেন। আগন্তুকগণও নিস্তব্ধ হইয়া বসিলেন। বাদ্যধ্বনি নীরব হইলে স্বামীজি ভক্তিভাবে মন্দিরের অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া করযোড়ে বলিলেন—"মা কল্যাণেশ্বরি! তোমার প্রসাদে জগতের কল্যাণ হৌক, সকল জীবের কল্যাণ হৌক।" বলিয়া তিনি দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং গুরুদেবের অনুসরণ করিয়া আগন্তুকগণও দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

আরতি শেষ হইলে জ্ঞানানন্দ দেবীর প্রসাদী ভোগ নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনিয়া অতিথিদের সম্মুখে রাখিলেন। স্বামীজির আদেশে তাঁহারা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দেহ মন সুস্থ করিলে বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নীত হইলেন। স্বামীজি তাঁহাদিগকে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করিয়া তাঁহার নিকট পুনরায় আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহারাও তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

৩। গুরুশিষ্যে।

গুরুদেবের আদেশক্রমে ঘণ্টাখানেক পরে অতিথিত্রয় স্বামীজির সমীপে উপস্থিত হইলেন। চারিদিক অন্ধকার। স্বামীজির কক্ষ হইতে একটী ক্ষীণ আলোকরেখা আসিয়া বাহিরের অন্ধকারকে যেন আরও গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। স্বামীজি অজিনাসনে বসিয়া অতিথি দিগকে

কম্বলাসনে বসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অতিথিগণ সুখে উপবেশন করিলে স্বামীজি বলিতে লাগিলেন—

"বৎসগণ! যে কারণে আমি তোমাদিগকে ডাকিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। আমি লক্ষণ দেখিতেছি যে, বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধানে এই সুবিস্তৃত পাণ্ডুরাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে। আমি ভারতের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি; পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদিগের যে প্রকার প্রভাব, তাহাতে মনে হয়,ভারতের এই অংশ তাহাদের হস্তগত হইতে বিলম্ব হইবে না; বিশেষতঃ মুসলমানেরা পাণ্ডুরাজ্যের ভিতর নানা স্থানে যেরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান এড়াইবারও কোন উপায় দেখি না। ক্ষোভ—ক্ষোভেরও কোন কারণ দেখি না।"

অতিথিত্রয় গুরুদেবের কথা শুনিয়া তো স্তম্ভিত—তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল, কথা সরিল না—পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

সকলেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া স্বামীজি মধ্যে মধ্যে থামিয়া থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "সকলই নিজের দোষ; হিন্দু-জাতির মধ্যে বড়ই দোষ ঢুকিয়াছে। শ্রেণীর পর শ্রেণী—শতবিধ ভাগ—পরস্পরকে পরস্পর ঘৃণা করে—এ জাতির জীবন কতদিন থাকে? সমাজের এক অংশ যদি এত হীন ও হেয় হইয়া থাকে তবে তো সে সমাজ অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠে। বুদ্ধদেব এটী ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—প্রাচীন সমাজের স্বার্থে আঘাত পড়িল—বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হইল। যে সমাজে নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা জাগিয়া উঠে—সে সমাজ বাহিরের আক্রমণ কতদিন আট্‌কাইতে পারে? শতবিধ বিভাগের কারণে জনসাধারণের ভিতর যে অজ্ঞান ও অধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—হিন্দুরাজ্যের ধ্বংস বুঝি বা আর নিবারিত হয় না। পাণ্ডুরাজ্য মুসলমানের হস্তগত হইয়াছে, ইহা আমি জাগ্রত স্বপ্নে দেখিয়াছি। তোমরা তাহা নিবারণের চেষ্টা কর—কিন্তু—" স্বামীজির কথা শুনিয়া সকলেরই প্রাণে মহা আতঙ্ক জাগিল। সকলের প্রাণের কথা জ্যেষ্ঠ বলভদ্র ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি ভারতে হিন্দুরাজ্য আর থাকিবে না—মুসলমানের রাজ্যই স্থায়ী হইবে?"

স্বামীজি কতক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া বলিলেন—"না, মুসলমান রাজ্যও চিরস্থায়ী হইবে না—দেখিতেছি, মুসলমানদিগের পর যেন সুদূর সাগর পার হইতে কোন্

এক জাতি আসিবে। ইহা সত্ত্বেও ভারতের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল দেখিতেছি—মনে হইতেছে, এক সময়ে এই শতবিধ বিভাগ সমাজ হইতে উঠিয়া যাইবে, বিরোধ ও বিবাদ মুছিয়া যাইবে—বাহির হইতে যে চাপ ভারতের ঘাড়ে আসিবে, তাহারই ফলে মৈত্রীই ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ভগবানের মঙ্গল বিধান যখন কেহ মানে না, তখন ভগবানের আঘাত তাহাকে মঙ্গলের পথে ফিরাইয়া আনে। ভারতবাসী যদি মৈত্রীকে ধরে, তবে তাহার স্বাধীনতা কে হরণ করিতে পারে? মুসলমান যদি বা আসে, তবে তাহার গুণ গ্রহণ কর, ভারত আবার ক্ষাত্র তেজে সমুদ্ভাসিত হইবে; তাহার দোষ অনুকরণ কর, পতন অনিবার্য্য।"

অনেক রাত্রি হইতেছে দেখিয়া জ্ঞানানন্দ উপস্থিত হইতেই স্বামীজির ইঙ্গিতে অতিথিত্রয়কে লইয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষ দেখাইয়া দিলেন। স্বামীজিও পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে বলভদ্র, রামভদ্র ও বীরভদ্র, এই আগন্তুকত্রয় মুখ হাত পা ধুইয়া স্বামীজির কক্ষের নিকটবর্ত্তী হইতেই দেখিলেন যে, তিনি প্রাঙ্গনে পদচারণা করিতেছেন। স্বামীজিকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই প্রণাম করিয়া চরণধূলি লইলেন। তিনিও সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যখন তাঁহারা দাঁড়াইয়া উঠিলেন তখন স্বামীজি তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ বীরভদ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কাল সন্ধ্যায় তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, তাহা মনে রেখো। আরও দু-চারটী কথা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই। আত্মকলহই পতনের মূল, একতাই উন্নতির মূল। হিতোপদেশের কথা খুবই ঠিক—একগাছি খড়ে বিশেষ কিছুই হয় না, কিন্তু খড়ের সমষ্টিতে রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহার দ্বারা মত্তহস্তীও বাঁধা যায়। কামিনী ও কাঞ্চনের মোহে কখনও আত্মবিস্মৃত হইও না। হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আসিলেই আমার কথাগুলি মনে করিবে। আমি শীঘ্রই তীর্থভ্রমণে বাহির হইব—কতদিন পরে যে ফিরিব, ফিরিবই কি না, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। একটা কথা তোমাদিগকে বিশেষ ভাবে বলিয়া রাখি। হিন্দুরাজ্য বা মুসলমান রাজ্য, সে দিকে বড় বেশী লক্ষ্য না রাখিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রতিই বিশেষ মনোযোগ দিবে। ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে রাখিবে। আমার আর কিছুই বলিবার নাই। তোমরা শুভ মুহূর্ত্তে পাণ্ডুরাজ্যে ফিরিয়া যাও—তোমাদের কল্যাণ হৌক।"

স্বামীজির কথা শেষ হইলে অতিথিত্রয় তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া স্বামী জ্ঞানানন্দ ও অন্যান্য কয়েকজন কর্ম্মচারীর

নিকট যথোচিত অভিবাদন ও অভিভাষণ সহকারে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায় গ্রহণের পালা সাঙ্গ হইলে তাঁহারা যেখানে অশ্বগুলিকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেখানে গেলেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ আশ্রমের বাহিরে কয়েকপদ তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন। অতিথিত্রয় নীরবে নিঃশব্দে ঘোড়ায় সাজ পরাইয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া চলিলেন। তিনজনই চিন্তাকুল—মুখে কাহারও একটী কথা নাই। তাঁহারা যখন অদৃশ্য হইলেন, তখন স্বামী সত্যানন্দ একটু অনুচ্চ স্বরে আপনার মনে বলিলেন—"কল্যাণেশ্বরি! ভগবতি! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে—আমাদের চেষ্টায় কি-ই বা হয়?" ইহা বলিতে বলিতে তিনি প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনার জন্য ধীরে ধীরে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

৪। গণেশ শর্ম্মা।

পুরাকালে সপ্তগ্রামের উত্তর পশ্চিম কোণে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে গণেশ শর্ম্মা নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গ্রামে তখন শতাবধি লোকের বাস ছিল। তাহাদের প্রায় সকলেই অতি দরিদ্র কৃষক ছিল। প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর কৃষিক্ষেত্র ছিল। সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দ্বারাই দরিদ্র গ্রামবাসীদিগের সংসারযাত্রা কোনরূপে নির্ব্বাহ হইত। গণেশ শর্ম্মারও সামান্য যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল, সেই ভূমিজাত শস্যের অংশে এবং গ্রামবাসীদিগের পৌরোহিত্য ও যজন যাজনাদি ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া তিনিও তাহাদিগের ন্যায় কায়-ক্লেশে দিন যাপন করিতেন।

গণেশ শর্ম্মা যেমন ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিক ছিলেন, তেমনি তিনি খুবই ভক্তিমান সাধক ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর বৈশাখের শেষে পুরীধামে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দর্শনের অভিপ্রায়ে যাত্রা করিতেন এবং মাসাবধি কাল পদব্রজে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া স্নানযাত্রার কিছু পূর্ব্বে পুরীধামে উপস্থিত হইতেন। তথায় একমাসের ঊর্দ্ধকাল অবস্থিতি করিয়া স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, এইরূপে প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক তিনমাস কাল তিনি উড়িষ্যার পথে ও পুরীধামে যাপন করিতেন।

সে সময় উড়িষ্যা প্রদেশে সুপ্রসিদ্ধ গজপতিবংশীয় নরসিংহ দেব রাজত্ব করিতেন। গজপতিবংশ উড়িষ্যার বাহিরেও অনেক রাজ্য জয় করিয়া

উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহাদের রাজ্য উত্তরে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—বর্ত্তমান হাবড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার অংশ এবং হুগলি জেলার দক্ষিণ অংশও উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। উৎকল রাজাদের দুর্দ্ধর্ষ খণ্ডারৎ সেনাদলের নাম শুনিলে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

গণেশ শর্ম্মার নিষ্ঠাভক্তি সম্বন্ধে পরে অনেক গল্প শোনা যায়। তিনি নাকি জগন্নাথদেবের সঙ্গে বিরলে কথাবার্ত্তা কহিতেন; কোন বিপদে পতিত হইলে জগন্নাথদেব নাকি স্বয়ং তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, একবার তিনি উড়িষ্যা হইতে ফিরিবার পথে দস্যুহস্তে নিপতিত হন। দস্যুগণ তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার প্রাণবধে উদ্যত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"আমার প্রাণবধ করিলে তোমাদের কোনই লাভ হইবে না; বরং তোমরা আমার বাটীতে চল, আমার যাহা কিছু আছে, সমস্তই আমি তোমাদিগকে দান করিব।" তাঁহার কথা শুনিয়া দস্যুরা তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাসগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করে। তিনি তাহাদিগকে স্বীয় কুটীরে লইয়া গিয়া বিশেষ যত্নসহকারে অতিথি-সৎকার করেন। প্রতিবেশীরা দস্যুদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"আমি উহাদের বিশেষ কোন পরিচয় জানি না, পথে উহাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, এখন উহারা আমার অতিথি।" একজন দস্যু গণেশ শর্ম্মার বাটীতে উপস্থিত হইয়াই কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়; সেই সময়ে গণেশ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী প্রাণপণে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া সেই দস্যুকে ব্যাধিমুক্ত করিয়াছিলেন। দস্যুরা তাঁহার দেবোপম চরিত্র দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। তদবধি তাহারা প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গণেশ শর্ম্মার বাটীতে আসিয়া সম্বৎসরের ভিক্ষা-লব্ধ অর্থের অর্দ্ধেক অংশ তাঁহার চরণে ভক্তিসহকারে নিবেদন করিয়া যাইত।

জগন্নাথক্ষেত্র কেবল উড়িষ্যা প্রদেশেরই তীর্থস্থান নহে, উহা সমস্ত ভারতেরও অন্যতর তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে শতসহস্র যাত্রী সেই পুণ্য-ক্ষেত্রে সমবেত হয়। এখন রেলপথ ও ষ্টীমারে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় প্রতি বৎসর যেমন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়, সেকালে তেমন হইত না।

তখন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিরা পদব্রজে এবং ধনবান ব্যক্তিরা গোশকট বা শিবিকা আরোহণে তীর্থযাত্রা করিতেন। গণেশ শর্ম্মা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং তিনি পদব্রজেই শ্রীক্ষেত্রযাত্রা করিতেন তাহা বলাই বাহুল্য।

এক বৎসর গণেশ শর্ম্মা স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা দর্শনের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পাণ্ডা মহাপ্রসাদ আনিয়া তাঁহাকে দিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"ঠাকুর! দেবতা স্বয়ং তোমার পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, তোমা হইতে এক প্রসিদ্ধ রাজবংশ নামিবে। সেই বংশের বংশধরেরা ধনে, মানে, দানে ও বলবীর্য্যে, খ্যাতিপ্রতিপত্তিতে, সকল বিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবেন; তাঁহাদের জয়ধ্বনি সাগরকূল হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে, এবং শত্রুগণ তাঁহাদের দুর্গে সহজে পদচিহ্ন দাগিতে পারিবেন না। বহুকাল পরে সেই সুপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ এক রূপবতী রমণীর চাতুরীতে পড়িয়া আত্মকলহ ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নির্মূল হইবে। সাবধান! তোমার বংশে কেহ যেন কোন স্ত্রীলোকের রূপমোহে পতিত না হয়, এবং কেহ যেন ভ্রাতৃদ্রোহী দেশদ্রোহী না হয়। যতদিন তোমার বংশ ঐ সকল পাপে কলঙ্কিত না হইবে, ততদিন তোমার বংশধরেরা অপরাজিত থাকিবে। তুমি বংশানুক্রমে এই উপদেশ দিয়া যাইও।"

পাণ্ডাঠাকুরের এই সকল কথা গণেশ শর্ম্মা একমনে শুনিতেছিলেন, এবং শুনিতে শুনিতে আত্মবিস্মৃত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যে, ঐ ভবিষ্যদ্বাণী বলিবার সময় পাণ্ডাঠাকুরের দেহ হইতে দিব্য জ্যোতি বাহির হইতেছিল এবং চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। পাণ্ডাঠাকুরের মুখ হইতে কথাগুলি বাহির হইবার সময় গণেশ শর্ম্মার মনে হইতে লাগিল যেন কোন সুদূর হইতে কথাগুলি ভাসিয়া আসিতেছিল। কথাগুলিও যেমন শেষ হইল, পাণ্ডাঠাকুরের অতিমানুষিক ভাবগুলিও চলিয়া গেল এবং তখন তিনি গণেশশর্ম্মার নিকট সাধারণ মনুষ্য মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। গণেশ শর্ম্মা এই ঘটনায় এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি দেবাদেশ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করিতে পারিলেন না—মুখে একটী কথাও সরিল না।

সেই বৎসর গণেশ শর্ম্মা যখন জগন্নাথক্ষেত্রে আসেন, তখন গৃহে তাঁহার পত্নী পূর্ণগর্ভা ছিলেন। গণেশের গৃহত্যাগের কয়েক দিন পরেই তাঁহার

একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। যথাসময়ে গণেশ ফিরিয়া তাঁহার পুত্রের জন্ম সংবাদ পাইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী একটী শিশুকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণী সহর্ষে গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রকে স্বামীর ক্রোড়ে প্রদান করিয়া হাত মুখ ধুইবার জন্য জল আনিতে গেলেন। পুত্রের মুখ চুম্বনে উদ্যত হইয়া গণেশ দেখিলেন—শিশুর প্রশস্ত ললাটে রাজচিহ্ন সুস্পষ্ট অঙ্কিত। তিনি সুপণ্ডিত এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গ শুভচিহ্নে পূর্ণ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তখন পাণ্ডার সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্যই জগন্নাথ দেবের উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, এবং পত্নীর প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ শিশুর মুখে দিলেন। শিশুর বয়স যখন তিন চারি বৎসর, তখন অবধি গণেশ সাংসারিক কাজকর্ম্মে একপ্রকার বীতরাগ হইয়া পড়িলেন—সংসারের কোন বিষয়েই পূর্ব্বের মত মনোযোগ দিতে পারিতেন না. সর্ব্বদাই যেন চিন্তান্বিত হইয়া থাকিতেন। জগন্নাথক্ষেত্রে পাণ্ডার মুখে জগন্নাথ দেবের যে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছিলেন, তাহা কাহারও নিকটে, এমন কি নিজের ব্রাহ্মণীর নিকটেও ব্যক্ত করেন নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র রাজ্য লাভ করিবে, তাহা কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিবার সাহস না পাওয়ায় তিনি নিজেই চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছিলেন। রাজ্যলাভের পথ যে কি প্রকারে সুগম হইবে, তাহার কোন পথ ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না।

একদিন এইপ্রকার চিন্তাদোলায় গণেশ শর্ম্মা দোল খাইতেছেন, এমন সময় এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার অতিথি হইলেন। সন্ন্যাসী কৃশ ও দীর্ঘকায় ও মাথায় জটাজুট, কপালে বিভূতির ত্রিপুণ্ড্রক, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে জবাকুসুমের মত টক্‌টকে লাল সিন্দূরের একটা বড় ফোঁটা জ্বলজ্বল করিতেছে। চক্ষুদুটী হইতে যেন অগ্নিকণা বাহির হইতেছে—চাহিলে মনে হয়, যেন তাঁহার সম্মুখে অন্তস্তল পর্য্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বাহুদুটী আজানুলম্বিত। পা দুখানি সরু কিন্তু পেশল—দেখিলে মনে হয়, যেন বন-জঙ্গল কোন কিছুরই বাধা তাহারা মানিতে চায় না। মাত্র একটী কৌপীন পিত্তলের শৃঙ্খলে কটিতে আবদ্ধ গলে রুদ্রাক্ষের মালা, দুই বাহুমূলে রুদ্রাক্ষের তাগা। লোকটিকে দেখিলে ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা অজানা ভয়ের উদ্রেক না হয়, তাহা বলা যায় না। সন্ন্যাসী গণেশের শিশুপুত্রকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"ইহার কপালে রাজচিহ্ন দেখিতেছি, তোমার এই পুত্র রাজা হইবে।" সন্ন্যাসীর মুখে জগন্নাথ দেবের

প্রত্যাদেশ সমর্থিত হইতে দেখিয়া প্রত্যাদেশের ইতিহাস গণেশ সন্ন্যাসীকে আমূল বলিয়া ফেলিলেন, প্রাণের ভিতর সে কথা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—"ভগবানের আদেশ, তোমার পুত্র রাজা হইবে; এসো, আমরা উভয়ে মিলিয়া সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার যথারীতি ব্যবস্থা করি।" তদবধি সন্ন্যাসী গণেশ শর্ম্মার গৃহে স্থায়ী বাসা বাঁধিলেন। গণেশ পত্নী সন্ন্যাসীর যথোচিত যত্ন সমাদর করিতে লাগিলেন। গণেশের সঙ্গে সন্ন্যাসীর অনেক সময়েই গোপনে পরামর্শ চলিত। প্রতিবেশীরা ভাবিত, সন্ন্যাসীর নিকট গণেশ মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক কিছুকাল গুরুসেবা করিতেছেন।

৫। স্বর্ণ ময়ূর।

গণেশ শর্ম্মার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। দস্যুশিষ্যদের কল্যাণে তাঁহার অন্নকষ্ট তো দূর হইলই, হাতে যথেষ্ট অর্থও সঞ্চিত হইল। তাঁহার তৃণাচ্ছাদিত কুটীরের পরিবর্ত্তে একখানির পর একখানি ইষ্টকালয় উঠিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর পরামর্শ মত তাঁহার জন্য গ্রামের বাহিরে শ্মশানক্ষেত্রে একটী সুন্দর ক্ষুদ্রাকার আবাস নির্ম্মিত হইল। সন্ন্যাসী প্রচার করিলেন যে, তাঁহার বিনা অনুমতিতে গণেশ ব্যতীত অন্যকেহ সেই আবাসের সীমা মধ্যে পদার্পণ করিলে নিঃসংশয় তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে! সন্ন্যাসী তাঁহার আবাসের চতুর্দ্দিকে একপ্রকার বিষকণ্টক বসাইয়া রাখিয়াছিলেন—কেহ তাহা ভেদ করিয়া আসিতে গেলে তাহার চরণ বিক্ষত না হইয়া উপায় ছিল না, এবং ক্ষত হইলেই সেই কণ্টকের বিষ তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া দুই চারি দিনের ভিতরেই তাহাকে ইহলোক হইতে সরাইয়া দিত। সেই কণ্টক রাশির মধ্য দিয়া সন্ন্যাসীর আবাসে যাইবার একটী অতি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, সেটী কেবল সন্ন্যাসীর ও গণেশের জানা ছিল। গণেশ অধিকাংশ সময়ই সেই আবাসেই যাপন করিতেন। একবার গ্রামের এক দুষ্ট বালক কৌতূহলপরবশ হইয়া ঐ আবাসের অভিমুখে গিয়াছিল; পথে কণ্টকাবদ্ধ পদে গৃহে ফিরিতে না ফিরিতে তাহার পা দুখানি ফুলিয়া ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল এবং দুই এক দিনের ভিতরেই সে পিতামাতার কোল খালি করিয়া চলিয়া গেল। সেই অবধি গণেশ ব্যতীত অন্য কোন গ্রামবাসী কি এক অজানা রহস্যজনিত ভয়ে সন্ন্যাসীর আবাসের দিকে যাইত না।

এই প্রকারে বৎসর দুই তিন কাটিয়া গেল। গণেশ শর্ম্মার আর্থিক উন্নতি

হইল বটে, তাঁহার মুখে গভীর চিন্তার ছায়া ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ব্বের মত গণেশ গ্রামবাসীদের সঙ্গে খোলা প্রাণে মেলামেশা করিতে পারিতেন না। সর্ব্বদাই নির্জনে থাকিতেই ভালবাসিতেন—সন্ন্যাসী ব্যতীত কাহার সঙ্গে বেশী কথা বলিতে পারিতেন না। অনেক সময়ে তিনি পাগলের মত নিজের মনেই বকিয়া যাইতেন; সকলে ভাবিত, তিনি সত্যসত্যই উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। আর এক বিষয় গ্রামবাসীগণ তাঁহার মানসিক বিকার বলিয়া ধরিল। তাঁহার পুত্রের বিদ্যারম্ভ যথাসময়ে করাইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বালকের শাস্ত্র অপেক্ষা শস্ত্র-চর্চ্চায় প্রতি বেশী ঝুঁকিলেন; ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা ক্ষত্রচর্য্যের প্রতিই পুত্রকে সমধিক অনুরাগী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। উড়িষ্যা হইতে এক শিষ্যকে ডাকাইয়া গণেশ তাঁহার পুত্রকে অসিচালনা, গদাযুদ্ধ, অশ্বচালনা প্রভৃতি বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। বালক ব্রাহ্মণপুত্র হইয়াও ক্ষত্রিয়পুত্রের মত যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেলে, বালক যৌবনের মুখে উপস্থিত হইল। তখন একদিন সন্ন্যাসী গণেশকে বলিলেন—"আমার গুরুদেবের নিকটে প্রাপ্ত বিদ্যাবলে আমি তোমাকে একটা স্বর্ণময়ূর নির্ম্মাণ করিয়া দিব। তুমি একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। আমার সেই স্বর্ণময়ূরকে মন্ত্রপূত করিয়া তোমার মন্দিরের চূড়ায় বসাইয়া দিব। যতদিন মন্দিরের চূড়ায় ময়ূরটী থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্যে কোন অলক্ষণ ঘটিবে না। কোথাও কোন অন্যায় কার্য্য ঘটিবার কথা উপস্থিত হইলেই ময়ূর কেকারবে সকলকে জাগাইয়া তুলিয়া সাবধান করিয়া দিবে। তুমি আমায় ময়ূর নির্ম্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দাও।"

সন্ন্যাসীর আদেশে গণেশ তাঁহার দস্যুশিষ্য প্রভৃতিকে ডাকাইয়া তাহাদের দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাসীর আবাসে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া গ্রামবাসীরা সভয়-চিত্তে শ্রবণ করিত যে, সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে সর্পগর্জ্জনের মত কি এক ভীষণ শোঁ শোঁ শব্দ আসিতেছে, এবং আশ্রমের এক কোণ হইতে ভীষণ ধোঁয়া ও আগুনের হল্‌কা প্রভৃতি দেখা যাইত। অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা ঐ সকলকে সন্ন্যাসীর অনুচর সহচর ভূতপ্রেতের কাণ্ড বলিয়া মনে করিত। ক্রমান্বয়ে এইভাবে বৎসর দুই কাল কাটিয়া গেলে ঐ সমস্ত ধোঁয়া শব্দ সমস্তই থামিয়া গেল।

ইত্যবসরে গণেশ শর্ম্মা নিজের বাসগৃহ ও সন্ন্যাসীর আশ্রম উভয়ের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিলে সন্ন্যাসী মহা যাগযজ্ঞ সহকারে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন, গ্রামবাসীরা নির্ব্বাক হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর সহসা একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখিল যে, সেই মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি প্রশান্ত স্বর্ণময়ূর বসিয়াছে—তাহার উপরে নবোদিত সূর্য্যের কনক কিরণ প্রতিফলিত হইয়া চারিদিক ঝল্‌সাইয়া দিতেছে। মন্দিরটী আটতলা। তাহার শীর্ষদেশে উঠিবার একটা সিঁড়ি ছিল। সর্ব্বোচ্চ কক্ষের ছাদের উপর ময়ূরটী সুকৌশলে স্থাপিত হইয়াছিল। চূড়ার উপরে ময়ূর সংস্থাপিত হইবার পর অবধিই "পিশাচসিদ্ধ" সন্ন্যাসী সেই মন্দিরের নিম্নতম প্রকোষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর ভয়ে গ্রামবাসীরা সন্ন্যাসীর আশ্রমের মত এই মন্দিরের দিকেও যাতায়াত করিতে সাহস করিত না।

ময়ূর স্থাপনের মাসখানেকের মধ্যেই গণেশ শর্ম্মার মৃত্যু ঘটিল। স্বর্ণময়ূরও সহসা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন, তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে। গ্রামবাসীরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে মন্দিরাভিমুখে আসিয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে গণেশ শর্ম্মার মৃত্যু সংবাদ দিয়া সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে গণেশ শর্ম্মা স্বীয় কিশোরবয়স্ক পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—"বাবা ঠাকুর! আমি তো চলিলাম—তোমার হস্তে আমার পুত্রকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরলোক যাত্রা করিলাম। ভগবানের প্রত্যাদেশ যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তাহা তুমি করিও।" পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস! এই সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদের পরম হিতৈষী; তুমি ইহাঁকে গুরুপদে বরণ করিয়া ইহাঁর আদেশ মত চলিলে রাজ্যলাভ করিতে পারিবে। আমার বংশধরেরা ইহাঁরই শিষ্যবর্গের নিকট যাহাতে বংশাবলীক্রমে দীক্ষা গ্রহণ করে, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিও।"

অশৌচান্তে গণেশপুত্র যথোচিত সমারোহে পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন। পরে একদিন সন্ন্যাসীর আদেশে তিনি আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ন্যাসী সকলের সম্মুখে গণেশপুত্রের মস্তকে একটী রত্নমুকুট পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার ললাটে পূজার সিন্দূরে রাজতিলক পরাইয়া তাঁহাকে "পাণ্ডুরাজা" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। গ্রামবাসী সকলেই ভয়ে ভক্তিতে সন্ন্যাসীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইল। জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ সার্থক হইল। গ্রাম-

বাসীরা তাঁহাকে যথারীতি খাজনা দিতে আরম্ভ করিল। তদবধি রাজ্যের নাম হইল "পাণ্ডুয়া।"

কয়েকপুরুষ ধরিয়া অবিচ্ছেদে পাণ্ডুরাজার বংশ পাণ্ডুয়ার সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিলেন। বংশের বয়ঃজ্যেষ্ঠ যিনি, তিনিই "পাণ্ডুরাজা" নাম ধারণ করিয়া রাজপদ অধিকার করিতেন। উপন্যাসের প্রারম্ভে যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে যিনি পাণ্ডুরাজা ছিলেন, তাঁহারই দুই পুত্র এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাদের তদানীন্তন গুরুদেব উপরোক্ত সন্ন্যাসীর শিষ্যপরম্পরায় আগত শিষ্য স্বামী সত্যানন্দের নিকটে যাইতেছিলেন। স্বামী সত্যানন্দ পরমহংস। তিনি বর্ত্তমান পাণ্ডু-রাজাকে স্বর্ণময়ুর জাগ্রত রাখিবার মন্ত্রকৌশল শিক্ষা দিয়া কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে সাধনভজনের সুবিধার জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন। পাণ্ডুরাজের সমৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার রাজ্যের রাজধানী পাণ্ডুয়া সহরেও নানাবিধ কোলাহল কলরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বামী সত্যানন্দের তাহা ভাল লাগিত না।

ক্রমশঃ।

মনোভাব।

রচয়িতা—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ

মনে করি ধরি ধরি, ধরিতে না পারি ;
এ কেমন ভাব প্রভো ! বুঝিতে যে নারি !
মনে আসে কথা কিন্তু মুখে নাহি ফুটে,
বলিতে বাসনা সব বলি অকপটে,
এ বিষম প্রহেলিকা বুঝা নাহি যায়,
আনন্দ বিষাদে মন নিমগন তায়।
ঘুচাইয়া দাও নাথ ! এ বিশাল ধাঁধা,
পরাণ শান্তিতে গ'লে খুলে যাক বাধা।
দিবা নিশি মন প্রাণে হউক মিলন।
হৃদয় আসন হোক্ শান্তির সদন॥

শাঁখা ও সিন্দূর।

লেখক—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, প্রকৃতি গম্ভীর। উচ্চ ঝাউ গাছের একটানা সাঁই সাঁই শব্দে, মাঝে মাঝে ঝটিকাতাড়িত শুষ্ক পত্রের খস্ খস্ শব্দে প্রকৃতিকে আরও গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও কোন সৌধপরে রাত্রিচর কাল পেচকের কর্কশ রব শুনা যাইতেছে কি যাইতেছে না; কোথাও কোন উচ্চ বৃক্ষশাখে উল্লুকের উৎপাতে কুলায় বসিয়া ভয়াকুল কাকেরা ডাকিতেছে কি ডাকিতেছে না; কোথাও কোন দূরস্থ পল্লীতে শৃগালেরা এক একবার তারস্বরে চীৎকার করিতেছে কি করিতেছে না; কোথাও কোন গ্রাম্য কুকুরের বিকট রব শুনা যাইতেছে কি যাইতেছে না। হরনাথের সদর মহলে ছট্টুলাল নিদ্রা যাইতেছে কি নিদ্রা যাইতেছে না! উহার নাসিকা-গর্জ্জনে রামলাল ও সখিলালের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতেছে কি ঘটিতেছে না; তাহারা বিরক্ত হইয়া এক একবার গালি পাড়িতেছে কি পাড়িতেছে না; সকলেই বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শুইয়াছে কি না শুইয়াছে জানি না। তবে যাহারা অনাহারক্লিষ্ট, যাহারা উৎকট পীড়াগ্রস্ত, যাহারা গূঢ় চিন্তায় ব্যস্ত, যাহারা পরের অনিষ্ট করিতে সিদ্ধহস্ত, যাহারা দুষ্কার্য্যে রত, তাহারাই কেবল জাগ্রত। আর জাগ্রত কে? মোক্ষদা।

মোক্ষদা একবার এ পাশ, একবার ও পাশ করিতেছেন। দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শুইয়াও তাঁহার নিদ্রা নাই। মোক্ষদা ভাবিতেছেন,—

"বুড়োকে একবার হাত কর্‌তে পার্‌লে সব গোল চুকে যায়। কর্‌তেই বা কতক্ষণ? চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। মিন্সে যেমন আমার কথা অমান্য করেছে, তেমনি নাকাল না করে আর ছাড়্‌ছি না। জামায়ের কথা পাড়্‌লে, আমার মুখে হাসি দেখ্‌লে, মনে করে জামায়ের ওপর আমি খুব সন্তুষ্ট আছি। আ—মর্ মিন্সে! আমি কি সে জন্যে হাসি? কবে ও মুখে কান্না দেখে হাস্‌ব

তাই হাসি। সামান্য এটা বুঝ্‌তে পারে না, আবার আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে আসে! জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ! রোস; আর বড় দেরী নেই। এবার ঘাড় ভাঙ্‌বোই ভাঙ্‌বো। এখন আর সে কাল নেই, 'কাল পড়েছে কলি, ত কলির মত চলি।' আর ধর্ম্মপথে এ কালে কিছু হয় না। আজ কাল যে যা কিছু করেছে, তা অধর্ম্মপথে থেকেই করেছে। ধর্ম্মপথে অলাভ ছাড়া লাভ নেই, দুঃখ ছাড়া সুখ নেই। আমার আবার ধর্ম্ম! যা কর্‌বার তা এক-কালে করেছি। এখন অধর্ম্ম কর্ত্তে বসেছি, অধর্ম্মই করব, ধর্ম্মের আর ধার ধারি নে। অধর্ম্মের গোড়া মিথ্যে। মিথ্যে করে না বল্লে আর চল্‌ছে না। বুড়ো যেমন আমায় বিশ্বাস করে, আমিও তেমনি নলির শ্বশুরদের উপর মিথ্যে দোষ দিয়ে বুড়োকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌বো—বুড়ো চটে খুন হবে। অন্যায় শুন্‌লে কে রাগ না করে থাক্‌তে পারে? বুড়োও রেগে উঠ্‌বে—যখন রেগে উঠ্‌বে, আমিও সেই সময় মিন্সের হয়ে পাঁচটা গাল পাড়্‌বো, নলির জন্যে দুঃখ কর্‌ব। আমি জামাইকে যে ভালবাসি তা মিন্সে জানে। তবেই আমাকে আর সন্দেহ কর্‌তে পারবে না, নলির শ্বশুরদের ওপর খুব চটে যাবে; মিন্সে আমার মুঠোর ভেতর এসে পড়্‌বে। তখন যা খুসি তাই কর্‌তে পার্‌ব। কোন গোল বাধ্‌লে এক কথায় সব গোল মিটিয়ে দোব।"

"এখন করি কি? ঠিক মনে পড়েছে। মিন্সেকে দেখিয়ে একদিন একটা ভেট পাঠান যাক্‌। তারপর সেই ভেট নিয়ে একটা কাণ্ড বাধাব। মিন্সের যাতে রাগ বাড়ে তাই কর্‌ব। একদিন কেন? কালই একটা ভেট পাঠান যাক্‌, তারপর যে দিন জামাই আন্‌বার কথা বোল্‌বে, সেই দিন কাজও গুছিয়ে নোবো।"

মনস্কামনা সিদ্ধির উপায় স্থির করিয়া কুটিলা মোক্ষদা নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিলেন। শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবী সুকোমল ক্রোড়ে কোমলাঙ্গী মোক্ষদাকে লইলেন কি না জানি না, মোক্ষদা যেন কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন, কিন্তু তাঁহার গর্ব্ব-স্ফীত ওষ্ঠদ্বয় অল্প অল্প স্পন্দিত হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হরনাথ। দেখ, জামাইকে কাল নিমন্ত্রণ করে পাঠাও।

মোক্ষদা। তা তুমি পাঠাও না? তোমাকে ত কেউ বারণ করেনি?

হরনাথ। এতদিন হয়ে গেল, জামাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, তাই বল্‌ছি।

মোক্ষদা। ও গো! তোমাকে অত করে বোঝাতে হবে না, তোমার কথার আগেই আমি বুঝে নিয়েছি।

হরনাথ। তা তুমি বুঝ্‌বে না ত বুঝ্‌বে কে? সত্য বল্‌চি তামাসা নয়, জামাইকে কালই নিমন্ত্রণ করে পাঠাও।

মোক্ষদা। তা, তুমি পাঠাতে পার না? সে কথা আমায় বার বার শুনাচ্চ কেন?

হরনাথ। কেন বল দেখি,—তুমি কেউ নয় নাকি?

মোক্ষদা। রকম দেখে তাই মনে হয়! তোমায় মানে কে? ভয় করে কে?

হরনাথ। কেন? তোমায় কেউ কিছু বলেছে নাকি? তোমায় ভয় করে না এমন লোক তো দেখ্‌তে পাইনে। বুঝি কেউ কিছু বলেছে? তা না হলে এত রাগ কেন?

মোক্ষদা। তা রাগ কিসে? আমায় পাঁচ কথা বল্‌বে, এ আর কথা কি?

হরনাথ। কেন? কি হয়েছে, স্পষ্ট করেই বলনা? তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে!

মোক্ষদা। তা তুমি বুঝ্‌বে কেন? যদি বাড়ীর খবর রাখ্‌তে, তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে।

হরনাথ। তোমার সঙ্গে কেউ বক্‌তে পার্‌বে না, এক কথা বল্লেই হয়।

মোক্ষদা। ভাল না লাগে, কাণে আঙ্গুল দিয়ে বসে থাক। আর কিছু শুনে কাজ নাই।

হরনাথ। থাক্‌তে পার্‌লে অনেক কালই থাক্‌তাম। তোমায় বলে কষ্ট পেতে হবে কেন? সত্য বল্‌চি, ওদের উপর তোমার এত রাগ কেন বল দেখি? তারা ত তোমার গায়ে ছুঁচ ফোটাতে যায় নি?

মোক্ষদা। ছুঁচ ফুটিয়েচে কি না ফুটিয়েচে, সে খবর কি রাখ? তুমি কেবল জামাই জামাই করেই উন্মত্ত!

হরনাথ। সে যা হউক, জামাইকে ডাক্‌তে পাঠালে, তাঁরা পাঠাবেন না, এ কেমন কথা ! অবশ্যই পাঠাবেন।

মোক্ষদা। সেইজন্য বল্‌ছি একটু ভেবে চিন্তে বল্লে সহ্য হয়। তুমি মনে কর, মেয়ে দিয়ে তাদের মাথা কিনে রেখেছ। জামাইকে যখনই ডাক্‌তে পাঠাবে, তখনই হাজির হবে। দেখ, কামার বাড়ী গিয়ে বুদ্ধিটে পিটিয়ে সরু করে এসোগে !

হরনাথ। আমি কি অন্যায় বলেছি ? এই যে পাড়ায় এত ঘর রয়েছে, কাদের জামাইকে ডাক্‌লে আসে না, বল ত দেখি ?

মোক্ষদা। ও হরি ! আমার কথা বুঝ্‌তে পার নি বুঝি ! এ সামান্য কথা আমায় আবার খুলে বল্‌তে হবে ! সে ঘর বুঝে আছে। এই যে কথায় বলে—

"কোঁদল নাড়ী কোঁ কোঁ করে।
কোঁদল নইলে রইতে নারে॥"

ওদের তাই। তাতে আবার ছেলে কালেজের পড়া পড়্‌চে, আর কি রক্ষে আছে ? এক হনুমানেই রক্ষে নেই, তাতে আবার সুগ্রীব !

হরনাথ। কেন ? তারা ত খুব ভাল লোক ! ঝগ্‌ড়াটে নয় ত !

মোক্ষদা। এই জন্যই ত তোমার কথায় থাকিনি। আমার কথা যখন বিশ্বাস কর না, তখন তোমায় বলে কি ঝক্‌মারিই করেছি ! এই নাকে কাণে খৎ, আর না, যা হবার বেশই হয়েচে ! শেষে কিছু হলে, আমারই দোষ দিয়ে বস্‌বে ! আমিই যত নষ্টের গোড়া, এর জন্যেই সংসারটা অধঃপাতে গেল ! তাই বলি, এই বেলা দেখে শুনে নাও, আমিও পথ দেখি।

এই বলিয়া চতুরা মোক্ষদা গমনোদ্যতা হইলেন। হরনাথ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"অত রাগ কেন, শুনই না বলি।"

মোক্ষদা। আর মাথামুণ্ডু শুনে কাজ নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, পদ্মর মা ত ঘরে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করলেই সব বুঝ্‌তে পারবে।

হরনাথ মহা বিভ্রাটে পড়িলেন, বলিলেন,—

"না-না, আমার কথা কি ভুল হ'তে নেই ? আমি ওদের ভাল বলে জান্‌তেম তাই বল্লেম। এতে আর রাগের কথা কি ? তোমার কথায় ত অবিশ্বাস করি নাই।"

মোক্ষদা অবসর বুঝিয়াই দুই কথা বলিয়া লইলেন ; বলিলেন,—

"তোমায় বার বার মানা করেছিলাম, তুমি আমার কথায় কাণই দিলে না, তোমার যেমন কর্ম্ম এখন তেমনি ভোগ।"

হরনাথ। কি হয়েছে বল দেখি।

মোক্ষদা। তা হয়েছে বেশ। আবার আমায় কেন ? আমি ও সব কথার ভেতর নেই।

হরনাথ। আহা ! বলই না গা ! অত বাঁকায় কাজ কি ?

মোক্ষদা। তা শুন্‌বে কি ? এই সে দিন পদ্মর মা, জামাই বাড়ী তত্ত্ব নিয়ে গেছ্‌লো। তোমার সুমুখেই ত তত্ত্ব পাঠালুম। তাদের তেমন তত্ত্ব মনে ধর্‌ল না; পদ্মর মাকে কত ঠাট্টাই কর্‌লে, পদ্মর মা ভাল মানুষ, কিছু না বলে মুখ বন্ধ করে চলে এলো। ভয়ে ভয়ে চলি বলেই ত তাদের জোর। তুমি যেমন একটুতেই জুজুবুড়ি। সব কথাতেই থাক্ থাক্। অপর কেউ হলে কেমন চুপ্ করে থাক্‌ত দেখতে। তারা ত তোমার মত ভীতু নয়। আবার সেই নিয়ে ঘোঁট কত ? কে আর তাদের কথা শুন্‌তে গেছে, লোকের মুখে কত কথাই শুন্‌তে পাই। সব কথা লিখে রাখ্‌লে, একখানা পুঁথি হয়ে যায়। লোকের সাক্ষাতে বলে কি, "ওরা আবার বড় মানুষ ! ওদের চেয়ে রামাহাড়ীর অনেক টাকা আছে !" এ কথা ত রাতদিন যার তার কাছে বল্‌ছে। আবার জামাইকে ডাক্‌তে গেলেই, একটা ওজর করেই আছে। আজ পেটের অসুখ, কাল মাথার অসুখ, পরশু এক্‌জামিন, এই রকম কত ওজরই করে, তার সংখ্যা নাই। ঝিকে বলে কি,—"কি গো বড়মানুষের ঝি ! জামাইকে ডাক্‌তে এসেছ ? দেখ, তোমাদের গিন্নিকে বোলো, জামাই গরীব বলে যেন অচ্ছেদ্দা না করে, জামাই কি পর ?" দেখ দেখি, এসব কথা শুন্‌লে রাগ হয় কি না ? নলির শাশুড়ীর কথা শুন্‌লে আমার পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে ওঠে। সত্যি বল্‌চি, তুমি যাই বলনা কেন, রাগির কথা শুনে আমার এমন রাগ হয় যে, পাঁশ পেড়ে কাট্‌লেও রাগ যায় না। আমি বলেই সব সহ্যি করে আছি, আর কেউ হ'লে দিত দশ কথা শুনিয়ে। ছেলের মা,—ছেলের মাই আছে, তা বলে মুখ নাড়া সহ্য হয় না।

হরনাথেরও বিলক্ষণ ক্রোধ জন্মিল। নলিনীর শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি রূঢ় কথা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াও মোক্ষদার বিপক্ষে কোন কথা বলিতে হরনাথ ইচ্ছা করিলেন না, বরং মোক্ষদারই উপর সন্তুষ্ট হইলেন। দুষ্টবুদ্ধি চতুরা মোক্ষদা হরনাথের চক্ষে ধূলি দিলেন, অল্পেই হস্তগত করিলেন। বৈবাহি-

কের প্রতি বিলক্ষণ ক্রোধ জন্মিলেও শান্ত প্রকৃতি হরনাথ বাহিরে প্রকাশ করিলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"যা হবার তা হয়েছে, নলিনীর অদৃষ্টে যা লেখা আছে তাই হবে। এখন একবার জামাইকে আনাবার বড় আবশ্যক হয়েছে, যে উপায়েই হউক জামাইকে আন্‌তেই হবে। এক্‌জামিন শেষ হয়েছে, কালই নিমন্ত্রণ কর্‌তে লোক পাঠাও।"

হরনাথকে রাগান্বিত বুঝিয়া মোক্ষদা মনে মনে সুখী হইলেন। বলিলেন,—

"আমায় আর কেন, তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি লোক পাঠাও। আমি হার মেনেছি।"

চতুরা মোক্ষদার চাতুর্য্যজালে জড়িত হরনাথ সরোষে বলিলেন,—

"আচ্ছা, কালই আমি লোক পাঠাচ্ছি। এবার জামাই যদি না আসে, তখন বুঝা যাবে।"

নবম পরিচ্ছেদ।

পরদিন হরনাথ শুভক্ষণে জামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বাটীতে মহাধূম পড়িয়া গেল। কেহ ঝাড় দেওয়ালগিরী ঝাড়িতে লাগিল, কেহবা বৈঠকখানার আস্‌বাবের সামগ্রী যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিতে লাগিল। এইরূপে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে বড়ই ব্যস্ত। আর মোক্ষদা স্থির, ধীর, গম্ভীর। চোখে হাসিও নাই, কান্নাও নাই, মুখে বিরাগও নাই; যেন সংসারে নির্লিপ্ত সিদ্ধপুরুষ।

প্রতিবেশিনীদিগের বাটীতেও মহা ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কোন সুন্দরী বাছিয়া বাছিয়া মূল্যবান সাড়ী বাহির করিতেছে, কোন সুন্দরী মধ্যাহ্নেই সালঙ্কৃতা ও সবস্ত্রা হইয়া হরনাথের বাটীতে গমনেচ্ছায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে; একবার এ ঘর, একবার ও ঘর করিতেছে; কোন সুন্দরী মনোমত বস্ত্রালঙ্কার অভাবে অভিমানে কান্না জুড়িয়া দিয়াছে কোন সুন্দরী রসিকতা করিবার জন্য পুরাতন ছড়া ও হিঁয়ালি আবৃত্তি করিতেছে, অঞ্চল ধরিয়া ছেলে বিকট কান্না জুড়িয়া দিলেও রসিকতার আক্ষেপ নাই! ফল কথা, প্রতিবেশিনীমহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

নলিনীর অন্তরে আজ সুখ নাই। তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না।

সঙ্গিনীরা ভয়ে ভয়ে গুটি গুটি আসিল, নলিনীর কাছে বসিল; নলিনী কিন্তু উহাদিগের সহিত মিশিল না, উঠিয়া ধীরে ধীরে আপনার ঘরে চলিয়া গেল। অনিন্দ্যমুখ-মণ্ডল ম্লান দেখিয়া সঙ্গিনীরা বুঝিল, নলিনীর অন্তরে সুখ নাই। সখীর বিষণ্ণতার কারণ সঙ্গিনীরা বুঝিল, বুঝিয়াই নলিনীর পিছু পিছু গেল, নির্জ্জন দেখিয়া উমা জিজ্ঞাসিল,—

"নলি! তোর কি হয়েছে ভাই? আজ তুই এমন কেন?"

নলিনী একবার কথা কহিল,—মনোভাব গোপন করিয়া বলিল,—

"কিলা! তোদের যেমন ঠাটের কথা!"

বিরজা বলিল,—

"না ভাই; তুই যাই বল্, তোর মনে সুখ নেই, আমরা তোর মুখ দেখেই বুঝেছি, তুই আমাদের কাছে ঢাক্‌ছিস্, তা ঢাক্ না লো ঢাক্, আমরাও তোকে আর কিছু বল্‌তে চাইনে, এই চল্লুম!"

বাস্তবিক সঙ্গিনীদের কথাই সত্য। স্বামী গরীব, গরীবের সহিত একত্র থাকিতে হইবে, তোষামোদ করিতে হইবে, তাহার কথায় উঠিতে বসিতে হইবে, নলিনী ইহা পারিবে না। যৌবনসুলভ লজ্জাবশতঃ সঙ্গিনীদের নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে নলিনী পারিল না,—মিথ্যার আবরণ দিয়া বলিল,—

"সত্যি বল্‌চি, আমার কিছু হয় নি।"

কমলা বিশ্বাস করিল না, বলিল,—

"কি লা, আবার তুই মিথ্যা বল্‌ছিস? তবে তুই চুল বাঁধিস্ নি কেন? ভাল কাপড় পরিস্‌নি কেন? গায়ে গয়না নেই কেন? পায়ে আল্‌তা নেই কেন? আজ তোর সোয়ামী আস্‌বে, বলিস্ কি লো? একবার মাথাটাও ত বেঁধে রাখ্‌তে হয়! তোর সব উল্টো! আবার এদিকে নিত্যি নিত্যি গয়না পরা হয়, জরির কাপড় পরা হয়, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করা হয়; আজ একেবারে কিছুই নেই! অন্যদিন না পর্‌লি, আজ পর্‌বার দিন। তোর মা ত তোকে কিছু বলেন নি, আমাদের মা হ'লে বোকে বোকে সারা হতেন। এই না তুই মায়ের আদুরে মেয়ে! এই বুঝি আদর! ঢং দেখে আর বাঁচিনে!

বিরক্ত হইয়া নলিনী বলিল,—

"আচ্ছা লো আচ্ছা, তাই কর্‌ব। তোদের মতন ত খোসামুদে নই, আস্‌বে শুনে, সেজে গুজে থাক্‌তে হবে! আ-মরি আর কি!

কমলার বড় রাগ হইল, রাগে রাগে বলিতে লাগিল,—

"দেখ্ নলি! সোয়ামী গুরুজন, মরি মরি মরি কি লা!
ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে? তোর যে ভারি আস্পর্দ্ধা বেড়েছে। আগে এমন ছিলিনে ত! মেয়ে মানুষের অত বাড় ভাল নয়।"

নলিনী নীরব হইয়া রহিল, আর কোন কথা কহিল না। কমলা আবার বলিল,—

"তবে তুই মনে করেচিস্ কি? বাপের বাড়ী চিরকাল থাক্‌বি?"

মোক্ষদার কূট-কৌশল-কীটদষ্ট-হৃদয়া আত্মভিমানিনী নলিনী ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া অভিমানভরে বলিল,—

"হাঁ—থাক্‌বো। শ্বশুরবাড়ী দাসীপনা কর্‌তে পার্‌ব না।"

নলিনীর গর্ব্ব দেখিয়া কমলা বিস্মিত হইল, ঘৃণায় ও রাগে বলিল,—

"দাসীপনা কি লা?"

নলিনী সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল,—

"দাসীপনা না ত কি?"

সঙ্গিনীরা অবাক হইল, নলিনীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। নলিনী আবার বলিতে লাগিল,—

"সেখানে গাধার মত খাট আর খাও। যখন যা ইচ্ছে তা খেতে পাব না, যা ইচ্ছে তা পর্‌তে পাবো না, যেখানে ইচ্ছে যেতে পাবো না। কেবল খাট আর থাক। অমন চাক্‌রাণী হয়ে, পরের বশ হয়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।"

নাক মুখ নাড়িয়া কমলা বলিল,—

"আমরা পরবশ! তুই আবার স্বাধীন কবে লা? তুই কি এখন মনে কর্‌লে সব কর্ত্তে পারিস্? এখন যদি আমি তোর কাছে পাঁচ টাকা ধার চাই, তুই দিতে পারিস? তোর কাছে যদি খেতে চাই, তুই খাওয়াতে পারিস? আজ তুই পাঁচ টাকা জমাতে মনে কর্‌লে জমাতে পারিস্? তা পারিস্ নি, তবে তুই স্বাধীন কিসে?"

নলিনী ফাঁপরে পড়িল, ধীরে ধীরে বলিল,—

"কেন, মার কাছে থেকে নোবো। মা না দেন, বাবার কাছে নেবো।"

"আচ্ছা, তাই বেশ কথা; মা বাপের টাকা আছে, তা তোর তাতে কি? তাঁরা যদি না দেন, তুই টাকা কোথা পাবি? তবে তুই স্বাধীন কিসে?"

নলিনী বুঝিল তাহার হার হইয়াছে, কিন্তু সে সহজে হারিবার পাত্রী

নহে, উত্তর ছাড়িয়া প্রশ্ন ধরিল, বলিল,—

"তোরা স্বাধীন কিসে?"

কমলা সগর্ব্বে বলিতে লাগিল,—

"আমরা স্বাধীন নয় ত কি লা? আমরা মনে কর্‌লে যা ইচ্ছে তা কর্‌তে পারি;—পাঁচ টাকা কেন, একশ টাকা গুণে, দিতে পারি, এই দেখ আমার কাছে চাবি।"

ইহাতেও কমলার তৃপ্তি হইল না, বস্ত্রাঞ্চল হইতে চাবির গুচ্ছ হস্তে লইয়া বলিল,—

"দেখ্, যাঁর এই চাবি, তাঁরই বলে আজ স্বাধীন, যাঁর জন্যে সিঁথেয় সিঁদূর পরেছি তাঁরই বলে আজ স্বাধীন, যাঁর জন্যে হতে শাঁখা, তাঁরই বলে আজ স্বাধীন। আজ যে আমরা তোর সঙ্গে এত জোর কোরে কথা কচ্ছি, সেও তাঁরই বলে—সেই একজনের বলে আমরা, নড়্‌চি ফির্‌চি, আজ আমাদের মতন সুখী কে? তোর সবই আছে, হেলায় হারাতে বসেছিস্। যদি স্বাধীন হ'তে ইচ্ছে করিস্, তা'হলে সোয়ামীকে ভক্তি কর্‌তে শেখ্। সোয়ামীর সেবার চেয়ে আর পুণ্যি নেই। সোয়ামীই পরম গুরু, সোয়ামীই পরম দেবতা, সোয়ামীকে অভক্তি অশ্রদ্ধা করিস্ নি! সোয়ামীকে ভক্তি কর্‌লে, ভালবাস্‌লে সুখী হবি, স্বাধীন হবি। তাই এমন সোয়ামীর নিন্দে কোরে পাপের বোঝা আর ভারি করিস্ নি। নারী হ'য়ে জন্মেছিস্, অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়! পাপে মর্‌বি যে!"

নলিনী যেন কেমন কেমন হইল। কমলার উপদেশ তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল কি না জানি না। কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নলিনীকে মোক্ষদা ডাকিলেন,—

"নলি! ও নলিনী!"

"কেন মা!"

"এ দিকে আয় মা, এ দিকে আয়।"

অমনি নলিনী উঠিল, সঙ্গিনীদিগের প্রতি চাহিয়া বলিল,—

"যাই ভাই! মা ডাক্‌চেন।"

এই বলিয়া নলিনী প্রস্থান করিল।

সঙ্গিনীরা নলিনীর ভাব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল, আজ নলিনীর স্বামী আসিবে, নলিনীর অন্তরে আনন্দ ধরিবে না। স্বামী

আসিবার দিনে কোন্ যুবতী বিষণ্ণ হইয়া থাকে? কিন্তু আজ নলিনীর ভাব দেখিয়া তাহারা অবাক হইল, দেখিল নলিনীর সমস্তই বিপরীত। কমলার বড় রাগ হইল; বলিল,—

"ভোগে ওই ভুগ্‌বে, আমরা ত আর ভুগবো না, আমাদের কি?"

নলিনী আর ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া সঙ্গিনীরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ বদনে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ—

সাধক-সঙ্গীত।

সংগ্রাহক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

ও মন! মালিক যে তোর ঘরে। বৃথা খুঁজিস্ কেন দূরে দূরে?
ঘর না খুঁজে বাইরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে,
সাধের জীবন যায় রে বয়ে, আপন কর্ম ফেরে॥
দিবানিশি সে তোমারে, ডাক্‌ছে মৃদুমধুর স্বরে,
তুই কানার মত ইতস্ততঃ দিন কাটালি ঘুরে ঘুরে॥
বলদ যেমন বয় রে চিনি জানে না তার স্বাদ কেমন।
তুইও তেম্‌নি মরিস্ বয়ে স্বাদ ভোগে তার অন্য পরে॥
অপূর্ব্বেন্দ্র বলে রে মন! একবার হৃদয়-ঘরে যাও রে এখন,
ঘরের মাণিক দেখ্‌বে ঘরে, আনন্দ পাবে অন্তরে॥
আপনাকে না জানে যে জন, ও তার পর জানা কি হয় রে কখন?
আপন খবর জানে যে জন, সেই জানে সে কত দূরে॥

গুরু-শিষ্য।

যব্ হাম্ হ্যায় তব্ গুরু নেহি
যব্ গুরু হ্যায় তব্ হাম্ নেহি।
এক মোয়ানমে দো খড়্গ ন সমারে॥

ছায়াদেহ ও স্থাবরসংশ্লেষ।

লেখক—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

শিশু অবস্থায় যাহারা মরে তাহারা ব্যতীত সাধারণ পুণ্যপাপকারী ব্যক্তিমাত্রই কিছুদিন ছায়াদেহে থাকিয়া জন্মগ্রহণ করে। দেহীমাত্রেরই ইহা নিয়ম। মৃত্যুর পর গ্রহণীয় দেহই ছায়াদেহ, লিঙ্গদেহেরই প্রকারভেদ। যে স্থূলদেহ দেহী ত্যাগ করিয়া যায়, তাহারই ছায়াকার দেহ ছায়াদেহ। ইহা সংস্কারমূলক মনোময় দেহ! এ দেহে পাপপুণ্যের ফলভোগ না হইলেও জীবদ্দশায় পরিচিত সাধারণ সুখ-দুঃখবোধ, ক্ষুধাতৃষ্ণাবোধ বা ক্লান্তিস্বস্তিবোধ অবশ্য থাকে। এই ছায়াদেহে জীব ততদিন অবস্থিতি করে যতদিন তাহার পূর্ব্বদেহের পর দৃঢ় আসক্তিটি লোপ না পায়। পূর্ব্ব স্থূল দেহের উপর আসক্তি কমিয়া আসিলেই পরবর্ত্তী স্থূল দেহের উপর আসক্তি ফুটিয়া উঠে, নূতন আসক্তিটি সম্যক্ ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বদেহের সংস্কারও বিলীয়মান হইতে থাকে। এইরূপে গাঢ় ভাবনাদ্বারা চিত্রিত ধ্যেয় মূর্ত্তির মত ছায়াদেহটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া ক্রমে বিলীন হইয়া পড়ে। সংস্কারলোপে সংস্কারমূলক দেহের লয়।

বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুঝান আবশ্যক। মৃত্যুর সময়ে সকল দেহীকেই একটি মূর্চ্ছা (তা সে এক লহমার জন্য হইতে পারে) আসিয়া অধিকার করে। সেই মূর্চ্ছার অন্তরালেই দেহী অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যুকে লাভ করে। মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইতে পারিলে জীবের যেমন স্বস্তি, মৃত্যুকালে পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিতে পারিলে দেহীরও তেমনই স্বস্তি। মৃত্যুর পর "আমার দেহ" এইরূপ সংস্কার বলবতী থাকে বলিয়া সংস্কারানুরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী স্থূলদেহের ছায়াকারটি দেহীকে গ্রহণ করিতে হয়। আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি—প্রয়াগে গেলাম, গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থানটি দেখিলাম। তখন ত চক্ষু মুদ্রিত, শরীরটি অসাড় ভাবে শয্যোপরে শায়িত; বুঝিতে হইবে, এই চক্ষু নহে অথচ এই চক্ষুর মত চক্ষু, এই দেহ নহে অথচ এই দেহের মত দেহ লইয়া আমি প্রয়াগে

যাইয়া গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম স্থানে গিয়াছিলাম। স্বপ্নের দেহ যেমন দেহ, পরলোকে ছায়াকার দেহও ঐ রকমই দেহ। পরলোকটি স্বপ্নের সহিতই উপমিত হইয়া থাকে।

মরণান্তে ছায়াকার দেহ পাইয়া দেহী জীব অনির্দ্দিষ্টলক্ষ্যে ছুটিয়া যায়। পরবর্ত্তী স্থূলদেহ না পাইলে তাহার অনির্দ্দিষ্টলক্ষ্যে ছুটিয়া চলার বিরাম হয় না। স্থূলদেহ কি উপায়ে পাইবে, কোন্ স্থানে উহা মিলিবে, দেহী তাহা জানে না। এ অবস্থাকে ক্ষিপ্ত শৃগালাদির উন্মত্তপ্রায় অবস্থা বলা যাইতে পারে। এ অবস্থায় প্রিয়জন সম্মুখে দেখিলেও দেহীর তৃপ্তি হয় না। সম্মুখে শীতল সরোবর, তৃষ্ণাও বলবতী, কিন্তু জল খাইবার উপায় নাই—এ অবস্থা যেমন কষ্টকর,—প্রিয়জনকে সম্মুখে দেখিয়া স্পর্শ করার অধিকার নাই, আদর করার যো নাই, এ অবস্থা তেমনই কষ্টকর। প্রিয়জনও ছায়াকার দেহীকে দেখিতে পায় না, ছায়াকার দেহীও আপনার উপস্থিতি প্রিয়জনকে কোনমতে বুঝাইতে পারে না। তবে কখন কখন জীবিত ব্যক্তি যে স্বপ্নে মৃতব্যক্তিকে দেখিতে পায়, তাহাতে মৃতব্যক্তির অপেক্ষা জীবিত ব্যক্তিরই ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য সূচিত হয়। স্বপ্নে দেখা দেওয়ায় মৃতব্যক্তির ইচ্ছা থাকিলেও সর্ব্বত্র দেখা দেওয়া তাহার সম্ভব হয় না। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষিপ্ত শৃগালাদির মত উন্মত্তপ্রায় সে অবস্থা; তখন সে ইচ্ছাও না জাগাই স্বাভাবিক।

ছায়াদেহে অবস্থিতি সংহিতাকারগণের মতে দুইমাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত (স্বর্গনরকে যাঁহারা যান তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র)। মনুষ্যেরা আবার দশদিন হইতে (অধিকারী ভেদে) একমাস পর্য্যন্ত ছায়া দেহেরই স্থূল অবস্থা আতিবাহিক দেহ লাভ করিয়া থাকে।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য পশু পক্ষীরা পর্য্যন্ত মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহ ধারণ করিবে। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত সংহিতা গ্রন্থ অধিক প্রামাণিক গ্রন্থ। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ মনুষ্যমাত্রেরই আতিবাহিক দেহ ধারণের কথা সমর্থন করিয়াছেন। এই আতিবাহিক দেহ নাশের জন্যই আধ্যাত্মিক-চিকিৎসাস্বরূপ দশপিণ্ডের ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে।

আতিবাহিক দেহ নাশের পর পূর্ব্বোক্ত ছায়াদেহ। আতিবাহিক দেহ, বলিয়াছি ত, ছায়াদেহেরই অপেক্ষাকৃত স্থূল অবস্থা মাত্র। ছায়াদেহে অবস্থিতি, তুলনায় বলা যায়, যেমন বিচারের পূর্ব্বে আসামীর হাজত বাস। ছায়াদেহে পাপের ক্ষয় নাই, হাজতবাসেও দণ্ডের স্বরূপ নাই।

ছায়াদেহে অবস্থিতিকালে পুণ্যবান্ ব্যক্তি সুসংস্কার-বশে ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট পান না; পাপকারী ব্যক্তি সে কষ্ট পান, ইহাই পার্থক্য। জীবিত পুত্রাদি যদি সে সময়ে "এই অন্ন, এই জল তোমাকে দিলাম" এইরূপ সংস্কার উৎপন্ন করিয়া দেয়, তবে মৃত ব্যক্তির ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্টটি দূর হইতে পারে। এই জন্য অন্নদান জলদানের মন্ত্রের মধ্যে একটি আদেশের ভাব আছে।

ছায়াদেহে কি পুণ্যকারী কি পাপকারী সকলকেই অবস্থিতি করিতে হয়। স্বর্গে বা নরকে যে স্থানেই যাও, তৎপূর্ব্বে ছায়াদেহে সকলকেই থাকিতেই হইবে। ছায়াদেহ-গ্রহণ কি স্বর্গগামী কি নরকগামী সকলেরই অপরিহার্য্য।

"সংবৎসরে দেহমতোঽন্যংচ প্রতিপদ্যতে। ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥"

পারলৌকিকার্থ পুণ্যকারী ব্যক্তি স্বর্গে, উৎকট পাপকারী ব্যক্তি নরকে গমন করে। সাধারণ পুণ্যপাপকারী ব্যক্তি একেবারেই ছায়াদেহ গ্রহণ করে। ছায়াদেহের বিচ্যুতি ঘটিলে কি সাধারণ পুণ্য-পাপকারী, কি পারলৌকিকার্থ পুণ্যকারী, কি বা উৎকট পাপকারী, এমন কি ছায়াদেহ গ্রহণ যাহারা না করে সে সকলব্যক্তিও—সকলকেই তখন স্থূলদেহ লাভের জন্য শস্য আশ্রয় করিতে হয়। সূক্ষ্ম বীজাণুরূপে অতি সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহে দেহীদের অবস্থিতি করার নামই শস্য-আশ্রয়। শস্য-আশ্রয়ই শস্য-সংশ্লেষ বা স্থাবর-সংশ্লেষ। শস্য ভক্ষণের সঙ্গে রসরূপে, রক্তরূপে, পরিশেষে শুক্ররূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যপাপানুরূপ জন্মলাভ করে। দেহীর এই শস্য-আশ্রয়ের নামই (দার্শনিক নাম) স্থাবর-সংশ্লেষ। স্থাবরে লাগিয়া থাকার নামই স্থাবর-সংশ্লেষ। এই শস্য-সংশ্লিষ্ট অবস্থায় দেহী এমন সংমূর্চ্ছিত, এমন সুষুপ্ত ভাবে থাকে যে স্থাবরেরছেদ কর, ভেদ কর, তাহাতে দেহী কোনরূপ কষ্টই অনুভব করিবে না। মনুষ্যদেহে রক্তের ভিতর কত জীব বাস করে, অঙ্গের ছেদন করিলে সে জীবের কি কোন যাতনা উপলব্ধি হয়? পুণ্যকারী ব্যক্তিদের জন্যই এই স্থাবর-সংশ্লেষ। ইহা পাপ জন্ম নহে।

স্থাবর যোনিই পাপ-জন্মবিশেষ। স্থাবর যোনি অর্থাৎ স্থাবরজন্ম আর স্থাবর-সংশ্লেষ এক সামগ্রী নহে। স্থাবরের দেহই স্থাবর যোনির দেহ, এইজন্যই সেই স্থাবর দেহের ছেদন-ভেদনে স্থাবর জন্মগ্রহণকারী দেহীর কষ্ট অনুভূত হয়। স্থাবর-সংশ্লিষ্ট দেহীর দেহত আর স্থাবর নহে যে কষ্ট হইবে!

কুমুদ।

লেখিকা—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,।

এত কুমুদ-দলে আমার জলে
কে ভাসায় ?
ও সে খেলার ছলে 'বাহবা' বলে
কি ভাষায় ?
এ যেন সেই সরল শিশু
অঙ্গন-মাঝে বরষা-বারে,
কাগজ-তরী ভাসিয়ে দ্যায়
পুলক-মজায় সারে সারে—
আধফোটা সেই শিশুর মতন
শীকরনিকর নাচে পুলক-মাতন,
ও সে তরী চালিয়ে দেখে লুকিয়ে
কত দূরেতে যায়।
ও বুঝি এক না-জানা শিশু
ফুলের তরী ভাসিয়ে দিয়ে—
গাল-ভরা এক হাসি হেসে
লালের পরে লক্ষ্য নিয়ে
ক'রে কত তরণী হাতে রচন
গুন্‌গুনিয়ে ও অফুট বচন
ও ইয়ার ছেড়ে হিয়ারে আপনি হাসায়।
এত কুমুদদলে আমার জলে কে ভাসায় ?

কি চাই ?

লেখক—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

জানি না—কি চাই! তুমিই বা কে? কি এক মোহসাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছ, কি এক অসার সংসারকে সার জ্ঞান করাইয়াছ, যাহাতে তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। তোমার নিত্য নব নব লীলার কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলাম না। কত স্থান ঘুরিয়াছি, কতই তোমার অনির্ব্বচনীয় অদ্বিতীয় লীলা খেলার নিদর্শন দেখিয়াছি, কত লোক দেখিয়াছি, কত কথা শুনিয়াছি, তবুও যে তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। তোমার এক দিনের এক মুহূর্ত্তের রঙ্গ কই আমি জীবন ভরিয়া ভাবিয়াও যে স্থির করিতে পারিলাম না। প্রাণের আবেগে ক্ষণস্থায়ী সুখের লালসায় পূর্ণিমার গগনে পূর্ণ চাঁদের খেলা দেখিতে ভালবাসিতাম, মনপ্রাণ-মাতান গোলাপ ফুটিত, কত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইতাম, কত ভালবাসিতাম, কত সোহাগ করিতাম! কিন্তু তোমার সুনীল আকাশের কোলে কেন চাঁদ খেলা করে,—তোমার অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এক সৃষ্টি কেন কুসুম, সে ভাব যখন আমার এই বেসুরা হৃদয়ের ভগ্নতন্ত্রী জাগাইয়া দেয় তখনই তোমার অসীম অপার মহিমা জানিতে সাধ যায়, তখনই তোমাকে আমার করিয়া চিনিতে বাসনা হয়। তখনই আমার চাঁদের খেলা দেখিবার সাধ মিশিয়া গিয়া চাঁদকে বুকে চাপিয়া রাখিতে বাসনা হয়! তখনই তোমার সৃজিত ফুল লইয়া তোমাকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে মনের বেগ প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়! হে দেব! জানি না তোমার কি অভিনব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি! জানি না কে আমার অতীত গভীর অন্ধকার হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের শিখা জ্বালাইয়া দেয়। কে আমার কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দেয়। কে আমার বেসুরা হৃদয়তন্ত্রী হইতে সুর মিলাইয়া দিয়া তোমার অপার মহিমার গুণ কীর্ত্তন করায়! কে তুমি আমায় স্মরণ কর; কে তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া পাগল কর? আবার কেনই বা স্নেহ কর, যত্ন কর, প্রাণ দিয়া ভালবাস? তাই তোমাকে সকাতরে কর-যোড়ে শুধাইতেছি "তুমি আমার কে?" প্রাণের আবেগে অতি ব্যাকুলতায়,

ইংরাজী ভাষায় গালিগালাজ করিয়া উক্ত বার লাইব্রেরীর কেরাণীর দ্বারা উক্ত কালী বাবুকে tresspass অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত করিবার উপদেশ দেন। তাহাতে ব্যারিষ্টারপ্রবর রাজনারায়ণ মিত্র মহাশয় (Mr R. Mitter.) যোগদান করেন। তাঁহাদের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া কালীবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার গণ্ডদেশে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। তাহা দেখিয়া উমেশচন্দ্র কালীবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাবু! আপনি আমার সমক্ষে উক্ত সপিনা ও ১৬৲ টাকা যাহা উহার ফি স্বরূপ আনিয়াছেন পালিত মহাশয়ের সমক্ষে টেবিলের উপর রাখুন এবং সপিনার জারি Affidaitএ লিখিবেন অমুক তারিখে অমুক স্থানে Mr. W.C.Banerjee সমক্ষে আমি Mr T.Palit এর সপিনা জারি করিয়াছি। যদ্যপি দরকার হয় আমি Justice এর সমক্ষে দাঁড়াইয়া আপনার পক্ষ সমর্থন করিব।" তৎক্ষণাৎ পালিত মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"Mr Palit.! তুমি কোন্ আইনে উক্ত সপিনা না লইয়া অস্বীকার করিতে পার?" তখন পালিত ও মিত্র মহাশয় কয়েক মিনিট আইনের বহির পাত উল্টাইয়া বলিলেন, "বাঁড়ুয্যে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য এবং আমরা সপিনা লইতে বাধ্য।" তখন পালিত মহাশয় উক্ত সপিনা নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া গ্রহণ করিলেন।

বলা বাহুল্য কালীবাবুর পরিধেয় বস্ত্র অপরিস্কার ছিল। কালীবাবু উমেশ চন্দ্রের এই মহত্ব দেখিয়া সকলের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

২

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, উমেশচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি বিলাতে ছিলেন তখন তাঁহার বিমাতার মৃত্যু হয়। তিনি তিন মাস বাদে বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ সত্যধন বিদ্যাভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"ধন! আমার মার শ্রাদ্ধে কতজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বিদায় হইয়াছে, কত ভিখারী বিদায় হইয়াছে?" তাহাতে জানিতে পারিলেন বিশেষ কিছু হয় নাই। তজ্জন্য তিনি আদেশ দিলেন "এই ষান্মাসিক শ্রাদ্ধে সমারোহ করিতে হইবে।" তজ্জন্য ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিলাত হইতে আসিয়া প্রতিবৎসর তাঁহার কনিষ্ঠের নিকট খবর লইতেন পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধকিরূপে সম্পাদিত হইবে।

(৩)

উমেশচন্দ্র তাঁহার পৈতৃক বাটীতে সামাজিক ক্রিয়া কলাপে যদিও মুখ্যভাবে যোগদান করিতেন না, তিনি গৌণভাবে অর্থাদি সরবরাহ করিতেন এবং বাটীতে যাত্রাদি নাট্যাভিনয় হইলে তিনি শুনিতে আসিতেন। তিনি অতিশয় নাট্যামোদী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায় প্রতি শনিবারে Bengal Theatre এ প্রহ্লাদচরিত্র, প্রভাস-মিলন নাটকাদি অভিনয় দেখিতে আসিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীকমলকৃষ্ণ Shelly বানার্জী। ইনি ইংরাজী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে উমেশচন্দ্র তাঁহার পৈতৃক বাটীতে একটী মহৎ ভোজ দিতেন, তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইত। তিনি ভোজের দিন আসিতেন না, কেবল মাত্র যাত্রার দিন আসিতেন। একবার উক্ত দিবসে বৈঠক খানায় এই লেখকের পিতা ৺ শম্ভু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি উমেশচন্দ্রের মধ্যম পিতৃব্য ছিলেন) এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বসিয়া আছেন, তাহা দেখিয়া উমেশ চন্দ্র বিলাতি পোষাকে মজ্‌লিসে বা কোন কুর্শীতে না বসিয়া পা-পোষের উপর বসিলেন। তাহাতে এই লেখকের পিতা তাঁহাকে তাঁহার সন্নিকটে বসিতে বলিলেন। তাহাতে উমেশচন্দ্র বলিলেন,"—আমি পা-পোষে বসিবার উপযুক্ত। আমার এ মজ্‌লিসে স্থান এই পাপোষ। তাহাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।"

আবার যখন উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ সত্যধন সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে M. A. এ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারি পাঠ জন্য তাহার জ্যেষ্ঠের অনুমতি চাহিলেন, তখন উমেশচন্দ্র বলিলেন,—"ধন! তুমি কি মনে কর আমি এত টাকা রোজগার করিয়া সুখে আছি? আমি এক হাতীর বংশ সৃষ্টি করিয়াছি। তুমি স্বদেশে থাকিয়া বাপ পিতামহের নাম সম্ভ্রম বংশমর্য্যাদা রক্ষা কর, বিলাতে যাইও না।"

তিনি স্বধর্ম্মানুরাগীগণকে সম্মান করিতেন এবং যথা বিহিত পুরস্কার দিতেন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীতত্ত্ব।

লেখক—শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

হায়! ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতা, বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রিতা শ্রীশ্রীকমলা দেবীর শ্রীপাদ-পদ্মরেণু মস্তকে ধারণ করিবার যোগ্যতা আমার কোথায়? কোথায় সেই বৈজয়ন্তবিরাজিনী দেবরাজ-অঙ্কবিহারিণী পৌলোমী দেবীর কিরীটস্খলিত সন্তানক-কুসুমের পরাগরাজি-রঞ্জিত রাতুল চরণপদ্ম, আর কোথায় বা সংসার-মোহান্ধ ত্রিতাপতাপিত ভজন-সাধন-হীন মন্দমতি আমি। মাতঃ! কমলে! কাতর কিঙ্করের চাপল্য ক্ষমা করুন, দেবি!

আর তুমিও অলক্ষ্মি মাতঃ! প্রসীদ সন্তানে। অতি মন্দমতি আমি ভক্তি-বিহীন সদাচারবিবর্জ্জিত কদাচারলীন। অক্ষম তোমার তত্ত্ব-মহিমা-কীর্ত্তনে।

একে ত মনুষ্য-ভাষা দেবলীলার বর্ণনে অসমর্থ। তাহাতে আবার অনৃত-মণ্ডিত সংসারীর এই প্রবল প্রয়াস। ত্রিকালদর্শী যোগীগণের বহুতপস্যার দ্বারাও যাহা অচিন্ত্য ও অননুমেয়, সেই দেব-মহিমার বর্ণনায় একজন বিবেকহীন মূর্খের লেখনী পরিচালনা! মাতঃ অলক্ষ্মি! আমার জ্ঞানকৃত এই নিন্দিত ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর অপর নাম কমলা। ক— ব্রহ্মত্ব, ম—শিবত্ব লা=দান করেন যিনি। এই অর্থে ব্রহ্মত্ব ও শিবত্বদায়িনী অর্থাৎ মোক্ষপ্রদায়িনী। ত্রিভুবনের অধিবাসিগণের যত কিছু আশা আকাঙ্খা উৎসাহ আনন্দ ও গৌরব অহঙ্কার তৎসমস্তই ঐ দেবীর কৃপায়। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ; গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা, বিদ্যাধর, নর ও বানরাদি সকলেই কমলা মাতার করুণায় ধন-সম্পদ এবং তজ্জনিত আনন্দ উপভোগ করেন। আর যোগী-ঋষিগণও যে নশ্বর কাঞ্চন-রত্নাদি-পরিত্যাগী হইয়া মোক্ষানন্দের অধিকারী হয়েন তাহাও শ্রীকমলার প্রসাদে। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই তিনি—

"কিঞ্চাতি বহুনোক্তেন সংক্ষেপেনেদমুচ্যতে।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ।
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয় নানয়োর্বিদ্যতেঽপরম্॥"

অতি বলার ফল কি? সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে, দেবতাগণের মধ্যে ও মনুষ্যাদি জাতির মধ্যে পুরুষ নামে ভগবান হরি এবং স্ত্রী নামে লক্ষ্মী দেবী! উভয় ভিন্ন আর কিছুই নাই।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে কথিত হইয়াছে যে; তিনি প্রথমে ভৃগুপত্নী খ্যাতিতে উৎপন্না হইয়া শেষে লীলার অমৃত-মন্থনে পুনরায় ক্ষীরোদসাগর হইতে উৎপন্ন হন। ইনি—

"দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণুর্দ্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥

ইনি দেবত্বে দেবদেহা ও মনুষ্যত্বে মানুষী হইয়া বিষ্ণুর দেহানুরূপ আত্মদেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ইনি নিত্য, অজ ও অনাদি। কেবল ফুলের সৌরভ ও দীপের শিখার ন্যায় আবির্ভূত হয়েন।

ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু। ভৃ ধাতুর অর্থ ভরণ করা। খ্যাতির অর্থ সম্মান, যশঃ। লক্ষ্মীমানের ভরণ জন্য ক্লেশ হয় না এবং সর্ব্বদাই যশোলাভ হয়। দক্ষের কন্যা খ্যাতি। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিই খ্যাতিলাভ করেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। খ্যাতি ভৃগুর সম্মিলনেই লক্ষ্মীর জন্ম।

ইনি বিষ্ণুর অঙ্কলক্ষ্মী শক্তি। বিষ্ণুর সকল কার্য্যের সহায়িনী। ফলতঃ ইহার কোনই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নাই। যখন যে কার্য্যে বিষ্ণুর অভিলাষ হয়, ইনি তখনই সেই সেই কার্য্য সাধনার্থে বিষ্ণুর অভিলাষানুরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। হরি যখন আদিত্য, তখন ইনি পদ্ম হইতে উৎপন্না হয়েন; রামচন্দ্র হইলে তৎপত্নী সীতা দেবী ও শ্রীকৃষ্ণাবতারে রুক্মিণী হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই, ইনিই মহালক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। শ্রীমহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবী সেই ভগবতী শর্ব্বানীরই দেহাংশজাতা। ইঁহার অগ্রজা অলক্ষ্মী দেবীর বিষয় বিবৃত হইতেছে।

ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থনে কৌস্তভাদি রত্ন উত্থিত হইলে দেবগণ উহা দেববরিষ্ঠ বিষ্ণুকে দিলেন! তাহার পর কমলা উত্থিত হইলে বিষ্ণু তাঁহাকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন; তখন লক্ষ্মী দেবী বলিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা আছেন; তাঁহার বিবাহ না হইলে ধর্ম্মতঃ অগ্রে আমার বিবাহ হইতে পারে না। অতএব আপনি তাঁহার বিবাহ দিয়া পরে আমার উদ্বাহ ক্রিয়া করিবেন। ধর্ম্ম ব্যতিক্রম করিবেন না।"

লক্ষ্মীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বিষ্ণু অতি দীর্ঘ তপস্যাপরায়ণ

উদ্দালক নামা (মতান্তরে দুঃসহ) মুনিকে বিনয় করিয়া অলক্ষ্মী সম্প্রদান করিলেন। স্থূলৌষ্ঠী, বিশুষ্কবদনা, বিরূপা, স্রবৎ-আরক্তনয়না; রুক্ষপিঙ্গলকেশা—এমন যে কন্যারত্ন তাঁহাকে বিষ্ণুর বাক্যে মুনিবর স্বাশ্রমে লইয়া গেলেন।

তথায় হোমধূমে সুগন্ধীকৃত, বেদগানে মুখরিত পরম রমণীয় আশ্রম দর্শনে অলক্ষ্মী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং কহিলেন, "হে প্রভো! এ স্থান আমার বাসযোগ্য নহে। আমায় অন্যত্র লইয়া চলুন।" উদ্দালক কহিলেন, "তোমার বাসযোগ্য স্থান কোথায়?"

অলক্ষ্মী কহিলেন, "যেখানে বেদধ্বনি হয়, অতিথির সেবা হয়, যজ্ঞদান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম যথায় হয়, সেখানে আমি থাকি না; যেখানে দেবপূজা ও পিতৃশ্রাদ্ধ হয়, সেখানে আমি থাকি না। যথায় দানক্রিয়া ও শৌচাচার না হয়, চৌর লম্পটগণ থাকে, সেই স্থানই আমার প্রিয়। বৃদ্ধ, সজ্জন, বিপ্র যেখানে নিষ্ঠুরবাক্যে অপমানিত হয় তথায় আমার বাসস্থান।"

সূতমুনি কহিলেন, "উদ্দালক মুনি এই কথা শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ হইলেন এবং কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে অলক্ষ্মি দেবি! তুমি এই অশ্বত্থমূলে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান কর। ততক্ষণ তোমার বাসযোগ্য স্থান অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়া আসি।" এই বলিয়া মুনি চলিয়া গেলেন। অলক্ষ্মী আশায় আশায় থাকেন, ফলে কিন্তু স্বামীরত্ন আর ফিরিলেন না।

তখন অলক্ষ্মী স্বামীকে না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিয়ের কন্যা কোথায় কিছুই জানেন না, কোথায় যাইবেন? শেষে এমন উচ্চ চীৎকারে কাঁদিতে লাগিলেন যে, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর শ্রুতিবিবরে সেই ক্রন্দন প্রবেশ করিল। তিনি তখন দিদির দুঃখে দুঃখিতা হইয়া শ্রীহরিকে সকল বিবৃত করিলেন। "ভাল বর দিয়েছ কিন্তু! বর কন্যাকে ফেলিয়া নিরুদ্দেশ! কন্যা কাঁদিয়া অস্থির। এখন স্বামিহারা বেচারার উপায় কি?" "বিষ্ণু বলিলেন, চল, দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া শ্রীবিষ্ণু সহিত লক্ষ্মীদেবীর মর্ত্তে আসিয়া ক্রন্দননিরতা, স্বামিপরিত্যক্তা অলক্ষ্মী দেবীকে দেখিলেন।

আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া তাঁহার ক্রন্দনের মাত্রা বাড়িয়াই চলিল। শেষে চক্রী বিষ্ণু অনেক বলিয়া কহিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন, "তুমি এখন এই অশ্বত্থমূলেই থাক। অশ্বত্থবৃক্ষ আমারই অংশ। এখানে তোমার কোনই ভয় ও ভাবনা নাই। প্রতি শনিবারে লক্ষ্মীদেবী তোমার নিকট আসিবেন এইজন্য বিনা শনিবারে বোধিতরু অস্পৃশ্য!

অলক্ষ্মী পূজায় কাঁকরের চন্দন, কৃষ্ণবস্ত্র, লৌহালঙ্কার ও কৃষ্ণপুষ্প লাগে। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় রাত্রিকালে গোময়ের পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাম হস্তে নির্ম্মাল্য পুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণকুসুমে পূজা করিবে! তাঁহার মূর্ত্তি এইরূপ:—ইনি কৃষ্ণবর্ণা, দ্বিভুজা, কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানা, লৌহালঙ্কার-ভূষিতা, কঙ্করঘৃষ্টচন্দনে সর্ব্বাঙ্গ বিলেপিতা, সম্মার্জ্জনীহস্তা, গর্দ্দভারূঢ়া ও কলহপ্রিয়া!

যে ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ হইয়া কেবল শয়ন করিয়া থাকে, তাহাকে অলক্ষ্মীর আবেশ হয়। অতএব কার্য্যকুশলের লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে।

এই জন্যই বলা হইয়াছে—

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।"

অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে। আর কাপুরুষগণই দৈব কর্ত্তৃক পাইবার ভরসা রাখে। অলমতি বিস্তরেণ।

সাধক-সঙ্গীত।

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সরকার বিরচিত।

রাগিণী-ভূপালী—তাল-কাওয়ালী।

অন্তর যাতনা তারা, আর আমি জানাব কারে?
তুমি ত' সকলি জান'মা, (তবে) কেন কাঁদাও বারে বারে?
ছ'জনেতে যুক্তি ক'রে, (আমায়) ফেলেছে মা বিষম ফেরে;
দমন ক'রে সে ছটারে, মুক্ত কর মা অভাগারে॥
মায়ার বাঁধন দে মা খুলে,
স্থান দে গো মা চরণতলে,
অঘোরে অন্তিম কালে
তুলে দিও ভবপারে॥

সমালোচনা।

খেয়াল—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি বিরচিত। কলিকাতা ৫৫ নং অপারচিৎপুর রোড আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে শ্রীমনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ছাপা কাগজ বাঁধাই উৎকৃষ্ট; মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

খেয়ালের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এই খেয়ালটি শুধু খেয়াল মাত্র নহে। হ্যাম্‌লেট্ সম্বন্ধে যেমন সেক্সপীয়র বলিয়াছেন যে হ্যাম্‌লেটের পাগলামীর ভিতরেও একটা শৃঙ্খলা দেখা যাইত "There was A method in his madness"—সেইরূপ আমার খেয়ালের তিতরেও একটা শৃঙ্খলা দেখা যাইবে। এই গ্রন্থে আমার তিনটি ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে এবং তাহার সঙ্গে ভ্রমণ বৃত্তান্তের আকারে লিখিত একটী উপন্যাসের ভূমিকা আছে—এই চারিটী লইয়া আমার খেয়ালের জন্ম।"

ভূমিকায় গ্রন্থকার খেয়ালের জন্মবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাত্র প্রদান করিয়াছেন। আমরা আগ্রহসহকারে "খেয়াল"—পুস্তকখানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত এবং সাহিত্য স-সারে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সর্ব্বজন-সুপরিচিত। খেয়ালের ভাষা প্রাঞ্জল ও চিত্তগ্রাহী। ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সহিত গ্রন্থকারের পবিত্র জীবনের অনেকানেক বিচিত্র ঘটনাও এই খেয়ালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানিতে জানিবার, বুঝিবার, ভাবিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। খেয়াল কেবলমাত্র জীবনের বিচিত্র-ঘটনাপূর্ণ মামুলী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে—সমাজের বংশের ও স্বজাতির বিশিষ্টতা না হারাইয়া মানব কি প্রকারে স্বভাবে, চরিত্রে জ্ঞানে ও ভক্তিতে লোকসমাজে প্রকৃত মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, খেয়ালে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ইংরাজী শিক্ষিত হইয়াও যেরূপ সত্যপরায়ণ সদাচারী তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির আদর্শরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫শ বর্ষ | ১৩৩৬ সাল, জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

বাংলার প্রাণিসঙ্ঘ।*

ভদ্রমহোদয়গণ!

আজ আপনারা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিকে যে স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। আজ আমি আমার পরমবন্ধু হেমেন্দ্রবাবুর স্থলেএইবিজ্ঞান-শাখার সভাপতিরূপে আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই স্থল অধিকার করিবার ক্ষমতা আমার আছে বলিয়া মনে করি না; কেবল এই সম্মিলনের কর্ম্মিগণের প্ররোচনায় আমি সন্তরণে অপটু হইয়াও জলে ঝাঁপ দিয়াছি। তাহার উপর হেমেন্দ্রবাবু যে অসুস্থতার দরুণ এই গুরুভার লইতে অক্ষম হইলেন, তজ্জন্য আমি ক্ষোভে আরও হীনবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এই গুরুভার বহনে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা জানি না। অধিকন্তু আমার মত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দুই দিনে গঠিত ক্ষুদ্র অভিভাষণ আপনাদের কতদূর প্রীতিকর হইবে, তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

আমি বহুদিন হইতে প্রাণী লইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছি। আজ আমি বাংলার প্রাণিসঙ্ঘ বা প্রাণিসমষ্টি (Fauna) সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিব।

* হাবড়া জেলার অন্তর্গত মাজুগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, ডি, এম, এস, সি, এফ, জেড, এস, মহাশয়ের অভিভাষণ।

কোন দেশ বা প্রদেশে যে সমুদয় প্রাণী দৃষ্ট হয়, তাহাদের সমষ্টির নাম প্রাণিসঙ্ঘ। বঙ্গদেশে বহুবিধ প্রাণী দৃষ্ট হয় এবং তৎসম্বন্ধে অনেক জানা আছে এবং জানিবারও আছে। আমরা এই বিষয় লইয়া কিছু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক আমাদের নিজেদের সাহিত্যে ইহাদের বিষয় কি জানিতে পারিঅতি প্রাচীনকাল হইতে আমরা বহু প্রাণীর নাম লিপিবদ্ধ দেখিয়া আসিতেছি। চারি বেদ, ব্রাহ্মণাদি, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ, কাব্য, অভিধান ও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে বহু প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাকৃত এবং বঙ্গভাষায় ঐ সকল প্রাণীর নামের অপভ্রংশ এবং অন্যান্য নূতন নামও আমরা দেখিতে পাই। আমরা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বহু পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উভচর, মৎস্য, পর্ব্বপদীর অন্তর্ভুক্ত অনেক প্রাণী, কীট ও ক্রিমির নাম জানিতে পারি। কিন্তু কোনও গ্রন্থে তাহাদের পরিচয়ের জন্য কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ চক্ষে দেখিয়া বংশানুক্রমে বহু প্রাণীর পরিচয় হইয়া আসিতেছে, ইহার এই ফল দাঁড়াইয়াছে যে, প্রাণীর নাম মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের পরিচয়ের কোন উপায় নাই; এইরূপে আমাদের প্রাণিসম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের অনেক হ্রাস হইয়াছে। যে প্রাণিগুলি নানাকারণে মানবের সহিত সংবদ্ধ (যেমন যে সকল পশু, পক্ষী ও মৎস্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যাহারা নানা উদ্দেশ্যে গৃহে পালিত হয়, যে সকল প্রাণী সচরাচর বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয় অথবা যাহারা নানাপ্রকারে ক্ষতিসাধন করে,) সেগুলি আমাদের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আমরা অভিধান হইতে প্রাণি-পরিচয়ের সাহায্য পাই। অভিধানকারগণ একটী প্রাণীর বহু নাম সংগ্রহ করিয়াছেন; ঐ সকল নামের অর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা প্রাণীটীর আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিশেষত্ব সম্বন্ধে অনেক জানিতে পারি। ঐ সকল লক্ষণ একত্রে প্রাণীটীর পরিচয়ে অনেক সহায়তা করে। এই সকল লিপিবদ্ধ নাম ভিন্ন আমরা প্রাণীর অনেক দেশীয় নাম লোকমুখে শুনিতে পাই; পুনশ্চ, এক প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এইরূপে এক মৎস্যের বহু নাম পাওয়া যায়। এই সকল দেশীয় নাম বহুস্থলে সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত কথার অপভ্রংশ হইলেও তাহাদের অনেকগুলি নূতন গঠিত বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু, বহুপ্রাণী অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি, আরও বহু প্রাণী আছে যাহাদিগকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের

সাহায্য ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সকল প্রাণীর বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি; আমাদের আদি সাহিত্যে তাহাদের উল্লেখ থাকাও সম্ভবপর নহে। আমরা আধুনিককালে অভিধান এবং আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেশীয় প্রাণিগণের উল্লেখ এবং যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া থাকি। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেদাদি গ্রন্থে বহু প্রাণীর নাম এবং কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছেন। আমিও ঐ বিষয় লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছি, উহা প্রবন্ধাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হইল, তাহা হইতে বাংলার, কেবল বাংলার কেন, সমুদায় ভারতের প্রাণিসঙ্ঘের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতে আগমনপূর্ব্বক এদেশের প্রাণিগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক নাম সঙ্কলন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা যে কেবল এই কার্য্যে রত হইয়া ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা ভারতের নানাস্থান হইতে নানা প্রাণী সংগ্রহ করতঃ তাহাদের মৃতদেহ সুরা প্রভৃতি দ্রব পদার্থে রক্ষিত করিয়া ইউরোপে পাঠাইতে লাগিলেন। ইউরোপের নানা সাময়িক পত্রে ঐ সকল প্রেরিত প্রাণিগণের বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিনিয়াস্ নামক একজন বিখ্যাত ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত তাঁহার প্রকাশিত প্রাণিবিজ্ঞানগ্রন্থে ভারতীয় অনেক পশু, পক্ষী ও মৎস্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যে সমুদয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আমাদের দেশে আগমনপূর্ব্বক বাংলার প্রাণিগণের পরিচয়ের উন্নতিকল্পে মনোযোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে হামিল্টন বুকানন সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বঙ্গদেশের বহু পশু, পক্ষী এবং মৎস্যের রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করাইয়া তাহাদের সঙ্গে দেশীয় এবং বৈজ্ঞানিক নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল চিত্রের কতকগুলি নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বহু মৎস্য এবং পক্ষীর রঞ্জিত চিত্র Asiatic Society of Bengal এর গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি যাদুঘরের গ্রন্থাগারের জন্য মৎস্যগুলির চিত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করান হইয়াছে। হামিল্টন সাহেব Fishes of the Ganges নামে একখানি গাঙ্গেয় মৎস্যের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন; গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য হইলেও অনেক গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার এক বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি দেশীয় নামগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং যথাসম্ভব ঐ নামগুলি তাঁহার

গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গঠিত বৈজ্ঞানিক নামগুলিতে অনেক মৎস্যের দেশীয় নাম রক্ষিত হইয়াছে। আমরা সকলে জানি যে, কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লাটিন ভাষায় লিখিত হয়। একটী নাম দুই শব্দে গঠিত—প্রথম শব্দটী গণের (Genus) নাম এবং দ্বিতীয়টী জাতীয় নাম (Name of the species)। দুইটীতে মিলিয়া নামকরণ হইল। যেমন রুহমাছের বৈজ্ঞানিক নাম Cyprinus ruhu ; এস্থানে Cyprinus কথাটী গণের নাম (রুই-প্রভৃতি মাছ যে গণের অন্তর্ভুক্ত) দ্বিতীয় শব্দটি জাতীয় নাম এবং এস্থলে দেশীয় নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। হামিল্টন সাহেবের নামকরণের এই রীতির জন্য আমাদের অনেক দেশীয় নাম রক্ষিত হইয়া গিয়াছে, নচেৎ অনেক নাম লোপ পাইত। আজকাল পক্ষীদিগের বহু অন্তর্জাতি (Subspecies) নির্ণীত হওয়ায় তিনটী শব্দযুক্ত বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহৃত হইতেছে—প্রথম শব্দটী গণের, দ্বিতীয়টী জাতীয় এবং তৃতীয়টী অন্তর্জাতীয়। ক্রমশঃ অন্যান্য প্রাণীগনের নামও এইরূপে গঠিত হইয়া থাকিবে। যাহাহউক হামিল্টন-বুকাননের গঠিত নামগুলির অনেক পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ জাতীয় নামগুলি চলিত আছে, এবং তাঁহার নাম এ সম্পর্কে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে। তাঁহার পদানুসরণ করিয়া রাসেল, ফ্রেয়ার, ডে, জর্ডান প্রভৃতি বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতীয় প্রাণিগণের বিবরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারাও অনেকস্থলে জাতীয় নামের জন্য দেশীয় নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন ও ঐ সঙ্গে দেশীয় নামগুলিও লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু ভারতীয় (তৎসঙ্গে বঙ্গদেশীয়) পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, পতঙ্গ, লৌতেয় প্রভৃতির বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই কার্য্যে বহু অগ্রসর হইলে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় Fauna of the British India নামক পুস্তক ধারাবাহিকরূপে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই পুস্তকে ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ এবং ব্রহ্মদেশের প্রাণিগণের বিবরণ এবং যথাসম্ভব প্রকৃতি লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। আজিও পুস্তকখানি প্রকাশিত হইতেছে এবং এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহাতে খণ্ডে খণ্ডে ভারতীয় পশু, পক্ষী (ইহার দ্বিতীয় বর্দ্ধিত এবং পরিশোধিত সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে) সরীসৃপ ও উভচর, মৎস্য, কোমলাঙ্গী, কয়েক বর্গান্তর্গত পতঙ্গ, লৌতেয়, স্পঞ্জ, পুরুভুজ এবং শঙ্খ-প্রাণী, জলৌকা প্রভৃতির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

এখনও বহুপ্রাণির বিবরণ প্রকাশিত হইতে বাকি আছে। আমরা এস্থলে আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পুস্তকখানি বঙ্গদেশে মৎস্যের চাষ সম্পর্কে প্রকাশিত হয়। মিঃ কে, সি, দে, আই, সি, এস্ মহাশয় বঙ্গদেশীয় মৎস্যের চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি লিখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া পুস্তকখানি সম্পাদন করেন। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বৈজ্ঞানিক নামের সহিত অনেক স্থানীয় নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। যদিও মৎস্যের চাষ বঙ্গদেশে স্থায়ী হইল না, তথাপি দেশীয় মৎস্যের নাম রক্ষার দিক্ হইতে দেখিলে পুস্তকখানি দেশের হিত সাধন করিয়াছে। আমরা এজন্য গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আজকাল Zoological Survey of Indiaর সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের প্রকাশিত Records of the Indian Museum নামক সাময়িক পত্রে ক্রমশঃ বহুপ্রাণির বিবরণ প্রকাশিত করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে স্বর্গীয় Nelson Annandale সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পূর্ব্বেও যাদুঘরের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীরূপে বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতে আগমন করিয়া বহু ভারতীয় প্রাণিসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে Neville Anderson, Finn, Alcock প্রভৃতি সাহেবগণ বিশেষভাবে পরিচিত। Alcock সাহেব অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত "ভারতীয় দশপদী খোলকীর বিবরণ" তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। আজকাল বিদেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যতীত কয়েকজন বঙ্গবাসী বঙ্গের প্রাণিতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। তন্মধ্যে এই নগণ্য অভিভাষণকারী ভিন্ন ডাঃ বি, কে, দাস, শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহাদের অধীন গবেষণাকারী ছাত্র মিঃ ভাদুড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রায় সকল দেশেই প্রাণিসঙ্ঘের বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

তৃতীয়তঃ, প্রাণিসমষ্টি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ভারতীয় প্রাণিসঙ্ঘ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, অবশ্য তাহাতে বঙ্গীয় প্রাণিসঙ্ঘ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আমরা প্রাণিগণের শ্রেণীবিভাগ ধরিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিতে থাকিব।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর প্রাণিগুলি আদ্যপ্রাণী (Protoza) নামে অভিহিত সাধারণতঃ ইহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—Sarcoda বা উপপাদিগ, Mastigophora বা প্রতোদী, Ciliophora বা লোমাঙ্গী এবং Sporozoa বা রেণুজপ্রাণী। ইহারা জলে, জলসিক্ত স্থলে এবং অন্য প্রাণীর দেহ মধ্যেও বাস করে! আদ্যপ্রাণিগণ বহুসংখ্যায় দৃষ্ট হয়! বঙ্গীয় আদ্যপ্রাণিগণের বিবরণ যৎসামান্য প্রকাশিত হইয়াছে! আমি দ্বিতীয় শ্রেণী ভিন্ন বাকি তিনটীর অন্তর্গত অনেকগুলি প্রাণ্বির বিবরণ নানা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। বহু বৎসর পূর্ব্বে Asiatic Society of Bengalএর সাময়িক পত্রে কতকগুলি প্রতোদীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল! রায় বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপোধ্যায় মহাশয় পরান্তঃবাসী প্রতোদী লইয়া আলোচনা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় আদ্যপ্রাণিগণের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় আদ্যপ্রাণিগণের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহার প্রণয়নে বহু কর্ম্মীরও প্রয়োজন।

অতঃপর আমরা ছিদ্রালদেহী (Porifera) এবং সুষিরান্ত্রী নামক দুইটী বিভাগের (Phyla) প্রাণিগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। স্বর্গীয় Annandale সাহেব Fauna of the British Indiaতে এ সম্বন্ধে একখণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন! ছিদ্রালদেহীকে চলিত কথায় স্পঞ্জ বলা হয়, তবে কথাটী বিদেশীয়। আমরা পুকুরে Spongilla জাতীয় কয়েক প্রকার স্পঞ্জ দেখিতে পাই। এই বিভাগের প্রায় সমুদয় প্রাণী সমুদ্রবাসী হইলেও একটীমাত্র বংশ (Spongillidae) স্বাদু জলে জন্মিয়া থাকে; আমাদের পুকুরের স্পঞ্জ এই বংশের অন্তর্গত। পুকুরের স্পঞ্জগুলি কখন কখন সবুজবর্ণ এবং কখনও মলিন শ্বেতবর্ণ। ইহা কোন জলমগ্ন পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং প্রায়ই বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করে! ইহা দেখিতে গোলাকার অথবা দীর্ঘাকার!

সুষিরান্ত্রী বিভাগের অন্তর্গত Hydra নামক এক প্রাণী আমাদের দেশে পুকুরে দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বস্থলে দেখা যায়। ইহা দেখিতে একটী ১/৪ ইঞ্চি লম্বা সরু কাঠির মত; একদিকে কোন পদার্থে সংলগ্ন থকে, অপর দিকে চুলের মত কয়েকটী শুণ্ড সংলগ্ন থাকে। ইহার বর্ণ শ্বেত। Hydra জাতীয় আর এক প্রকার প্রাণী লবণাক্ত জলে দৃষ্ট হয়; বাদার খালে সময়ে সময়ে ইহা বহুসংখ্যায় দৃষ্ট হয়। ইহার নাম

Irene ceylonensis। এই প্রাণির জীবনে দুইটী অবস্থা লক্ষিত হয়। প্রথম অবস্থায় ইহা দেখিতে অনেকটা Hydra র মত। ইহাদের অনেকগুলি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া একত্র বাস করে। ইহার গাত্র হইতে মুকুলের মত প্রবর্দ্ধন উত্থিত হয় এবং তাহা হইতে একটী প্রাণী জন্মায়। প্রাণিটী পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহার গাত্র হইতে স্খলিত হয় এবং জলে স্বাধীনভাবে জীবিত থাকে। এই প্রাণী দেখিতে উন্মুক্ত ছত্রের ন্যায় এবং ইহাকে Medusa বা ছত্রকপ্রাণী বলা হয়। ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা। ছত্রকপ্রাণির স্ত্রী ও পুরুষভেদ লক্ষিত হয়। তাহাদের দেহাভ্যন্তরে ডিম্বাণু এবং শুক্রকীটাণু জন্মিয়া পরে জলে ক্ষরিত হয়। তাহারা জলে একত্র হইয়া ক্রমশঃ একটী Hydraর মত প্রাণিতে পরিণত হয়। সুষিরান্ত্রী বিভাগের অন্তর্গত আরও অনেক প্রাণী দৃষ্ট হয়, যাহারা সমুদ্রের জলে বাস করে। ইহারা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে দৃষ্ট হয়। প্রবাল ইহাদের মধ্যে সুপরিচিত, ইহাদের কঙ্কাল দেখিতে অতি সুন্দর এবং নানাপ্রকার আকৃতি ধারণ করে। এই সকল সুষিরান্ত্রী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ যাদুঘর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা পুরী গিয়াছেন তাঁহারা সমুদ্রের ধারে এইরূপ বহু প্রাণী দেখিয়া থাকিবেন।

আমরা এক্ষণে চিপিট কৃমি (Platyhelminthes) সম্বন্ধে দেখিব। আমাদের ফিতা কৃমি, পাতার ন্যায় কৃমি প্রভৃতি চেপ্টা কৃমিগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের অধিকাংশ অন্যান্য প্রাণির দেহাভ্যন্তরে বাস করে; কিন্তু একজাতীয় চিপিট কৃমি (Turlelllaria) জলে বাস করে! পুকুরের জলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মানবের দেহে যে সকল ফিতা-কৃমি ও পত্র-কৃমি (flukes) দৃষ্ট হয় তাহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গ-দেশে যে সকল ফিতা ও পত্র-কৃমি মানুষের দেহে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আমাদের জানা আছে। কিন্তু অধিকাংশ মেরুদণ্ডীর অন্ত্র এবং দেহ-গহ্বরে ফিতা-কৃমি ও পত্র-কৃমি পাওয়া যায়। বাংলায় যে সকল মৎস্য খাদ্যরূপে ব্যব-হৃত হয় তাহাদের দেহে নানাপ্রকার ফিতা-কৃমি দেখা গিয়াছে। আমাদের সাধা-রণ ভেক, গৃহগোধিকা, নানাজাতীয় সর্প, কচ্ছপ, অনেক প্রকার পক্ষী এবং গৃহ-পালিত পশুর অন্ত্রাভ্যন্তরে নানাজাতীয় ফিতা-কৃমি পাওয়া গিয়াছে। এই গুলি শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। পত্র-কৃমিও ঐরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ভেড়ার পিত্তনালীতে একপ্রকার পত্র-কৃমি দেখা যায়।

আর এক বিভাগের কৃমি দৃষ্ট হয় যাহাদিগকে বর্ত্তুল কৃমি বলে (Nema-

thelminthes) আমাদের ছেলেদের মলদ্বারের ছোট কৃমি, বয়স্ক ব্যক্তিগণের অন্ত্রস্থ বড় কৃমি প্রভৃতি এই বিভাগের অন্তর্গত ; Ankylostoma duodenalis এবং Filaria medicinensis নামক দুই প্রকার কৃমিও বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। ইহাদের প্রথমোক্ত কৃমিটী একপ্রকার রক্তাল্পতা রোগ উৎপাদন করে। দ্বিতীয় কৃমি দ্বারা এক প্রকার নালী ঘা উৎপন্ন হয় ; অথর্ব্ববেদ এবং কৌশিক সূত্রে ইহার উল্লেখ আছে। মানুষের অন্ত্র এবং রক্তে বহু প্রকার বর্ত্তুল কৃমি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি আমাদের সব জানা আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রাণীর অন্ত্রে এইরূপ কৃমি দৃষ্ট হয়। সাধারণ আরসুলা, ভেক, গিনিপিগ্ প্রভৃতির অন্ত্রে বহুপ্রকার বর্ত্তুল ক্রিমি পাওয়া যায়। পুনশ্চ, বহু প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুল কৃমি ভিজা মাটিতে বাস করে। এইগুলি দেখিতে শিশুদিগের মলদ্বারের ছোট কৃমির ন্যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাণের পোকার যে হুজুক উঠিয়াছিল, তাহাতে এই কৃমিগুলিকে পাণের পোকা বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহারা মাটিতে বাস করে এবং পাণের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

কণ্টকশুণ্ডী (Acanthocephala) নামক একপ্রকার কৃমি জাতীয় বিভাগের প্রাণিগুলির সম্বন্ধে এ দেশে কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। আমি সাধারণ কোলাবেঙের দেহাভ্যন্তরে এই জাতীয় কৃমি দেখিয়াছি।

কোমলাঙ্গী বা পিণ্ডালদেহী (Mollusca) নামক বিভাগের অন্তর্গত শামুক, গুগ্‌লি, ঝিনুক প্রভৃতি প্রাণী বঙ্গদেশে বহুসংখ্যায় দৃষ্ট হয়। Fauna of the British India এবং Records of the Indian Museum এ এই বিভাগের বহু প্রাণীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসামের অবর প্রদেশ হইতে বহুবিধ প্রাণী সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি খোলাবিহীন শামুকজাতীয় প্রাণী পাওয়া যায় ; ঐ প্রাণিগুলির বিবরণ লিখিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করা হয়। Records of the Indian Museumএ ঐগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

চক্রবাহী (Rotifera) নামক বিভাগের অন্তর্গত বহুপ্রাণী বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। এইগুলি অণুবীক্ষণিক। ইহারা সচরাচর জলের ভিতর গাছে সংলগ্ন থাকে এবং কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহারা দেখিতে এত সুন্দর যে বহু সাধারণ ব্যক্তি সখ করিয়া ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন। Hudson এবং Gosse সাহেবের Rotifera নামক পুস্তক জগদ্বিখ্যাত।

Asiatic Society of Bengal হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রে বহু দিন পূর্ব্বে কয়েকটী চক্রবাহীপ্রাণির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ইহাদের আলোচনা, গবেষণার এক নূতন পথরূপে এখনও উন্মুক্ত রহিয়াছে।

এক্ষণে আমরা পর্ব্বিত কীট সম্বন্ধে (Annelida) দেখিব। কেঁচুয়া এবং জোঁক এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। Michaelson নামক একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতবর্ষ এবং লঙ্কাদ্বীপের কেঁচুয়া জাতীয় পর্ব্বিত কীটগুলির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তীকালে Stevenson নামক আর একজন সাহেব ঐ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন ; ইনি Fauna of the British Indiaতে কেঁচুয়া জাতীয় পর্ব্বিত কীটগুলি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পদিন হইল, ভারতীয় জলৌকাগুলির বিবরণ Fauna of the Brtitish Indiaতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুশ্রুত সংহিতায় কয়েক প্রকার সবিষ ও নির্বিষ জলৌকার উল্লেখ এবং অতি সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। আমি সেই পুস্তকের সাহায্যে ঐ জলৌকাকয়টীর পরিচয় এবং বৈজ্ঞানিক নাম নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। Asiatic Society of Bengal এর মাসিক অধিবেশনে ঐ প্রবন্ধটী পঠিত হইয়াছে, এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আর এক জাতীয় পর্ব্বিত কীট (Polychacta) লবণাক্ত জলে দৃষ্ট হয়। সুন্দরবন বাদার জলে এইরূপ কয়েক জাতীয় কীট পাওয়া যায় ; সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই।

আমরা এক্ষণে পর্ব্বপদী (Arthropoda) নামক এক বৃহৎ বিভাগে উপনীত হইলাম। অসংখ্য প্রাণী এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। খোলকী (Crustacea) (যেমন চিংড়ি, বিছাচিংড়ি, কাঁকড়া), পতঙ্গ বা ষট্-পদী (Insecta) (যেমন আরসুলা, প্রজাপতি, মাছি, ফড়িঙ্), লৌতেয় (Arachnida) (যেমন মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা, এটুলি), শতপাদিক (Chilognatha) (তেঁতুলিয়া বিছা), দ্বিযুগ্মপদী (Diplopoda) (কেন্নুই) এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা হইয়াছে, তথাপি বহু গবেষণার আবশ্যক। Fauna of the British Indiaতে কয়েক বর্গীয় পতঙ্গ এবং লৌতেয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। Alcock সাহেবের পুস্তকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ দশপদী খোলকীর বিবরণ পাওয়া যায়।

যাদু-ঘর হইতে প্রকাশিত পত্রিকাখানিতে Kemp সাহেব অনেকগুলি খোলকীর বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এখনও অনেক করিবার আছে। আমাদের পুকুরে বহুবিধ ক্ষুদ্রাকার খোলকী দৃষ্ট হয়. সে গুলির বিবরণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের কাদা চিংড়ি (Mysidacea) এক বর্গের খোলকীর অন্তর্গত। পর্ব্বপদী বিভাগের অন্তর্গত আন্তপর্ব্বপদী নামে একটা শ্রেণী আছে যাহার অন্তর্গত প্রাণিগুলি দেখিতে কীটের ন্যায়। এই শ্রেণীর প্রাণিগুলিকে পর্ব্বদেহী এবং পর্ব্বপদীর মধ্যবর্ত্তী মনে করা হয়। আবর হইতে এই জাতীয় অনেকগুলি প্রাণী সংগৃহীত হইয়াছিল। Kemp সাহেব ইহাদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শৈলজ বা সঙ্ঘ প্রাণী (Polyzoa) নামে এক বিভাগে অনেকগুলি প্রাণী দৃষ্ট হয়। অনেকগুলি প্রাণী একত্র সংবদ্ধ হইয়া বাস করে। বঙ্গদেশে কয়েক প্রকার সঙ্ঘপ্রাণা দৃষ্ট হয়। ইহারা পুকুরের জলে গাছের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া বাস করে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। কলিকতার পুকুরে বহুবার এইজাতীয় প্রাণী দেখা গিয়াছে।

মন্দগামী (Tardigrada) নামক কয়েকটী আণুবীক্ষণিক প্রাণী আছে, যাহারা দেখিতে ঠিক ভালুকের মত। এদেশে এ প্রাণির কোন আলোচনা হয় নাই। বহুদিন হইল, আমি গাছের টবের মাটীতে এই প্রাণী দেখিয়াছিলাম সুতরাং ইহারা যে বঙ্গে দৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কণ্টকচর্ম্মী (Echinodermata) নামে এক বিভাগে তারা মৎস্য, ভঙ্গ-প্রবণ তারা, জল-কণ্টকী, জল-কুষ্মাণ্ড নামে বহু প্রাণী দৃষ্ট হয়। ইহারা সমুদ্রের তলায় বাস করে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এই সকল প্রাণী দৃষ্ট হয়। যাদুঘর হইতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

অবশেষে আমরা মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলির নিকট উপস্থিত হইলাম। কয়েক জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী ভিন্ন মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও পশু এই বিভাগের অন্তর্গত।

মৎস্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। Hamilton সাহেবের Fishes of the Ganges প্রকাশিত হইবার পর Day সাহেব Fishes of India নামক এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন; ইনিই আবার Fauna of the Brltish India তে ভারতীয় মৎস্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার পর আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ বি, এল্ চৌধুরী মহাশয়

বহুদিন যাবৎ মৎস্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন; তিনি বহু অজ্ঞাত মৎস্য আবিষ্কার এবং তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন। ইনি অবসর গ্রহন করিলে ডাঃ সুন্দরলাল হোরা মহাশয় এখনও মৎস্যের চর্চ্চা করিতেছেন। সম্প্রতি আমি বঙ্গভাষায় "বাংলার মৎস্য পরিচয়" নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে "প্রকৃতি" নামে দ্বৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে যতদূর সম্ভব মৎস্যগুলির দেশীয় নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

ভারতীয় উভচর এবং সরীসৃপগুলির বিবরণ Fauna of the British Indiaতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ভেক উভচর শ্রেণীর অন্তর্গত। সরট, সর্প, কুমীর ও কচ্ছপ সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত। Fayrer নামক সাহেব ভারতীয় বিষধর সর্প এবং তাহাদের বিষ সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পদিন হইল Wall নামক এক সাহেব Poisonous Terrestrial Snakes of India নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থে বঙ্গদেশের সর্পের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য বঙ্গীয় সরীসৃপ সম্বন্ধে আর কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। Fauna of the British Indiaতে দুই সংস্করণে ভারতীয় পক্ষীর বিবরণ প্রকাশিতহইয়াছে পক্ষীদের বিবরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বঙ্গদেশে ডাঃ শ্রীসত্যচরণ লাহা মহাশয় বহুদিন হইতে পক্ষী সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতেছেন এবং কয়েকখানি পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন।

পশু সম্বন্ধেও আমরা Fauna of the British Indiaর উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতে পারি। ইহার পর সময়ে সময়ে নানা পত্রিকায় পশু সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে।

অবশেষে আমি এই সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জ্ঞাপন করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। আমরা বিভিন্ন বিভাগের প্রাণীদিগের সম্বন্ধে আলোচনায় দেখিতে পাইলাম যে বঙ্গদেশের, বঙ্গদেশের কেন, সমুদয় ভারতবর্ষের প্রাণি-সঙ্ঘের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এখনও অতিশয় অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আমরা যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রতি দৃক্‌পাত করি তখন দেখিতে পাই—সকল দেশেরই প্রাণিসমষ্টি সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কেবল ভারতবর্ষ অন্যান্য বহুবিষয়ের ন্যায় এবিষয়ে অনেক পিছাইয়া পড়িয়া আছে। ইহা আমাদের পক্ষে কম দুঃখ এবং লজ্জার কথা নহে। আজকাল যখন এদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, প্রাণিবিজ্ঞানের আলোচনা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে, তখন

প্রাণীবিজ্ঞানের এইদিক্—প্রাণীসঙ্ঘ—কেন অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে? যাহাতে বঙ্গের প্রাণীসঙ্ঘের জ্ঞান শীঘ্রই সম্পূর্ণতা লাভ করে তদ্বিষয়ে প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনোযোগী হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা। এতদিন বিদেশীয় প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আমাদের দেশে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, আজ যেন আমাদের স্বদেশীয় প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেই কার্য্যে ব্রতী হন, ইহা আমার ঐকান্তিক বাসনা।

আত্ম-সমর্পণ।

লেখক—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী।

আজি আমি সমর্পিব তোমার ও পদে,
হে দেবতা! ঘৃণা-অনুতাপ-ক্ষোভ-খেদে
সিক্ত জীর্ণ শীর্ণ আমার এ "আমি" টুক্।
যাহা রুদ্ধ ছিল এতদিন ক্ষুদ্র সুখ
মাঝে সংসারের আমি, সংসার আমার
ভেবে; প্রতিদিন স্নেহ কলরব আর
হাঁসি কান্না রাশি সেথা উঠিত ধ্বনিয়া
সদা;—আজি দেখ সেথা বারেক চাহিয়া
নাথ! নাহি আর ছোট-খাট শিশুখেলা,
শুধু ক্ষোভে, শুধু খেদে মগ্ন সারা বেলা!
কোথা হ'তে এক অশুভ স্বপন এসে
ধীরে ধীরে এনেছে এ নিরানন্দ দেশে!
পৃথিবীতে আজি আমি নিতান্ত নগণ,
তাই নাথ! তব পদে আত্ম-সমর্পণ॥

শাঁখা ও সিন্দূর।

লেখক—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে।

দশম পরিচ্ছেদ।

দিন গেল, ক্রমে সন্ধ্যা তাহার পর রাত্রি আসিল। আকাশে ফুট্ ফুট্ করিয়া নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিল। স্বভাব-সুন্দর চন্দ্রমা সুশীতল স্নিগ্ধকর কিরণ বিকীরণ করিল। ফুল্ল কুসুম নিচয় মৃদুমন্দ সমীরণ সংস্পর্শে মৃদুমন্দ নাচিতে নাচিতে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল; নবসুরভি সুগন্ধি সমীর-সঞ্চারে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। ঊর্দ্ধে চন্দ্রের হাসি, নিম্নে পুষ্পের হাসি,—উভয় হাসির সংমিশ্রণে প্রকৃতিকে হাস্যময়ী করিয়া তুলিল।

সেই হাস্যময়ী রজনীতে জামাতা ব্রজকিশোর আসিল। সুসজ্জিত বৈঠক খানায় বসিল, শ্বশুর হরনাথের প্রীতি-সম্ভাষণে, আদর আপ্যায়নে জামাতা ব্রজকিশোর বড়ই প্রীতি অনুভব করিল। সদর মহলে আর বড় অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রতিবেশিনীরা ব্রজকিশোরকে বেষ্টন করিল।

অন্তঃপুরে মহাধূম! পাড়ার পুরস্ত্রীরা নূতন জামাতা দেখিতে আসিয়াছে। জামাইয়ের সহিত প্রতিবেশিনীদিগের আমোদ আহ্লাদ হয়,—তাহা মোক্ষদার ইচ্ছা নহে; কিন্তু পাছে জামায়ের উপর বিতৃষ্ণভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি প্রতিবেশিনীদিগকে নিবারণ করিতে পারেন নাই; সুতরাং আজ তাহারা অন্দর মহল সরগরম করিয়া তুলিয়াছে।

প্রায় এক বৎসর হইল কর্ত্রী-গৃহিণীর রেষারেষি, কাজেই ব্রজকিশোরকে সকলে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই; আজ সে আকাঙ্ক্ষা মিটাইল; ব্রজকিশোরকে দেখিয়া তাহাদের চক্ষু জুড়াইল। তাহারা দেখিল, ব্রজকিশোরের রূপ অনুপম, নাসা সুন্দর, চক্ষু সুন্দর, ললাট সুন্দর, দেহের সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর। সুন্দর দেখিয়া সুন্দরী যুবতীর সুন্দর হৃদয়ে যুগপৎ তড়িৎ খেলিয়া গেল!

বৃদ্ধা মহলে ব্রজকিশোরের প্রশংসার সঙ্গে স্ব স্বজামাতার প্রশংসাবাদ হইতে লাগিল। প্রৌঢ়াদিগের প্রতি চোক ঘুরাইয়া, নাক নাড়িয়া যুবতীরা আর সে দিকে কাণ দিল না, তাহারা ব্রজকিশোরকে লইয়াই ব্যস্ত। কেহ রসিকতা করিয়া, কেহ ছড়া কাটাইয়া, কেহ গান গাহিয়া, কেহ হেঁয়ালি আওড়াইয়া, কেহ বা গায়ে পড়িয়া ব্রজকিশোরকে বিব্রত করিয়া তুলিল। যুবতীদিগের আনন্দে হাসিতেছিল যুবতীরা আর হাসিতেছিল যৌবনভাব বিভোরা প্রৌঢ়ারা। আর বৃদ্ধারা যুবতীর মধ্যে থাকিয়া হাসিতে ও হাসাইতে ছিলেন,—তাঁহাদের দন্তবিহীন-মুখ-নিঃসৃত এক একটী মিষ্ট কথায় যুবতীদিগের মধ্যে হাসির রোল উঠিতেছিল। কোন বৃদ্ধা, কোন যুবতীর আচরণে বিরক্তিচ্ছলে বলিলেন,—

"ও কি লো রাজি! নাতজামাইয়ের গায়ে পড়ে কি তামাসা কোত্তে হয়? তামাসা কর্‌বার কি আর লোক পেলি নি?

যে যুবতী ব্রজকিশোরের গায়ে পড়িয়াছিল, সে অপ্রস্তুত হইবার পাত্রী নহে; সেও বলিয়া উঠিল,—

"এই দেখনা আই মা, বিজি আমায় ঠেল্‌ছে!"

আই মা বলিল,—

"বিজি! ও কি লা?"

এই প্রকার আমোদ আহ্লাদ চলিতেছে, হাসি খুসি চলিতেছে, রং তামাসা চলিতেছে, নির্ম্মলা পুরস্ত্রীগণের নির্ম্মল হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দের উৎস ছুটিতেছে, এমন সময়ে মোক্ষদা প্রেরিতা কোন এক রূঢ়-ভাষিণী প্রৌঢ়া আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিল,—

"যা লো যা! তোরা বাড়ী যা! অনেক রাত হয়েছে, বাড়ী যা!"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুবতীগণ ব্রজকিশোরের কাছে বিদায় লইল, বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ারাও মোক্ষদার নিকট জামাতার প্রশংসা করিয়া একে একে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

মোক্ষদা এখন একা হইলেন, যেন কিছু সুস্থ হইলেন। ব্রজকিশোরের প্রশংসায় বুকে আগুন জ্বালতেছিল, তাঁহার মনে হইতেছিল, প্রশংসাকারিণীদিগের এক একটার গলা টিপিয়া বাটীর বাহির করিয়া দেন। তাহারা চলিয়া গেল. জ্বর ছাড়িল, মোক্ষদা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

আহারাদির পর ব্রজকিশোর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের চতুর্দ্দিকে

দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, কক্ষটি পরিপাটীরূপে সজ্জিত; ছবি, দেওয়ালগিরি, আলমারী ও পালঙ্কাদি যথাস্থানে রক্ষিত। সামাদানে বাতি জ্বলিতেছে, বাতির আলোকে ঘর আলোকিত। আর এক আলোকেও শয্যা আলোকিত। যে আলোক তাহার নিভৃত হৃদয় আলোকিত করিয়া আছে,—ব্রজকিশোর দেখিল, সেই আলোক শুভ্র, সূক্ষ্ম শুকাবৃত হইয়া শয্যার জ্যোতি বিস্তার করিতেছে। সেই শয্যার নিকট ব্রজকিশোর গেল,—হৃদয়ের আলোক, শয্যার আলোক এতদুভয়ে কোন বিভিন্নতা আছে কি না, দেখিবার জন্যই যেন নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়াইয়া—দাঁড়াইয়া—ব্রজকিশোর ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কাটিল। পরে সলজ্জ ভালবাসার আকুলিত কণ্ঠে ব্রজকিশোর ধীরে ধীরে ডাকিল—

"নলিনি!"

কোন উত্তর নাই! ক্ষণেক কাটিয়া গেল। আবার ব্রজকিশোর ডাকিল,—

"নলিনি! ঘুমিয়েছ?"

কোন উত্তর নাই। ব্রজকিশোর বড়ই ফাঁপরে পড়িল। এতদিন যাহার মূর্ত্তি, ভালবাসার স্নেহস্পর্শে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া হৃদয়ের নিভৃতস্থানে করিয়া সুখী, সেই প্রাণ-প্রফুল্লকারিণী মূর্ত্তির অব্যাহিত পরে থাকিয়াও ব্রজকিশোর আজ বড়ই ফাঁপরে পড়িল, বার বার দুইবার ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইল না। যাহার চিন্তায়, যাহার অনুপম রূপ, বিলোল নয়ন,—নিটোল নাসা, আরক্তিম গণ্ড, সলজ্জ হাসি, কত রাত্রি তাহাকে বিনিদ্রিত করিয়াছে, সেই রূপমাধুর্য্যময়ী প্রাণের পুতলী নলিনী কি ঘুমাইল? কিছুই স্থিরীকৃত হইল না; আবার অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চ অথচ মধুরস্বরে ব্রজকিশোর ডাকিল,—

"নলিনি! নলিনি! ঘুমুলে?"

মোক্ষদার প্ররোচনায় নলিনী ভাবিয়া রাখিয়াছিল, শয্যায় শয়ন করিলেই স্বামীকে অপমান করিবে, কিন্তু তাহা পারিল না, স্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়া তাহাকে জড়ীভূত করিয়া ফেলিল, একইভাবে নলিনী শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। এক্ষণে বারংবার স্বামীর মধুর আহ্বানে নলিনীর সলজ্জ ভাবের যেন কিছু হ্রাস হইল। নলিনী একটি ছোট উত্তর দিল,—

"না"

"না" শব্দেই উৎকণ্ঠিত ব্রজকিশোরের হৃদয় জুড়াইল, আকাঙ্ক্ষা মিটিল,

যেন আকুল প্রাণে অনুকূল বাতাস বহিল!

ব্রজকিশোর বলিল,—

"তবে উত্তর দাওনি কেন?"

আবার কোন উত্তর নাই। কি উত্তর দিবে, নলিনী কিছুই স্থির করিতে পারিল না. চুপ করিয়া রহিল।

আবার প্রশ্ন হইল,—

"ভাল আছ?"

"হুঁ!"

"এখন কি পড়্ছ?"

"সীতার বনবাস।"

"মানে বুঝ্তে পার?"

"সব পারি না।"

"কার কাছে পড়?"

"কমলার কাছে!"

"সেখানে গেলে আমার কাছে পড়্বে ত?"

নলিনী এতক্ষণ বেশ উত্তর দিতেছিল, শ্বশুরালয়ে যাইবার কথায় তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল, মা'র সকল কথা মনে পড়িল—ক্রোধের উদ্দীপন হইল। কথা কহিয়া লজ্জার অনেক লাঘব হইয়াছিল, নলিনী—স্পষ্ট বলিল,—

"তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবে কেন?"

ইহার অর্থ ব্রজকিশোর কিছুই বুঝিতে পারিল না, সবিস্ময়ে বলিল,—

"কেন? আমাদের বাড়া কি যাবে না?"

নলিনী। না। গরীবের ঘরে খাট্তে কে যাবে?

ব্রজকিশোর। যাদের লোক জন নাই, তাদের বৌ-ঝিয়েরা না খাট্লে কে খাট্বে বল?

নলি। ও কথা কেন? তাই বল না কেন, চাকরাণীগিরী করাতে পরের মেয়েকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ। আমি তা যাব না।

ব্রজ। তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি বড় কম। এখন তোমার মা বাপ এক রকম তোমার পর তা জান? এ বাড়ী পরের বাড়া আমাদের বাড়া তোমার নিজের বাড়ী তা জান? নিজের বাড়ীতে নিজে করবে, এতে দোষ কি?

নলি। মা বাপকে পর শিখিয়ে আমাকে চাকরাণী করে রাখ্তে চাও?

আমার মা বাপ যেমন আমার পর, তোমারও মা বাপ তেমনি তোমার পর; তুমি তবে তোমার মা বাপকে ছেড়ে আমাদের বাড়ীতে খাট আর থাক না কেন?"

তীক্ষ্ণ উত্তরে ব্রজকিশোর বুঝিল, মা বাপকে পর বলিয়া ভাল করে নাই। নলিনীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিল,—

"আচ্ছা, তোমারও মা বাপ তোমার পর নয়, আমারও মা বাপ আমার পর নয়, এখন রাগ গেল ত? মা বল্ছিলেন, দু-দশদিনের ভেতরেই তোমায় নিয়ে যাবেন। যাবে ত?"

শ্বশুরালয়ে যাইবার কথায় নলিনীর ক্রোধের বৃদ্ধি হইল। নলিনী বলিল,—

"তোমাদের বাড়ীতে আবার মানুষে যায়! নিজেদেরই খেতে কুলোয় না, শুতে কুলোয় না, আবার পরের মেয়েকে খেতে দেবে, শুতে দেবে! অত যদি সাধ যায়, অপর চাকরাণী রাখগে, এ চাকরাণী যাবে না।"

ব্রজকিশোরের বড় রাগ হইল, বলিল,—

"পৃথিবীর মধ্যে তোমার বাপই যা বড় মানুষ।"

নলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল, মোক্ষদার বুলি ধরিল, বলিল,—"তাইত! তোমরা আবার কি? চিরকাল চটে শুয়েই গেছে। কোন কালে চাকর চাকরাণীর মুখ দেখেছ কি? আজ কাল না হয় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। আমরা বনেদী বড়মানুষ। আমাদের নিয়ে ঘর করা যার তার কর্ম্ম নয়।"

ঘৃতাহুতির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া ব্রজকিশোর বলিল,—

"অমন ঢের ঢের বনেদী ঘর দেখা আছে। টাকা হলেই বনেদী হয় না।"

নলিনী আরও রাগিয়া উঠিল, যাহা মনে আসিল, তাহাই বলিতে লাগিল। ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—

"তুমি আবার মুখ নাড়্চো কি? তোমাদের কেঙ্গলাকুটে দশা কে না জানে? পাঁচ বাড়ী ফেন চেটে বেড়াতে, কে না জানে? এখানে বিয়ে হয়ে লোকে যা চিনেছে। তা না হ'লে তোমাদের চিন্ত কে?"

ব্রজ। চুপ কর বল্ছি। আমার সব সহ্য হয়, গুরুজনের নিন্দে সহ্য হয় না। গাল দিতে হয়, আমায় দাও, তাতে আমি রাগ করব না।

নলি। উচিত কথা বল্ব, তাতে তুমি রাগই কর, আর যাই কর। আচ্ছা, সত্যি করে বল দেখি, তোমরা চেটায় শুয়ে মানুষ কিনা? তোমাদের মুরোদ কত তা জানা আছে।

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্রজকিশোর বলিল,—

"ফের্ ঐ কথা! ফের্ যদি ও কথা মুখে আন, তা হ'লে তোমার আর ও মুখ দেখ্‌ব না।"

"ও মুখ দেখ্‌ব না!" স্বামীর এই বজ্র-কঠিন কথায় নলিনীর হৃদয় কিছুমাত্র টলিল না, কাঁপিল না, মোক্ষদার কুশিক্ষায় নলিনীর পঞ্চীকৃত হৃদয় টলিবে কেন, কাঁপিবে কেন? অধিকতর রূঢ়স্বরে নলিনী বলিতে লাগিল,—

"ভয় দেখাচ্চ কি? আমার মুখ দেখ্‌বে না, নাই দেখ্‌লে? আমি ভয় তাতে করিনি। এমন ঘরে, এমন বিছানায়, যা তোমার কোন পুরুষে শুতে পায়নি, আজ তুমি শুলে—তাই ভাগ্যি করে মান। এই ত আবার বল্লুম। আমার আর ত মুখ দেখ্‌বে না! যাও—কোথা যাবে যাও,—এখনই যাও।"

ব্রজকিশোর বড়ই মর্ম্মাহত হইল,—দারুণ অপমানে মুহ্যমান হইল,—আর কোন কথা বলিল না। শয্যা হইতে নামিয়া পিরিহান বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, ব্রজকিশোর একবার মাত্র নলিনীকে দেখিল,—দেখিল, নলিনী তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, সে দৃষ্টি—মমতার, ভালবাসার নহে, ঘৃণা-বিজৃম্ভিত গর্ব্বের। বদ্ধার্গল দ্বার খুলিয়া ব্রজকিশোর ঘরের বাহির হইয়া গেল।

প্রচ্ছন্ন-হৃদয় মোক্ষদা প্রচ্ছন্নভাবে দ্বারের অন্তরাল হইতে সকল কথা শুনিতেছিলেন। এক্ষণে মন্ত্রণা-সিদ্ধি হইল দেখিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না।

পদ্মর মা দারুণ গ্রীষ্মবোধে ঘরের বাহিরে আসিয়াছিল, স্পষ্ট শুনিল নলিনী কাহাকে "যাও" বলিল। কৌতূহল নিবারণার্থ শব্দ লক্ষ্য করিয়া পদ্মর মা সেই দিকেই আসিতেছিল। পথে ব্রজকিশোরকে দেখিয়া পদ্মর মার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সে ব্রজকিশোরকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। সহসা একটা কথা শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ আপনাআপনি দুর্ব্বল হইয়া আসিল, মাথায় হাত দিয়া পদ্মর মা বসিয়া পড়িল। পদ্মর মা মোক্ষদার বিকৃত কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনিল—শুনিল, "ছেড়ে দে, যাচ্ছে যাক্।" পদ্মর মার চেষ্টা বিফল হইল, হস্ত-স্খলিত ব্রজকিশোর সেই রজনীতে দৃঢ়পদে দ্রুত চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই পদ্মর মা প্রকৃতিস্থ হইল। পূর্ব্ব ঘটনাগুলি তাহার স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। পদ্মর মার একটা গুরুতর ভাবনার বিষয় হইল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—

"এ কি গিন্নীর মুখের বাক্যি! সত্যি সত্যি কি গিন্নীর গলা! না—না, তা নয়, এও কি হতে পারে! শাশুড়া হয়ে জামাইকে অপমান করতে পারে কি? এত রেতে গিন্নীই বা কি কর্‌তে আসচে? আর কেউ নয় ত? গিন্নীর গলা করে নলির সর্ব্বনাশ কোর্ত্তে আসে নি ত? নলিকে সোয়ামী ছাড়া করে, এমন সর্ব্বনাশী ভালখাকী কে?"

পূর্ব্বের অনেক ঘটনা পদ্মর মার স্মরণ হইল, বিবাহের পর হইতে গোপনে নলিনীর সহিত মোক্ষদা কি পরামর্শ করিতেন, তাহা একে একে স্মরণ হইল; কিসের পরামর্শ, পূর্ব্বে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, পদ্মর মা আজ তাহা বুঝিল,—মোক্ষদার অন্তরে যে বহ্নি লুক্কায়িত ছিল, আজ তাহা বুঝিল। বুঝিল,—আজ সমস্ত দিবস মোক্ষদার বিপরীত মূর্ত্তি ছিল, সমস্ত দিবস বদনে হাস্যের লেশ মাত্র ছিল না, বর্ষাঘন-ঘটাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় মুখমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে পদ্মর মা চন্দ্রালোকে দেখিল, গর্ব্বিতা মোক্ষদার বদনে হাস্যরেখা বিদ্যমান। হাস্যমুখে মোক্ষদা তাহারই নিকট আসিতেছেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও হাসি নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

মোক্ষদা পদ্মর মাকে কত অনুনয় বিনয় করিলেন,—পূর্ব্বোক্ত ঘটনা চাপিয়া রাখিবার জন্য পদ্মর মার হস্তে কিছু দিলেন। পদ্মর মা প্রথমে লইতে অস্বীকার করিল, পরে হাত পাতিয়া লইল, সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদার সাধুতার অনেক প্রমাণ দর্শাইল, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—

"বাপ্‌রে—এ কথাও কি বল্‌তে আছে! কার ঘরে নেই? তা বলে কি সে কথা নিয়ে গাঁ ফাটাতে হবে? আমি সে মেয়ে নই যে পেটে একটা কথা থাকে না।"

পদ্মর মাকে হস্তগত করিয়া মোক্ষদা আবার নলিনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন নলিনী নিদ্রিতা।

তাম্বুলরাগরঞ্জিতাধরা মোক্ষদার মদগর্ব্বস্ফীত কপোল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, ঈষৎ হাসি দেখা দিল, সে কুঞ্চন সরল নহে—জটিল, সে হাসি সরস নহে—নীরস।

ক্রমশঃ।

মহারাজাধিরাজ স্যার রামেশ্বর সিংহ

জি, সি, আই, ই, কে, বি, ই,

লোকান্তরে—

দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ স্যার রামেশ্বর সিংহ জি, সি, আই, ই, কে, বি, ই, বিগত ১৯ শে আষাঢ় ইং ৩রা জুলাই বুধবারে দ্বারভাঙ্গার রাজপ্রাসাদে পরলোক গমন করিয়াছেন। মহারাজাধিরাজের বয়স সপ্ততি বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি কিছুদিন হইতে অসুস্থও হইয়াছিলেন, তথাপি এত শীঘ্র যে তিনি পর-

লোক গমন করিবেন, ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। তিনি বৃটীশ ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার, ভারতের একজন প্রধান ধনী ছিলেন! তিনি আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দু-সমাজের খ্যাতনামা নেতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এক বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হয়েন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর মাত্র আড়াই বৎসর বয়সে রাজপদে অভিষিক্ত হন। মহারাজ বাহাদুর স্যার লক্ষ্মীশ্বর ঐ সময়ে নাবালক থাকায় জমিদারির ভার কোর্ট অব্ ওয়ার্ড্‌সের হস্তে সমর্পিত হয়।তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দ্বারভাঙ্গায়,মজঃফরপুরে ও কাশীধামে শিক্ষা লাভ করেন। ১২ বৎসর বয়সে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক সমস্ত পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহার বয়স অল্প থাকায় তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয় নাই। পরে তিনি পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ সাবালক হইলে কুমার রামেশ্বর সিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পৃথক্ হইয়া দ্বারভাঙ্গা জেলার অভ্যন্তরে রাজনগর নামক স্থানে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার নিজ সম্পত্তির আয় হইতে নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে তিনি ষ্ট্যাটুটরি সিভিল সার্ভিসের নিয়মানুসারে সরকারের অধীনে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন ।১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৯ নয় বৎসর কাল তিনি ঐ পদাভিষিক্ত ছিলেন। দেশশাসন কার্য্যের এই অভিজ্ঞতার ফলে উত্তরকালে তিনি তাঁহার সুবৃহৎ জমিদারীর সমস্ত কার্য্য পরিচালনায় দক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার কালেই বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। দুঃখের বিষয়,তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। নিঃসন্তান মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে পোষ্য পুত্র গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তিনি ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করেন এবং রামেশ্বর সিংহকে তারযোগে আহ্বান করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন। ১৮৯৮ সালে রামেশ্বর সিংহ দ্বারভাঙ্গার অধিপতি হন এবং "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজ্য লাভ করিবার পর হইতে ইতিনি হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হন। বঙ্গদেশ ও বিহারের হিন্দু সমাজে তাঁহার অবিসংবাদিত নেতৃত্বের অধিকার স্বীকৃত হয়। ফলতঃ তিনি সমস্ত ভারতবর্ষেরই হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন। প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতের সর্ব্বপ্রকার হিন্দু ধর্ম্মান্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া

গিয়াছেন! তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভারত-ধর্ম্মমণ্ডলের সভাপতি ছিলেন। ধর্ম্মোদ্দেশ্যে তাঁহার অপর্য্যাপ্ত দান ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ৺কাশীধামের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য হিন্দু প্রতিষ্ঠানেও তিনি প্রভূত দান করিয়াছিলেন।

রাজনাতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রভূত প্রভাব ছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বঙ্গদেশের ও বিহারের জামিদারগণের প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন! তিনি বঙ্গদেশের ও বিহারের জামদার-সভারও সভাপতি ছিলেন। বিহার ও উড়িষ্যার লাট সাহেবের কার্য্যকরী সভার সর্ব্বপ্রথম সদস্যপদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করেন। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ৪০ লক্ষ টাকার ওয়ারবণ্ড ক্রয় করেন। যুদ্ধকালে তিনি বহুবিধ দাতব্য ভাণ্ডারে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা দান করেন। ইহার মধ্যে তিনি ওয়ার রিলিফ ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা এবং একখানি বিমানপোত ক্রয়ের জন্য দুই লক্ষ টাকা দান করেন।

তিনি টাটা কোম্পানী, ওয়ালফোর্ড মোটর ট্রান্স্পোর্ট্ কোম্পানী, ভিলিয়াস লিমিটেড কোম্পানী প্রমুখ অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন! ধর্ম্ম-সংক্রান্ত, শিক্ষা-সংক্রান্ত ও জনসেবা-সংক্রান্ত দানে তিনি প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদ" নামক সুবৃহৎ প্রাসাদ তাঁহার ব্যয়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি সরকারের কৈসার-ই-হিন্দ্ পদক, কে, সি, আই, ই ও জি, সি, আই, ই ও কে, বি, ই উপাধি লাভ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বংশগত মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনি দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কামেশ্বর সিংহের বয়স বর্ত্তমানে দ্বাবিংশ বৎসর। ইং ১৯২৯ সালের বিগত ১৫ই তারিখে দ্বারবঙ্গে "লক্ষ্মীশ্বর-বিলাস" প্রাসাদে মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ত্রিহুত বিভাগের কমিশনার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ইনিই এখন দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ হইলেন। আমরা এই শোকসন্তপ্ত রাজপরিবারের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিবাহের পণপ্রথার কারণ ও তাহার প্রতিকার

লেখিকা— শ্রীযুক্তা রত্নমালা দেবী।

আমাদের এই হিন্দু সমাজে আজকাল কন্যা বিবাহের সমস্যা বড়ই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতদিন না আমাদের সমাজের এই দুর্নীতিমূলক পণপ্রথার উচ্ছেদ হয় ততদিন সমাজের কল্যাণ নাই। পূর্ব্বকালে আমাদের হিন্দুসমাজে ভদ্রবংশের পুত্রকন্যার বিবাহে পণ লওয়া অতীব ঘৃণার কথা ছিল। আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ ছেলের বিয়েতে টাকা লওয়া খুব নীচতা বলিয়াই মনে করিতেন। পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে আগে সদ্বংশ ও কুল-শীলে শ্রেষ্ঠ নির্দ্দোষ ঘর খুঁজিতেন। পাত্রী যত সুন্দরী না হোক, ভদ্রবংশ-জাতা সুলক্ষণা লক্ষ্মীশ্রী-যুক্তা কন্যা সকলেই খুঁজিতেন, এবং কন্যার পিতার অবস্থা অনুসারে তিনি স্বেচ্ছায় জামাতাও কন্যাকে বস্ত্র অলঙ্কার তৈজসাদি যাহা দিতেন পাত্রপক্ষ তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রীত হইতেন। তবে পূর্ব্বকালে কুলীনঘরে মেয়ে দিতে হইলে কুলীনের কুলমর্য্যাদা ১৬টী টাকা দিতে হইত। তখনকার দিনে ছোট বড় ইতর ভদ্র কেহই মেয়ের বিবাহ দিতে এত বেগ পাইত না। অবস্থা অনুসারে ছেলে মেয়ের বিবাহে সকলেই আনন্দমহোৎসব করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে বসিয়া প্রথমেই ৪।৫ হাজার টাকা দর হাঁকিয়া বসেন। কাজেই কন্যার গরীব কেরাণী পিতারা চক্ষে অন্ধকার দেখেন। সংসারে ধনী লোকের সংখ্যা খুব কম; গরীব ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই বেশী, এবং গরীব কেরানীর সংখ্যাও বড় কম নহে। ধরুন, যাঁহার মাসিক আয় ৫০।৬০ টাকা, তাঁহার যদি চার পাঁচটি কন্যা সন্তান থাকে তাহা হইলে কন্যার পিতাকে ত চক্ষে সরিষাফুল দেখিতে হয়।

এস্থলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অবস্থাটী কিরূপ শোচনীয় তাহাই চিন্তা করুন; একটী গৃহস্থ পরিবারে চার পাঁচটী পুত্রকন্যা থাকিলে ৫০।৬০ টাকায় দুইবেলা দুমুঠা পেট ভরিয়া খাইতে পায় কি না সন্দেহ। তাহার উপর আবার চারটি পাঁচটি কন্যার পিতা হইলে তাঁহার জীবন কিরূপ কষ্টকর তাহা সহ-জেই অনুমেয়। আবার বাংলাদেশের জল হাওয়ার গুণে মেয়েগুলিও শীঘ্র

শীঘ্র আগাছার মত বাড়িয়া উঠে। বড় জোর চৌদ্দবছর পর্য্যন্ত মেয়ে ঘরে রাখা চলে, তার পর যোড়শী হলে কেউ আর বড় একটা কনে পছন্দ করে না। তখন গরীব পিতা মেয়ের বিবাহ দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে নানা স্থানে পাত্র খুঁজে বেড়ান। অথচ মেয়েটিকে সৎপাত্রে দিতে সকল মা বাপেরই ইচ্ছা,—যেন মেয়ে খাবার পর্‌বার কষ্ট না পেয়ে সচ্চরিত্র স্বামীর হাতে পড়ে। এদিকে অবস্থাপন্ন ভাল পাত্রটী খুঁজিতে গেলে পাত্র পক্ষ আগেই মেয়ের বাপ কি রকম খরচ পত্র কর্‌বেন সেইটাই ভালরূপ জানিতে চাহেন। বরং পল্লীগ্রামের লোকের মনুষ্যত্ব আছে, হৃদয় আছে, কাণ আছে, এবং চক্ষুলজ্জার খাতিরও আছে। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে ছেলের বিবাহ দিতে বসে ছেলের বাপ দস্তরমত দরকষাকষি করেন। পাত্রের পিতা একেবারে চার পাঁচ হাজারের ফর্দ্দ দিয়া বসেন। তাহাতে গরীব মেয়ের বাপের মাথায় একেবারেই আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে; অথচ কন্যাটীকে অবস্থাপন্ন সৎপাত্রে দেবার প্রবল ইচ্ছা আছে। এ ক্ষেত্রে কন্যার বিবাহ দিতে হয়ত পৈত্রিক জমাজমা বা ভদ্রাসন বাটী বা গৃহিণীর দুচারখানা অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিতে হয়। কন্যার বিবাহ দিয়া ভালরূপ তত্ত্বতাবাস করিতে না পারিলে মেয়ের ত লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না, কাজেই মেয়ের বাপ অনশনে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া চির জীবন মেয়ের ঋণ শোধ করেন। কিন্তু এক ঋণ শোধ না দিতে দিতেই আর একটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠে। তখন মেয়ের বাপের চক্ষুস্থির হয়। এমনি করে সারা জীবন মেয়ের বিবাহ দিতে দিতে জীবনান্ত হয়ে ওঠে। সাংসারিক অভাব দৈন্য ও কন্যার বিবাহের অর্থ চিন্তায়, অনাহারে বা অল্পাহারে গুরুতর পরিশ্রমে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে। একদিকে দেশে অন্ন বস্ত্রের সমস্যা যেমন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অপর দিকে কন্যার বিবাহও একটী গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহের অবস্থা কি ছিল আর এখন কি হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখুন। বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা দেখিয়া মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও পুত্রের বিবাহে পণ লওয়া অবাধেই চলিতেছে। আমাদের দেশোদ্ধারকারী শিক্ষিতদল কাগজে কলমে বড় বড় আর্টিকেল লিখিয়া বক্তৃতায় ঘর ফাটাইয়া "কন্যাদায়ের প্রতিকার কর" বলিয়া চেঁচাইয়া থাকেন। কিন্তু সত্য সত্য দেশের মঙ্গলের জন্য ও সমাজের কল্যাণের জন্য কয় জন বদ্ধপরিকর হইয়া কন্যাদায়ের প্রতিকার চেষ্টা করিয়া থাকেন? এই কন্যাদায়ের যথার্থ প্রতিকার করিতে হইলে ছোট

বড় সকলকেই কোমর বাঁধিতে হইবে। এবং যাহাতে এই দুর্নীতিমূলক পণ প্রথার সমূলে উচ্ছেদ হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সমাজ আমাদের নিজস্ব জিনিষ, তবে যাঁহারা বাস্তবিক দয়ালু পরদুঃখকাতর, জগতের মঙ্গলকার্য্যে যাঁহারা ব্রতী, তাহারা অগ্রে নিজেদের সমাজ সংস্কার করিয়া পণপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করতঃ দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্নদের উদ্ধার করুন-নতুবা সমাজের মঙ্গল আশা সুদূরপরাহত। পুত্রকন্যা ভগবানের দান, স্বেচ্ছায় তাহা লাভ হয় না। কেহ বা বহু পুত্রের পিতা, কেহ বা বহুকন্যার পিতা হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে মেয়ে জন্মিলে আনন্দের পরিবর্ত্তে একটা বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসে, তাহার কারণ মেয়েটীর বিবাহের সময় পিতার সর্ব্বস্বান্ত হবে, এই চিন্তা। সে কালে পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে বসিয়া কেহ এত লোভ করিত না। বরং বিবাহে টাকা লওয়া নীচতার কার্য্য বলিয়াই সকলে মনে করিতেন। তবে স্বইচ্ছায় কন্যার পিতা কন্যাজামাতাকে বস্ত্রালঙ্কার তৈজসাদি যাহা দিতেন, পাত্রপক্ষ হাসিমুখে তাহাই লইয়া গৃহলক্ষ্মী পুত্রবধূটীকে বরণ করিয়া লইতেন। এজন্য ছোট বড় ইতর ভদ্র সকলেই মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইলেই বিবাহ দিতে পারিতেন; এখন বিবাহ-বিধি আইন হইয়া ১৪ বা ১৫ বৎসর না হইলে কন্যার বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু অর্থাভাবে তাহার অতিরিক্ত বুড়ি বাইশ বছরের কন্যা লইয়া কন্যার পিতারা কাঁদিতেছেন। অর্থাভাবই ইহার কারণ। আমাদের হিন্দু-বিবাহের অর্থ শুধু স্ত্রী পুরুষের মিলন নহে। ইহার মধ্যে অনেক গুরু-কর্ত্তব্যভার আছে। প্রথমতঃ পাত্র-পাত্রী বংশে কুল-গৌরবে উভয়ের সমতুল্য হওয়া চাই। কিন্তু আজকাল ছেলে মেয়ের বিবাহ দিতে বসিয়া কেহ বড় একটা বংশ ও কুল মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি রাখেন না! এখন পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। এখন আর বংশমর্য্যাদার দিকে কেহ বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না। এখন সকলেই অবস্থাপন্ন শিক্ষিত পাত্রে কন্যা দিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়েন। পাত্রপক্ষও যাহাতে ভাল দরে ছেলে বিক্রয় করিতে পারেন তাহাই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, আমাদের সমাজ এখন কতদূর স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে। এই পণপ্রথা পূর্ব্বে ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল না। ছেলের বিয়েতে টাকা লইতে হইলে অনেকের মাথা হেঁট হইত। এখন আর বরপণ লইতে কেহই পশ্চাদপদ নহেন। ছেলের বিয়ের নাম হইলেই পাঁচ হাজারের ফর্দ্দ দিয়া বসেন। সকল ঘরেই বিয়ের কথা তুলিতে গেলে আগে দেনা

পাওনা মিটাইতে বলেন। কাজেই গরীব গৃহস্থ কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার বরপণ দিতে প্রাণান্ত হয়. নতুবা অবস্থাপন্ন ঘরে মেয়ের বিবাহ হয় না। এজন্য এখন হিন্দু-সমাজের গৃহে গৃহে অর্থাভাবে অষ্টাদশ বা বিংশতি বর্ষীয়া কুমারী কন্যা অবিবাহিতা থাকে। পিতামাতার অর্থের সঙ্গতি না থাকিলে কন্যার বিবাহ দুর্ঘট হইয়া থাকে। আমাদের বাংলা দেশের মধ্যে অন্নবস্ত্রের সমস্যা দিন দিন যেমন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে. তাহার সহ বিবাহের পণপ্রথা মিলিত হইয়া হিন্দুসমাজকে উৎসন্নের পথে লইয়া যাইতেছে। যদি প্রকৃত স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্খী কেহ থাকেন তবে এই সর্ব্বনেশে পণপ্রথা সমূলে উচ্ছেদ করুন। তরুণ যুবকদল যাঁহারা আমাদের আশা ভরসা তাঁহারা যদি সকলে এক বাক্যে একপ্রাণ একমন হইয়া বরপণপ্রথা উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হয়েন তবে অচিরেই সমাজ হইতে এই পণপ্রথা উঠিয়া যায়। যাঁহারা সমাজে ধনী বলিয়া গণ্য তাঁহারা অবশ্য কন্যার বিবাহে পাঁচ দশ হাজার যৌতুক দিন। কিন্তু গরীব গৃহস্থ মধ্যবিত্তগণ এই নিদারুণ পণপ্রথার হস্ত হইতে যাহাতে মুক্তি লাভ করেন কায়মনোবাক্যে তাহায়চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমরা আত্মীয় স্বজনের বিবাহে প্রায়ই দেখিতে পাই শুধু রূপগুণবতী বধূ হইলে চলিবে না, বধূর অঙ্গে হীরা মুক্তার অলঙ্কার থাকিবে, বধূর সঙ্গে গাড়ি বোঝাইকরে টেবিল চেয়ার আয়না দেরাজ খাট পালঙ্গ রূপার দান রূপার চায়ের সেট এ সব না থাকিলে শ্বশ্রূ ননদেরা বধূকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না। তার উপর মেয়ে যদি সুন্দরী না হয়, গরীব মেয়ের বাপ মেয়েকে ভালরকম তত্ব তাবাস কর্‌তে না পারেন, তবে মেয়ের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। শুধু যে বিবাহ দিয়াই পিতা মাতা নিশ্চিন্ত হইবেন তাহাও নয়। আমাদের সমাজ এই মহা অনর্থকার বরপণ প্রথার জন্য উৎসন্ন যেতে বসেছে। সে কালে টাকা নিয়ে ছেলের বিয়ে দেওয়া একটা ঘৃণিত তুচ্ছ নীচকায বলিয়াই সকলে মনে করিত। এখন আর শিক্ষিত অশিক্ষিত ভদ্র অভদ্র কেহই পণপ্রথার বিরোধী নহেন। ছেলের বিবাহ দিতে হলেই লম্বা ৫০০০ হাজারের ফর্দ্দ দিয়া বসেন। অনেক স্থলে ফর্দ্দ দেখিয়াই মেয়ের বাপের চক্ষুস্থির হইয়া বসে। সংসারে সকলের কিছু সচ্ছল অবস্থা নহে অথচ বরপণ দিতেই হবে পিতার অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, বিবাহে টাকা চাই। আমাদের শিক্ষিত সমাজ দিন দিন স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণমনা অনুদারচিত্ত হইয়া উঠিতেছেন তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। কাহারও সুখদুঃখে সমবেদনা নাই। সে

কালে ছেলের বিবাহ দিয়ে টাকা লওয়ার কথা শুনিলে অনেকে কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া রাম নাম করিতেন। কিন্তু আজকাল বরপণ লইবার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। উদরপূর্ত্তি না হইলে উদারপ্রকৃতি হওয়া যায় না। এখন যাঁহার পাঁচটী পুত্র, তিনি পাঁচটী ছেলের বিবাহ দিয়া ২৫ হাজার সঞ্চয় করিতে চাহেন ও ছেলের বিবাহ দিয়া অনেকে বড় লোক হইতে চাহেন। কাজেই চক্ষুলজ্জার খাতির বড় আর কেহ রাখেন না। বরপণ লইবার দ্বিতীয় কারণ পিতামাতার অর্থসঞ্চয়স্পৃহা। কেন না পরের ধনে পোদ্দারি করিতে সকলেই ভালবাসে। কন্যার পিতারা যদি একমত হইয়া কন্যার বিবাহ হউক বা নাই হউক, "আমরা পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিব না" বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন তবে পণপ্রথার নিশ্চয়ই উচ্ছেদ হয়। কন্যাদায়ের প্রতিকার করিতে হইলে পণপ্রথার উচ্ছেদ করা চাই, নতুবা সমাজের কল্যাণ নাই। আমাদের সমাজের ধর্ম্মবল দিন দিন শিথিল হওয়ায় সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহা সকলেই জানেন। ধর্ম্মবল হ্রাস হইলে তাহার সঙ্গে সকল বলেরই হ্রাস হইয়া থাকে। এই কারণ বরপণের জন্য দায়ী সমাজ। সমাজ যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, তবে কোন বিষয়ের শৃঙ্খলা থাকে না। সমাজ যদি যথেচ্ছাচারী হয় তবে সমাজের ধর্ম্ম কখনই সুরক্ষিত হয় না। তখন তাঁহার ধ্বংসই অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। আমাদের নৈতিক চরিত্র বল গঠনের সহায় সমাজ। লোক রক্ষা ও সমাজ রক্ষা দুইই ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কেন না সমাজ-বন্ধন না থাকিলে লোক রক্ষা হয় না। আজ আমাদের দেশে যে অন্নবস্ত্রের কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে তাহার বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিবেন, তাহার জন্যও দায়ী সমাজ। সমাজের শাসন না থাকায় আমাদের দেশে কন্যার বিবাহ একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়ছে। এই দুর্নীতিমুলক পণপ্রথা যদি সমাজ বদ্ধপরিকর হইয়া উচ্ছেদ করেন তবে নিশ্চয়ই সমাজের গতি ফিরিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি হওয়ায় সমাজ দরিদ্র হইয়াছে। সমাজের আর পূর্ব্বকালের ন্যায় বল নাই। সমাজ এখন প্রাণশক্তিহীন। সমাজে এখন আর বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে কেহ কাহার দিকে তাকায় না। সমাজের আর একতাবন্ধন নাই। যে হিন্দুসমাজ একদিন একতাবন্ধনে সুদৃঢ় ছিল, মনে করিলেই কেহ উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছাচার করিতে পারিত না, সমাজের শাসন সকলেই মাথা পাতিয়া লইত, এখন সমাজশাসনের শিথিলতায় তাহার হাত হইতে শাসনদণ্ড স্খলিত হইয়াছে। আমাদের দেশে এই বিবাহ সমস্যা যতদিন না মিটিবে তত দিন সমাজের দুর্গতিও ঘুচিবে না।

ভগবান বুদ্ধদেব।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

বৈদিকধর্ম্ম আর্য্যদিগের প্রাথমিক ও সনাতন ধর্ম্ম। হিন্দুগণ তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যাদি বৈদিক ধর্ম্মানুসারেই নির্ব্বাহ করেন। এই পবিত্র বেদে হিন্দু-মাত্রেই শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস করেন। যে হিন্দু বেদে বিশ্বাস রাখেন না, সকলে তাঁহাকে নাস্তিক নামে অভিহিত করেন। এক কথায় বলিতে গেলে বেদ হিন্দুগণের নিকট প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর সামগ্রী। এই বৈদিকধর্ম্ম পালন করিতে করিতে ক্রমশঃ হিন্দুগণ এই পবিত্র ধর্ম্মে অধিকতর আস্থাবান হইলেন এবং যজ্ঞ ও পূজাদির নিমিত্ত ছাগাদি পশুহত্যা করিতে লাগিলেন। যজ্ঞের পর সোমরস পান ও প্রাণীবলি দেওয়া ক্রমে প্রায় প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের নিকট কর্ত্তব্য কর্ম্মের ন্যায় হইয়া উঠিল। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ঘোরতর হিংসা-পূর্ণ হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের অছিলায় নিত্য নিষ্ঠুরতা প্রদর্শিত হইতে লাগিল। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই বাণী ভারত-মাতার বক্ষ হইতে যেন মুছিয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে সমাজের বিপ্লব অত্যাবশ্যক, কারণ তাহা ব্যতীত কিছুতেই সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। সমগ্র মানব-জাতির মন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং ভারতবর্ষে সমাজেরও ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মানুষের মনের মধ্যে একটী নূতন চিন্তার ধারা আনিবার জন্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উদ্ভব হইল। সমাজকে পরিত্রাণ করিবার জন্যই যেন শাক্যসিংহ উদিত হইলেন। এইজন্যই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চদুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। এমন কি মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণে পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শাক্য-সিংহের

অনেকগুলি নাম আছে, তাহার মধ্যে সিদ্ধার্থ,গৌতম ও শাক্যমুনিই প্রধান। শাক্যসিংহ বা শাক্যমুনি তাঁহার নামকরণের নাম নহে—শাক্য-বংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়াই তাঁহার ঐ নাম হইয়াছিল। নেপাল প্রদেশস্থিত কপিলবস্তু নামক নগরের ক্ষত্রিয় রাজা শুদ্ধোদন তাঁহার পিতা ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম মায়াদেবী। রাজা শুদ্ধোদনের পিতার নাম ছিল সিংহহনু। তাঁহার ন্যায় ন্যায়বান ও মহানুভব রাজা অতি বিরল। শাক্যসিংহ কপিলবস্তু নগরে খৃঃ পূঃ ৬২৩ সালে বসন্তকালে শুক্লপূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সৌভাগ্যবতী মায়াদেবী এমন পুত্রের জননী হইয়াও সন্তানপালনসুখ হইতে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন। পুত্র প্রসবের এক সপ্তাহ কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তখন তাঁহার ভগিনী প্রজাপতি দেবী যত্নের সহিত নবজাত শিশুকে লালন পালন করিতে থাকেন।

প্রজাপতি দেবীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অসাধারণ যত্নে শাক্যসিংহ ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। সাধারণতঃ রাজকুমারদের যেরূপ স্বভাব চরিত্র হয় শাক্যসিংহের ঠিক তাহার বিপরীত ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন এবং তাঁহার সমবয়সী বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে এক দণ্ডও নষ্ট করিতেন না। তাঁহার বালকসুলভ চপলতা কিছুমাত্র ছিল না এবং যে বয়সে বালকেরা একরূপ খেলাধুলা করিয়াই দিন কাটাইয়া দেয়, সেই বয়সে পুত্রের সংসার-বৈরাগ্যের ভাব দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন তাঁহাকে সংসার আবর্ত্তে নিমগ্ন করিবার জন্য নানারূপ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি পুত্রের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং ভাবিলেন যে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলে পর শাক্যসিংহের সংসারের উপর আর বৈরাগ্য থাকিবে না। উপযুক্ত পাত্রী অনেক অনুসন্ধানের পর, দণ্ডপাণি নামক একজন উচ্চ শাক্যবংশীয় ব্যক্তির গোপা নাম্নী কন্যার সহিত বহু আড়ম্বরে গৌতমের বিবাহ হইল। শাক্য-সিংহ বিবাহের পর কিছুকাল দাম্পত্যসুখ ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধীয় চিন্তা উত্থিত হইত এবং দিবসের অধিকাংশ সময়েই তিনি চিন্তা-সাগরে মগ্ন থাকিতেন। শুদ্ধোদন পুত্রের এই ভাব দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ ও প্রলোভন দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। যাঁহার মন একমাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র, সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখ ও প্রলোভন তাঁহার মনকে কিছুতেই সে পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। ক্রমশঃ তাঁহার সাংসারিক সুখে অধিকতর বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। ঘটনাক্রমে একদা

তিনি বহুজন পরিবেষ্টিত হইয়া রথারোহণে নগরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় পথের উপর জরাগ্রস্ত, দন্তহান, জীর্ণ জনৈক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার এইরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে সারথি সবিনয়ে কহিল,"যুবরাজ! এই ব্যক্তির বৃদ্ধ বয়স,সেইজন্যই এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে এ সংসারে কালক্রমে যৌবন গত হইলে মানব মাত্রেরই এই একই দশা ঘটে।" এই ব্যাপারের পর শাক্যসিংহ সংসারের উপর আরও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন যে, "জীবগণ কি মূর্খ! ক্ষণস্থায়ী সুখের নেশায় বিভোর হইয়া, যাহাতে নিত্যসুখ পাওয়া যায়, তাহার বিষয় ভাবিতেছে না। এসংসারে এক মাত্র নির্ব্বাণ বা মুক্তি ব্যতীত কোন সুখই চিরস্থায়ী নহে। এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও কেন মানব সেই অবিনশ্বর অসীম সুখের আকর মুক্তির পথে ধাবিত হয় না?" সেদিন আর তাঁহার ভ্রমণ হইল না—চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অন্য এক দিবস তিনি রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ-সম্মুখে রোগগ্রস্ত জীর্ণ-কলেবরবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন এবং সারথিকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি পূর্ব্ববারের ন্যায় এ বারেও তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ কুমারকে জানাইল। কুমার সারথির উত্তর শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন "রোগ ও শোকের তাড়নায় মানুষ এইরূপ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি এই সমস্ত দেখিয়া সংসার সুখে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছা করে?" সে দিনও আর তাঁহার ভ্রমণ করা হইল না, সে দিনও প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় তৃতীয়বার রথারোহণে ভ্রমণকালীন পথিমধ্যে বস্ত্রাবৃত এক মৃতব্যক্তি দেখিতে পাইলেন। সেই মৃতব্যক্তিকে ঘিরিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনগণ কাঁদিতেছে। তাহা দেখিয়া রাজকুমারের মনে সংসারের উপর বিলক্ষণ বিরক্তি হইল। তিনি সেই স্থানেই রথ হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন, "সারথি! তুমি প্রাসাদে গমন কর, আমি এখন হইতে সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায় চিন্তা করিব।" তিনি আর কিছু না বলিয়া সারথিকে বিদায় দিলেন এবং উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে তিনি একজন সৌম্য রোগ-শোক-বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তিনি একজন ভিক্ষু,—সংসারের সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত। এইব্যক্তি সমস্ত রিপুবর্গ জয় করিয়া একমাত্র ভিক্ষার দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। শাক্যসিংহ এই ব্যক্তিকে দেখিয়া মনে ভাবিলেন

যে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই একমাত্র পথই অবলম্বন করেন। তিনি স্থির করিলেন যে তিনিও সেই পথই অবলম্বন করিলেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি সে দিন প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের হৃদয়ে সংসার বৈরাগ্যের ভাব বদ্ধমূল দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গৌতম কিছুতেই টলিলেন না; তাঁহার হৃদয়ের ভাব অপরিবর্ত্তিত রহিল।

একদা গভীর রজনীতে শাক্যসিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঘোটক আরোহণে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও একমাত্র প্রিয়পুত্র রাহুলকে ত্যাগ করিয়া প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়া প্রাতঃকালে 'অনোমা' নামক নদীতে স্নান করিয়া ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিলেন। তথা হইতে সর্ব্বপ্রথমে তিনি বৈশালীতে একজন ন্যায়পরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহাতে মুক্তির কোনরূপ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। তথা হইতে রাজগৃহে এক ব্রাহ্মণের সমীপে পুনরায় শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের আশা, তাহাতেও পূর্ণ হইল না। এই স্থান হইতে তিনি 'উর্ব্বিলব' নামক এক গণ্ডগ্রামে ৬ বৎসর যাবৎ কঠোর যোগাভ্যাস করেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার অভীষ্ট ফল লাভ হইল না। সর্ব্বশেষে গয়াতে বোধিদ্রুম-মূলে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া তিনি তাঁহার চির আকাঙ্খিত পবিত্র বৌদ্ধজ্ঞান লাভ করিলেন—তাঁহার কঠোর পরিশ্রম সার্থক হইল। তখন হইতে তিনি "বুদ্ধদেব" নামে জনসমাজে পরিচিত হইলেন।

খৃঃ পূঃ ৫৮৮ সালে বৌদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুগণের পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বারাণসীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় বহু ব্যক্তি তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তৎকালীন মগধাধিপতি রাজা বিম্বিসার এই ধর্ম্ম স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছায় বহুলোক এই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। দেশ বিদেশ হইতে বহু বিচক্ষণ পণ্ডিত তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া সনাতন বৈদিক ও অন্যান্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই নবধর্ম্মের পবিত্র পতাকা-মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সময় ভগবান বুদ্ধদেব বহুদিন মগধাধিপতির আতিথ্য স্বীকার করেন, কিন্তু যখন উক্ত রাজা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন, তখন হইতে তিনি শ্রাবস্তীতে বসবাস করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

সকলেই এই মহাপুরুষের শিষ্য হইতে লাগিল। কোশলরাজ ও রাজা প্রসন্নজিৎ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রধান ছিলেন। ১২ বৎসর পরে তিনি তাঁহার পৈত্রিক রাজধানী কপিলবস্তুতে গমন করিয়া তাঁহার পিতৃস্বসা, স্ত্রী ও বহু নরনারীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপে স্বীয় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ভগবান বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ সালে কুশীনগরের নিকটস্থ পাওয়া নামক গ্রামের গহন কানন মধ্যে দেব-মানবলীলা সংবরণ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বহুশিষ্যপরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, ষামগ্রাম, উথদীপ, পাওয়া ও কুশীনগর—এই আটটী স্থানে প্রোথিত করিয়া তাঁহার শিষ্য-বর্গ তাহার উপর ৮টী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁহার শিষ্যবর্গের এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল যে তাঁহার দন্ত ও কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা মন্দির ও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সকল মন্দির ও স্তূপ এখনও বৌদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া বিখ্যাত। কলিকাতার বৌদ্ধমন্দির তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম।

ভগবান বুদ্ধদেব স্বয়ং কোনরূপ গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার তিনজন প্রসিদ্ধ শিষ্য ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ত্রিপিকটের প্রথম অধ্যায় "অভিধর্ম্ম" কাশ্যপ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শিষ্য; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ 'সূত্র' নামক দ্বিতীয় 'অধ্যায়', তাঁহার শূদ্র শিষ্য উপালী 'বিনয়' নামক তৃতীয় অধ্যায় রচনা করেন। এই গ্রন্থ খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে রচিত হইয়াছিল। মগধের রাজা অজাতশত্রু শতপাণি শিখর-মূলে একটী বৌদ্ধ বিহার প্রস্তুত করিয়া খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিবার নিমিত্ত একটী সভাতে সমস্ত বৌদ্ধ আচার্য্যগণকে আহ্বান করেন। ইহাই বৌদ্ধগণের প্রথম সঙ্গম তাহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গম মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক মোগালীর পুত্র আচার্য্য তিষ্যর নেতৃত্বে পাটলীপুত্র (আধুনিক পাটনা) নামক নগরে আহুত হইয়াছিল। চতুর্থ ও শেষ বৌদ্ধ সঙ্গম মহারাজ কণিষ্ক কর্ত্তৃক তাঁহার রাজধানী কাশ্মীর নগরে আহুত হইয়াছিল।

মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উন্নতিকারক। রাজা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর খৃঃ পূঃ ২৬৭ অব্দে অশোক মগধের সিহাসনে আরোহন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভুত উন্নতিসাধন করেন। ইহার জন্যই তিনি জগতে ধর্ম্মাশোক নামে পরিচিত। তাঁহার রাজত্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ

করিয়াছিল। অশোক তাঁহার ভ্রাতা মহেন্দ্র ও ভগিনী সঙ্ঘমিত্রকে সিংহল দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। অশোকের মৃত্যুর পর হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ক্রমশঃ অবনতির পথে ধাবিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সিংহলদ্বীপ হইতে ক্রমে চীন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জাপান, শ্যাম, উত্তর সাইবেরিয়া এবং এমন কি সুদূর আপ্‌সাগু দেশ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য কোন ধর্ম্মের এত শীঘ্র পৃথিবীতে এতদূর উন্নতি হয় নাই। এখনও সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৪৫, ৫০, ০০, ০০০ ব্যক্তি বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী আছেন।

বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।

পেঁড়োর মন্দির।

লেখক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি।

বাবর আলি।

দিল্লীর সম্রাট ফেরোজ সাহের একমাত্র কন্যা সেলিমার জন্মদিন। আজ তিনি ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সম্রাটের আদেশে সহরের কাজকর্ম্ম সমস্তই আজ বন্ধ। কেবল দোকানীরা দোকান পাট খুব জাঁকাইয়া খুলিয়া বসিয়াছে। সম্রাটের প্রাসাদ হইতে দীনদুঃখীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সমস্ত দিল্লী আজ উৎসবের আমোদ আহ্লাদে নিমগ্ন। সহরবাসী প্রত্যেকেই ভাল কাপড় পরিয়া আর হাতে রেশমী রুমাল উড়াইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। বন্ধুবান্ধবের দেখা পাইলেই পরস্পরের মুখ হইতে হাসি ফুটিয়া উঠে, আর কুর্ণিসের ধুম পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পানবিনিময়েরও ধুম পড়ে। সম্রাট এবং তাঁহার উজীর দেওয়ান প্রভৃতি সকল পরিষদই এই উৎসবে উন্মত্ত। সহরের প্রত্যেক পল্লার প্রত্যেক পথের দুইধারের গৃহ হইতেই হাস্যের অট্টরোল আর সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিতেছে। গোলাপ, হেনা, যুঁই, বেলা, চামেলীর আতরের সৌরভে আজ সকল গৃহই ভরপুর। বীণা, এস্রাজ, স্বরদ, সুরবাহার প্রভৃতির তানললিত মধুর নিক্কণ, বাঁয়াতবলা ও মৃদঙ্গের গুরু গুরু সুমন্দ্রধ্বনি এবং গায়কগায়িকাদের কণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব্ব তাললহরী আজ

যমুনার কলতানকেও পরাজিত করিয়া দিল্লীনগরীকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। দিল্লীর আকাশপাতাল সমস্তই আজ উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা।

সন্ধ্যার পর রাজপথ-গুলি বিচিত্র-বর্ণ দীপের আলোকে বিচিত্র রূপ ধারণ করিল। প্রত্যেকেই নিজনিজগৃহ শত-শত দীপমালায় সুশোভিত করিল। রাজ-প্রাসাদ লাল নীল সবুজ রঙ্গের দীপমালা-পরিহিত হইয়া প্রাসাদ সরোবরে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, তখন তাহা ইন্দ্রপুরীর শ্রী ধারণ করিল প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে সম্রাট নগরীর শোভা দেখিবেন, তাই প্রাসাদের সন্নিহিত আমীর উজীর প্রভৃতি উমরাহগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া গেল যে কাহার অট্টালিকা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সাজান হয়।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। প্রাসাদের অনতিদূরে রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী এক অট্টালিকা হইতে উৎসব কল্লোলের খুব জোর কোলাহল শোনা যাইতেছে, গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণেই উৎসবের অনুষ্ঠান আয়োজন হইয়াছে। যাহার ইচ্ছা সে প্রবেশ করিয়া গান-বাজানা শুনিয়া ক্রীড়া-কৌতুক দেখিয়া বাহির হইতেছে—প্রবেশ করিবার কোনই বাধা নাই। প্রাঙ্গণের সম্মুখেই গৃহস্বামী বয়স্যগণের সঙ্গে একমনে পাশাখেলায় প্রবৃত্ত। মধ্যে মধ্যে হার-জিত অনুসারে চীৎকার ধ্বনি উঠিতেছে। গৃহস্বামীর বয়স আন্দাজ বৎসর পঁচিশ। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান; পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বাবর আলি বন্ধুগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্রাটের অধীনে সেনানীর পদ গ্রহণ করেন। বন্ধুদের ইচ্ছা ছিল, তিনি মন্ত্রীর পদের জন্য চেষ্টা করেন। মন্ত্রী হইয়া কলম পেশার কাজের পরিবর্ত্তে বীরের মত যুদ্ধ করাই তাঁহার কাছে বেশী প্রার্থনীয় মনে হইয়াছিল। সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া কয়েকটী যুদ্ধে অসম-সাহসিকতা ও রণদক্ষতা দেখাইয়া বাবর সম্রাটের সুনজরে পড়িয়াছিলেন। বাবর আলি আজ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। অনেক বড় বড় আমীর ওমরাহ বাবরকে কন্যাদানে খুবই উৎসুক হইলেও তিনি বিবাহের কথা কাণেই তুলিতেন না। বলা বাহুল্য যে অন্যান্য অট্টালিকার ন্যায় বাবরের অট্টালিকাও দীপমালায় সুসজ্জিত হইয়া গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিতেছিল। পাশা খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে দ্বিতলে একটী বৃহৎ কক্ষে দুই তিনটী নর্ত্তকী নুপুরনিক্কণের সঙ্গে পা ফেলিতে ফেলিতে নৃত্যের উপক্রম করিল। তাহাদের নুপুরধ্বনি বাবরআলি ও তাঁহার বয়স্যদের কাণে আসিয়া পৌঁছিল।

বয়স্যেরা পাশা খেলিবার সময়েই বেশ দুএকপাত্র টানিয়া প্রাণের মধ্যে গোলাপী নেশাকেও একটু টানিয়া আনিয়াছিলেন। বাবর দুএকপাত্র টানিলেও তাঁহার প্রাণে নেশা তেমন লাগে নাই। যাই হৌক, নর্ত্তকীদের নুপুরধ্বনির সঙ্গে তাঁহাদেরও প্রাণ নৃত্যের ছন্দে বাজিয়া উঠিল। তাঁহারা পাশা বন্ধ করিয়া দ্বিতলে যাইয়া ধপ্‌ধপে ফরাসের উপর গিয়া বসিলেন।

সম্মুখে একটী পারশ্যদেশীয় বহুমূল্য কার্পেট বিছানো আছে। কার্পেটে ফুলফল লতাপাতা এমন সুন্দর আঁকা, মনে হয় যেন সে গুলি স্বাভাবিক। কার্পেটের উপর এখানে ওখানে সেখানে জরীর কারুকার্য্যে খচিত মক্‌মলের ওয়াড়ঢাকা অনেকগুলি তাকিয়া রাখা ছিল। বাবর একটী তাকিয়া লইয়া হেলান দিয়া বসিলেন, আর বয়স্যেরাও যিনি যেখানে পাই-লেন, তিনি সেইখানেই একএকটী তাকিয়াতে গা ঢালিয়া দিলেন। পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত সুললিত চাপ্‌কান ও মাথায় তক্‌মাবিশিষ্ট শাম্‌লা-পরিহিত হুঁকাবরদারেরা নিঃশব্দ পদক্ষেপে রত্নখচিত আল্‌বোলাতে মৃগনাভি-সুবাসিত তামাকুতে ফুঁ দিতে দিতে প্রত্যেকের সম্মুখে হাত পাঁচ ছয় দূরে রাখিয়া নলটী এক একজনের হাতে ধরিয়া দিল। বাবর ও তাঁহার বয়স্য ও নিমন্ত্রিত সকলেই সম্মুখে রক্ষিত পানের বাটা হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে গুড়গুড়ির নল মুখে ধরিলেন এবং তাঁহাদের মুখের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরটী সুবাসিত করিয়া তুলিলেন। কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একটা ঝাড় ঝুলিতেছিল। তাহার বিচিত্র বর্ণের ফানুসের ভিতর পরিষ্কার নারিকেল তেলের আলো জ্বলিয়া সমস্ত গৃহটীকে পরীরাজ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

কার্পেটের একধারে কয়েকজন বাদক সারঙ্গী ডুগি ও তবলা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল। দুইজন সুন্দরী নর্ত্তকী হীরে পান্না চুনি মুক্তা প্রভৃতি রত্নখচিত পেশোয়াজ পরিয়া ও বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পায়ের ঝুমুর বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া কার্পেটের একধারে দাঁড়াইল। তাহারা পর-স্পরের সঙ্গে মৃদুলমধুর স্বরে আলাপ করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ফরাসের উপর উপবিষ্ট এক একটী যুবকের সঙ্গে বিলোলকটাক্ষে কুর্ণিসের এবং হাসির আদান প্রদান চালাইতেছিল। সুরবাঁধাও হইয়া গেল আর নর্ত্তকীদ্বয়ও হাবভাব সহকারে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের হাস্যপরিহাস, অঙ্গ-ভঙ্গী, বিলোলকটাক্ষ প্রভৃতি যে যে যুবকের প্রতি পরিচালিত হইতেছিল, তিনিই নিজেকে বড়ই সম্মানিত ও কৃতার্থ বোধ করিতেছিলেন। নর্ত্তকীরা

চকিতের মধ্যেই বুঝিয়া লইয়াছিল যে, কাহার প্রতি কতটুকু সম্মান কতক্ষণ ধরিয়া দিতে হইবে এবং তদনুরূপই সম্মান বিতরণ করিতে লাগিল—কাহাকেও সম্পূর্ণ বাদ দেয় নাই। যুবক ব্যতীত অনেক বালকবালিকাও ফরাস বিছানার প্রান্তে বসিয়া আনন্দের হাসিতে বেশ জমাট বাঁধাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু যদি কেহ তাহাদের মধ্যে বসিত, তবে তাহাদের কাচ মুখে নর্ত্তকীদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গীসম্বন্ধে যুবকের উপযুক্ত নানা প্রকার পাকা মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনিলে সে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইত। একালের মত যুবকেরা সেকালে সভায় নর্ত্তকীদের সঙ্গে হাস্যপরিহাস ব্যতীত কোনপ্রকার অভদ্রোচিত ব্যবহার করিতেন না। সেকালে প্রকাশ্য সভায় কোন প্রকার ওরূপ কিছু করা নিতান্ত বর্বরোচিত বলিয়া ধরা হইত। যুবকদিগের রসিকতায় প্রত্যুত্তরে নর্ত্তকাদ্বয়ও হাস্যমুখে যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া রসিকতায় পরিচয় দিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে তাহার ফলে হাসির হিল্লোলে সমস্ত কক্ষটী মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। সুশুভ্র পরিচ্ছদ পরিহিত পরিচারকদের কেহ বা আতর, কেহ বা গোলাপজল, কেহ বা পান, কেহ বা সুরাধার নিঃশব্দপদক্ষেপে নিমন্ত্রিতবর্গের নিকট উপনীত করিতেছিল।

বহুক্ষণ নৃত্যের পর উপস্থিত সকলের অনুরোধে নর্ত্তকীদ্বয় গান ধরিল। একজন গাহিল—

নয়ী ঋতু নয়ী ফুল, নয়ী বেশ বাহার।
নয়ী কলিয়াঁনকো নয়ী রস।

অপরজন তাহার আখর দিয়া ধরিল—

নয়ী দ্রুম নয়ী পাতা নয়ী নয়ী কলিয়াঁ
তা পর ভ্রমরু বস।

এই একটী গীত, কতবার কতরকমের কায়দায়, কখনও ধীর মন্থর গতিতে, কখনও বা দ্রুত গতিতে, কখনও খাদে, কখনও বা তার স্বরে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গান করিতে লাগিল। গাতের এক একটী ছত্র, এক একটী পদ লইয়া উহারা যেন খেলা করিতে লাগিল। গানের সঙ্গে তালে তালে হাত ঘুরাইয়া নিজেদের রূপমাধুরী যুবকদের হৃদয়ে প্রবেশ করাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটী করে নাই। তাহারা তখন নিজেদের শক্তি অনুভব করিয়া আনন্দে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা যখন গানে গিট্‌কিরি গমক দিয়া তান ছাড়িতে লাগিল, তখন যেন গানের ঝরণা নামিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের গান যখন শেষ হইল, তখন চারিদিক হইতে "ক্যাবা" ক্যাবাৎ"

"শোভনুল্লা" প্রশংসাধ্বনিতে সহসা সমস্ত গৃহটী মুখরিত হইয়া উঠিল, আর নর্ত্তকীদের চারিদিকে কুর্ণিশ করিবারও মহা ধুম পড়িয়া গেল। শ্রোতৃমণ্ডলী গোলাপী আতর সুবাসিত রুমালে যথাশক্তি আসরফি বাঁধিয়া ছুড়িতে লাগিলেন। নর্ত্তকীগণ তাহা স্পর্শ করিল না; সারঙ্গীবাদক সেই সকল রুমাল হইতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি বাহির করিয়া একটী সুবর্ণরেকাবীতে রাখিয়া রুমালগুলি নর্ত্তকীদের হাতে দিতে লাগিল, নর্ত্তকী যাহার রুমাল তাহাকে সেলামের সঙ্গে ফিরাইয়া দিতে লাগিল।

নর্ত্তকীদের একজন কিছুপরে অপর কক্ষে চলিয়া গেল। তখন দ্বিতীয় নর্ত্তকী পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিল; নৃত্যকলাতে সে দিল্লীতে সুপ্রসিদ্ধ। সে সারঙ্গীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গান ও নৃত্য করিতে করিতে সকলকে বিমোহিত করিল। তাহার অঙ্গসঞ্চালন দেখিলে মনে হয় না যে তাহার দেহে অস্থি বলিয়া কোন পদার্থ আছে। যখন তাহার দুগ্ধফেননিভ গৌরবর্ণ ও মৃণালকোমল সুগোল বাহুদ্বয় গানের তালে তালে ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, এবং যখন তাহার নিটোল বাহুর রত্নখচিত অলঙ্কারগুলির উপরে চারিপার্শ্বের ঝাড়লণ্ঠন হইতে বিচিত্র বর্ণের রশ্মি প্রতিফলিত হইতে লাগিল, তখন দর্শকবৃন্দের চক্ষু আর তাহা হইতে ফিরিতে চাহিতেছিল না। নূতন একদল নর্ত্তকী আসিয়া নবোৎসাহে নৃত্যগীত ধরিবার পূর্ব্বে এই নর্ত্তকী বাদকদিগের সঙ্গে পানের বাটা প্রভৃতি লইয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল। পরিচারকেরা ঘন ঘন পানপাত্র সুরাপূর্ণ করিয়া সকলের নিকট ধরিতে লাগিল।

দলিতা ফণিনী।

নূতনদল নর্ত্তকী নৃত্যগান সুরু করিতেছে, এমন সময় একজন প্রহরী আসিয়া বাবর আলির কাণে কাণে বলিল—"জনাব! এক স্ত্রীলোক আপনার জন্য অন্দরের বারাণ্ডায় অপেক্ষা করিতেছেন।" বাবর আলিকে তখন বেশ একটু গোলাপী নেশায় ধরিয়াছে। স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া তিনি আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী বয়স্যদিগকে একটু জড়ানো সুরে বলিলেন—"গানবাজনা চলুক, আমি একবার অন্দর থেকে এখনি আস্‌ছি।" বয়স্যেরা একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আরে বাবর ভায়া! তোমার আবার অন্দর কবে থেকে হলো?"

বাবর যখন বিবাহ করেন নাই, তখন এক প্রহরীর কথায় এমন জম্‌জমাট মজলিস ছাড়িয়া অন্দরে কেন ? তাঁহার যে অনেক আত্মীয়া ছিলেন সে কথা বয়স্যদের নেশার ঝোঁকে মনে আসিবার অবসর পায় নাই। যাই হোক, বাবর বন্ধুদের কথার উত্তর না দিয়া মুচ্‌কিয়া একটু হাসিলেন এবং নতমস্তকে সকলকে অভিবাদন করিয়া অন্দরের দিকে চলিলেন!

অন্দরে যাইতে হইলে ঝিলমিলিঘেরা একটী বারণ্ডায় ভিতর দিয়া যাইতে হইত। বারাণ্ডাটী ফুলে পাতায় সুসজ্জিত হইলেও তাহা অন্দরের বারাণ্ডা বলিয়া সেখানে বড় বেশী ঝাড়লণ্ঠন খাটান হয় নাই! বাড়ীর মহিলারা সবাই অন্তঃপুরের উৎসবে মত্ত ছিলেন। কাজেই কেহই সদর অন্দরের মধ্যবর্ত্তী বারাণ্ডাকে আলোয় ঝক্‌মকে করিয়া তোলা দরকার মনে করেন নাই।

বাবরালি দীর্ঘ বারাণ্ডার শেষ প্রান্তে অন্দরের মুখে আসিয়া দেখিলেন—এক রমণী একটী স্তম্ভে হেলান দিয়া দণ্ডায়মানা। রমণী একটু আঁধারের মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন বলিয়া বাবর নেশার চক্ষে সহসা ধরিতে পারেন নাই যে রমণী কে? বারর যখন তাঁহার অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন রমণীও অন্ধকার ঘুঁজি হইতে একটু আগাইয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে চারি পার্শ্বের লণ্ঠনের আলো পড়িল। বাবর তখন রমণীকে চিনিতে পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সামান্য জড়ানো ভাষায় রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"কে—জুমিলা ? আমাকে ডাক পড়েছে কেন ?"

জুমিলা যুঁইফুলের একছড়া গোড়ে মালা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মালাটী মৃণালনিন্দিত দুইহস্তে ধরিয়া বাবরের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"হাঁ—আমি জুমিলা—তোমার বাল্যসখী; আজ এই উৎসবের দিনে আমার যাহা কিছু সমস্ত তোমাকে দেবার জন্য আমার হৃদয় আকুল হয়ে উঠেছে; তাই এই মালাগাছি তোমার গলায় পরাতে চাই, আর আমার দেহমন তোমারই করে সঁপে দিতে চাই। এ সমস্তই তুমি গ্রহণ কর।"

বাবরের গোলাপী নেশা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহার বাঁ হাত কাঁপিয়া উঠিল। বাবর কি এক অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। বাবর বলিলেন—"জুমিলা! জুমিলা! আমাকে আর প্রলোভন দেখিও না—আমি তাহা পার্‌ব না।"

জুমিলার মুখ সহসা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সেই আলো-আঁধারের ভিতরেও বাবর তাহা দেখিতে পাইলেন। বাবর যে জুমিলাকে ভাল বাসিতেন

না তাহা নহে। কিন্তু আর এক রমণী জুমিলা অপেক্ষাও তাঁহার মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। বাবরের বীর ও সমরপ্রিয় হৃদয়ে জুমিলার গায়ে-পড়া উপযাচক ভাব সায় পাইত না, সমধর্মী তড়িত-দ্বয় যেমন পরস্পরকে চায় না—ইহাও বোধ হয় সেইরকম। বাবর চাহিতেন বন্ধুর শান্ত হৃদয়ে ডুবিয়া শান্তির সন্ধানে যাইতে।

জুমিলা অভিমানের আগুনে পুড়িয় যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দলিতা ফণিনীর মত অভিমান ও রোষভরে দাঁতে দাঁত চাপিয়া অতিকষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন "পার্‌বে না কেন ?"

বাবর থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন—"জুমিলা ! আমার কথা আগে শোন, তার পর আমার উপর রাগ করতে হয় কোরো। তুমি আমার বাল্য সখী, সত্য।" এই কথা শুনিয়া জুমিলার অন্তরে আশার ক্ষীণ প্রদীপ ক্ষণেকের জন্য একটুখানি জ্বলিয়া উঠিল, ভাবলেন বুঝি বা বাবরকে সম্পূর্ণ নিজের করিয়া পাইবেন।

বাবর অজানতঃই জুমিলার আশা বাড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার অনেক পরে বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাহাও সত্য।" জুমিলা তখন আগ্রহভরে বাবরের দিকে দুইএক পা আগাইয়া গিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, বন্ধু কি তোমায় তেমন ভালবাস্‌তে পারে ? এই লও—আমার মালাগাছি লও—আমার দেহমন সমস্তই লও—এই উৎসবরাতে আমি বড় আশা করে এসেছি—আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরো না।" ইহা বলিয়া বাবরের গলায় মালাগাছি পরাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন। বাবর তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"কিন্তু জুমিলা—আমি তোমাকে প্রথম থেকেই কনিষ্ঠা ভগ্নী—"

বাবরের কথা শেষ হয় নাই, জুমিলা অভিমান ও ক্রোধের বিষ উদ্গীরণ করিতে করিতে বাবরের কথা চাপা দিয়াই বলিলেন—"থাক্, থাক্, ঢের হয়েছে—তোমার উপদেশ শোন্‌বার জন্য এখানে আসি নি—ভগ্নী—কি ধার্মিক ! এই দেখ—তোমার জন্য সমস্ত হৃদয় দিয়া যে মালা গেঁথেছিলাম, এই তা' পায়ে দলে দিলাম।" বলিতে বলিতে জুমিলা মালাটা পায়ের তলে ফেলিয়া জরীর কাজ করা মখমলের চটী জুতা দিয়া বারবার মালাটীকে দলিয়া সরোষে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় রাগে দুঃখে জুমিলার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, আর ঠোঁট বাঁকিয়া গিয়াছিল।

কিছু দূর গিয়াই একবার মুখ ফিরাইয়া বাবরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন—"বাবর! আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে, কিন্তু মহম্মদের শপথ করে বলছি, বঙ্গুর প্রেমের ভূমি লাভ করতে পারবে না।" ইহা বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই জুলিনা অন্দরের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। বাবর কিছুক্ষণ সেইখানে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া চিন্তান্বিতচিত্তে ধীরে ধীরে নৃত্য-শালায় অভিমুখে চলিলেন।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

আর্য্য, জ্যোতিষ :—সাহিত্য,বিজ্ঞান, বেদ, তন্ত্র, দর্শন ও জ্যোতিষসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ৩।৵০ সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ। ১৩৩৫ সালের ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্যোতিষ সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকার বঙ্গসাহিত্যে একান্ত অভাব। আমরা সহযোগী আর্য্য-জ্যোতিষ" মাসিক পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করি,।

রবি।—ত্রৈমাসিক পত্র। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা। কর্ত্তৃক "আগরতলারাজ্যরবি—কিশোর-সাহিত্যসমাজ"হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক-মূল্য ২।৵০ মাত্র। জীবনের চতুর্থ বৎসর অতিক্রম করিল। ত্রিপুরা রাজ্যের নিকটে বঙ্গ-সাহিত্য চিরঋণী। বঙ্গসাহিত্যের সেবায় রাজসংসার চির অভ্যস্ত। "রবি" ত্রৈমাসিক পত্রের পরিবর্ত্তে মাসিক পত্ররূপে পরিণত হইলে আমরা সুখী হইব।

পঞ্চপুষ্প! সচিত্র মাসিকপত্র—১৩৩৫ সাল আষাঢ়। বঙ্গসাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত সুলেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে সম্পাদনভার গ্রহণ; করিয়াছেন। প্রবীন ও নবীন লেখক মহোদয়গণের রচনা সম্ভারে "পঞ্চপুষ্প" মাসিকপত্রখানি বঙ্গ-সাহিতের গৌরবান্বিত হইয়াছে। সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের কৃতিত্বে "পঞ্চপুষ্প" আরও উন্নতির-পথে অগ্রসর ও দীর্ঘ-জীবনী কামনা করি।

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫ শ বর্ষ } ১৩৩৬ সাল, আষাঢ়। { ৩য় সংখ্যা।

গৃহলক্ষ্মীর প্রতি।

লেখক— শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

(১)

অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যজিয়া ধৌত করিয়া মুখ,
ছড়া, জল-ধারা, গোময় মাড়ুলি লিপ্ত আঙ্গিনা বুক,
বাসী প্রদীপের পলিতা ফেলিয়া ধুয়ে সযতনে তুলি,
দেবালয় গিয়া প্রণিপাত করি মার্জ্জিত কর ধূলি।
ঘাট বাট ঘর করে তর তর মাজিয়া বাসন যত।
রাখ থরে থরে পিড়ুলি উপরে মস্থি জলকণা যত।
কমলা আমার গৃহের দেবতা, না পাই দেখিতে তাঁরে,
গৃহের লক্ষ্মী সদা জাগ্রত তোষে কত মতে মোরে।

(২)

স্নিগ্ধ-দরশ মধুর-পরশ কথা গুলি মৃদু কত,
এত গৃহ-কাজে আছ নিয়োজিত বিরাগ না হেরি তত॥
মুখে মধু-ভায সুমধুর হাস দশন প্রকাশ নহে,
সর্ব্ব শরীরে মৃদুতা মাখান মধুর মহিমা বহে॥

কুসুম-পেলব তব করাঙ্গুলি চম্পক-কলি-সম।
অঙ্গ লিভরি দিতেছ অমিয়, কান্তি মধুর-কম॥
লক্ষ্মী আমার গৃহের দেবতা, দেখিতে না পাই তাঁয়।
গৃহের লক্ষ্মী সদা জাগ্রত হোর তোমা সুখ পাই॥

(৩)

হলুদ-লিপ্ত বসন তোমার রন্ধন গৃহে হেরি
কৃশাণুর তাপে বদন-পদ্ম লোহিতবর্ণ ধরি।
অন্নদারূপে বিতর অন্ন থালী ও দর্ব্বী করে
বদনে তোমার তৃপ্তির রেখা, নয়নে করুণা ঝরে॥
শত নয়নের দীপ্তি লইয়া শতকাজ দরশনে
সাবহিত তুমি ; ধন্য ! তোমার এত কি শক্তি মনে ?
লক্ষ্মী আমার গৃহের দেবতা, দেখিতে না পাই তাঁয়
গৃহের লক্ষ্মী সদা প্রসন্ন তোমা হেরি সুখ পাই।

(৪)

সৃজন, পালন, পোষণ, তোষণ, ব্রহ্মাণী এবং বৈষ্ণবী
এই দুই গুণে গড়িলা ব্রহ্মা আমি তাই মনে ভাবি।
সান্ধ্য পবনে স্নিগ্ধ যখন ধরণীর প্রতি অঙ্গ
রজনী মিলিতে চাহেন অধীরা নিশানাথ সুখসঙ্গ
কলসী ভরিয়া আনিয়া সলিল, জ্বালিয়া প্রদীপখানি
দেখাও দুয়ারে দেবালয়দ্বারে অঞ্চলবাস টানি।
প্রণমি নোয়ায়ে সকল অঙ্গ যাচ শ্রীহরির পদে
স্বামী-সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হোক, রোক্ সদা নিরাপদে।
এমন দেবতা এমন লক্ষ্মী যে গৃহে আছেন ভাই !
সে গৃহে কখন অভাবের দুঃখ দৈন্য-বেদনা নাই॥

পেঁড়োর মন্দির।

লেখক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি।

জুমিলা।

জুমিলা কে ?

সম্রাট ফেরোজ সা যখন বালক ছিলেন, তখন "বদরুদ্দি" নামক এক পাঠান যোদ্ধৃপুরুষ ফেরোজ সার অস্ত্র-শিক্ষার গুরু ছিলেন! অর্থোপার্জ্জনের জন্য বদরুদ্দি হিরাট হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন। এখানে সামান্য সৈনিকের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বদরুদ্দি অল্পদিনের মধ্যে শৌর্য্যে বীর্য্যে ও রণকৌশলে একজন দেশপ্রসিদ্ধ সেনানী হইয়া পড়িলেন! বদরুদ্দি যে দলে হিন্দুস্থানে আসিতে ছিলেন, সেই দলে তাতারনিবাসী এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীও বাণিজ্য উপলক্ষে সপরিবারে ভারতে আসিতেছিলেন। দস্যুসঙ্কুল দুর্গম পার্ব্বত্যপথে উভয়ের মধ্যে প্রীতি জমিয়া উঠিল। তাতারের পরিবারে এক পত্নী ও এক কিশোরী কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। দিল্লীতে আসিয়া অল্পকালের মধ্যে বদরুদ্দিকে যশে অর্থে উঠিতে দেখিয়া তাতার বণিক তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবও সহজেই গৃহীত হইল। যথা সময়ে মহাসমারোহে বিবাহও সম্পন্ন হইল।

দুঃখের বিষয় বদরুদ্দির পত্নী একটী কন্যা প্রসব করিয়া সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করেন। বদরুদ্দি সেই নবজাত শিশুকন্যাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন, এই সময়ে তাঁহার এক দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা পিতৃব্যপত্নী আমিনা দারিদ্র্যনিপীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলেন। বদরুদ্দি ইহা ভগবানেরই দয়া ভাবিয়া আমিনার উপরেই কন্যার লালন পালনের ভার দিলেন। বদরুদ্দির পত্নীবিয়োগের পূর্বে বৎসর দুয়ের মধ্যে তাঁহার শ্বশুর বণিক ও বণিক পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় বণিককন্যাই তাঁহাদের প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। এখন বণিককন্যার মৃত্যুতে বদরুদ্দিই সেই সমস্ত বিষয় লাভ করিলেন।

আমিনার উপর বদরুদ্দি শিশুকন্যার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু পত্নীশোকে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি যুবরাজ ফেরোজ সা অপেক্ষা প্রায় দশবৎসর বড় ছিলেন। কন্যা একটু বড় হইতে থাকিলে ফেরোজ সাকে অস্ত্রশিক্ষা দিবার পর বাড়ীতে আসিয়া বদরুদ্দি খেলার ছলে কন্যাকেও অস্ত্রচালনা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। পিতার শিক্ষাকৌশলে কন্যা অশ্বারোহণ প্রভৃতি পুরুষোচিত বিদ্যা অল্পবয়সেই সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। ফলে স্ত্রীসুলভ কোমলভাবের পরিবর্ত্তে তাহার উপর পুরুষোচিত ভাবের অল্পবিস্তর ছাপ পড়িয়াছিল। ক্রমে পিতার সঙ্গে যুবরাজের অস্ত্রচালনা দেখিবার জন্য জুমিলা রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে লাগিলেন। সেখানে সম্রাটের জ্ঞাতিপুত্র সুফিউদ্দিন, বাবরালি এবং অন্য কয়েকজন বালকও অস্ত্রশিক্ষা করিতে আসিতেন।

সম্রাটের মৃত্যুর পর ফেরোজ সা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি রাজ-কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, অস্ত্রশিক্ষার বড় একটা সময় পাইতেন না। কিন্তু বদরুদ্দির শিক্ষাদানের কার্য্য নিয়মিতরূপেই চলিতে লাগিল। বাবর আলি, সুফি-উদ্দিন প্রভৃতি তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। সেই সময় অবধি বাবরালির সহিত একটু বেশী মেশামেশির কারণে জুমিলা মনে মনে বাবর আলিকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলেন।

জ্ঞাতিসূত্রে সুফিউদ্দিন ফেরোজ সার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। সুফির এক জ্যেষ্ঠ ভগ্নী ছিলেন। তিনি পাঁচ বৎসরের এক কন্যাকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সেই মাতৃহীন বালিকা বন্নু মাতুল সুফিউদ্দিনের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিলেন। বন্নু ও জুমিলা উভয়ের বয়স প্রায় একই ছিল। তাহারা অবাধে পরস্পরের বাড়ী-তে যাতায়াত করিবার কারণে উহাদের পরস্পরের মধ্যে সখিত্ব জমিয়া উঠিয়া-ছিল। দুইজনেই সুন্দরী বটে; জুমিলার সৌন্দর্য্যে একটু পুরুষভাব ছিল, বন্নুর সৌন্দর্য্য রমণীসুলভ কোমলতা-মাখা ছিল। সময়ে সময়ে যখন বাবরালি বদরুদ্দির গৃহে যাইতেন, এমন অনেকবার হইয়াছে যে, বাবর সেখানে জুমিলা ও বন্নুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। বাবরের হৃদয় অনেক সময়ে বন্নুর কাছে বসিয়া বিশ্রাম-লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিত; বাবর নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবন বন্নুর করতলে সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু জুমিলার সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করিলেও কোথায় যেন তাঁহার স্বাধীনতায় গঠিত হৃদয়ের কাছে বাবরের হৃদয় ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিত। প্রকৃতিতে সজাতীয় দুইটী তড়িৎ-

প্রবাহকে পরস্পরের নিকট প্রতিহত হইতেই দেখা যায়। তদ্ব্যতীত জুমিলা গুরুকন্যা বলিয়া বাবর তাঁহাকে ভগ্নীরূপেই দেখিতেন। সে সময়ে মুসলমানদের মধ্যে যে সকল হিন্দুভাব প্রবেশ করিতেছিল, তন্মধ্যে ইহা একটী।

জুমিলা সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার পিতা বদরুদ্দি সহসা একটা যুদ্ধে নিহত হইলেন। পিতার মৃত্যুতে জুমিলা মাতামহ ও পিতা উভয়ের পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। নবীন সম্রাট ফেরোজ সা গুরুকন্যার অভিভাবক হইয়া সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন স্বভাবতই সম্রাটের অন্তঃপুরে জুমিলার অবাধ যাতায়াত বৃদ্ধি পাইল। এদিকে বন্নু সম্রাটের আত্মীয় হইবার কারণে রাজপ্রাসাদেরই এক অংশে সুফির সহিত বাস করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। এইরূপে সম্রাটকন্যা সেলিমা, সুফির ভগ্নী বন্নু এবং জুমিলা, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ক্রমশই জমাট বাঁধিতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শৈশব অবধিই নানা কারণে জুমিলার হৃদয়ে পুরুষভাবের বেশ একটু ছাপ পড়িয়াছিল। এখন যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে পিতার পরলোকগমনে তিনি সম্পূর্ণই স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। তিনি সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার রূপ-লাবণ্য ও অতুল সম্পত্তির লোভে অনেক আমীর ওমরাহ তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। জুমিলা কাহারও দিকে কোনও লক্ষ্যই করিতেন না—তাঁহার প্রতিজ্ঞা বাবরকেই জয় করিয়া বিবাহ করিবেন। বাবর বন্নুর প্রতি অনুরক্ত, জুমিলা যে তাহা বুঝিতেন না, তাহা নহে। বুঝিতেন বলিয়াই তাঁহার বাবরকে জয় করিবার জন্য আরও জেদ চাপিয়াছিল।

জুমিলার বাসভবন খুব বড় ছিল না—বদরুদ্দি তাঁহার বাসভবন অনাব-শ্যক বড় করিয়া নির্ম্মাণ করেন নাই। সেই বাসভবনে পূর্ব্বাবধিই জুমিলা তাঁহার ধাত্রী ও পিতার চাচী আমিনার সঙ্গে বাস করিতেন। উভয়ের মধ্যে স্নেহ-বন্ধন এতই দৃঢ় হইয়াছিল যে, পিতার মৃত্যুর পর আমিনাই গৃহ-কর্ত্রী হইলেন। আমিনার বয়সও অনেক, আর জুমিলা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন, তাই জুমিলার অনেক কাজ তাঁহার চক্ষে অসংগত বোধ হইলেও তিনি তাহা উপেক্ষা করিতেন। পিতা এবং আমিনা উভয়েরই নিকট অতিরিক্ত আদর পাইবার ফলে জুমিলা নিজের কার্য্যের বিরুদ্ধে কাহারও কোনও প্রতি-বাদ সহিতে পারিতেন না। এখন বাহিরে যাইবার সময় বোরখা ব্যবহার

করিতে বাধ্য হইলেও অন্তরে তিনি ইহার বিরোধী ছিলেন। বন্নু ও রাজনন্দিনী সেলিমা অন্তঃপুরের চতুঃসীমার মধ্যেই আমোদ আহ্লাদে ক্রীড়া-কৌতুকে কাল কাটাইতে ভাল বাসিতেন। কিন্তু জুমিলার পক্ষে তাহা অসম্ভব ছিল। জুমিলার মনপ্রাণ অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিত না, বাহিরের উদ্দাম কর্মকোলাহল, শতসহস্র লোকের সুখদুঃখের খেলা, বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম, অনবরত চলাফেরার আনন্দ জুমিলাকে অধিক তৃপ্তি দান করিত। জুমিলা বাবরালিকে ভাল বাসিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণের কথা ছিল এই যে, যদি বাবরালির সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়—যদি কেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিবাহ নিশ্চয়ই হইবে—তাহা হইলে বাবরের সাহায্যে মুসলমান সমাজে এক নূতন যুগ আনয়ন করিবেন, অবগুণ্ঠন প্রথা এবং দিনরাত অন্তঃপুরবাসী হইয়া থাকিবার নিষ্ঠুর প্রথা প্রভৃতি সমূলে নির্মূল করিবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, বাবরের ন্যায় উদারহৃদয় লোক তাহার ন্যায় স্বাধীনচেতাকে নিশ্চয়ই বিবাহ করিয়া তাহার কল্পনাকে সার্থক করিবেন।

যমুনাপুলিনে।

বাবর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া জুমিলা ঠিক ধরিতে পারিলেন না যে, বাবরকে জয় করিবার পথে কোথায় বাধা পড়িল; কিন্তু বুঝিলেন জগৎ সকল সময়ে তাহার ইচ্ছামত নাও চলিতে পারে। বাবরের প্রত্যাখ্যান তাহার ইচ্ছা সফল হইবার পথে সর্ব্বপ্রথম বাধা। ইতিপূর্ব্বে পিতা, আমিনা প্রভৃতি যাঁহার কাছে তিনি যে আবদার করিয়াছিলেন, কেহই তাহার আবদার অপূর্ণ রাখেন নাই। কিন্তু আজ যখন তিনি নবযৌবনের শোভাসৌন্দর্য্যে নবপ্রস্ফুটিত গোলাপের মত বিকশিত হইয়া উঠিতেছেন, এবং যখন তিনি চিরজীবনের জন্য নিজের জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব বাবরের করকমলে স্বেচ্ছায় তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন, আজ কিনা বাবর তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। নিজের যৌবন ও জীবনের উপর তাহার একটা প্রবল ধিক্কার আসিল। তিনি মান অপমানের কথা ভুলিয়া গেলেন। ক্রোধে, অভিমানে, প্রণয়ের প্রত্যাখ্যানজনিত অপমানে জর্জরিত হইয়া উঠিলেন। প্রাসাদের অন্তঃপুরে অধিকক্ষণ থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বশরীর হইতে যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতেছিল। জুমিলা অন্তঃপুরের এক খিড়কিদুয়ার দিয়া বাহির

হইয়া রাজপথে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইলেন। পরক্ষণে রাজপথের এক দিক ধরিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন।

আজ উৎসব—অন্যদিনের মত প্রহরান্তে রাজপথ নিস্তব্ধ হয় নাই। রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে, এখনও রাজপথে লোকজন চলিতেছে। এ সমস্ত কিছুই জুমিলার লক্ষ্য হইল না। চলিতে চলিতে জুমিলার কখনও বা মনে হইতেছিল যে, 'কোথাও গিয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াই'; কখনও বা মনে হইতেছিল—"না, আত্মহত্যাই বা করিব কেন? প্রত্যাখ্যান অপমান—ইহার প্রতিশোধ লইয়া যাহা করিতে হয় করিব—প্রতিশোধ না লইয়া মরিতে পারিব না।" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আনমনে চলিতে লাগিলেন। আমিনার স্নেহ, গৃহের সুখ প্রভৃতি সম্ভোগ করিবার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলেন। চারিদিকের আলো তাহাকে বিঁধিতে লাগিল—তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া জুমিলা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"ভগ্নী—তোমার ভগ্নী হতে চায় কে? আমি তো তোমার ভগ্নী হতে চাইনি! উনি বন্নুকে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন! বন্নু আবার একটা মানুষ—সে তো মোমের পুতুল—তার আবার গুণ কি আছে যে, তুমি আমায় ছেড়ে তার পায়ে আত্মসমর্পণ করতে গেলে? ভাল—আমি যদি জুমিলা হই, তবে বাবর! আমার পায়ের তলে তোমার মাথা নোয়াব, তবে আমার প্রাণের জ্বালা যাবে? বন্নুর নাম মনে আসিবা মাত্র জুমিলার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। সে সময় তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে মনে হইত যেন তিনি দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া সবেমাত্র আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছেন—তাহার মুখ কখনো বা জ্বর রোগীর মত লাল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আবার কখনো বা পাংশুবর্ণ হইতেছে; শোণিত স্রোত কখনো বা খরবেগে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে, আবার কখনো বা রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। বন্নু ও বাবরের কথা ভাবিতে ভাবিতে জুমিলার মস্তক বড়ই গরম হইয়া উঠিল। তখন তিনি মস্তকের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন।

বহুক্ষণ চলিতে চলিতে জুমিলা দেখিলেন, রাজপথের একপার্শ্বে একটী সরু গলি গিয়াছে—সেখানে দীপমালার কোনই লক্ষণ নাই। গলির দুইধারে লতাপাতার বেড়া চলিয়াছে। জুমিলা অন্যমনস্ক ভাবে সেই গলিতে প্রবেশ করিয়া একটু বেশ আরাম বোধ করিলেন। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন—একি! তিনি কোথায় আসিয়াছেন? গলির দুই পার্শ্বে বেড়ার ভিতর দিয়া দরিদ্রদিগের পর্ণ-

কুটীর দেখা যাইতেছিল। সেই সকল কুটীর হইতে দুইএকটী প্রদীপের আলোক-রেখা বৃক্ষলতার পাতার আড়াল ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। কিছু পূর্ব্বে সহর হইতে উৎসব দেখিয়া এই সকল কুটীরের অধিবাসীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। তাই মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক হইতে স্ত্রীপুরুষের কথালাপের মৃদুস্বর, বালক বালিকা-দিগের হাসাহাসির খিল খিল ধ্বনি কানে আসিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে বাবরের উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছাই জুমিলার সমস্তখানিকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল তাই তিনি উন্মাদিনীর মত এতদূর চলিয়া আসিয়াছেন, এই গলির নির্জনতার ভিতরে তিনি কতকটা আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাই গলির চারিধারে দরিদ্র গৃহস্থদের নির্মল চিত্র দেখিয়া জুমিলা কল্পনা করিতে লাগিলেন—"নাই বা প্রাসাদে বাস করিতাম, বাবরকে বিবাহ করিয়া এই কুটীরেও কত সুখে থাকিতাম, কত সুন্দর বালকবালিকার হাসিমুখ নিত্য দেখিতাম।" এই সমস্ত চিত্র যতই তাঁহার কল্পনায় ভাসিতে লাগিল, ততই বেচারী নির্দ্দোষ বন্নুর উপর তাহার ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল—বন্নু মাঝখানে থাকাতেই তো তিনি বাবরকে পাইতেছেন না—উল্টা বাবরের কাছে প্রত্যাখ্যানের অপমান সহিতে হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন—"না, আত্মহত্যা করা হইবে না; কিন্তু—বাবর! জুমিলা জীবিত থাকিতে বন্নু তোমাকে পাইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিও!"

গলির ভিতরেও অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। সহসা দেখি-লেন—সম্মুখে যমুনার কালো জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব বাতাসের মৃদুল হিল্লোলে তালে তালে নাচিতেছে। আকাশের মত যমুনারও জলে অসংখ্য তারা উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। প্রকৃতির সমুজ্জ্বল শান্ত ছবি জুমিলার অন্তরে যেন সুশীতল বারিধারা বর্ষণ করিল। চন্দ্রমার সুধাধৌত যমুনাপুলিনে একখণ্ড প্রস্তরের উপর তিনি উপবেশন করিলেন। পশ্চাতে সুদূর দিল্লীর গগনস্পর্দ্ধী প্রাসাদরাজি গর্ব্বোন্নত মস্তক উত্তোলিত করিয়া প্রকৃতির দারিদ্রের প্রতি যেন উপেক্ষামণ্ডিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। জুমিলা একবার সেইদিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল—"কোথায় বা আজকার উৎসব, কোথায় বা বাবর ও তাঁহার বন্ধুবর্গের মজলিস, আর কোথায় বা আমি নিজের মর্ম্মব্যথা লইয়া এই যমুনাতীরে! এখানে যদি বা আত্মহত্যা করি, তবে কেহই আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করে? কিন্তু আত্মহত্যার ফল কি? কাল সহরময়

জানাজানি হইবে যে জুমিলা আত্মহত্যা করিয়াছেন, তারপর দুই একদিনের মধ্যে কেহই, এমন কি বাবর পর্য্যন্ত আমার নামও মুখে আনিবে না, বরঞ্চ বন্নু বাবরের সম্মুখে আমার নাম লইয়া উপহাস করিবে। না—আত্ম-হত্যাও করিব না, আর যে ভীষণ প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা লইয়া বাহির হইয়া-ছিলাম, তাহাও এই যমুনার জলে বিসর্জন দিলাম। কিন্তু প্রতিশোধ লইতেই হইবে—আমি বীর-মোঙ্গার মেয়ে, বীরের উপযুক্ত উপায়ে প্রতিশোধ লইব; বাবরই না হয় আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কিন্তু আমি তো তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। ভাল, তাহাই হোক, আমার প্রেমের গভীরতার পরিচয় দিয়া আমি বাবরকে নিজের করিয়া লইব। আহা! আমার নানী আমিনা না জানি আমার জন্য কতই ভাবিতেছেন।" এই প্রকার নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে জুমিলা প্রস্তরাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ মুখে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতে পারিলেন না। কল্পনা-রাজ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিলেন। জুমিলা তাঁহার শৈশবকাল, পিতার স্নেহ, আমিনার যত্ন, বাবরালির সঙ্গে খেলাধুলা, এইরূপ কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বাবরালিকে তিনি চান, কিন্তু বাবর তাহাকে চান না—তবে বাবরের জন্য এত হাহুতাশ কেন? উহাই তো বুঝা কঠিন। হাহুতাশই বা কেন? ভালবাসা পাইলে সুখ অথবা দিতে পারিলে সুখ? যে ভীষণ প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি বাহির হইয়াছিলেন তাহাতে সুখ পাইয়াছিলেন, অথবা প্রেমের দ্বারা বাবরকে জয় করিব, এই প্রতিজ্ঞার ভিতরে সুখ পাইতেছেন? মনে করিতেছেন বটে, বাবরকে বিবাহ করিয়াও তিনি নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখিবেন এবং বাবরের সাহায্যে মুসলমানসমাজের সংস্কার সাধনে অগ্রসর হইবেন, কিন্তু বাবর যদি বিবাহের পর স্বাধীনতা না দেন, অথবা সমাজসংস্কারে বাবরের এখন একআধটু ইচ্ছা থাকিলেও বিবাহের পর যদি মত বদলাইয়া যায়? এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে জুমিলা এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন যে, একজন লোক যে তাঁহার দিকে চলিয়া আসিতেছিল, জুমিলা তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। আগন্তুক কি একটা গান আপনার মনে গুণ গুণ সুরে গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল। সে যখন খুব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন জুমিলার চমক ভাঙ্গিল। যদিও তাঁহার সাহস খুবই ছিল, তবু এই নির্জন স্থানে সহসা এক আগন্তুককে দেখিয়া একটু ভয়চকিত নেত্রে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুককে দেখিয়া মুসলমান বলিয়াই বোধ হইল। তখন

তিনি সাহসে ভর করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি ?" সে জুমিলার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। পরে দুই তিনবার প্রশ্নের পর সে উত্তর দিল—"আমার নাম আবদুল গফুর।"

জুমিলা—"এখানে এত রাত্রে কেন ?"

গফুর—"আমি বাংলা মুল্লুক থেকে এই মাত্র এখানে পৌঁচেছি। আপনি এখানে এত রাত্রে কেন ?"

জুমিলা—"মর্‌তে। আমার সঙ্গে মর্‌তে পার ?"

গফুর—"পার্‌ব না কেন ? আমার তো আর কেহ নাই—পার্‌ব না কেন ? তবে সম্রাটের কাছে একটা কাজ আছে, সেটা শেষ করে তবে—

জুমিলা—"ভাল ভাল তা শোনা যাবে—এখন চল আমাদের বাড়ীতে। বিশ্রাম করে কাল সকালে উঠে শোনা যাবে।" জুমিলা আর বিলম্ব না করে গফুরকে পিছনে পিছনে আসিতে বলিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গফুর ধুলিধূসরিত দেহে পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

অতিথি।

জুমিলার নানী আমিনা বুড়ী সেই রাত্রে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া জুমিলার জন্য অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়াছিলেন। জুমিলা এক একদিন সেলিমা বা বন্নুর বাড়ী হইতে বেশ একটু রাত করিয়া আসিতেন। তাই প্রথম প্রথম আমিনা জুমিলার জন্য বেশী চিন্তিত হন নাই। অবশেষে সম্রাটের নহবৎখানা হইতে সুমধুর বেহাগ রাগিণী বাজিয়া উঠিয়া নগরবাসীকে জানাইয়া দিল যে মধ্য-রাত্রি অতীত হইয়াছে। তখনও যখন জুমিলা আসিলেন না, তখন আমিনা একটু ভাবিত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন; কাজেই ভাবিতে ভাবিতে শেষে ফটক বন্ধ করিয়া শয়নগৃহে গিয়া শুইয়া পড়িলেন; জাগিয়া থাকিবার বিশেষ চেষ্টা করিলেও নিদ্রাদেবীর আদরে আর জাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। জুমিলা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে একচোট ধম্‌কাইবেন স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে সংকল্প কল্পনাতেই থাকিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হয়, এমন সময়ে জুমিলা গফুরকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। তিনি জানিতেন যে, এত রাত্রে সদর ফটক বন্ধ হইয়া

গিয়াছে, তাই তিনি গফুরকে দাঁড় করাইয়া খিড়কির দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। খিড়কির একটা চাবি বরাবরই তাঁহার কোমরে বাঁধা থাকিত। ভিতরে ঢুকিয়া সদরের ফটক খুলিয়া গফুরকে প্রবেশ করিতে বলিলেন। গফুর একটু সভয় সঙ্কোচ দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতে লাগিল। তাহার মনের ভাব কতকটা বুঝিয়া জুমিলা বলিলেন—"তোমার কোন ভয় নাই, এ ঘর বাড়ী আমার, এখানে তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না।"

বহির্বাটীতে একটা কক্ষে গফুরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। গফুর সেখানে বসিলে জুমিলা অন্তঃপুর হইতে যে প্রদীপ আনিয়াছিলেন, তাহার আলোকে গফুরকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। অতিথি দারিদ্র্যপীড়িত ভদ্রসন্তান, নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক নহে, কিন্তু খুব চতুর। একজন ভৃত্যকে তাহার পরিচর্য্যার জন্য রাখিয়া জুমিলা চলিয়া গেল।

ভৃত্য গফুরের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, এদিকে জুমিলা অন্দরে গিয়া আমিনার শয়নকক্ষের দুয়ারে আঘাত করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তাঁহার নানীর তখন অর্দ্ধেক রাত—নানী কি উঠিতে পারেন ? শেষে অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর আমিনা নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে সাড়া দিয়া বলিলেন—"কে ?"

জুমি। আচ্ছা ঘুম তো ঘুমচ্ছিলে—আমার ডাকাডাকিতে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তোমার আর ঘুম ভাঙ্গে না—এখন দরজা খোল, আমি জুমিলা।

আমি। পোড়া চোখে ঘুম কি আছে ? সারা রাতই তো বসে কাটিয়েছি। তোমাদের মতো কি আমার কাঁচা বয়স যে, পড়্‌ব আর ঘুমে অজ্ঞান হব ? আমার ঘুম হলে তো বেঁচে যাই—ঘুম হয় কৈ ?

এইরূপ কতকটা আপনার মনে, আর কতকটা জুমিলাকে শুনাইয়া বকিতে বকিতে চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে শয্যা ত্যাগ করিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

জুমিলা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"তা সত্য; এই দেখ না, আমার কাঁচা বয়সের ঘুম বলিয়া আমার ঘুমের চোটে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

আমি। তাই বল; তোমাদের মত যদি আমাদের ঘুম হোত, তাহলে তো বাঁচ্‌তুম্‌। এখন খেতে দেতে হবে না কি ? না বাদসার বাড়ীতে সে কাজটা সেরে এসেছ ?

জুমি। আমার নানী থাকিতে বাদ্‌সার বাড়ীতে খেতে যাব কেন ? আমার বাপের বাড়ী কি খাবার নেই, না আমার নানী আমাকে খেতে দেয় না

যে অন্যের বাড়ীতে খেতে যাব?

আমি। তোবা—তোবা! অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই। চল খাবে চল।

জুমিলা। খাওয়া দাওয়া হবে এখন। এখন শোন, বাড়ীতে এক অতিথি এনে হাজির করেছি।

অতিথির কথা শুনে আমিনা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ! অতিথি? এত রাত্রে অতিথি? কে—পুরুষ না মেয়ে?

জুমি। পুরুষ মানুষ—ওগো! পুরুষ মানুষ। যমুনার তীরে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছি। অমিনা হেঁয়ালি বুঝিতে না পারিয়া সোজসুজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"পুরুষ মানুষ? —বয়স কত?"

জুমি। এই ৩০ এর কাছাকাছি—দশ পনের বছর এদিক হৌক বা ওদিক হৌক।

আমি। ভাল—ভাল—নানী আমার বেশ অতিথি এনেছে।

ইহা বলিয়া আমিনা নিজের মনে বকিতে বকিতে অতিথির আহারাদির ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। অতিথির আগমন সংবাদে বৃদ্ধা একটু আনন্দিতই হইয়াছিলেন। সেকালে মুসলমান মাত্রেই অতিথিসৎকার অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন—একজন অতিথিকে অন্তত ভোজন না করাইয়া গৃহস্বামী ভোজনে বসিতেন না। আজকাল এরূপ আতিথেয়তা বড় একটা দেখা যায় না। তাহা ছাড়া বৃদ্ধার বড়ই সাধ ছিল যে, জুমিলা কোন ভদ্র মুসলমানকে বিবাহ করিয়া অন্য পাঁচজনের মত ঘর সংসারী হন। বাবরালীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়; একান্ত যদি তাহা নাই হয়, তবে জুমিলা নিজের পছন্দ মত আর কাহাকেও বিবাহ করুন, তাহাতে আমিনার কোন আপত্তি নাই। আহারাদি সাজাইয়া জুমিলার দিকে মুখ ফিরাইয়া আমিনা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে জুমি—অতিথি কে?" তদুত্তরে জুমিলা সংক্ষেপে বলিলেন—"অতিথির নাম আবদুল গফুর।" আমিনা বুঝিলেন যে জুমিলা গফুর সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলিতে চান না। ইহা ভাবিয়া আমিনা প্রাণে একটা আঘাত পাইলেন। বৃদ্ধা জানিতেন যে, জুমিলা বাবরালিকে ভালবাসিতেন, কিন্তু বাবর জুমিলার প্রতি আশানুরূপ অনুরক্ত ছিলেন না। তাই বৃদ্ধা ভাবিলেন যে জুমিলা যদি সত্যই এই নবাগত অতিথির প্রতি অনুরক্ত হইয়াই থাকেন, তাহাও মন্দের ভাল। দিল্লীতে এত আমীর ওমরাহ থাকিতে যে জুমিলার একটী মনের মত পাত্র জুটিত না, আমিনার নিকটে তাহা বড়ই অসম্ভব

বোধ হইত। যাই হৌক, আমিনা খাদ্যদ্রব্য লইয়া জুমিলার সঙ্গে গফুরের নিকট গেলেন—অতিথি যে বাবরালি নন, তাহা তিনি জুমিলার কাছে শুনিলেও ঠিক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ভাবিলেন, অতিথি যদি বাবরালী নাই হন, লোকটার চেহারা কেমন, কি রকম তাহার চালচলন, সে আহারে বসিলে একবার ভালরকম দেখিয়া লইবেন। আহারের সময় গফুরকে দেখিয়া বৃদ্ধার সকল সংশয় দূর হইল। জুমিলার অনুরোধে গফুর আহার করিয়া বহির্বাটীতে নির্দ্দিষ্ট শয়ন কক্ষে গমন করিল; জুমিলা আর আহার না করিয়াই আমিনার সঙ্গে শয়নগৃহে ঢুকিলেন।

নিবেদন।

লেখক—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র।

আমায় তুমি নিঃস্ব কর,
কর রিক্ত গো;
আমার এই জীবন খানি
কর তিক্ত গো।
সকল দিবস, সকল রাতে,
ঘিরিয়ে রাখ যাতনাতে;
সলিল দিয়ে আঁখির পাতে
কর সিক্ত গো॥
মিথ্যা কেবল ভ্রমের বশে
সুখ সুখ করি—
দুঃখের সাথে সুখ যে গাঁথা
যুগ যুগ ধরি।
বুঝ্‌লে নাক জগত-জনে,
কোথায় পাবে আসল ধনে;
জড়িয়ে আছে কাহার সনে
সত্য বিত্ত গো!

ভরত-মিলন।*

লেখক—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

ভরত। শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন!
অনাহারে অনিদ্রায় কি দিবা রজনী
খুজিতেছি রঘুনাথ কমললোচনে;
কিন্তু কই? এখনো ত না পেনু সন্ধান।

শত্রু। হতাশ্বাস হ'য়োনাক' দাদা!
পুণ্যতীর্থ প্রয়াগের
জানকীর স্নানপূত যমুনার তটে,
করেছেন আশীর্ব্বাদ ঋষি ভরদ্বাজ—
চিত্রকূটে পাব মোরা আর্য্যের সন্ধান।

ভরত। চিত্রকূট—চিত্রকূট কতদূর আর?

শত্রু। এই ত সে চিত্রকূট গিরি।—
কুরঙ্গেরা রঙ্গে রঙ্গে ঘোরে চারিদিকে,
ময়ূরেরা করে কেকাধ্বনি,
বকুল আকুল-গন্ধ ছড়ায় বাতাসে,
এই ত সে চিত্রকূট দাদা!

ভরত। কিন্তু কোথা সেই কমললোচন?

শত্রু। আছে, দাদা!
এইখানে দেবী সাথে আর্য্য রঘুনাথ।

ভরত। শত্রুঘ্ন! কি সুন্দর রমণীয় স্থান এই!
ইচ্ছা হয়, নগরীর কোলাহল ছাড়ি'
এইখানে করি বাস সারাটি জীবন।

শত্রু। দাদা! অযোধ্যার পুরবাসী জন
করুক্ বিশ্রাম তারা সমতল ভূমে,

*লেখক প্রণীত "অগ্নিশুদ্ধি" নাটকের সংযোজয়িতব্য নূতন অংশ।

মোরা যাই উপত্যকা প'রে।

ভরত। পাব কি সে কমললোচনে?
কিন্তু, চরণ যে চলে না আমার।

শত্রু। চল দাদা! ঋষিবাক্য হবে না অন্যথা।

ভরত। চল! (প্রস্থান)

(রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। দাদা! শোন কাণপাতি'
সাগরকল্লোল সম সেনাকলরব
চিত্রকূট বক্ষঃ করে ভেদ।
কি জানি, শত্রু যদি হয়। (ধনুকে গুণদান।)

রাম। শান্ত হও ভাই!
নহে উহা সেনা কলরব।
লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ! দেখ লক্ষ্য করি'
আসে যে শত্রুঘ্ন সাথে ভরত আমার।

লক্ষ্মণ। জানিনাক' কি উদ্দেশ্যে আগমন হেথা।

রাম। অভিমানে হ'য়ে আত্মহারা
অবিচার করোনাক' ভাই!
মহাপ্রাণ ভরতের পরে।

(শত্রুঘ্ন সহ ভরতের প্রবেশ)

ভরত। দাদা, দাদা! (রামের পদতলে পতন)

রাম। ভাই—ভাই! (আলিঙ্গন)

লক্ষ্মণ। আর্য্য! (প্রণাম)

ভরত। লক্ষ্মণ, ভাই!
ফিরিতে যে হবে অযোধ্যায়।

শত্রু। আর্য্য! (রামকে প্রণাম করতঃ)
চেয়ে দেখ মুখপানে দাদার আমার!
দুঃখে ক্ষোভে জ্বালা অনুতাপে
কি হয়েছে বিবর্ণ মলিন!

রাম। বিশ্রামের প'রে
আলোচনা করা যাবে ভাই!

ভরত । করিব না আলোচনা,
শুনিব না যুক্তি কোন,
মানিব না কোন বাধা আমি !
ফিরে যেতে হবে অযোধ্যায় !

রাম । পিতৃসত্য রক্ষার কারণে—

ভরত । সে বন্ধন মুক্ত ক'রে দিয়ে চিরতরে
গেছে পিতা ছাড়ি ইহলোক ।

রাম । কি বলিলে — কি বলিলে ?
পুণ্যশ্লোক পিতা যে আমার—

(ভরতের স্কন্ধে মস্তক রক্ষা)

শত্রু । মহাপ্রাণ সত্যসন্ধ পিতা আমাদের
প্রাণ দিয়া সত্য তাঁর করিলা পালন ।
উন্মত্ত বিকারঘোরে হা রাম বলিয়া
মৃত্যুকালে ছাড়িলেন শেষ দীর্ঘশ্বাস ।

রাম । ওঃ—।

লক্ষ্মণ । অভিমান-বিষশল্য বৃথা এতদিন
পুষেছিনু মর্ম্মমাঝে আমি ।
পিতা—পিতা ! ক্ষমা ক'র লক্ষ্মণে তোমার ।

রাম । হতভাগ্য রামের কারণে
স্নেহময় পিতা সে আমার
অমূল্য জীবন তাঁর দিলা বিসর্জ্জন ।
আমি যদি নাহি জন্মিতাম
পুত্ররূপে পিতার আমার,
তা হ'লে ত এইভাবে আজ
মৃত্যু কভু ঘটিত না তাঁর ।

ভরত । বিধিলিপি ! তুমি কি করিবে দাদা !

রাম । কিন্তু রামের ললাটে, ভাই !
র'ল তাহা চিরতরে বজ্রলেপ যথা ।

ভরত । দাদা ! চল অযোধ্যায় !
কহিছ না কথা ? দিবে না উত্তর ?

যাবে না, যাবে না তবে তুমি ?

শত্রু । পতিহীনা শোকাতুরা বড়মা মোদের
আছে পড়ি' শয্যা'পরে
মমূর্ষূর প্রায় ;
হা রাম, হা রাম বলি'
দিবানিশি করিছে ক্রন্দন ।

ভরত । সে মায়ের কথা স্মরি' দাদা !
ফিরে চল যাই অযোধ্যায় ।

রাম । (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ)

শত্রু । শোকে ক্ষোভে মর্ম্মান্তিক লজ্জা অপমানে
দগ্ধহিয়া অভাগী সে সেজমা মোদের—
পড়ে আছে অশ্রুভারস্তম্ভিত নয়ন—
উন্মাদিনী—
মূক সম আদিনাথ শিবের চরণে !

রাম । শত্রুঘ্ন, বুঝাই ভরতে আমি !
তুমি কোন' দিয়োনাক' বাধা ।
লক্ষ্মণ ! একাকিনী দেবী আছেন কুটীরে ।

ভরত । দাদা চল অযোধ্যায় ! (হস্ত ধারণ, রামের নির্ব্বাক অবস্থিতি)

লক্ষ্মণ । চল ভাই, দেবীপদে করিগে প্রণাম ।

শত্রু । মিথিলার রাজপুত্রী—সূর্য্যকুলবধূ—
অযোধ্যার রাজরাণী—
মূর্ত্তিমতী আনন্দপ্রতিমা—
রয়েছে কুটীরে—
তপস্বিনী—একাকিনী আজি !

লক্ষ্ম । শত্রুঘ্ন !

শত্রু । কঠিন কঙ্করময় বন্ধুর এ পথ—
উপলব্যথিত পদে পদে ।
বল দাদা, কেমনে সে দেবী আমাদের
চ'লে এল এতখানি পথ !—
জলভারে স্নিগ্ধতনু মেঘমালা সম

ধরি' বুকে বিদ্যুতের তেজ। (ক্রন্দন)

লক্ষ। ধৈর্য্যহারা হয়োনা শত্রুঘ্ন!

শত্রু। দাদার অবস্থা দেখে এতদিন আমি
কোনমতে রেখেছিনু চেপে
জীর্ণপ্রায় বুকখানা মোর।
কিন্তু আর যে পারি না দাদা!

লক্ষ। চল ভাই, একাকিনী আছে দেবী।

(লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের প্রস্থান)

রাম। শোন ভাই, অতীতের গুহ্যকথা এক,—
রহস্যের ছলে পিতার সম্মুখে
হাসিতে হাসিতে
বলেছিলা মধ্যমা জননী,—
"জান রাম!
বিবাহের কালে পিতৃপাশে মোর,
হয়েছিলা প্রতিশ্রুত জনক তোমার,—
'গর্ভজাত তনয়ে আমার
দিতে এই অযোধ্যার রাজসিংহাসন।'
ভয় নাই, সে সত্যবন্ধন হ'তে
মুক্ত করিলাম আমি পিতারে তোমার।"

ভরত। মহাপ্রাণা ছিলা যে জননী
বুঝিতে না পারি আমি
কেন এ মতিভ্রম ঘটিল তাঁহার।

রাম। ভরত—ভাই! অনুরোধ মোর,
ফিরে তুমি যাও অযোধ্যায়!
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে
ইচ্ছা হয় দিও মোরে রাজসিংহাসন।
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃসম তব
করিতেছি সকাতরে অনুরোধ, ভাই!
শুনিবে না?
একটি একটি মাত্র অনুরোধ।

ভরত। শুনিব—শুনিব, দাদা!
বল কিবা আজ্ঞা ভরতের পরে।

রাম। যাই আমি পিতৃসত্য করিতে পালন।
ফিরে তুমি যাও চলি ভাই!
তারপর—

ভরত। তারপর! তারপর আর কিছু নাই।
একটি—একটি আজ্ঞা বলেছ ত দাদা!

রাম। অযোধ্যার সিংহাসনে বসি—

ভরত। করেছি প্রতিজ্ঞা আমি
গুরুদেব বশিষ্ঠের পাশে,
বসিব না সিংহাসনে,
যতদিন না ফিরিবেন আর্য্য রঘুনাথ
ততদিন আমি
না পশিব অযোধ্যার পুরে।

রাম। অভিমান ভরে
এ প্রতিজ্ঞা কেন করেছিলা ভাই?
অযোধ্যার রাজভক্ত প্রজা—
ভেবেছ কি রাজার বিহনে
অসহায় নিরাশ্রয় দাড়াবে কোথায়?

ভরত। ক্ষমা কর!
রাজা হতে পারিবনা দাদা!

রাম। ল'য়ে যাও উষ্ণীষ আমার।
ইহারে সম্মুখে রাখি'
প্রতিনিধি রূপে কর রাজ্যের পালন।
সব দিক্ রক্ষা পাবে ভাই!

ভরত। রেখে দাও উষ্ণীষ তোমার।

(লক্ষণ শত্রুঘ্ন ও সীতার প্রবেশ)

দাও তবে ওই পাদুকা দুখানি,
ওরই হ'য়ে প্রতিনিধিরূপে আমি
কঠোর কর্ত্তব্যভার বহিব নীরবে। (পাদুকা গ্রহণ)

চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে
ফিরে যদি নাহি এস, দাদা!
তবে প্রতিজ্ঞা আমার শুনে রাখ—
দেহ মোর অগ্নিমুখে করিব নিক্ষেপ।

রাম। ভুলিব না সে কথা ভরত।
অযোধ্যায়—

ভরত। আর কিছু কয়োনাক' দাদা!

—৩—

তখন।

লেখিকা—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু, বি, এ।

ওই কেয়া-বনের পাশ ঘিরে
খেয়া-তরী লাগ্‌লে তীরে
তুমি অম্‌নি ক'রেই লুকিয়ে খেলো।
তখন সিন্ধু জলে ডুব্‌বে রবি,
আঁধার হ'য়ে আস্‌বে সবি,
তুমি লুকিয়ে বনে আঁখি মেলো।
তখন পাখিরা সব ফির্‌বে বনে,
পবন ছুটে আস্‌বে খনে,
তুমিও তখন উড়িয়ে চুল এসো এলোমেলো।
তখন সন্ধ্যাতারা উঠ্‌বে ফুটে,
রাকা-শশী আস্‌বে ছুটে,
কুমুদ-বালা তুল্‌বে আঁখি—
ভাস্‌বে বন-উপবন,
কেয়া-বাসে মাত্‌বে পবন,
নীরব বাঁশী বাজ্‌বে থাকি থাকি—
তুমি তবে বনের পাশে পাশে
যূথী-ভরা মধুমাসে
লুকিয়ে দেখো তোমার সাথী—হারিয়ে গেছে দূরকাশে।
বাজ্‌লে ব্যথা খুঁজো বনে
আকুল মনে—প্রণয় ঢেলো॥

শাঁখা ও সিন্দূর।

লেখক—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নলিনীর কক্ষে মোক্ষদা প্রবেশ করিলেন, পদ্মর মাও তাহার ঘরে গেল, কিন্তু তাহার অন্তরে বড় কোলাহল উঠিল, এ ঘটনা কাহাকেও বলিবে কি না? দেখিল এ ঘটনা সে ভিন্ন আর কেহ জানে না; এ ঘটনার কথা রাষ্ট্র হইলে, মোক্ষদার মুখ দেখাইবার আর স্থান থাকিবে না, বুঝিল। অবশেষে অনেক চিন্তার পর পদ্মর মা স্থির করিল, এ কথা প্রকাশ না করাই ভাল।

ভাবনায় ভাবনায় পদ্মর মার নিদ্রা হইল না; অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল, পদ্মর মা শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল, দেখিল, এখনও অনেক রাত্রি আছে, পাছে কেহ কিছু মনে করে, এই ভাবিয়া আবার শয়ন করিল, আবার নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু নিদ্রা হইল না। বড় রাগ হইল, যাহারা নিদ্রার ব্যাঘাতের কারণ তাহাদের উপর বড় রাগ হইল। প্রথমে সে মোক্ষদাকে গালি পাড়িল, নলিনীকেও অনেক গালি দিল; হরনাথও নিস্তার পাইলেন না, কারণ তিনি সংসারের কর্ত্তা হইয়াও সংসারের কিছুই দেখেন না, মোক্ষদা যাহা করেন তাহাই হয়, এই উদ্দেশ করিয়া হরনাথকে গালি পাড়িল। পরে যত রাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, গালিরও মাত্রা ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে উহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ যে না হইল, এমন নহে।

বিনিদ্র অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকা পদ্মর মার আজ বড় কষ্টকর বোধ হইল, অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই শয্যা ত্যাগ করিল। অন্যদিন হইলে, আর এক-বার জড়তা ভাঙিয়া লইত, রৌদ্র দেখা না দিলে সে আর শয্যা ত্যাগ করিত না। কিন্তু আজ পদ্মর মা বড় কাজের লোক হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি একঝুড়ি বাসন হাতে অন্ধকারে বিড় বিড় করিতে করিতে, "অত বাড় ভাল নয়, দর্পহারী মধুসূদন আছেন," বলিতে বলিতে ঘাটে উপস্থিত হইল।

পদ্মর মা অনেক কাল এ বাড়িতে চাকরী করিতেছে, নলিনীকে একপ্রকার

কোলে পিঠে মানুষ করিয়াছে। তাই নলিনীর ভাবী দুর্দ্দশা ভাবিয়া তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হইল। মোক্ষদাই নলিনীর সর্ব্বনাশের মূল জানিয়া, সে অনেক গালি পাড়িল, গালি পাড়িয়াও তাহার গাত্রের জ্বালা প্রশমিত হইল না।

ঘাটে আসিয়া পদ্মর মা আপন মনেই বকিতেছিল, কাহাকেও শুনাইয়া বকে নাই। তবে তাহার সৌভাগ্যই বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, তাহার বকুনি বৃথায় গেল না, একজন শুনিয়া ফেলিল। সে সঙ্গে সঙ্গেই ঘাটে আসিতেছিল, পদ্মর মা তাহাকে অন্ধকারে দেখিতে পায় নাই।

বড় ঘরের বড় কথা শুনিবার জন্য কাহার না প্রাণ অস্থির হয়? পশ্চাৎবর্ত্তিনী প্রৌঢ়ারও প্রাণ অস্থির হইল, মন উচাটন হইল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, পদ্মর মার উদর চিরিয়া সকল কথা বাহির করে।

প্রৌঢ়ার অনেক গুণ। প্রধান গুণ সে পাঁচবাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়, পাঁচবাড়ীর সংবাদ তাহার কণ্ঠস্থ। যে দিবস সংবাদ কিছু গুরুতর, সে দিবস প্রৌঢ়ার বড়ই আনন্দ,—ঘন ঘন গমনাগমনের ঘটা দেখে কে? সে দিন প্রতিবাসী মহলে তাহার সমাদর দেখে কে? সামান্য কথায় নাক মুখ চোখ দেওয়া তিলকে তালে পরিণত করা প্রৌঢ়ার আর একটী প্রধান গুণ। এক্ষণে ভিতরের কথা জানিবার জন্য প্রৌঢ়ার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল, অতি আদরমাখা ডাক ডাকিয়া পদ্মর মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"হ্যাঁ গা মাসি! কি বল্‌ছিস্ গা? ঐ অত বাড় ভাল নয়, দূর্ হোক্ ছাই সব কথা মনেও থাকে না, কাদের কথা গা? বাবুদের বাড়ীতে তোর কিছু ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছে না কি? তা হতেই পারে, গিন্নীর মুখ ত একবারও ফাঁক্‌নেই, রাত দিন চল্‌ছেই। তা বাপু গরীবের উপর কি এতই ঝাল ঝাড়্‌তে হয়? তারা কি মানুষ নয়?"

"আমার সঙ্গে কিছু নয় গো! বলি, আমাদের জামাইবাবু কাল রেতে এসেছিলেন।"

এইটুকু বলিয়াই পদ্মর মা জিব কাটিল, মনে মনে বলিল,—

"দূর হোক্ ছাই! যা বলব না মনে করি, সেই কথাই এসে পড়ে!" ঢোক গিলিয়া আবার আরাম্ভ করিল,—

"গিন্নী অপমান—না-না-না! বলি তা,"

ধূর্ত্ত প্রৌঢ়ার বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না, মোক্ষদা জামাতাকে অপমান করিয়াছেন তাহা বুঝিল। তথাপি প্রৌঢ়া সন্তুষ্ট হইল না, পদ্মর মা কেন গোপন

করিতেছে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইল। আবার আদরের ডাক ডাকিয়া মধুর সম্ভাষণে প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসিল,—

হ্যাঁ:গা আমি কি পর গা, আমায় কোন কথা বল্‌তে ভয়ে পাচ্ছিস্? আমি তোদের বাবুর খেয়ে মানুষ, নলিকে একরত্তি থেকে বড় হ'তে দেখ্‌লাম। আমি ঘরের লোক, আমায় বল্‌তে দোষ কি? আমি শুন্‌লে তোদের ভালই হবে। আমি তেমন মেয়ে নই যে, এর কথাটি ওর কাছে, ওর কথাটি তার কাছে বলে বেড়াই। কাদের ঘরে না ঝগড়া হয়? ঝি জামাই নিয়ে ঘর কর্‌তে গেলেই ঝগড়া হয়। এই দেখ না মাসী! ঐ খাঁদা বোসেদের মেয়ে তামাক সাজতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছেল বলে তার মা জামাইকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে; গোপাল দাসের জামাই শাশুড়ীর হাত পুড়িয়ে দিয়েছে বলে শালাদের সঙ্গে কত মারপিট হয়ে গেল। তা মাসী! অমন সব ঘরে ঘরেই হয়ে থাকে, আর ও সব কথা ঢাকাও থাকে না। আজ না হয় কাল, পের্‌কাশ হয়ে পড়েই পড়ে, সত্যের ঢাক আপনিই বাজে।"

পদ্মর মার কাছে এত বাহুল্য করিবার প্রয়োজন ছিল না, সে নিজেই বলিতে প্রস্তুত। পদ্মর মা গম্ভীর অথচ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—

"দেখ মা! মানুষের কাছেঢাকা যায়, ভগবানের কাছে ঢাকা থাকে না। জামাই কি পর? ছি! ছি! ছি! কি লজ্জার কথা! গরীব বলে কি তাকে মান্‌তে হবে না? তা এমনই বা গরীব কি? তোদের মতনই যেন নয়, তা বলে কি তার মান্যি নেই? আহা! জামাই ত নয়—যেন কার্ত্তিকটি; শুন্‌তে পাই লেখা পরা বেশ শিখেছে। কর্ত্তা তাই সব ঘর ঠেলে ওকেই জামাই কর্‌লে, তা ত তোমার জান্‌তে বাকী নেই! তা মা বল্‌ব কি, বিয়ের পর হতেই গিন্নী মেয়েকে ফুস্‌লুতে লাগ্‌লো, মেয়েও তাই শিখ্‌লো! এতে মেয়ের দোষ কি মা? ভেতরে ভেতরে এত কারখানা, তা কি আমি এতদিন জানি! গিন্নী আমায় এত ভালবাসে তবু একদিন একটী কথাও মুখ ফুটে বলেনি। ধন্যি বল্‌তে হয়! কর্ত্তাই বা জান্‌বে কেমন করে? তিনি গিন্নীর কলকাটিতে নরেন চরেন। এদিকে মেয়ের যে কি সর্ব্বনাশ হচ্চে তা কেমন করেই বা জান্‌বে বল?"

প্রৌঢ়া এতক্ষণ পদ্মর মার কথাগুলি গোটা গোটা গিলিতেছিল,—কথারও শেষ হইল, প্রৌঢ়াও দাঁড়াইবার অবসর পাইল না। আজ অনেক ঘর ঘুরিতে হইবে, কাজেই প্রৌঢ়া দুই চারি কথায় সারিল, বলিল,—

"সত্যি বাপু! জামাই কি পর গা? এদের ছিষ্টি ছাড়া সংসার। মনে

একবারও ভাব্‌লে না, জামাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর্‌লে, অপমান কর্‌লে, তোর মেয়ের দশা,—”

এই কয়টি কথা শেষ করিতে প্রৌঢ়া অবসর পাইল না, পদ্মর মা মাথার দিব্যেও কর্ণপাত করিল না, একটী ডুব দিয়া আর্দ্র বসনেই হন্ হন্ করিয়া দত্ত-গৃহাভিমুখে ছুটিল।

নিকটেই দত্তদের বাড়ী। কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রৌঢ়া একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্র বাড়ীর কর্ত্রীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রত্যুষে প্রৌঢ়ার দর্শনমাত্র গৃহিণী বুঝিতে পারিলেন, আজ খবর কিছু গুরুতর। সাগ্রহে বলিলেন,—

“কি গো দিদি! কি সৌভাগ্যি! আজ তোমার পায়ের ধুল পড়্‌ল। এদিকে অনেকদিন এসনি, আছ কেমন? কাল না নলিনীর বর এসেছিল?

আপ্যায়িত হইয়া প্রৌঢ়া বলিল,—

“আর বোন! জামায়ের দুর্দ্দশার কথা আর কি বল্‌ব! রেতেই এল, রেতেই গেল!”

কর্ত্রী। বাপেরা বুঝি থাকতে বারণ করেছে?

প্রৌঢ়া। তা নয় গো, তা নয়; জামাই থাক্‌বে না কেন? জামাই কাল রেতে ছেল; মায়ে ঝিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেছে।

কর্ত্রী। অাঁ! সত্যি নাকি? জামাইকে মায়ে ঝিয়ে অপমান করেছে?

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! এইমাত্র পদ্মর মা সব খুলে বল্লে। যেমনি শুনেছি অমনি ভিজে কাপড়ে ছুটে এসেছি, আবার কখন ভুলে যাব?

দত্ত-গৃহিনী প্রৌঢ়ার হস্তধারণ করিয়া এক নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন, উভয়ের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। প্রৌঢ়া তিলকে তাল করিল। দত্ত-গৃহিনী তাহাতে আবার রং চড়াইল, দত্তদের ঝি তাহাতে আবার নক্সা করিল। ক্রমে দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই গৃহে গৃহে মোক্ষদার গুণের কথা নানা রঙ্গভঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এমন কি, এ ঘটনা একটা গল্প হইয়া দাঁড়াইল। যেখানে দুই চারিটি স্ত্রীলোক একত্র হইল, সেইখানেই মোক্ষদা ও নলিনীর রঙ্গকাহিনী গীত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নলিনীকে লইতে শ্বশুরালয় হইতে এক পরিচারিকা আসিল। মোক্ষদার মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইল। এতদিন মোক্ষদা মিষ্ট হাসি হাসিয়া প্রিয় সম্ভাষণে আদর আপ্যায়নে, নলিনীর শ্বশুর বাড়ীর লোকদিগকে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু এইবার এই পরিচারিকাকে দেখিয়াই মোক্ষদা জ্বলিয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বে নলিনীর শ্বশ্রূ ভাবিতেন, পুত্রবধূ বড় হইলে তখন আসিবে, ততদিনে ব্রজকিশোরেরও পাশের পড়া শেষ হইবে, এজন্য বধূকে লইয়া যাইতে বিশেষ কোন পীড়াপীড়ি করেন নাই। এক্ষণে বধূ বড় হইয়াছে, চতুর্দ্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে,—ব্রজকিশোরেরও পাশের পড়া শেষ হইয়াছে,—সুতরাং শ্বশ্রূঠাকুরাণী বধূমাতাকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, এক পরিচারিকা পাঠাইলেন। এ পরিচারিকা আর কেহ নহে, সম্মার্জ্জনী-বিতাড়িতা সেই তারিণী।

মোক্ষদা তারিণীকে দর্শনমাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বলিলেন,—

“তোদের মা কেমন ধারা? যে দিন মনে কর্‌বে, সেই দিনই নিয়ে যাবে। ও-মা-গো! এমন ত কোথাও দেখিনি! আমি ত আর বল্‌চিনি মেয়েকে পাঠাব না, মাসের আর কটা দিনই বা আছে। এ কটা দিন আর দেরী সয় না? না বোঝে নেই বুঝ্‌লে! আজ মেয়েকে ত পাঠাব না! যা কর্‌বার হয় করুক্।”

তারিণী এখন আর মোক্ষদার মুখাপেক্ষী নহে, উদ্ভট উত্তরে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল, হাত নাড়িয়া, চোখ মুখ ঘুরাইয়া তারিণী বলিতে লাগিল,—

“সে কি গো! আকাশ থেকে পড়্‌লে যে গো! আজই কি সবে নিতে পাঠিয়েছে? বছর ধরে লোক হাঁটাহাঁটি কর্‌ছে, বছর ধরে লোক ফির্‌চে; আজ নয় কাল, কাল নয় দশদিন পরে এমাস নয় ওমাস, এ রকম যত দিন নিতে এসেছে ততদিনই ভাঁড়াভাঁড়ি হতেছে। ঘরের বৌকে নিয়ে যাবে, এত আবার ভাঁড়াভাঁড়ি কেন গো! এমন ধারা ত কখন দেখিনি—কখন শুনিনি! নিতে এল, নিয়ে গেল এই ত জানি।”

মোক্ষদা আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, যাহা মুখে আসিল, নাক মুখ ঘুরাইয়া, চক্ষু রাঙ্গাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতে লাগিলেন,—

“তোদের বড় কথা! যা মুখে আসে তাই বলিস্! এত কথা কিসের? তোদের আমি একদিনও কি একটি কথা বলেছি যে তোদের নিত্যি নিত্যি কথা

শুন্‌তে হবে। ও সব আমি ভালবাসি নি! চুপ্‌ করে আস্‌বি, চুপ্‌ করে চলে যাবি, এই ত জানি। ছোট লোক না হ'লে বাড়ী বয়ে ঝগ্‌ড়া কোত্তে কে আসে? তোদের মত সৃষ্টিছাড়া কথা বাপের জন্মেও শুনিনি। ছেলের মা হয়ে যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছে! কেউ ত আর ছেলের মা হয় না! আমি বলেই তাই সয়ে আছি, আর কেউ হ'লে এতক্ষণ কুরুক্ষেত্র বেধে যেত।"

যাহার বেতন খাইত, তাহার নিন্দা তারিণীর অসহ্য হইত। প্রভুর নিন্দায় আরও রাগ হইল, সুরে সুর মিশাইয়া তারিণী বলিতে লাগিল,—

"দেখ, অত হাত মুখ নেড়োনা। যা বল্‌তে হয়, নিজের গায়ে হাত দিয়ে বল্‌তে হয়। যা তা মুখে বল্লেই হয় না। আমাদের বাবুদের সৃষ্টিছাড়া কথা কি গা? আমি জোর করে বল্‌তে পারি, বাবুদের মতন ভাল মানুষ ঐ গাঁয়ে মেলে না। খামকা লোকের ওপর বদ্‌নাম দিলেই হয় না। পাঁচ জনের মুখে বাবুদের সুখ্যেৎ ধরে না, খালি তোমারই মুখে নিন্দে শুন্‌তে পাই। বৌ নিতে এসেছি, তাই এত কথা! আমরা গরীব বলে কি এ সামান্যি কথা বুঝ্‌তে পারিনে? ঢের ঢের সংসার দেখেছি, এমন ধারা কোথাও দেখিনি! মেয়ের মা হয়ে এত জোর ছোট লোকেয় ঘরেও নেই। তারা ইজ্জৎ বোঝে, পরাণে ভয় আছে। আজ কাল বড় নোকের বড় কথা। একটু ভয়ও নেই, একটু ডরও নেই! যা মনে করে তাই করে, যা মুখে আসে তাই বলে। দেমাকে মাটীতে পা পড়ে না! বড় মানুষ বলেই সব ঢেকে যায়, গরীব হ'লে এতদিনে ঢাক বেজে যেত। মেয়ে শশুর ঘর কর্‌তে যাবে, এতে এত কথা কিসের? আবার বলে কি না বাড়ী বয়ে ঝগড়া করতে আসি। ঝগড়া আবার কিসের? বৌ নিতে এসেছি বৌ নিয়ে যাব, এত কথা কিসের? পাঠালে ত আর কোন কথা থাকে না?"

মোক্ষদার ধারণা ছিল, তাঁহার সহিত কথায় কেহ পারে না, কিন্তু আজ তারিণীর উত্তরে তাঁহার সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইল। মোক্ষদা রণচণ্ডীর মূর্ত্তি ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"দেখ্‌ তারি! তোর ছোট মুখে বড় কথা আর সহ্য হয় না! কি বল্‌ব, তুই আজ অন্য লোকের মাইনে খাস্‌, তা না হলে তোকে আজ দেখ্‌তুম, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতুম্‌। তুই যদি আর কখন এ বাড়ীর ত্রিসীমায় ঢুকিস্‌, তোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর্‌ব, দেখিস্‌—দেখিস্‌—দেখিস্‌! আজ থেকে তোদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচ্‌লো, এখনই দূর্‌ হ!"

পদ্মর মা নিকটেই ছিল, মোক্ষদার এ নিদারুণ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, নলিনীর সর্ব্বনাশ দেখিয়া মোক্ষদার পাপ মতি ফিরাইবার চেষ্টা করিল, বাষ্পাকুল-লোচনে মোক্ষদাকে কত বুঝাইল, পরে হাত ধরিয়া বলিল,—

"ওগো, নলির মুখপানে একবার চাও গো!"

মোক্ষদার রাগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, পদ্মর মার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তারিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"ঝি মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখ! এখনও দাঁড়িয়ে। বেরো—মাগী, বেরো!"

তাহার কথা গৃহিণী অগ্রাহ্য করিলেন দেখিয়া, পদ্মর মা মনে মনে বলিল,—

"মর্‌গে যা! আমার কথা না শুন্‌বি, তোরাই মর্‌বি; আমার কি?"

তারিণী বেশ জানিত, মোক্ষদা তাহার কিছুই করিতে পারিবে না, তাই সে মোক্ষদার মূর্ত্তিতে ভয় পাইল না, বরং যাইবার জন্য দুই হাত ঘুরাইয়া বিকৃত মুখ ভঙ্গিমায় বলিয়া গেল,—

"মেয়ে নিয়েই থাক!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ সমস্ত দিন জমিদারী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্লান্ত কলেবরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ও হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া নিজ কক্ষে গিয়া বসিলেন। একবাটী সরবৎ সম্মুখে রাখিয়া, একখানি পাখা লইয়া মোক্ষদা হরনাথকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন। আজ কাল দিন দিন যেমন গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য বাড়িতেছে, মোক্ষদারও তেমনি সরবতের রকমারি সুস্বাদ ও সাগ্রহ সেবা যত্নের আতিশয্য বাড়িয়া চলিয়াছে, স্বামী বশীকরণ মন্ত্রে মোক্ষদা সিদ্ধ কৌলিক। স্বামী-বশীকরণ-মানসা পাঠিকা! আপনার উচিত, মোক্ষদার বশীকরণ প্রণালী অনুকরণ করা।

শুষ্ক-কণ্ঠ ক্লান্ত হরনাথ, সরবতের বাটী হাতে লইলেন বটে, কিন্তু হাতের বাটী হাতেই রহিল, সরবত পান করা হইল না। ইহার কারণ একবিন্দু কদুষ্ণ জল তাঁহার হাতে পড়িল, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, অথচ আদর মাখা বিমর্ষ স্বরে বলিলেন,

"মোক্ষদা! কাঁদ্‌চ?"

মোক্ষদা আর সে মোক্ষদা নাই, তাহার আর সে প্রখরতা নাই, তবে যে একেবারেই নাই তাহা নহে! তবে হরনাথের কাছে আর সে প্রকার প্রখরতা

দেখা যায় না। বয়সাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বৃদ্ধি, জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নম্রতা সাধুতার বৃদ্ধি যেমন হইয়া থাকে, বুঝি মোক্ষদারও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রখরতা হ্রাস ও পতির প্রতি প্রীতি বৃদ্ধির সূচনা দেখা দিয়াছে। আজ কাল মোক্ষদা পতির তৃপ্তি-সুখার্থ নানাবিধ সুপক্ক ফল মূলাদি সংগ্রহ করিয়া রাখেন, স্বহস্তে পতির পাদ প্রক্ষালন ও সেবা করিয়া থাকেন, স্বহস্তে তালবৃন্তের মৃদু মন্দ ব্যজনে শ্রান্ত, ক্লান্ত, পতিকে প্রশান্ত করিয়া থাকেন। মোক্ষদার এবম্প্রকার স্বভাব পরিবর্ত্তনে সরলচিত্ত হরনাথ বড়ই প্রীত, তুষ্ট ও দিনে দিনে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। রূপ-সৌন্দর্য্যে প্রাখর্য্য মিশ্রিত থাকায় মোক্ষদা যতটা না স্পৃহনীয় ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সৌন্দর্য্যে, সারল্যের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে হরনাথের বড়ই মনোহারিণী হইয়া উঠিয়াছেন। কি পরাইলে, কি খাওয়াইলে, কি বলিলে, কি করিলে মোক্ষদা সুখী হন, হরনাথের এখন ইহাই চিন্তনীয় হইয়া উঠিয়াছে,— মোক্ষদার তুষ্টি-সাধনই হরনাথের সাধন, মোক্ষদার সাহচর্য্যই হরনাথের সৎসঙ্গ মোক্ষদার আজ্ঞাই হরনাথের ভগবৎপ্রত্যাদেশ। মোক্ষদার হাসি-খুসি, মোক্ষদার সুখ-সম্ভোগ, মোক্ষদার আনন্দ-উল্লাস, যাহার নন্দন-কানন সেই হর-নাথের হস্তে তপ্তাশ্রু পতন হইল,—হরনাথ শিহরিয়া উঠিলেন,-- জগৎ-সংসার শূন্য দেখিলেন, তাই সাগ্রহে সাদরে বলিলেন,—

"মোক্ষদা! কাঁদ্‌চ?"

"না, তুমি খাও।"

"না," মোক্ষদার এই একটি কথায় হরনাথের মাথা ঘুরিয়া গেল, পৃথিবী শূন্যময় বোধ হইল। শত শত "হাঁ" শব্দ যাহা প্রকাশ করিতে না পারে, একটী "না" তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়,—হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃস্থল আলোড়ন করিতে "না" শব্দ যেমন দক্ষ, শত শত "হাঁ" শব্দে সেরূপ দক্ষতা দেখা যায় না। যেখানে গূঢ় রহস্য প্রকাশের আবশ্যকতা হয়, সেখানে "হাঁ"র পরিবর্ত্তে "না"রই প্রকাশ দেখা যায়, তাই তত্ত্বদর্শী শাস্ত্রকারগণ "নেতি"—নেতি করিয়াই আত্ম-তত্ত্বের গূঢ় রহস্য প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। "না" শব্দের মর্ম্ম মোক্ষদা বুঝেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি কাঁদ কাঁদ স্বরে হরনাথকে বলিলেন,—

"না, তুমি খাও।"

হরনাথ বলিলেন,—

"মোক্ষদা! বুঝেছি, তুমি আমায় লুকোচ্চ।"

এবারেও মোক্ষদা বলিলেন,—

"না, তুমি খাও।"

"না" কথার মর্ম্ম হরনাথ বুঝিলেন,—

বুদ্ধিমতী মোক্ষদা একটু নাকিসুরে বলিলেন, কাজেই মর্ম্ম বুঝিতে হরনাথের মাথা ঘামাইতে হইল না। হরনাথ ভাবিলেন, শুনিলে পাছে আমার কষ্ট হয়, তাই মোক্ষদা গোপন করিতেছেন। এই গোপনেই হরনাথের অত্যন্ত কষ্ট হইল, তিনি বড়ই বিহ্বল হইলেন; বলিলেন,—

"মোক্ষদা! যদি আমার কাছে লুকোও তবে এই বাটী রহিল।"

মোক্ষদা হরনাথের পা ধরিলেন, জলভরা চোখে বলিতে লাগিলেন,—

"তুমি আমায় দুটো গাল দাও দেবে, কিন্তু যে সে আমায় গাল দেবার, নিন্দে করবার কে? আমায় গাল দেয় দিক্, আমার নিন্দে করে করুক, তার জন্যে আমি দুঃখ করিনে। তোমায় যে গাল দেবে, নিন্দে করবে, আমার তা সহ্যি হয় না; তোমার ওপর একটা কথা কেউ বল্লে বুক ফেটে যায়!"

এই বলিয়া মোক্ষদা নীরব হইলেন, নীরবে সঞ্চিতাশ্রু বহিল, সূক্ষ্ম বসনে ঈষদাবৃত উচ্চ কুচযুগল ও নীরবে ভিজিল, আর ভিজিল, হরনাথের প্রেমাপ্লুত মন।

মোক্ষদা মস্তক অবনত করা দূরে থাকুক, কখন নম্র হইয়া কথা কহিতেন না। সেই মোক্ষদা হরনাথের পদে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, ইহা কি সামান্য প্রহেলিকা! মোক্ষদা যতই হরনাথের দাস্যানুদাসী হউন না কেন, হরনাথ মোক্ষদার তীক্ষ্ণতা এখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; এই তীক্ষ্ণতার অনুভূতিই এক্ষণে মোক্ষদার অভিলাষ পূরণের সহায় হইল। মোক্ষদার হস্তধারণ করিয়া হরনাথ তুলিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, এমন কে আছে যে মোক্ষদার মনে কষ্ট দেয়? দেখিলেন, নলিনীর শ্বশ্রূ ভিন্ন মোক্ষদার অন্তরে ক্লেশ দিবার আর কেহ নাই।

মোক্ষদার মুখে হরনাথ নলিনীর শাশুড়ীর বিপক্ষে অনেক কথা শুনিয়া থাকেন; নলিনীর শাশুড়ী সর্ব্বদা লোকের কাছে নিন্দা করেন, গালি দিয়া থাকেন। এই সব কারণে নলিনীর শাশুড়ীর উপর হরনাথের ক্রোধ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে সেই ক্রোধাগ্নিতে অশ্রু সিঞ্চিত হওয়ায় ক্রোধ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। হরনাথ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—

"বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না, নলির শাশুড়ী—"

মোক্ষদার অন্তরে আনন্দের বেগ বহিল। বেগ-সম্বরণ-পটীয়সী মোক্ষদা

বলিতে লাগিলেন,—

"নলির শাশুড়ী কি পাজি ! সেদিন জামাইকে কত করে আনা হ'ল কেবল তোমার নামে পাঠিয়ে'ছল। মনে করেছিলুম, জামাই থাক্‌বে,—ওমা তা কি হইল ! কত সাধাসাধি করা গেল, কিছুতেই রইল না। বলে, থাক্‌লে মা বক্‌বেন, আমায় বারণ করেছেন, আমি থাক্‌ব না। এতে আর জামায়ের দোষ কি ? মা যা বলেছে, ছেলে তাই করেছে। আমাদের রাখ্‌তে সাহস হ'ল না। তা হ'লে কি আর রক্ষা থাক্‌ত ! অম্‌নিতেই কত গাল দেয়, রাখ্‌লে এখানে যা ও বা পাঠাত, আর পাঠাবে না, আবার গাল দিয়ে ভূত ছাড়া কর্‌বে। বেটার মা হয়েছে বলে, মাগী আর গুমুরে বাঁচেন-না !"

"ওমা ! আবার আজ হ'ল কি ! কোথাও কিছু নেই, নলিকে নিতে হুট্‌ করে একেবারে পাল্কি নিয়ে হাজির, সঙ্গে এক চাক্‌রাণী। সে বলে,—এখনই বৌকে নিয়ে যাব।"

"দেখ দেখি মাগীর কি আক্কেল ! কোথাও কিছু নেই, বলে কি না, বৌকে নিয়ে যাব। এমন করেই কি ডাক্‌তে পাঠাতে হয়। মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাই মনে কল্লেই ত পাঠান যায় না ! চুল বেঁধে দেওয়া, আল্‌তা পরাণো, গয়না পরাণো, কাপড় বার করা, এ সব ত আর অল্প সময়ে হয় না। তারা জানে না, তাও ত নয় ! হাঁ—পাঁচবার যাওয়া আসা কর্‌ত, একখানা কাপড় পরে গেলেও ক্ষতি ছিল না। তা নয়, এই প্রথম দিন ! কোথাও কিছু নেই, মেয়েকে হুট্‌ করে চাক্‌রাণীর সঙ্গে পাঠাই কেমন করে ? চাক্‌রাণী মাগী যেন সয়তানী, একেবারে হাঁক্‌ হাঁক্‌ করে এসে পড়্‌লো। যা মুখে এল, তাই বলে গাল দিলে। ঝগড়া কর্‌বার ত আর যায়গা পায় না, একটা নতা করে এলেই হ'ল ! নরম মাটীতেই বেড়ালে আঁচ্‌ড়ায়।"

পূর্ব্ব হইতেই নলিনীর শাশুড়ীর উপর হরনাথের বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল। মোক্ষদার কটু কাটব্যে হরনাথ বরং সন্তুষ্টই হইলেন, একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না।

গ্রামের নানা লোকের নানা কথায় মোক্ষদার মনে যে একটু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা দূর হইল। প্রথমেই মোক্ষদা পদ্মর মাকে হাত করিয়াছেন, এক্ষণে স্বয়ং কর্ত্তা হরনাথকেও মুঠার মধ্যে আনিলেন, মোক্ষদার অন্তরে ভয়ের পরিবর্ত্তে হাসি দেখা দিল। (ক্রমশঃ।)

গিরিশচন্দ্র।

লেখক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী সরস্বতী।

হে গিরিশ মহাকবি নট নাট্যকার—
তোমা সম এত গুণ হেরি নাই কার।
এই বঙ্গ জননীরে সাজাইলে ধীরে ধীরে—
দিয়ে কত মণি-মুক্তা- রত্ন অলঙ্কার—
ধন্য বঙ্গ-বরপুত্র প্রতিভা সাকার। ১।
মনে হয় তোমা সনে ব্যাধি করি রণ,
কতটা হরেছে তব সে দীন মরণ ?
রাখিতে মাটির দেহ চির নাহি পারে কেহ
সে মৃত্যু হরেছে তব আত্মা-আবরণ
অক্ষয় অব্যয় আত্মা কে করে হরণ ? ২।
সে পাষাণ মূর্ত্তি তব প্রাণশূন্য নয়,
নীরবে ভাবুক সনে আনে কথা কয় !
দেবতার মূর্ত্তি গড়ি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করি
পূজি ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে কাম্য লাভ হয়—
পাষাণ মূর্ত্তিতে হয় দেবতা উদয় ! ৩।
হরিনাম সুধা দানে তুমি পতিতায়
দেখাইলে শেষ পন্থা—শেষ গতি তায় !
হরিনাম সুধা পানে মত্ত হরিনাম গানে
নয়ন ধারায় তার বক্ষ ভেসে যায়—
দর্শক কাঁদিল তার সনে উভরায়। ৪।
বারাঙ্গনা সহচর ছিলে তুমি কবি,
তুচ্ছ করিয়াছ পর-প্রদত্ত পদবী।
রঙ্গিনীগণের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে ছিলে রঙ্গে
ভ্রূভঙ্গে করিয়া তুচ্ছ সুখ দুখ সব-ই-
উল্লাসে জ্বলেছ হয়ে হোমাগ্নির হবি ! ৫।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম বুদ্ধদেব-বাণী
করিলে প্রচার তায় আশ্চর্য্য বাখানি !
দেবীর পূজার তরে ছিল বলি কত ঘরে—
তুলে দিলে বলি তারা তব বাক্য মানি—
অকাল নিধন হতে বাঁচে কত প্রাণী ! ৬।
ভাষা ও ভাবেতে হেন শুভ পরিণয়
হেরিনি কাহারো আর এই বঙ্গময়।
ভাষাভাবে খোলাখুলি প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি
ছন্দোবন্ধে দোলাদুলি—মধুর বিস্ময় !
যে ভাবে ভাবুক-প্রাণ সাধে ডুবে রয় ! ৭।

যখন ছুটিত তব ভাবের ফোয়ারা
ভাষা তার সনে মিলি হ'ত মাতুয়ারা !
যে দেখেছে—সেই জানে কি স্রোত বহিত প্রাণে,
ছুটিত সে মুখ হতে প্রপাতের ধারা—
হেরি তাহা ভয়ে লিপিকার আত্মহারা ! ৮ ।
চরিত্র-সকল তব নখর-দর্পণে—
হইত বিম্বিত সদা তব প্রয়োজনে ।
শত শত কি চরিত্র সে চরিত্র কি বিচিত্র
অঙ্কিত করিলে তুমি ভাব-মুগ্ধ মনে—
কল্পনা সুন্দরী দাসী বিনা আবাহনে ! ৯ ।
জ্বালালে দীপক গানে অদ্ভুত অনল
মল্লারে বহিল সুধাধারা সুশীতল !
সোহিনীর মধু বাঁশী বাজিয়া মাধুরী রাশি
বহাইল সারা বঙ্গে রঙ্গ নিরমল—
নবরস-প্রস্রবণ তুমিই কেবল ! ১০ ।
এ ভবনের তীরে কবি গাহিল যে গান
সে গানও নহে বুঝি তোমার সমান !
মাঠে কৃষিকাজে রত হেরি কৃষিজীবী কত
গাহিয়া তোমার গান কাজে দেয় প্রাণ—
গানের সম্রাট তুমি—ধন্য জন্মস্থান ! ১১ ।
যে কীর্ত্তি রাখিলে তার নাহিক বিনাশ
যত দিন যাবে তত উজ্জ্বল বিকাশ ।
তব কীর্ত্তি তাজ সনে তুলনা মূর্খের মনে
কালে তাজ হবে ধ্বংস আছে এ বিশ্বাস,
করিবে তোমার কীর্ত্তি কালে উপহাস ! ১২ ।
সিন্ধুপার হয়ে তব যশোরশ্মি রাশি
সুদূর প্রতীচ্য দেশে উঠেছে বিকাশি ।
কালে পরদেশী কত মস্তক করিবে নত
তোমার মর্ম্মর মূর্ত্তি সম্মুখেতে আসি—
মহতে পূজিতে চির জানে বিশ্ববাসী ! ১৩ ।
অবনীতে কার হয় হেন ভাগ্যোদয়
না হইতে মৃত্তিকার এই দেহ লয়
ভগবান-পদাশ্রয় লভিলে হে মহোদয়—
না যাচিতে অনায়াসে মিলিল অভয়—
জয় দীন-দয়াময় রামকৃষ্ণ জয় । ১৪ ।

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫শ বর্ষ } ১৩৩৬ সাল, শ্রাবণ । { ৪র্থ সংখ্যা ।

ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের কতিপয় ঘটনা ।

লেখক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল ।
(ওরিএণ্ট্যাল সেমিনারী ও উমেশচন্দ্র ।)

উমেশচন্দ্র বাল্যজীবনে হরেরাম গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ত্যাগ করিয়া ওরিএণ্ট্যাল সেমিনারী নামক স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। তিনি মনোযোগী ছাত্র ছিলেন না, বরং দুরন্ত বালক ছিলেন। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার সময় তিনি সাধারণ পাঠে মনোযোগী ছাত্রগণকে পরীক্ষায় পরাজিত করিয়া প্রাইজ লইয়া যাইতেন ! তিনি এরূপ মেধাবী ছিলেন যে পরীক্ষার পূর্ব্বে ৭।৮ দিন মাত্র পাঠ করিয়া সমুদয় আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে পারিতেন। কিছুদিনপরে উমেশচন্দ্র হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। তথায় মহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও Carnduff সাহেবের নিকট পাঠাভ্যাস করেন। এই Carnduff সাহেব High Courtএর Judge Justice Carnduff এর পিতা ।

উক্ত ওরিএণ্ট্যাল সেমিনারী ৺গৌরমোহন আঢ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ আঢ্য উক্ত স্কুল চালাইতেন। কিছুদিন পরে উক্ত স্কুলের বালক সংখ্যা বড় কমিয়া যায়, তখন এক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির হস্তে আঢ্য মহাশয়েরা উহা প্রদান করেন। উহার সম্পাদক ছিলেন—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। ইনি প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং তিনি

প্রত্যহ দুই বেলা উক্ত স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। উক্ত Managing Committeeতে W. C. Banerjee, অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, মহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ চাঁদ মিত্র প্রভৃতি সভ্য ছিলেন। বেচারাম বাবু এই সেমিনারীর সহিত এত সংশ্লিষ্ট ছিলেন যে উক্ত স্কুলকে বেচারাম বাবুর স্কুল বলিয়া সাধারণ লোকে জানিতেন। বেচারাম বাবু ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার উইলে উক্ত সেমিনারী তাঁহার স্বকীয় সম্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করেন এবং শ্রীনাথ চন্দ্রের পুত্র গোপী নাথ চন্দ্রকে Secretary নিযুক্ত করেন।

বেচারাম বাবুর পুত্রের নাম ব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্কুল চালাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার উইলের probate গ্রহণ করিয়া স্কুল দখল লইতে উদ্যত হন। তখন তদানীন্তন Secretary অপূর্ব্ব কৃষ্ণ ঘোষ W. C. Banerjeeকে সমস্ত বিষয় অবগত করিলে মহামান্য হাইকোর্টে ব্রজগোপালের বিরুদ্ধে এক নালিশ রুজু করিয়া ব্রজগোপালকে দখল লইতে বিরত করিবার জন্য এক নিষেধাজ্ঞা (Injunction) প্রচার করেন। তজ্জন্য ব্রজগোপাল দখল লইতে পারেন নাই। উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরিএণ্ট্যাল সেমিনারী সাধারণ অর্থাৎ public স্কুল বলিয়া প্রচার করিবার জন্য উক্ত আদালতে এই নালিশ রুজু করেন যে উহা কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে।

উক্ত বর্ণনা সমর্থনার্থ উমেশ চন্দ্র বেচারাম বাবুর লিখিত একখানি পত্র বাহির করিলেন উহা বেচারাম বাবু ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল যে ওরিএণ্ট্যাল সেমিনারী সাধারণ স্কুল, কোন ব্যক্তিগত স্কুল নহে। ব্রজ বাবুর পক্ষে কৌন্সুলী Dunne সাহেব উহা দেখিয়া তাঁহাকে মিটাইতে বলিলেন। উমেশ চন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া বেচারাম বাবুর নিকট গচ্ছিত ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা না লইয়া উক্ত বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয় বলিয়া আদালত হইতে প্রচার করাইয়া লইলেন। পরে তিনি উহা ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করিয়া লন। ১৯০২ সন পর্য্যন্ত উমেশ চন্দ্র উক্ত স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং তিনি প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার Alma materএর উপর এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল যে উহার দিন দিন উন্নতিকল্পে তিনি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন। প্রাইজের সময় হাইকোর্ট হইতে ভাল ভাল বিচারপতিগণকে অনুরোধ করিয়া সভাপতি করাইতেন এবং স্বয়ং গুপ্তভাবে দান করিতেন।

তাঁহার দানের এরূপ স্বভাব ছিল যে ডান হাত দান করিলে বাম হস্ত জানিতে পারিত না। তাঁহার সময় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, পরে চন্দ্রভূষণ মৈত্র মাষ্টার হন। শ্রীঅভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁহাকে সকলে অভয় পণ্ডিত বলিয়া জানিত—তিনি Superintendent ছিলেন। শ্রীবিধু বদন বন্দ্যোপাধ্যায় Assistant Superintendent ছিলেন। উমেশ চন্দ্রের দ্বারা একটী পুরাতন স্কুল রক্ষিত হইয়াছিল, নতুবা উহা কাল কবলে পতিত হইত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও উমেশচন্দ্র।

উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের কৌন্সুলী হন। তিনি কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে Bar join করেন। তিনি সাতটী ভাষা জানিতেন। তাঁহার মাতৃভাষার উপর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ থাকায় আইন ব্যবসায়ে তত মনোযোগ দেন নাই। আইন সাধকের একাগ্র অনুরাগ প্রার্থনা করে, তাহা না দিলে উক্ত ব্যবসায়ে কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মাইকেল হাইকোর্টে পসার প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার দৈনিক খরচ বড় কম ছিল না। তজ্জন্য তিনি প্রায়ই দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু তাঁহার দেনা শোধের সামর্থ্য ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর মনোমোহন ঘোষ ও উমেশ চন্দ্র সাহায্য না করিলে মাইকেলের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য হইত। যখন মাইকেল খৃষ্টীয় ১৮৭৩অব্দে পীড়িত হন এবং যখন তাঁহার ইংরেজ পত্নী Sophia Henrietta Dutt পীড়িত হন, তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য মনোমোহন ও উমেশ চন্দ্র অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মাইকেল জেনারেল Presidency Hospitalএ ২৯শে জুন তারিখে গতাসু হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রকে উমেশ চন্দ্র ও মনোমোহনের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান এবং তাহার লালন পালন ও শিক্ষার ভার তাঁহারা লইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তঁহাদের আশ্বাস বাণী শুনিয়া মাইকেল কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন এবং শান্তভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উমেশ চন্দ্র কেবল মাইকেলকে নহে, কলিকাতা Bar Libraryর দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যারিষ্টার যখন যিনি তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তাহাকেই অকাতরে দান করিতেন এবং বলিতেন 'Payable whenable.' পাছে তাহারা দান গ্রহণ করিতেছে মনে করিয়া তাহাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়।

পরীক্ষার ফি দিতে পারিতেছে না বলিয়া যে ছাত্র তাঁহাকে ধরিত তাঁহার

বেবাক টাকা দিয়া বলিতেন, "অন্য কাহারও নিকট যাইবার দরকার নাই, আমিই সমস্ত দিতেছি" এবং তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেন যে W. C. Banerjee দান করিয়াছে ইহা কাহাকেও বলিও না। British Parliamentary Congress Committee রক্ষণার্থ তিনি বৎসর দুই যে কত টাকা দিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। India নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী কাগজের চাঁদা হইতে যে টাকা উঠিত তাহাতে উক্ত Congress Committeeর খরচা বিলাতে চলিত না। যে টাকা কম পড়িত W. C, Banerjee মহাশয় তাহা অকাতরে দিতেন, কিন্তু কখন কাহাকেও বলিতেন না যে তিনি এত টাকা দিতেছেন। ফলে এই হইল যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত Congress Committee বিলাতে যাহা ছিল তাহা উঠিয়া গেল। উক্ত Congress Committeeর সভ্য ছিলেন Charles Bradlaugh, W. S. Caine, George Yule, Sir William Wedderburn প্রভৃতি মনীষীগণ। Charles Bradlaugh সাহেবের চেষ্টায় Cashmere রাজ তাহার রাজত্ব ফেরত পান। Lord Dufferin annex করিয়া লইতে সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু Parliamentএ আন্দোলন হওয়ায় এবং Warren Hastingsএর কথা মনে পড়ায় তিনি তাহা করেন নাই। শাসন সংস্কার যাহা এখন আমরা দেখিতেছি তাহা উমেশ চন্দ্র প্রভৃতি কংগ্রেসের প্রবর্ত্তকগণের আন্দোলনের ফল। Allan Octavious Hume সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সরকারী চাকরী ছাড়িয়া ভারতবাসীগণের মঙ্গলের চেষ্টায় যত্নবান ছিলেন।

কেতকী।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর।

শ্রাবণে কুসুম-বনে সুবাস তোমার
পেয়েছি বরষা রসে। সরস সমীরে
ভেসে আসে মধুগন্ধ রেণুর সম্ভার।
চেতাইয়া আনমনা বিরহবিধুরে
গরজিল ঘন ভেক শ্রাবণ নিশায়।

মনে হ'ল কত কথা ব্যথাভরা চিতে,
কত কি হারায় গেছে—না জানি কোথায়—
ব্যগ্র মন সেই সব চাহে কুড়াইতে।
এই শ্রাবণের মত সুজলা সুফলা
আমারও অন্তর-পুরী ছিল শ্যামাঙ্গিনী
সহসা শমন-রোষে ধূসর-ধবলা
হইল রে পুষ্পবর! কব সে কাহিনী
কার কাছে? নিরন্তর বরষার মত
নয়ন নীরদে পড়ে ধারা শত শত।
কেতকি! কি সুখে তোমা করিব সম্ভাষ?
জীবনের শোভাময়ী, হাসির প্রকাশ—
ধূমাবৃত চিরতরে। একদা তোমার
প্রচুর-সুবাস মাখি প্রেয়সী আমার—
এই বরষণ দিনে খুলি বাতায়ন
হেরেছিল বরষার মূরতি মোহন।
আজি আমি একা এই নিরজন গেহে
আজও সেই বাপীতটে কণ্টকিত দেহে
ফুটিয়াছ কেতকিরে! কিন্তু কোথা তব
প্রাগ-উন্মাদন-করী সুরভি-বৈভব?
মানবের চিত্ত সনে প্রকৃতির ভাব
পরিবর্ত্ত হয় সদা করি অনুভাব।
যেই প্রাণারাম সুখে সুখের সময়ে
রোমাঞ্চিত হয় তনু, শ্রবণ বিবরে
পান করি হরষিতে; সুখক্ষণ লয়ে
সেই মধুরব ক্রমে বিরক্তি সঞ্চারে।
কেতকি! প্রাবৃট-সখি! বল দয়া করি
কোন্ তপঃ ফলে আমি তব রূপ ধরি,
বিলাব সুবাস, নিজে কণ্টক-বেষ্টিত,—
পরোপকারের সুখে মজিব নিয়ত?

শান্তি।

লেখক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

শান্তি জিনিষটা যে কি তাহা আমরা জানি না বা বুঝি না, অথচ আমরা সারাজীবন শান্তি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। ইন্দ্রিয় বিষয়ই আমাদের শান্তির জিনিষ বলিয়া আমরা গ্রহণ করি, কিন্তু একটীর উপভোগের পর আর তাহাতে সুখও পাই না—অন্য বিষয়ের অভাব বোধ করি—ভুক্ত বিষয়ে আর কোন সুখ পাই না। এইরূপে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আমরা সারাজীবন শান্তির আশায় ঘুরিয়া বেড়াই, কিন্তু শান্তি পাই না, ক্ষণিক সুখ পাই মাত্র—কিছুকাল পরে তাহা আবার দুঃখে পরিণত হয়—যেমন অধিক পরিমাণে সুস্বাদু পলান্নাদি খাইয়া সুখ অনুভব করিলাম, তৎপর দিন হয়তো পেটের অসুখের জন্য পূর্ব্বদিনের সুখ দুঃখে পরিণত হইল!

আমাদের হৃদয়ে শান্তির কিঞ্চিৎ আভাস আছে, কিন্তু তাহা যে কি তাহা আমরা ধরিতে পারি না, অথচ আমরা তাহার আশায় ঘুরিতেছি; কি যেন একটা জিনিষ আমাদের ছিল—তাহা হারাইয়াছি—তাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, ধরিতে পারিতেছি না। সংসারে আসিয়া আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকেই আমরা প্রাণ (life) বলিয়া বুঝিতেছি—দেহকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছি। দেহ সম্পর্কীয় বিষয়গুলি আমাদের আত্মীয় বলিয়া জানি এবং তাহাদের স্বভাব লোপে আমরা নিজ সত্ত্বা লোপ পাইল বলিয়া ভাবি। আজ নিজের কঠিন পীড়া হইল অমনি ভয় হয় শরীর নষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমার সত্ত্বা বা জীবন শেষ হইল। আপনাকে ছাড়িয়া পরকে আত্মীয় করার ফলই এই। আমার দেহের সত্ত্বা ফুরাইলে আমার সত্ত্বা ফুরায় না, তাহা মোহান্ধ জীব আমরা ধারণা করিতে পারি না। বিষয় সম্পর্কে আসিয়া আমরা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়াছি। আমাদেয় স্বরূপ আত্মাও ইন্দ্রিয় বশে নিজ স্বরূপ হারাইয়া মনরূপে সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ বা অনুভব করিতেছে। যিনি সকল সুখের আকর—যাঁহাকে পাইলে আর কোন অভাব থাকে না, তাঁহাকে ধরিতেও পারিতেছি না। তাঁহাকে ধরিতে হইলে ধর্ম্ম পথে থাকিতে হইবে।

প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা আমরা বুঝি না। কতকগুলি বাহিরের আচার ব্যবহারই আমাদের ধর্ম্ম হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা বাহ্য আচার ব্যবহার লইয়া ধর্ম্মের নামে কত পাপ কার্য্যই না করিয়াছে এবং করিতেছে —কত নর হত্যাই না হইয়াছে! এক সময়ে সমস্ত ইউরোপে রোমান কাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট নামক দুই খ্রীষ্টান দল মধ্যে কত অত্যাচার হইয়াছে। আমাদের মধ্যেও ধর্ম্মের বাহ্য বিষয় লইয়া হিন্দু মুসলমানে কত বিসম্বাদ চলিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্ম—যিনি ধারণ করিয়া আছেন। আমাদের এই শরীর কিম্বা আসমুদ্র এই পৃথিবী কিম্বা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যিনি ধারণ করিয়া আছেন তিনিই ধর্ম্ম। তাঁহার অভাবে আমাদের এই শরীর মড়া বা শব—দুইদিনের মধ্যে পচিয়া যাইবে, সমস্ত ভূমণ্ডল সম্বন্ধেও ঐ কথা—তাঁহার অভাবে কিছুই থাকিতে পারে না বা থাকিবে না। বর্ত্তমানে এই ধর্ম্ম আমরা হারাইয়াছি—তাঁহাকে ধরিতে হইবে—তাঁহাকে পাইলেই আমাদের হারাণ জিনিষ আমরা ফিরিয়া পাইব। আমরা সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় যাইয়া শান্তি লাভ করিব। সেখানে চিরানন্দ—সে আনন্দের পর আর দুঃখ নাই—সে এই পার্থিব সুখ নয় যে সুখের পর দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এই ধর্ম্মই আমাদের প্রাণ বা কুটস্থ সূর্য্যরূপী নারায়ণ—এখানে স্থিতি হইলে চিরশান্তি, চিরতৃপ্তি। এখন কিরূপেই বা তাঁহাকে ধরি, কেই বা পথ দেখাইয়া দেয়? এক সদ্‌গুরুই এই পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। আজকাল সকলেই গুরু—কেহ আর শিষ্য হইতে রাজি নহে। গেরুয়া বসন ও কতকগুলি মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া সকলে গুরু স্থানীয় হইতে চাহেন। আমরাও বাহ্যিক আওয়াজে ভুলিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করি—ও শেষে দুই অন্ধ মোহকূপে পড়িয়া জীবন হারাই।

এখন প্রথমে সদ্‌গুরু লাভ করিতে হইবে। পূর্ব্ব সুকৃতি ও তীব্র ইচ্ছা বলে ভাগ্যবানের সদ্‌গুরু আপনিই মেলে। ভগবান আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন; ও দেখা দিবার জন্য লালায়িত, কিন্তু আমরা এমনই মহাপাপী যে, তিনি দেখা দিতে চাহিলেও আমরা দেখিতে রাজী নহি। তাঁহাকে পাইতে হইলে গুরু-পদিষ্ট পথে সাধনা অভ্যাস করিতে হইবে—ও সকল কার্য্য ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। আমরা সকলে ভগবানের কার্য্য করিতে তাঁহার দ্বারা সংসারে প্রেরিত হইয়াছি। তাঁহারই কার্য্য আমরা সকলে করিতেছি—নিজের কোন কার্য্য নাই, সকলই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য—তাঁহার নিয়োগেই কার্য্য করিতেছি মাত্র। লাভা-লাভ ফলাফলের ভাগী আমরা নহি, তিনি। সকলেই যদি এইভাবে এই একই

উদ্দেশ্যে কার্য্য করি, তবেই এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে নতুবা নহে। উচ্চ দুরাশা, পরদ্রব্য লোলুপতা, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয় বশ্যতার দ্বারা এই সংসার এখন চালিত। এই অধর্ম্মই এখন ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। ইহাই সভ্য জাতির আদর্শ। আমরাও তাহাদের দেখাদেখি ঐ পথের পথিক হইয়াছি—শিশ্নোদর-পরায়ণ হইতে চলিয়াছি—শান্তির বদলে অশান্তি বাড়াইতেছি। অতএব ভারতীয় ঋষি প্রদর্শিত ধর্ম্মপথে সকলকে চালিত করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ কর, শান্তি আপনিই তোমার করতলগত হইবে। যতদিন ইন্দ্রিয়ের দাস থাকিবে ততদিন তোমাদের শান্তির আশা সুদূরপরাহত।

শম্+ক্তি=শান্তি—সাম্য ভাব—যখন মন কিছুতেই বিচলিত হইবে না তখনই শান্তির অবস্থা। সুখ হউক আর দুঃখ হউক, মন স্থির—অচল। এই সুখদুঃখের অতীত অবস্থা জীব কখন পাইতে পারে? এই আছে এই নাই—প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল এই জাগতিক কোন পদার্থেই শান্তি নাই, কেবল সেই এক ব্রহ্মই অবিকার্য্য—একই ভাবে চির বিরাজিত। তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতে পারিলে ইন্দ্রিয়গণ কিম্বা ইন্দ্রিয় বিষয় তাহার উপর আধিপত্য করিতে পায়িবে না। ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্তি না থাকাতে ইন্দ্রিয় বিষয় তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। তখন ইন্দ্রিয়গণের আধিপত্য লোপ পাইবে—আর তাহারা তোমার বশীভূত হইবে। ইন্দ্রিয় তোমার আজ্ঞা মত কার্য্য করিবে।তোমার মন ভগবন্মুখী হইলে, তখন ইন্দ্রিয়গণও ভগবন্মুখী হইয়া আমার ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়তা করিবে। তখনই ক্রমশঃ জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীতি হইবে। তখন কে তোমার শত্রু কে তোমার মিত্র? তখন জীবের মোহাবরণ ঘুচিয়া যাইবে, আবরণ স্বরূপ জীবের বাহ্য শরীর ও তদ্‌সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের (জীবত্ব, স্ত্রী পুত্রাদির) অসারতা বোধে তত্তৎ বিষয়ে বৈরাগ্য ও ত্যাগ আপনি আসিবে। তখন শান্তির অবস্থা পাইবে।

"ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।"

গীতা ১২শ অধ্যায় ১২ শ্লোক।

পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দের অতীত অবস্থাই শান্তি। সেখানে কাম (কামনা), ক্রোধ (বাধাতে ক্রোধ), লোভের দুর্দ্দমনীয়া উদ্দীপনা নাই।

মুখে শান্তি শান্তি করিলে শান্তি আসিবে না। বড় বড় সভা বা League করিলে শান্তি আসিবে না। যখন সকলেই একই মহান্ ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া, (ভগবানের কার্য্য করিতে আসিয়াছি, তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইব) একযোগে সেই শান্তি-প্রস্রবণ নারায়ণের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে ও তাঁহার শরণ লইবে, সেই দিন জগতে তাঁহার অনন্ত শান্তিধারা অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইবে— শোকতাপ জর্জ্জরিত জীব করুণাময়ের আশ্রয়ে চিরশান্তিতে বাস করিবে, ভগবানের বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করিবে।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।"

গীতা ১৮শ অধ্যায় ৬২ শ্লোক।

তাঁহাকে ধর, তাঁহাতে থাক, তাঁহারই কার্য্য কর—তোমার সকল দুঃখ সকল অভাব তিনিই দূর করিবেন—শান্তি পাইবে। ভগবানের উক্তি—

"কৌন্তেয় প্রতিজানিহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।"

তাঁহার ভক্তের কোন কষ্ট থাকে না—ভক্তির অর্থ ভালবাসা। তোমাকে চাই, আর কিছু চাই না—এরূপ ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন— তখন তাহার অভাব কিসের? ইচ্ছাই নাই, তখন অভাবের অস্তিত্ব কোথায়? সর্ব্বদাই অভাবশূন্য—তৃপ্তিপূর্ণ। অভাবই অশান্তি আনয়ন করে, অভাব নাই তো অশান্তি কোথায়? অভাব বিনা সকল শান্তিময়।

লৌহ যেমন ইস্পাতের সংসর্গে ইস্পাতত্ব পায়, সেইরূপ সর্ব্বশান্তিময়ের সংসর্গে জীবও শান্তিময় হইয়া যায়।

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।"

গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৫ শ্লোক।

ইহাই শান্তি। ভগবানের এই সংসর্গ লাভের উপায় কি? ভগবান তাহা নিজে বলিয়া দিতেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাষি যজ্জুহোসি দদাতি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম॥

গীতা ৯ম অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

কিন্তু আমরা কি করি, আমরা মনে করি আহার বিহার ইত্যাদি যে কোন কার্য্য করি, তাহা আমিই করি—আহারের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি? কিন্তু মূঢ় জীব বুঝে না, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন এক পদ যাইবার ক্ষমতা তাহার নাই। সকল কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইতেছে, আমরা উপলক্ষ মাত্র।

"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" গীতা দ্বাদশ অধ্যায় তাহাতেই আমরা সুখ

দুঃখ ভোগ করি। যাহাতে তাপ বা দুঃখ দেয় তাহাই পাপ, যাহাতে সুখ দেয় তাহাই পুণ্য। সুখের পর দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই সুখদুঃখের অতীত অবস্থায় যাইতে হইবে—তাহাই শান্তির অবস্থা। যতদিন ইচ্ছা থাকিবে, ততদিন সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যখন নিজের ইচ্ছা থাকিবে না—ভগবানের নিয়োগে ভগবানের কার্য্য করিতেছি মাত্র জ্ঞান হইবে, তখন কর্ম্মের ফলাফল ভগবানের উপর, গুরুর উপর। সুতরাং জীবও সুখ দুঃখের ভাগী হইবে না।

"যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥"

গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৭ম শ্লোক।

আমি খাইতেছি, কার্য্য করিতেছি প্রভৃতি তাঁহার কার্য্যের জন্য। শরীর দ্বারা তাঁহার কার্য্য করিতে হইবে, সুতরাং শরীর রক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন, নিজের উপভোগের জন্য নহে। সর্ব্ব কার্য্যে আসক্তি হীন হইতে হইবে, ইচ্ছা রহিত অবস্থা লাভ করিতে হইবে, নতুবা অভাব দূর হইবে না, শান্তি পাইবে না, তৃপ্তি বা আনন্দ তোমার ভাগ্যে ঘটিবে না।

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥"

গীতা ২য় অধ্যায় ৬৬ শ্লোক।

তবে শান্তি [illegible] সংকল্পর অভ্যাস দ্বারা তাঁহার আশ্রয় লাভ করিতে হইবে। তাঁহার শরণ লইতে হইবে, তখন তিনি আপনিই শান্তি দিবেন। তিনিই শান্তির প্রস্রবণ নারায়ণ।

শাঁখা ও সিন্দুর।

লেখক—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। পশ্চিম গগনে সূর্য্য ডুবু ডুবু। বড় বড় গাছের মাথায় রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছে। কাক চিল প্রভৃতি পক্ষীকুল স্ব স্ব কুলায় উড়িয়া যাইতেছে। রাখাল গরুর পাল লইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছে।

ধীরে ধীরে সান্ধ্য অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। হরনাথের অন্তঃপুরস্থ

উদ্যানে আলোক আঁধারের সমাবেশ হইয়াছে; সেখানে বৃক্ষাবলীর ঘন সমাবেশ সেখানে অধিক অন্ধকার, আর যেখানে সমাবেশ অল্প সেখানে অল্প আঁধার।

হংস হংসীর জলক্রীড়া এখনও ফুরায় নাই, উহাদের ক্রীড়ায় পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জল ছোট ছোট বীচির ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে ছোট হইতে বড়, পরে আরও বড় হইয়া তটে প্রহত হইতেছে আর মিলাইয়া যাইতেছে। যেখানে কমলের দল, ঢেউগুলি সেখানেও আঁকা বাঁকা, আবার যেখানে কুমুদের মেলা, সেখানেও তেমনি আঁকা বাঁকা।

পুষ্করিণীর শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত সুন্দর সোপানে পঞ্চদশ বর্ষীয়া এক সুন্দরী সান্ধ্য সমীরণ সেবনার্থ উপবেশন করিয়া আছে। সুন্দরী অপাঙ্গনয়না অনুপমা। তাহার দক্ষিণ জানুদেশ ঈষৎ উন্নত; উন্নত জানুর উপর স্বর্ণ-আভরণভূষিত সুগোল বাহুলতা,—চম্পককলির ন্যায় অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ নত হইয়া পড়িয়াছে। ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ রাশি আলুলায়িত, মৃদু মন্দ পবন হিল্লোলে ইতস্ততঃ হিল্লোলিত, একবার ঈষৎ উন্নত হৃদয়ে, একবার আরক্ত-কপোলে, একবার বা শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ার চন্দ্রাকৃতি-সুন্দর-ললাটে উড়িয়া পড়িতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে, সুন্দরীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। বিম্বোষ্ঠদ্বয় ঈষৎ বিভিন্ন; দেখিলে চিন্তামগ্না বলিয়া বোধ হয়। এই অনুপমা কে? পাঠক পাঠিকা চিনিয়াছেন কি? আমাদের নায়িকা নলিনী।

যৌবনের উন্মেষে নলিনীর হৃদয়ে ঐ পুষ্করিণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচির মত নব নব আশার লহরী নৃত্য করিতে চলিয়াছে। আবার দেখিতে দেখিতেই স্বকৃত কর্ম্মের কঠিন তটে লাগিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। কখন মনের ভিতর নন্দন কাননের সৃষ্টি হইতেছে, আবার পরক্ষণেই হতাশ ঝঞ্চাবাতে বিচুর্ণ হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে একটি পুতুল পাইলে নলিনী কতই যত্ন করিত, সাধের সে পুতুলটীকে কতই যতনে, কতই সন্তর্পণে এক মনে বেশভূষা পরাইত, পরাইয়া কতই আনন্দ পাইত। সে আনন্দে দ্বেষের লেশ নাই, [illegible] ছায়া নাই, অহঙ্কারের আভাস নাই, সে আনন্দ সরল, সুন্দর নির্ম্মল [illegible] বড়ই স্বাভাবিক। যাহার মন সামান্য পুতুলে পুলকিত হইত, [illegible] প্রফুল্ল হইত, তাহার মন আর সে পুতুলে, সুবাসিত পুষ্পে আনন্দিত হয় না, কোকিলের কুহু রব তাহার আর ভাল লাগে না; উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছা হয় না, ফুল তুলিতে, সাধের মালা গাঁথিতে আর সাধ যায় না। মন যেন কি এক অভিনব দ্রব্য পাইতে লালায়িত, পাইতে পাইতে পাইতেছে না। পায় না বলিয়াই

দুঃখ, নচেৎ দুঃখ কিসের ? সাধের বস্তু, প্রাণের জিনিস না পাইলে মন এইরূপই করে বটে। এ রীতি কেবল তোমার আমার মনের নহে, এ রীতি প্রকৃতির বলিয়াই তোমার আমার সকলেরই গতি সমান।

নলিনীর দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অবস্থান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে। বসন্ত সমাগমের ন্যায় যৌবনের মধুরিমা ধীরে ধীরে আসিয়াছে। যে মধু-মারুত হিল্লোলে বসুন্ধরা নব পরিচ্ছদে আবৃত হন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, ধীরে ধীরে নব শোভা ধারণ করে, নর-নারীর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্ফুরণ হয়, হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী নাচিয়া উঠে, নব নব ভাবের বিকাশ হয়, কালস্রোতে সেই হিল্লোলের মুখে আজ নলিনী পড়িয়াছে, যে হিল্লোলে বেণীর দোলনী, গ্রীবার নাড়নী, দেহের ভঙ্গিমা, কথার রঙ্গিমা, নয়নের চঞ্চলতা জন্মে, সেই হিল্লোলের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

নদীতে বান আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নদী যেমন স্তম্ভিত ভাব ধারণ করে, নলিনীর এক্ষণে সেই ভাব ; পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ের পূর্ব্বে আলোক আঁধারের সমাবেশ হয়, নলিনীর এক্ষণে সেই ভাব ; বসন্ত সমাগমের পূর্ব্বে প্রকৃতির যে ভাব হয়, নলিনীর এক্ষণে সেই ভাব।

পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলে নলিনীর ক্ষীণ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তৎপ্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল, যেন আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ হইল। নলিনী ভাবিল, বিধাতা তাহাকে এ রূপরাশি দিয়াছেন কাহার জন্য ? এ সুন্দর কর-যুগল কি স্বামীর সেবায় আসিবে না ? এ সুন্দর নয়ন-দ্বয় কি স্বামীর চরণ দেখিবার জন্য নহে ? যদি না হয়, যদি স্বামীর সেবায় না আইসে, যদি স্বামীর চরণ দেখিতে না পায়, তবে বিধাতা কেন এ সকল দিয়াছেন। তুলিয়া রাখিবার জন্য কি ? নলিনী মীমাংসা করিতে পারিল না।

সন্তরণ ক্রীড়াসক্ত হংস হংসীর উপর নলিনীর দৃষ্টি পড়িল। নলিনী দেখিল, হংস, হংসীকে অস্ফুট স্বরে প্রিয় সম্ভাষণ করিল, হংসী নিকটে আসিল, হংস চুম্বন করিল ; কত বিরক্ত করিল, হংসী বিরক্ত হইল না, পক্ষবিধুননে, মধুর কূজনে বরং আনন্দ প্রকাশ করিল।

হংস হংসীর ক্রীড়া দর্শনে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি-ভালবাসা নলিনীর হৃদয়ে উদয় হইল, হংসী হংসকে ঘৃণা করিল না, অবহেলা করিল না, উভয়ে উভয়ের প্রতি ভক্তি ভালবাসায় বিভোর হইল, নলিনীর চক্ষু ফুটিল। সে স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া অবমানিত ও বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল, তাহা এক্ষণে তাহার

স্মৃতিপথে ক্ষণে ক্ষণে জাগরিত হইতে লাগিল, অত্যন্ত ক্লেশ অনুভূত হইল। অলক্ষ্যে দুইবিন্দু জল নয়নপ্রান্তে দেখা দিল। আজ নলিনীর সম্মুখে পূর্ব্ব ঘটনাগুলি দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইতে লাগিল। কৈশোরাবস্থা হইতে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা তাহার স্মরণ হইল। অনেক বিষয় যা পূর্ব্বে সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, আজ তাহা স্পষ্ট বুঝিতেপারিল। বিশেষ মোক্ষদার কথা, তাহার বিবাহ সম্বন্ধে হরনাথের সহিত মোক্ষদার বিবাদের কথা, মোক্ষদার পরোচনা, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব, স্বামীর অপমান ও বিতাড়ন, এই সকল এক একটি করিয়া তাহার স্মরণ হইল। অন্তরেবড়ই ব্যথা পাইল। মোক্ষদার প্রতি যেন তাহার ভক্তি-ভালবাসার হ্রাস হইয়া আসিল।

মোক্ষদার প্রতি ভক্তি-ভালবাসার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কমলার প্রতি নলিনীর ভক্তি-ভালবাসা জন্মিল, কমলার কথাগুলি, উপদেশগুলি তাহার স্মরণ হইল। স্বামী ভিন্ন স্ত্রী কখন সুখী হইতে পারে না, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর গতি নাই, সেই উপদেশগুলি তাহার মনে উদয় হইল, কমলার কথা অগ্রাহ্য করিয়া ভাল করে নাই সেই জন্য অনুতাপ আসিল।

নলিনী চক্ষু মুদিল,—অন্তঃচক্ষু ফুটিল, আপনার হৃদয় আপনি দেখিল, দেখিল তাহার হৃদয় আঁধার, আঁধারে স্পষ্ট কিছু দেখিতে পাইল না। তখন কমলার সহিত তাহার তুলনা করিল, যতদূর পারিল করিল। নলিনী দেখিল, কমলা দরিদ্রের পত্নী হইয়াও কত সুখী। কমলা মনে করিলে যাহা করিতে পারে সে তাহা পারে না। কেন এমন হইল ? কমলার পতিভক্তি আছে বলিয়া, কায়মনে পতি সেবায় রত বলিয়া। শুদ্ধ পতি সেবাই বা কেন ? কমলা জল তুলে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, দেবরের ছেলেদের কত যত্ন করে, এত কাজ করিয়াও কমলা কত সুখী, তাহার অন্তরে আর সুখ ধরে না। কিন্তু কিছুই না করিয়া, কুটাটি পর্য্যন্ত না নাড়িয়া উহার অন্তরে সুখ নাই কেন ? নলিনী বুঝিল, স্ত্রীর সুখ স্বামী, সেই স্বামী বিচ্ছেদই তাহার দুঃখ।

সহসা একটা কুকুর বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। নলিনী চমকিত হইল, দেখিল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আস্তে আস্তে উঠিল, ধীরে ধীরে উদ্যান অতিক্রম করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল, কাহারও দিকে তাকাইল না, কাহাকেও কিছু বলিল না, কাহাকেও কোন কথা বলিল না ; ধীরে ধীরে আপন গৃহে প্রবেশ করিল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, কেহ বুঝিল না।

রাত্রে নলিনী কিছুমাত্র আহার করিল না, অসুখের ভাণ করিয়া শয়ন করিল।

শয়নেও সুখ নাই, নিদ্রার আবেশ নাই, কেবলই অশান্তি! অশান্তির মধ্যে পড়িয়া নলিনী আজ ভাগ্যক্রমে শান্তির শীতল ছায়া দেখিল। দেখিল, স্বামী-সুখ ভিন্ন পৃথিবীতে আর সুখ নাই। স্বামীই স্ত্রীজাতির একমাত্র অবলম্বন, দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়। স্বামীই স্ত্রীর সম্পদ, স্ত্রীর ইষ্ট, স্ত্রীর সুখ, স্ত্রীর শান্তি;—দেখিল, ব্রজকিশোর ধর্ম্মাত্মা,—সে পাপিষ্ঠা, সে তাহার যোগ্যা নহে।

পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত—অনুতাপ। অনুতাপে নলিনীর হৃদয় নির্ম্মল হইয়া আসিল, নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি ভালবাসার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল, আবার সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিবিমণ্ডিত ব্রজকিশোরের অনিন্দ্যরূপরাশি দেখিয়া নলিনী মুগ্ধ হইল,—প্রণয়পয়োধি উচ্ছলিত হইল, হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিল, প্রেমাশ্রু বহিল, চক্ষু ভাসিল, গণ্ড ভাসিল, শরীর শিথিল হইয়া আসিল। নিদ্রার আবেশ হইল, ঘুমাইয়া পড়িল।

নলিনী স্বপ্ন দেখিল, রজনী জ্যোৎস্নাময়ী চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত,—পুলকিত। গাছের মাথায় মাথায়, লতার পাতায়পাতায়, চন্দ্র কিরণ পড়িয়াছে। বায়ু-তাড়িত পুষ্করিণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা চিকি মিকি ঝিকি মিকি করিতেছে। জগৎ স্নিগ্ধ, প্রকৃতি হাস্যময়ী। সে হাস্যময়ী রজনীতে নলিনী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে, একাই ভ্রমণ করিতেছে! তাহার হৃদয়ে কত কি সোহাগে, কত কি নব নব ভাবের উন্মেষ হইতেছে, আর শুখাইয়া যাইতেছে, সোহাগের ভাবের পরিপুষ্টি হইতেছে না, যেন একটা কিসের অভাব, সেই অভাবই যেন অশান্তির ভাব আনিয়া দিতেছে।

সহসা নলিনী চমকিয়া উঠিল, অদূরে মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণেই দেখিল, আর কেহ নহে, তাহার হৃদয়ের স্বামী—স্বামী।

স্বামীকে দর্শন মাত্র নলিনীর আঁধার হৃদয়ে ছবি উজলিয়া উঠিল। লজ্জায় নলিনী অধোবদন হইল। ব্রজকিশোর অধোমুখী নলিনীর হাত ধরিল। নলিনীর আত্মবিস্মৃতি ঘটিল, স্বর্গে কি মর্ত্তে কিছুরই স্থিরতা রহিল না।

ক্রমে লজ্জার লাঘব হইল উভয়ের মুখ ফুটিল। কত রস, কত রঙ্গ, কত হাসি, কত খুসী, কত ভাব, কত ভঙ্গিমা, কত সোহাগ, কত আদর, কত আলিঙ্গন, কত চুম্বন চলিল, বিশ্রাম নাই। সেই অবিশ্রাম ধারায়, সুখের—শান্তির ভক্তি-ভালবাসার নদী বহিল। সে নদীর কল কল নাদ নাই, কলকণ্ঠি অপ্সরা কণ্ঠনিঃসৃত স্বর্গীয় সঙ্গীত অপেক্ষাও সুখপ্রদ।

দাম্পত্য-প্রেমোদ্ভূত সুখই সুখ; এ সুখ নির্ম্মল; সরল, স্বাচ্ছন্দ্যময়। এ স্বাচ্ছন্দের

সুখের আবেশে নলিনী শিহরিয়া উঠিল—সুখের নিদ্রা, সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! নলিনী কাঁদিয়া উঠিল, শূন্য হৃদয়ে, শূন্য দৃষ্টিতে, চারিদিক শূন্য দেখিল,—সুখের অশ্রুর পরিবর্ত্তে, দুঃখের অশ্রুভরা চোখে নলিনী উপাধানে মুখ লুকাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে, পাপ কখন ঢাকা থাকে না। মোক্ষদার কাহিনী এ কাণ ও কাণ করিয়া সাত কাণ ঘুরিয়া ক্রমে হরনাথের কাণে উঠিল। এতদিন হরনাথের কাণে তুলিতে কাহারও সাহস বা ইচ্ছা হয় নাই। নানা জল্পনা কল্পনায় তিক্ত হইয়া বাল্যসহচর স্পষ্টবাদী এক বন্ধু হরনাথের কাণে মোক্ষদার কাহিনী তুলিলেন,—জামাতা ব্রজকিশোর যে স্ব-ইচ্ছায় সে রাত্রি বাটি ত্যাগ করে নাই, মোক্ষদা ও নলিনী উভয়ে ব্রজকিশোরকে অপমান, এমন কি সম্মার্জ্জনী তাড়নে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, তাহা হরনাথকে বুঝাইয়া বলিলেন, আর সংসারের মঙ্গল, বিশেষ নলিনীর ভাবী মঙ্গলের জন্য নলিনীকে শ্বশুরালয়ে শীঘ্রই পাঠাইবার পরামর্শ দিলেন।

প্রকৃত বন্ধুর মুখে এ নিদারুণ কথা শুনিয়া হরনাথ মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, প্রশান্ত মূর্ত্তি ম্লান হইল, বদনে বিষাদের ছায়া পড়িল দুশ্চিন্তার সূচিভেদ্য বেদনার অনুভূতি হইল। হরনাথ অস্থির হইলেন, তাঁহার অন্তরে বিষম কোলাহল উপস্থিত হইল। যাহা শুনিলেন তাহা কি সত্য? নলিনী ও মোক্ষদা জামাতাকে অবমানিত করিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, ইহা কি সত্য? হরনাথ বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিলেন না। নলিনী বালিকা, তাহার কথা ধর্ত্তব্যই নহে। আর মোক্ষদা জামাতাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন, পুত্রতুল্য স্নেহের জামাতাকে অবমাননা করিবেন, বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, ইহা কি সত্য? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? হরনাথের হৃদয়ে তাহা স্থান পাইল না, হরনাথের চক্ষে মোক্ষদা এক-প্রকার নির্দ্দোষ হইলেন। তাঁহার ধারণা, কেহ শত্রুতা করিয়া এ দুর্নাম রটাইয়াছে। কে এমন শত্রু আছে যে, মিথ্যা করিয়া এ দুর্নাম রটাইবে? নলিনীর শাশুড়ী কি? নলিনীর শাশুড়ীই শত্রু। তিনি মনে করিয়াছেন, মোক্ষদা ও নলিনীর দুর্নাম রটাইয়া অপদস্থ করিবেন। বৈবাহিক রামদয়াল ইদানীং হিতাহিতজ্ঞান রহিত হইয়াছেন; নচেৎ নলিনীর শাশুড়ীর সাধ্য কি এ কথা রটায়?

সুতরাং বৈবাহিকের কাছে এ কথা উত্থাপনে কোন ফল দর্শিবে না। তবে ব্রজকিশোরকে ডাকাইয়া এ কথার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে দোষ কি? না,—ডাকাইয়া কাজ নাই। কে কবে মাতার দোষ দিয়া থাকে? অতএব ব্রজকিশোরকে অপ্রস্তুত করিয়া তাহার অন্তরে ক্লেশ দিবার আবশ্যক নাই।

মনে মনে নানা উপায় স্থির করিলেও হরনাথ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। একটা জনরব সর্ব্বৈব মিথ্যা হইতে পারে না, মূলে অবশ্য কিছু সত্য নিহিত আছে। নচেৎ এতদিন কোন কথা নাই, আজ এ কথা উঠিবে কেন? এই সকল চিন্তায় হরনাথ মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন! জনরব কখন সত্য কখন বা মিথ্যা বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। এই উভয় সমস্যায় পড়িয়া তিনি কি করিবেন, কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তাঁহার অন্তরে একবার ক্রোধ, একবার ক্ষোভ, একবার বা মোহ আসিতে লাগিল। মোক্ষদা যদি সত্য সত্যই জামাতার অবমাননা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভদ্র সমাজে দাঁড়াইবার স্থান নাই। কিন্তু মোক্ষদা কি এমন কাজ করিতে পারেন? না, তাহা হইতে পারে না, মোক্ষদার ব্যবহার বড়ই সৎ বড়ই স্নেহময়। যাহা হউক হরনাথ সে দিবস কাছারির কার্য্যে মন-সংযোগ করিতে পারিলেন না, বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

ব্রজকিশোরকে বহিষ্কৃত করিবার পর হইতে মোক্ষদা সর্ব্বদাই শঙ্কিতা থাকিতেন। পদ্মর মাকে অর্থের দ্বারা হস্তগত করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কাহাকে বলিবে, কে শুনিবে, কে রটাইবে, এ দুশ্চিন্তা অহর্নিশি তাঁহার অন্তরে জাগরিত হইত, প্রতি পাদ-বিক্ষেপ শব্দে, প্রতি অস্ফুট ধ্বনিতে, তাঁহার ভয় হইত.—ঐ বলিল, ঐ শুনিল, ঐ রটাইল! হরনাথকে কোন দিন বিষণ্ণ বা চিন্তামগ্ন দেখিলে মোক্ষদার প্রাণ শুকাইয়া যাইত; কিন্তু ঘুণাক্ষরে তাহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না, পাছে মনোমালিন্য ঘটে সেই আশঙ্কায় চিত্তকে সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। তিনি যাহাই করুন ব্রজকিশোরকে বহিষ্কৃত করিয়া, নলিনীর সর্ব্বনাশ করিয়া যে পাপরাশি সঞ্চিত করিয়াছেন, সেই পাপের দণ্ড কে খণ্ডাইবে? দিবারাত্র দুশ্চিন্তায় তাঁহার অন্তরের প্রফুল্লতা নষ্ট হইত, কুস্বপ্নে নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। বাহিরে ভালমানুষ সাজিলে কি হইবে? বাহ্যিক প্রফুল্লতা সম্পাদনে লোকের চোক্ষে ধুলি দিলে কি হইবে? আভ্যন্তরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবহৃদয়ে প্রকৃত প্রফুল্লতা জন্মে। আভ্যন্তরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা মোক্ষদা ইচ্ছা সুখে হারাইয়াছেন।

মোক্ষদা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হরনাথের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া চতুরা মোক্ষদা হরনাথের মনের ভাব জানিতে উৎসুক হইলেন, এবং রমণীর রমণীয় অস্ত্র, বিলোল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—

"আজ এত শীগ্‌গির?"

হরনাথ অন্যমনস্ক ছিলেন, সুতরাং মোক্ষদা কোন উত্তর পাইলেন না। স্বামীর ইত্যাকার ভাব মোক্ষদা পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, আজ পতির মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইলেন। নানা কু-ভাবনা আসিয়া অন্তরে বিষম কোলাহল উপস্থিত করিল। চতুরা মোক্ষদা কৌশল অবলম্বন করিলেন, সরবতের বাটী পতির সম্মুখে ধরিলেন, সোহাগের ভাণ করিয়া অতি নম্র, অতি বিনীত, অতি মধুর বচনে বলিলেন,—

"এই নাও, ধর।"

রমণীর মধুর বিনীত স্বর ব্যর্থ হইবার নহে। যেন সপ্তস্বর ভেদ করিয়া মোক্ষদার স্বর হরনাথের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। মোক্ষদার প্রতি ক্রোধ-পরবশ হইয়া হরনাথ যাহা চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা এককালে অন্তর্হিত হইল। মোক্ষদার সহাস্য আননে হরনাথ কুটিলতার লেশ মাত্র দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার চক্ষে মোক্ষদা নির্ম্মল ও সরল বলিয়া প্রতীত হইল।

পুরুষের সাধ্য কি, স্ত্রী জাতির চাতুরী বুঝিতে পারে? পুরুষে চাতুরী বুঝিতে পারে, দুষ্টারা কদাচ বিশ্বাস করে না। তাহারা ভাবে, পুরুষের মাথার উপর যে দুইটী চক্ষু জ্বলিতেছে, দুই পার্শ্বে যে দুইটা কর্ণ ঝুলিতেছে, তাহা কেবল শোভার জন্য।

মোক্ষদার ভয় দূর হইল; এতাবৎ কাল হরনাথকে সেবা যত্ন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এতদিনে সার্থক হইল—বুঝিলেন। চাতুর্য্যময়ী মোক্ষদা মনে বল পাইলেন, মনে মনে হাসিলেন।

সন্দিগ্ধমনা হরনাথ এক্ষণে লজ্জিত হইলেন, ইতঃস্তত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"শুনেছ কি কাণ্ড রটেছে?"

মোক্ষদা সাশ্চর্য্যে বলিলেন,—

"কি? কি রটেছে?"

হরনাথ বলিলেন,—

"শুন্‌তে পাই, তোমরা জামাইকে অপমান করিয়াছ ?"

মোক্ষদা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন,—

"কি ! কি ! জামাইকে অপমান ?"

হরনাথ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছ।"

মোক্ষদার কিছুই বৈলক্ষণ্য হইল না, তিনি বলিলেন,—

"তোমরা—কারা ?"

হরনাথ বলিলেন,—

"তুমি আর নলিনী।"

চকিতে মোক্ষদার বদনে কালিমার ছায়া পড়িল, চকিতে বিলয় পাইল। কণ্ঠ গর্ব্বে মোক্ষদা ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিলেন,—

"কি বল্লে ? জামাইকে অপমান করেছি—ঝাঁটা মেরেছি ! কার কাছে এ কথা শুন্‌লে ? কার ঘাড়ে এত রক্ত, আমাদের একটা কথা বলে। তার সর্ব্বনাশ হোক্ ! এখনই তার নিপাত হোক্ !"

এই বলিতে বলিতে চক্ষে জল দেখা দিল কিনা জানি না, মোক্ষদা কিন্তু চক্ষু অঞ্চলে মুছিলেন, হরনাথকে উদ্দেশ করিয়া পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—

"দেখ, যে যা বল্‌ক, তুমি ওকথা মুখে এনো না। তুমি আমার যত দোষ দিতে পার দাও, তাতে আমার দুঃখ নেই; নলিনীর দোষ দিও না। বাছা আমার ভাল মন্দ কিছুই জানে না, শুন্‌লে এখনই কেঁদে সারা হবে। তোমার কি এক-রত্তিও মায়া দয়া নেই, কি বলে তুমি দুধের মেয়ে নলির দোষ দিলে বল দেখি ? নলি আমার ও তোমার চোখের ওপর রয়েছে, মুখে কখনও একটা উচ্চ-বাচ্চি নেই তাকে, তুমি ছাড়া দুই বল্‌তে শুনেছ কি ? জেনে শুনেও যদি পরের কথা বিশ্বাস কর্‌বে, তবে তোমায় কি বল্‌ব ? তবে কি আমাদের ওপর তোমার কোন সন্দেহ হয়েছে ? বল ? ফের বল ? সত্যি করে বল ? আমার বুক কেমন কচ্চে !"

এই বলিতে বলিতে মোক্ষদার ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল ; আবার চক্ষু মুছিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ব্রজকিশোর কি আমার পর ! নলি আমার পর হতে পারে, ব্রজকিশোর আমার পর নয়। ব্রজকিশোরের জন্যে ইষ্টদেবতার কাছে কত মঙ্গল কামনা করে থাকি, তা তুমি কি জান্‌বে ? জান্‌লে ওকথা মুখে আন্‌তে না। হা আমার অদেষ্ট ! এত সইতে হবে কে জান্‌ত ! আমি ত আগেই বলেছিলুম, আমি

কোন কথায় থাক্‌তে চাইনে ; পরে কোন কথা উঠ্‌লে আমাকেই দোষে ফেল্‌বে। আজ তাই ঘট্‌লো, আমার কথাই ফল্লো ! হা আমার পোড়া কপাল ! এ কষ্টের চেয়ে আমার মরণই ছিল ভাল !"

এই বলিয়া চতুরা অজস্র অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন, বস্ত্রাঞ্চল ভাসিয়া গেল।

প্রথম দর্শনেই মোক্ষদাকে নির্দ্দোষ বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল, এক্ষণে মোক্ষদার নরম গরম বক্তৃতা শুনিয়া, চক্ষে জলধারা দেখিয়া হরনাথ মুগ্ধ হইলেন, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন,—

"কেঁদনা, চুপ কর, তোমাদের উপর আমার সন্দেহ নাই।"

মোক্ষদার বুক দশ হাত হইল, মনে আরও বল পাইলেন। মোক্ষদা বলিতে লাগিলেন,—

"নলিনীর শাশুড়ী নরুণ-মুখী, তারা যে এমন সর্ব্বনাশ কর্‌বে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাদের মুখ দেখাবার ঠাঁই তার রাখ্‌লে না। কি কুক্ষণে নলির বিয়ে হয়েছেল, মান ইজ্জত সব গেল ! আর ভাব্‌ছ কি ? এর কি আর উপায় আছে ?"

হরনাথ অনেক ভাবিলেন, দুর্নাম অপনোদনের এক মাত্র উপায় স্থির করিয়া বলিলেন,—

"উপায় এক আছে, নলিরে শ্বশুর বাড়ী পাঠান ছাড়া আর উপায় দেখি না।"

মোক্ষদা মহা সমস্যায় পড়িলেন। মনে মনে পদুর মাকে অনেক গালি পাড়িলেন। পদুর মা না-বলিলে এ কথা রাষ্ট্র করিল কে ? পদুর মার বড় স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে, সে কেমন, তাহার বাড় কত ভাঙ্গা দেখিবেন, মোক্ষদা ইহা মনে মনে স্থির করিলেন ; কিন্তু এখন হরনাথের কথার কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন। নলিনীকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবেন কি না, এই বিষয়ে তাঁহার মনে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার পর আপন মনে কি স্থির করিয়া মোক্ষদা বলিলেন,—

"যখন দুর্নাম রটেছে, তখন সহজে যাবার নয়। নলি এখানে থাক্‌লে লোকে আরও কত কি মন্দ রটাবে। এখন পাঠানই ভাল।"

অন্তরের কথা কিছুই জানিলেন না, হরনাথ মোক্ষদার আচরণে সন্তুষ্ট হইলেন; মোক্ষদার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ও ভালবাসা বর্দ্ধিত হইল। নলিনীর জন্য কষ্ট হইল, নলিনী শ্বশুর ঘর করিয়া সুখী হইতে পারিবে না বুঝিয়া তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন; বলিলেন,—

"মেয়েটাকে জলেই দিয়েছি, যাউক—সেইখানেই থাকুক !"

"নলি! তোর কপালে এই ছেল হা—আমাদের অদৃষ্ট!"

ইত্যাকার নানা ছাঁদ-ছন্দে মোক্ষদার অশ্রুধারার-জোয়ারে হরনাথ ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। রমণি! তুমি ধন্য! ধন্য তোমার অশ্রুবেগ!

(ক্রমশঃ।)

স্বপ্ন।

লেখক— শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন ভট্টাচার্য্য।

কভু স্বরগের নারী, কি মাধুরী বলিহারী,
নেত্র কোণে হাসি মাখি যুবায় মাতাও।
কভু বা পুরুষ বেশ, উগ্রমূর্ত্তি রুক্ষ কেশ,
নেত্রে বহ্নি, অসি করে, চীৎকারিয়া ধাও।

কভু সিংহাসনোপরে, কত লোক কর-যোড়ে,
শুধু ওই কৃপাভিক্ষা করে চারিধার।
কভু কাঙ্গালিনী-বেশে ভ্রম, দেবি, কত দেশে,
রুগ্ন দেহ, খিন্ন তনু, চক্ষে নীরধার।

যবে নিদ্রা-পথ ধরি ধায় দেহী তব পুরী,
কতরূপে তুমি তারে কুহক দেখাও।
শূন্যে অট্টালিকা গাড়, রত্নাসন মাঝে ধরি
রাজ্ঞীরূপে বসি রামা হাসি মুখে চাও।

কভু শ্মশানের মাঝে, বিকট প্রেতের সাজে,
নরাস্থি-কপাল লয়ে কর গো তাণ্ডব।
ব্রহ্মাণ্ডে দুজ্ঞেয় তুমি, কুহকের লীলাভূমি,
কিছুই তোমার কাছে নহে অসম্ভব।

বসন্ত ও তাহার প্রতিকার

Pox and its remedy.

লেখক—রাজবৈদ্য - কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন কবীন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

অতি প্রাচীন কাল হইতেই মস্যুরিকা নামের সহিত আমরা পরিচিত। মুনিঋ

ষিজ্ঞান বিশারদ চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতির রচিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এই পাপ রোগের উল্লেখ হইয়াছে। বৈদ্যকগ্রন্থ ভাবপ্রকাশে মসূরিকা পীড়ার পর্য্যায়ে "শীতলা" নামক একজাতীয় রোগের বর্ণনা আছে। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে "শীতলা দেবী" এই জাতীয় রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পুরাণকার মাতা শীতলার যেরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞান, যুক্তি ও সুচিকিৎসা প্রভৃতির উৎকৃষ্ট আদর্শ। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও যুক্তিযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ। আয়ুর্ব্বেদে মসূরিকাকেই "বসন্ত" (Small Pox) বলে। পানি বসন্ত (Chicken Pox) ও হাম (Measles) মসূরিকারই অন্তর্গত, কারণ এই সকল রোগেই শরীরে মসূর কলায়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট বিস্ফোটক উদ্গত হয়। "পানিবসন্ত ও হাম" বিশেষ কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক নহে। বসন্ত সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্ট, জঘন্য, ক্লেশকর ও প্রায়ই দুশ্চিকিৎস্য। এই জন্য হিন্দুরা এই বিষম রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে রোগোপশমের জন্য ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা দৈবশক্তি, শুদ্ধাচার ও পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠানের উপর অধিক নির্ভর করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ এই রোগকে "মার অনুগ্রহ" বলে। এই মায়ের নাম "শীতলা"। শীতলা দেবীর সহিত এই পাপ রোগের কি সম্বন্ধ থাকা সম্ভব, তাহাই বলা হইতেছে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মসূরিকা রোগের প্রাদুর্ভাব কালে কালে অধিক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোনও ভূভাগেই ইহার প্রকৃত চিকিৎসা হয় না। সমগ্র মানব সমাজের বিশ্বাস যে, এই রোগের কোনও ঔষধ নাই। আবহমান কাল হইতে এই ভ্রান্ত সংস্কার দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত পরিপোষিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিকই কোনও দেশে ইহার কোন চিকিৎসা-প্রকরণ লক্ষিত হয় না। অদ্যাপি কেহ এই পাপ রোগের জীবাণু-কারণতা নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং ইহা আগন্তু ব্যাধি। ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির মধ্যে পূজা, তপ ও হোমাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা শীতলারোগ-প্রশমনের চেষ্টা করা হয়। শীতলা-রোগ মাতা শীতলাদেবীর অনুগ্রহ; সুতরাং হোমাদির দ্বারাই মায়ের শান্তি সাধন করা যাইতে পারে, ইহাই সার্ব্বজনীন বিশ্বাস। পূজা, হোম ও জপ প্রভৃতি মানসিক অনুষ্ঠান অনাবশ্যক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। রোগোপশমের জন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, মনে শান্তি ও পবিত্রভাব যে অসীম মঙ্গলকর তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। পরিচ্ছন্নতা ও শুদ্ধাচার প্রভৃতির উপকারিতা সকলেই জানেন। বসন্ত রোগের ন্যায় জনপদধ্বংসী এরূপ রোগ আর নাই। এইরূপ কলুষিত

ভীষণ রোগের প্রতিষেধ ও প্রশমন যে জনপদ রক্ষার জন্য কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। চিকিৎসা, শুচি, পরিষ্কৃতি ও পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি এইরূপ ভয়ঙ্কর রোগের প্রতিষেধ ও প্রশমনের প্রধান উপায়। জনসাধারণকে এই সকল শুভক্রিয়ার উপকারিতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করাইবার জন্যই শীতলা দেবী উক্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কল্পিতা হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে পুরাণকার মাতা শীতলার মূর্ত্তির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনী-কলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥"

দেবী গর্দ্দভ পৃষ্ঠে সমারূঢ়া ও দিগম্বরী, তাঁহার হস্তে সম্মার্জ্জনী ও কক্ষে কলস এবং মস্তক শূর্প (কুলা) দ্বারা অলঙ্কৃত। কি জন্য মাতা শীতলার এইরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে? নিশ্চয়ই ইহার কোন গূঢ় রহস্য ও উদ্দেশ্য আছে।

অদ্বিতীয় মনস্বী ও তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী আর্য্যঋষিগণ এইস্থলে বৈজ্ঞানিক উপদেশের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা ধর্ম্মসংশ্রবে জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল করিবার অভিপ্রায়েই শীতলা দেবীর এইরূপ মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণোক্ত স্তোত্র মধ্যে কথিত হইয়াছে:—

"ন মন্ত্রং নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে! ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥"

"হে মাতঃ শীতলে! এই পাপ রোগ হইতে ত্রাণ করিবার তুমি ভিন্ন অন্য কোনও মন্ত্র বা ঔষধ নাই।'

শরীর ধর্ম্ম পালনই যে এই সকল রোগের একমাত্র অবলম্বন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দেবীর যেরূপ বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃষ্টরূপ পর্য্যালোচনা করিলে আর্য্যঋষিদের বিজ্ঞানবত্তার গুরুত্ব যথেষ্ট বোধগম্য হইবে।

(১) "দেবী দিগম্বরী" অর্থাৎ বস্ত্রাদি বেশ বিবর্জ্জিত। এই রোগত্রয় অত্যন্ত সংক্রামক, বস্ত্রাদির দ্বারা এই সংক্রমণ-বিষ বিশেষরূপে স্থানান্তরিত ও জনান্তরিত হয়। সংক্রমণ-বিষের বিস্তৃতির একটী প্রধান কারণ বস্ত্রাদি। দেবীকে "দিগম্বরী" কল্পনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই রোগের প্রাদুর্ভাব কালে "সংক্রমণ-ক্রিয়া অধিক পরিমাণে বস্ত্রাদি দ্বারাই সাধিত হয়" এই বলিয়া যেন জনসাধারণকে সতর্ক করা হয়।

"দেবী গর্দ্দভপৃষ্ঠে সমারূঢ়া" অর্থাৎ তাঁহার বাহন গর্দ্দভ। পশুর মধ্যে

একমাত্র গর্দ্দভই "মসূরিকা" রোগের সংক্রমণ-বিষ নিবারণ করিতে সমর্থ। কারণ গর্দ্দভ ব্যতীত অন্য সকল জন্তুই বসন্তাদি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। গর্দ্দভের দুগ্ধে উক্ত রোগের সংক্রমণ-বিষ নিবারণ করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে বলিয়াই "দেবী গর্দ্দভপৃষ্ঠে সমারূঢ়া" বলা হইয়াছে।

"দেবীর হস্তে সম্মার্জ্জনী ও কক্ষে কলসী" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পরিষ্কৃতি ও পরিচ্ছন্নতা অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোগ প্রতিষেধক পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। রোগীশয্যা, রোগীগৃহ, ভূবায়ু, পানীয় ও আহারীয় প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ যথাবিহিত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ অবস্থায় ব্যবহৃত হইলে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের প্রধান অঙ্গ প্রতিপালিত হয়। রোগী ও সমস্ত জনপদ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে সকলরোগের প্রকোপই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না। সেইজন্যই দেবীর "হস্তে মার্জ্জনী ও কক্ষে কলসী" বলা হইয়াছে। "দেবীর মস্তক সূর্প দ্বারা অলঙ্কৃত" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে—প্রাণধারণের জন্য আহারীয় দ্রব্যের বিশুদ্ধির আবশ্যকতা সর্ব্বশাস্ত্রের অনুমোদিত ও বিজ্ঞানসম্মত। ভারতবর্ষে হিন্দুসংসারে মানবমণ্ডলীর জীবনাধার তণ্ডুল, গম ও যব প্রভৃতি অন্নদ্রব্য সকল বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইয়াই ব্যবহৃত হয়। শূর্প (কুলা) দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হয়। হিন্দুসংসারে অনেক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও শূর্পের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। তজ্জন্যই "দেবীর মস্তক শূর্প দ্বারা অলঙ্কৃত" বলা হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণে মাতা শীতলা দেবীর যে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার (১) নম্বরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কালে জনসাধারণকে সর্ব্বদা পরিষ্কার বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। (২) নম্বরে গাধার দুধকে "বসন্ত রোগের প্রতিষেধক" বলিয়া জানাইতেছে। (৩) নম্বরে রোগের প্রাদুর্ভাব কালে কলসীতে জল লইয়া ঝাটা দ্বারা সমস্ত বাড়ী, ঘর, দুয়ার, রাস্তা ও ঘাট প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলা হইয়াছে। (৪) নম্বরে রোগের প্রাদুর্ভাব কালে আমাদের খাদ্যদ্রব্যাদি তণ্ডুল, গম ও ডাল প্রভৃতি শূর্প (কুলা) দ্বারা ঝাড়িয়া বিশেষরূপ পরিষ্কার করিয়া খাওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আর্য্য ঋষি বর্ণিত ইহাই দেবীমূর্ত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

দেবী শীতলার মূর্ত্তি, ধ্যান ও পূজা প্রভৃতির যেরূপ বর্ণনা স্কন্দপুরাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রকৃত রহস্য অবগত হইতে পারিলে বিজ্ঞান ও সদ্যুক্তি প্রভৃতির সহিত এই পাপ রোগের প্রতিষেধ ও প্রশমন বিষয়ক যে নিগূঢ় উপদেশ পাওয়া যায়, তাহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

বসন্তকালের সহিত বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যেমন ফল, ফুল ও শস্যাদির বীজ ক্ষেত্রে বপন করিলে সকল ঋতুতেই অঙ্কুর উদ্গত হয় না, বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ বীজ অঙ্কুরিত ও ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ জীবের দেহক্ষেত্রেও ঋতু বিশেষে ব্যাধি বিশেষের বিষ-শক্তি সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয়। বসন্ত রোগের বিষের কার্য্যকরী শক্তির উপর ঋতুর প্রভাব যেরূপ বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন রোগেই প্রায় সেরূপ হয় না। শীতাবসানে বসন্ত ঋতুর সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে কখনও বা জনপদধ্বংসী মূর্ত্তিতে, কখনও বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে বসন্তব্যাধি নিজ সাময়িক আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। শারীরধর্ম্ম পালনের বা স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ বিধির বিরোধী কার্য্যই এই রোগের উৎপত্তির ও ব্যাপকতার প্রধান সহায়।

কালভেদে স্বাস্থ্যরক্ষণ বিধিও স্বতন্ত্র। বসন্ত কালের সহিত বসন্ত রোগের বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে মনে হয় যে, বসন্তকালের উপযোগী স্বাস্থ্যসংরক্ষণ বিধি অবলম্বিত হইলে, অনেক সময়ে বসন্তের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত থাকিতে পারা যায়। কালোচিত শারীর ধর্ম্ম পালন করিয়া চলিলে মানবজাতি সর্ব্ব রোগ হইতে বিমুক্ত থাকিতে পারে।

বসন্তকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়াই, বোধ হয়, ইহা বসন্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বপ্রধান, আকস্মিক ও তীব্র বিস্ফোটক জ্বর এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংক্রামক ও জনপদধ্বংসী। দূষিত ভূবায়ু, জল এবং অন্য রোগীর সংস্পর্শ হইতেই এই ভীষণ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহাতে শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসূর কলায়ের ন্যায় দাগ উদ্গত হয় কিম্বা কেবলমাত্র ত্বক্ রক্তবর্ণ ধারণ করে। পরে যথাক্রমে বিবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া শেষে উহা শুষ্ক হইয়া যায়। আরোগ্য হইলেও এই ব্যাধি প্রায়ই পীড়িতের দেহে স্বীয় আবির্ভাবের পরিচয় চিরদিনের জন্য বিকৃত চিহ্নে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া যায়। জনপদধ্বংসী এরূপ ভয়ানক রোগ আর দ্বিতীয় নাই। সময়ে সময়ে ইহা অধিক প্রকোপশালী হইয়া বড় বড় পল্লী ও নগর প্রভৃতি একেবারে ধ্বংস করে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সকল অবস্থায় ও সকল বয়সেই সমভাবে এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু শৈশব ও যৌবনের উপরেই বসন্তের যেন অধিক আধিপত্য। গর্ভিণী ও নবপ্রসূতির উপরও বসন্তরোগের একটু বিশেষ লক্ষ্য আছে। উক্তাবস্থায় গর্ভিণী ও নবপ্রসূতি বসন্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, রোগ প্রায়ই সাঙ্ঘাতিক হয়। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণবল ও অতিরিক্ত মাদকসেবক ব্যক্তি-

গণের এই পীড়া অতিশয় সাঙ্ঘাতিক হয়। ইহা অপেক্ষা কুৎসিৎ, জঘন্য ও প্রদুষ্ট-রোগ জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

"বসন্ত, পান বসন্ত ও হাম" এই তিন প্রকারের মধ্যে বসন্তই সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর ও প্রায়ই দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় সর্ব্ববিধ মহামারীর মধ্যে বসন্তের ভীষণ প্রকোপ বর্ষে বর্ষে কোন না কোন স্থানে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার সংক্রামক-বিষ এক ব্যক্তি হইতে অন্যান্য ব্যক্তিতে অতি সহজে সংক্রামিত হইয়া থাকে। কখনও বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্পর্শ দ্বারা কখনও বা মধ্যস্থ তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা এই রোগের বিষ সংক্রামিত হয়। এই বিষ অতিশয় প্রবল এবং রোগ বিস্তারে প্রায়ই বিফল হয় না। অন্য কোন রোগের বিষ ইহার ন্যায় অত্যধিক দূর পর্য্যন্ত স্বীয় প্রতাপ বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। ইহার বিষের শক্তি বহুদিন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকে। রোগী বা রোগীর মল, মূত্র, শ্বাস, ঘর্ম্ম, রক্ত ও বস্ত্র প্রভৃতির সংস্রবে এই বিষ বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে পারে। রোগীর শয্যা, বস্ত্র ও রোগ-কক্ষস্থ অপরাপর দ্রব্য [illegible] করিয়া এই রোগের বিষ বহুদিন শক্তিশালী থাকিতে পারে। [illegible] দেহ দ্বারা দূষিত বায়ু ও সংক্রামক-শক্তি সম্পন্ন হয়। রোগীর রক্তধারা কিম্বা বিস্ফোটক নিঃসৃত পূঁযাদি দ্বারা অপর লোকের দেহে সহজেই বসন্ত-বিষ সংক্রামিত হইতে পারে। বিস্ফোটকের চূম্‌টী বা মামড়ী দ্বারাও সংক্রামক বিষ অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হয়। অনেকে আবার রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়াও রোগের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত থাকেন। ইহার প্রধান কারণ মনে এই হয় যে, সকল সময়ে সকল ব্যক্তির জীবনীশক্তি রোগ গ্রহণ যোগ্য দূষিত অবস্থায় থাকে না কিম্বা কোন বিষময়ী শক্তি অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া জীবন শক্তিকে বলহীন এবং রোগ গ্রহণ যোগ্য দূষিত অবস্থাপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। বিস্ফোটকের পূঁযোৎপত্তি ও শোষণাবস্থার প্রবল সংক্রামক কাল অপেক্ষা রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তাবস্থায় এই রোগ অধিক সংক্রামক হয়। সাধারণতঃ বসন্তরোগের প্রথম অবস্থার দানা (গোটা) দ্বিদলের ন্যায় দৃঢ় হয়। সেরূপ দানা (গোটা) আর কোন রোগে হয় না। রক্তিম জ্বরের এবং হামের বিস্ফোটকের সহিত প্রথম অবস্থার বসন্ত-বিস্ফোটকের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বিশেষতঃ হামের সহিত ইহার এত সৌসাদৃশ্য দেখা যায় যে, অনেকস্থলে রোগ নির্ণয়ে ভ্রান্তির সম্ভাবনা হয়

(ক্রমশঃ)

প্রহ্লাদ।

(পৌরাণিক)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

এই পৃথিবীতে অবতার গ্রহণের কিছু পূর্ব্বে, শ্রীভগবান তাঁহার কোনও ভক্ত বরকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। প্রতিযুগেই তাঁহার অবতার গ্রহণ ও লীলা প্রকাশ।

হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের নিধনকালে তিনি বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার পর হিরণ্যাক্ষাগ্রজ হিরণ্যকশিপুর উৎপাতে উপদ্রুতা ধরণীর দুঃখভার দূর করিতে, তিনি নৃসিংহ অবতার গ্রহণ করেন। এইরূপ ধারণের পূর্ব্বেই তাঁহার পরমভক্ত প্রহ্লাদকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারই পরমভক্ত, বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় ও বিজয়। "অতি ভাবে হরিসেবায় ত্বরায় মুক্তি হইবে" বলিয়া এই সত্যযুগে তাঁহারা দিতি গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরম ভক্ত প্রহ্লাদের উপাখ্যান অতি বিচিত্র। উহা বিষ্ণুভক্তির উদ্দীপক ও পরম মঙ্গলময়। প্রহ্লাদ পূর্ব্ব জন্মে পরম ধার্ম্মিক শিবশর্ম্মার পুত্র সোমশর্ম্মা নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি শালগ্রাম তীর্থে সতত ঋষিগণ সন্নিকটে থাকিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। তিনি বিষয়-বাসনা পরিহার করতঃ নিরহঙ্কার ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়াছিলেন। ধন-রত্নাদি তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ লোষ্ট্রবৎ ছিল। সেই ধর্ম্মাত্মা জিতাহারী ও জিতনিদ্র হইয়া একান্তে একান্তমনে যোগাসনে আসীন হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন।

কালক্রমে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। কিন্তু আসন্নকালে তিনি দানব দর্শন করিয়া অতি মাত্র ভীত হইলেন। আশ্রমের ঋষিগণ কেহ বলিলেন দৈত্য, কেহ বলিলেন দানব। এই প্রকার "দৈত্য ও দানব" শব্দ তাঁহার শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে বিপ্রবর সোমশর্ম্মার চৈতন্য লুপ্ত হইল, এবং সুমহৎ "দৈত্য ভয়" হৃদয়ে প্রবেশ করিল। অন্তিমকালে যে প্রকার চিন্তায় উপরত হয়, সে পরজন্মে সেই প্রকার দেহ ধারণ করে। শ্রীশ্রীগীতায় উল্লেখ—

"যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

অর্থাৎ লোকে মরণকালে যে যে ভাবকে স্মরণ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করে, সদা তদ্ভাব-ভাবিত হওয়ায় সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়।

দৈত্য ভাবনায় দেহত্যাগ করায় পরজন্মে ঐ ব্রাহ্মণ, হিরণ্যকশিপুর গৃহে পুত্রভাবে জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎপরে দেবাসুর যুদ্ধে ঐ পুত্র (এ জন্মে তাঁহার নাম প্রহ্লাদ হইয়াছিল) নিহত হইলেন। যুধ্যমান প্রহ্লাদ চক্রপাণি বাসুদেবের ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ চিন্তা করিতেছিলেন।

পূর্ব্ব জন্মের যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁহার মনে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল উদিত হইল। "আমি দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্ম্মার পুত্র সোমশর্ম্মা ব্রাহ্মণ। এক্ষণে দানবীতনু গ্রহণ করিয়া দৈত্যকুলে জন্মিয়াছি। হায়! আমার পূর্ব্বকৃত তপস্যা কি জন্য বিফল হইল? আর কি আমি মোক্ষদাতা শ্রীহরির কৃপালাভ করিব?" এই সকল চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষদায়ক হরিপদ স্মরণে প্রহ্লাদ দেহত্যাগ করিলেন।

চক্রধারী হরি কর্ত্তৃক প্রহ্লাদ নিহত হইলে, তাঁহার জননী কমলা, অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া, দিবারাত্রি রোদন করিতে লাগিলেন। কমলা পরমা সাধ্বী সতী ও হরিভক্তি পরায়ণা ছিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে চঞ্চল হইয়া, দেবর্ষি নারদ আসিয়া বলিলেন, "পুণ্যভাগিনি! তুমি পুত্রের নিমিত্ত শোক করিও না। ঐ প্রহ্লাদের ন্যায়ই তোমার পুত্র জন্মিবে। তিনি পরম বৈষ্ণব হইবেন। কিন্তু এই সকল গোপ্য কথা কাহাকেও বলিও না। নিজের মনেই রাখিবে।"

দেবর্ষির সান্ত্বনা বাক্যে কমলা শান্তি পাইলেন। যথাকালে তাঁহার পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। এই পুত্রও পূর্ব্বের ন্যায়ই আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট। এ জন্মেও তাঁহার নাম হইল প্রহ্লাদ বা প্রহ্লাদ।

প্র—প্রকৃষ্টেন (প্রকৃষ্টরূপেণ) হ্লাতি (আহ্লাদয়তি) যঃ সঃ প্রহ্লাদঃ। অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক। যে পরমানন্দদায়ক সে নিজেও আনন্দময় পুরুষ। আত্মানন্দে তাঁহার অন্তর মন নিয়তই ভরপূর। প্রহ্লাদ এ জন্মে পরম ভাগবত হইয়া উঠিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কৃষ্ণ কথায় আনন্দ হইত। বর্ণ পরিচয়ের কালেই ক দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। গুরুমহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন—

ক হেরি কমলাকান্ত কৃষ্ণে পড়ে মনে।
কৃতান্ত-দলন কৃষ্ণ পরমকারণে॥

শণ্ড ও অমর্কের পাঠশালায় তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইলে, গুরুদ্বয় যত্ন সহকারে ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গ এবং রাজ-নীতি সকল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহ্লাদের কিন্তু এসকল শিক্ষায় যত্ন হইল না। তিনি গুরুপুত্রদ্বয়ের অনুপস্থিতকালে সমবয়স্ক বালকগণের সঙ্গে হরি কথায় কালযাপন করিতেন। একদা ঐ প্রকার তত্ত্ব-কথায় ব্যাসক্ত আছেন, এমন সময় শণ্ডামার্ক আসিয়া সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইলেন।

শণ্ডামার্ক প্রহ্লাদকে তত্ত্বকথায় নিমগ্ন দেখিয়া বলিলেন, "বৎস! এ সকল কথা এক্ষণে পরিত্যাগ কর।" প্রহ্লাদ কহিলেন, "ত্রিবর্গসাধন সংসারী লোকের পক্ষে আপাততঃ মধুর বটে, কিন্তু পরিণামে মোক্ষদাতা হরিনামেই চির-শান্তি। অতএব আপনার নিকট আমি আর অসার বিষয় শিক্ষা করিব না।"

যথাকালে এই সকল সংবাদ হিরণ্যকশিপুর শ্রবণগোচর হইলে, দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন যে, পিতৃব্য-ঘাতী সেই হরি, দৈত্যগণের পরমারি। অতএব তাঁহার নাম করিও না। কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই হরিনাম ত্যাগ করিলেন না। তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে প্রহ্লাদকে হস্তীপদতলে, অগ্নি-কুণ্ডে ও পর্ব্বতশিখর হইতে নিক্ষিপ্ত করিলেন। শ্রীহরির কৃপায় প্রহ্লাদ সকল বিপদ হইতেই মুক্তিলাভ করিলেন।

তৎপরে প্রহ্লাদকে বিষান্নভোজন করান হইল, তাহাতেও মৃত্যু হইল না। মুনিগণদ্বারায় কৃত্যানম্নী রাক্ষসী উৎপাদন করাইয়া প্রহ্লাদকে বধ করিতে বলিলেন। কৃত্যার অস্ত্র হরির সুদর্শন চক্রাঘাতে খণ্ডশঃ হইল, এবং কৃত্যাও নিহত হইল। অবশেষে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করা হইল। তাহাতেও প্রহ্লাদ মুক্তিলাভ করিল। তখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল বিপদ হইতে কাহার সাহায্যে উদ্ধার পাইতেছ?" প্রহ্লাদ কহিলেন, "শ্রীহরির কৃপায় ভবভয় দূরে যায়। মৃত্যুভয় ত দূরের কথা। তাঁহার অভয় চক্ষু সর্ব্বতঃ প্রসারিত হইয়া আছে।"

তখন ক্রুদ্ধ দৈত্যপতি কহিলেন, "তোর সে হরি কোথায়?" প্রহ্লাদ কহিলেন, "তিনি সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন।" হিরণ্যকশিপু বলিলেন, "এখানে তোর হরি আছেন?"

প্রহ্লাদ। নিশ্চয় আছেন। নতুবা সর্ব্বব্যাপী নাম যে বৃথা হয়।

হিরণ্য। এই স্ফটিক-স্তম্ভে?

প্রহ্লাদ। স্ফটিক-স্তম্ভেও আছেন। প্রতি অনুপরমাণুতেও আছেন। "তাহ'লে নিকটেই পরমারি মোর" এই বলিয়া স্ফটিক-স্তম্ভে পদাঘাত করিতেই, ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান শ্রীহরি লোক-ভীষণ-মূর্ত্তি নরসিংহ-রূপ ধারণ করিয়া স্ফটিক-স্তম্ভ হইতে বিনির্গত হইলেন। সত্যের জয় হইল!

তখন নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়া প্রহ্লাদকে বরদান করিলেন। প্রহ্লাদও পিতার সকল দোষ ভুলিয়া তাঁহার জন্য শ্রীহরির নিকট স্বর্গ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীহরিও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ফলতঃ প্রহ্লাদের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা এ সংসারে দুর্লভ।

ঈশ্বরে তন্ময়ত্ব হেতু তাঁহার প্রতি যে সকল অভিচারকর্ম্ম প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা নিতান্তই বিফল হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে বিংশোধ্যায়ে প্রহ্লাদের তন্ময়ত্ব প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

"এবং সঞ্চিন্তয়ন্ বিষ্ণুমভেদেনাত্মানো দ্বিজ।
তন্ময়ত্বমবাপাগ্র্যং মেনে চাত্মনমচ্যুতম্॥
বিসস্মার তথাত্মানং নান্যং কিঞ্চিদজানত।
অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ পরমাত্মেত্যচিন্তয়ৎ॥"

হে দ্বিজ! বিষ্ণুকে এইরূপে আপনা হইতে অভিন্ন ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রহ্লাদ আপনাকে অচ্যুত মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে নিজেকেও বিস্মৃত হইয়াছিলেন, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কিছুই জানিতে পারেন নাই। এবং আমিই অব্যয় অনন্ত ও পরমাত্মা এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।

এইরূপ তন্ময়ত্ব ঈশ্বর প্রাপ্তির কারণ। দ্বাপরে গোপকামিনীগণ, রাসক্রীড়া-বসরে যখন শ্রীহরি অন্তর্দ্ধান করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় তাঁহারা একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলেন। কেহ শ্রীহরির গোবর্দ্ধন ধারণের অভিনয় করিতেছেন, কেহ বা গোধন চরাইতেছেন, কেহ সখাগণের প্রণয়কলহ করিতেছেন। তখন "অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল কানাই" এই প্রকার অবস্থা।

এ অবস্থায় "আমি জীব" "আমার দেহ" ইত্যাদি জ্ঞান থাকে না। শ্রীভগবান আসিয়াছেন, ভক্ত দেখিতে পাইতেছেন না, হৃদয়ে, হৃদয়ে দেখিতেছেন। তখন শ্রীহরিকে ভিতরের রূপ লুকাইতে হইল। বাহ্য দৃশ্যে ভক্ত দেখিলেন ইনিই শ্রীহরি! প্রহ্লাদ ভক্তগণের অগ্রগণ্য ধীর স্থির এবং অত্যন্ত পিতৃমাতৃ-ভক্ত; পিতা

যে অত অনিষ্টাচরণ করিলেন; তাহাতে প্রহ্লাদের ক্রোধ নাই। বরং পিতৃদেবের অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত। কিসে পিতার মোহবন্ধন কাটিবে, কিসে তাঁহার উত্তম জ্ঞানলাভ হইবে, তদ্বিষয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত।

ঈশ্বর তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—

বরং বরয় এতৎ তে বরদেশান্মহেশ্বরাৎ।
যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজ ঐশ্বরম ॥
বিদ্বামর্ষাশয়ঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকগুরুং প্রভুম্।
ভ্রাতৃহেতি মৃষাদৃষ্টিস্তদ্ভক্তে র্ময়ি চাদ্যবান্ ॥
তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্দুস্তরাদঘাৎ।
পূতস্তেঽপাঙ্গ সংদৃষ্টস্তদা কৃপণবৎসল ॥

হে বরদ! যদি বর দিবেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার পিতা ক্রোধাবিষ্ট মনে সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকগুরু প্রভু তোমাকে যে নিন্দা করিয়াছেন, ভ্রাতৃঘাতী বলিয়া যে হিংসা করিয়াছেন, তোমার ভক্ত আমাতে যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি কৃপা করিয়া সেই সকল দুরন্ত দুস্তর পাপার্ণব হইতে উদ্ধার করুন। যদিও আপনার অপাঙ্গদৃষ্টিতে তিনি ধূতপাপ হইয়াছেন, তথাপি হে কৃপণ-বৎসল ভগবন্! তাঁহাকে পবিত্র করুন।

শ্রীভগবান কহিলেন—

"ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥

হে নিষ্পাপ! তোমার ন্যায় কুল-পাবন পুত্র যে সাধুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ত্রিসপ্ত পুরুষ পূত হইয়াছে। তোমার পিতা যে পবিত্র হইয়াছেন, তাহা আর বেশী কি? যদিও ব্রহ্মা মরীচি ও কশ্যপ এই তিন পুরুষ তাহার পিতার পিতা, তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পগত পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রীহরি ঐ কথা বলিলেন। পুনরায় বলিলেন—

"কুরু ত্বং প্রেতকৃত্যানি পিতুঃ পূতস্য সর্ব্বশঃ।
মদনঙ্গস্পর্শনেনাঙ্গ লোকান্ যাস্যতি সুপ্রজাঃ ॥
পিত্র্যঞ্চ স্থানমাতিষ্ঠ যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কর্ম্মাণি মৎপরঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ)

শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা :—"মদঙ্গস্পর্শনেন সর্ব্বশঃ পূতস্য তে পিতুঃ পাপ

শঙ্কৈব নাস্তি। কেবলং পুত্রকৃত্যানি প্রেতকার্য্যানি কুরু।" অর্থাৎ আমার অঙ্গস্পর্শদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হইয়াছে—তোমার পিতার নিমিত্ত পাপশঙ্কা করিবে না, তিনি নিষ্পাপ। কেবল পুত্রের কার্য্য কর। পুত্রের কার্য্য পিতার প্রেতকৃত্য করা, শ্রাদ্ধাদি করা ইত্যাদি।

ব্রহ্মবাদিগণ তোমার পিতৃদেবের স্থান যে প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি তথায় গিয়াছেন। এক্ষণে তুমি আমাতে মনোনিবেশ করিয়া আমাকেই পর (শ্রেষ্ঠ) মনে করতঃ মৎপরায়ণ হইয়া কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ কর।

শ্রীহরির আজ্ঞায় প্রহ্লাদ পিতৃ-কৃত্য সমাধা করিলেন এবং নিষ্কাম ভাবে কিছুকাল রাজ্য-শাসন করিয়া, স্বপুত্র পরম ধার্ম্মিক বিরোচনকে রাজ্যভার প্রদান করিলেন। পরে কর্ম্মক্ষয়কর যোগাভ্যাসে মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

প্রহ্লাদ চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণরাজির সমাবেশ দৃষ্ট হয়, অন্যত্র তাহা দুর্লভ। দুরন্ত দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া তিনি দৈত্যকুল কলঙ্ক অপনোদন করিলেন। অতএব কুবংশে জন্মিলেই যে কুলোক হইতে হইবে, এমন কথা নাই। কণ্টক বনেও চন্দন তরু জন্মে। পঙ্কিল তড়াগেও কমলের উৎপত্তি হয়। অধিক কি?

অবেলায়।

লেখিকা—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ।

মনটা আমার আজ্‌কে কেমন
লাগ্‌ছে নাক' মোটেই খেলায়।
ফির্‌তে গেহে বাগান থেকে
চাইছে পরাণ এই অ-বেলায়।
যূথি-বনের ধারে ধারে
ফুল ফুটেছে সারে সারে,
বাতাস হোথা পারে পারে
দোলা লাগায় জীবন-ভেলায়।
যাব চলে আজ্‌কে আমি,

আঁধার হ'য়ে আসে যামি,
নীলাকাশে নেইক আলো,
ভয়ঙ্করের সুবেশ কালো,
কানন-তলে কোন রেখা
ভাল ভাবে যায় না দেখা,
ঘোর আঁধারের নিবিড় লেখা
হারিয়ে মোরে নাম্‌ছে হেলায়।

—•—

সাথী।

লেখক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শোক-তাপ প্রতিঘাতে কাল বহে যায়,
অদৃষ্ট-আকাশ সদা মেঘাবৃত ঘোর,
পলকে কপোল বহি ঝরে আঁখি লোর,
কে মোর হইবে সাথী মরত ধরায় ?
যে মোরে বাসে গো ভাল' সেই যায় চলে,
লইয়ে অতীত স্মৃতি হৃদয় মাঝারে
আমি শুধু আছি পড়ে একেলা আঁধারে,
একি রীতি সংসারের সবে তায় ছলে !

অতৃপ্ত বাসনা লয়ে বেড়াই ঘুরিয়া,
স্তম্ভিত কল্পনা ভয়ে, হৃদে নাহি বল,
যৌবনের সাধ-আশা গেছে গো চলিয়া,
আছে শুধু-সাথী মোর নয়নের জল ;
মিলিতে জীবন সাথী আশা নাহি তার,
কাঁদিয়া জনম যাবে সুধু অভাগার !

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫ শ বর্ষ { ১৩৩৬ সাল, ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের কতিপয় ঘটনা।

লেখক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে উমেশ চন্দ্রের মাতৃভক্তি প্রগাঢ় ছিল। যদিও তিনি প্রকাশ্যে সাহেবিয়ানা দেখাইতেন, তিনি অন্তরে অন্তরে যথার্থ হিন্দু ছিলেন। এই কারণে স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে) Secretary of State Lord Crossদ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ একজন সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাহাতে Mr. N. N. Ghose, প্রমুখ সদস্যগণের অনুরোধে উমেশ চন্দ্র মনোনীত হইবার জন্য প্রার্থী হন, এবং রায়বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রতিদ্বন্দী নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন। নির্ব্বাচন দিনে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'উমেশ চন্দ্র সদস্য হইবার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত' এই প্রস্তাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় উপস্থিত করেন। আর মহারাজা স্যার নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব

বহাদুর K. C. S. I, রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ফলে উমেশ চন্দ্র সর্ব্বোচ্চ সম্মতি সূচক ভোটে সদস্য মনোনীত হন। তদানীন্তন খবরের কাগজে উমেশ চন্দ্রকে দৈত্য (Jiant) ও রাজকুমারকে বামন (Dwarf) রূপে আঁকিয়া জনসাধারণকে উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা বুঝান হইয়াছিল। তিনি Elected member ছিলেন এবং Mr. R. C. Dutta. I. C. S. (রমেশ চন্দ্র দত্ত) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য ছিলেন। রমেশ বাবু বলেন—"উমেশ চন্দ্র প্রত্যেক মন্ত্রণা সভায় দেশের কল্যাণার্থ অনেক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং এক বিষয়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক উপকার সাধন করেন।

ইংরাজী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে অর্থাৎ ১২৯৯ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে উমেশ চন্দ্রের মাতা ঠাকুরাণী সরস্বতী দেবী পুণ্য বারাণসী ধামে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর ৩।৪ দিন পূর্ব্বে তিনি পুত্রের ব্যয়ে তুলাদণ্ডে ওজন হইয়া তৎ-পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করেন। তুলা পুরুষ মহাদান অর্থাৎ (চালত ভাষায়) তুলট একটী মহৎ ক্রিয়া। প্রাচীন কাল হইতে রাজা মহারাজা বড় বড় জমিদার ভুঁইয়া প্রভৃতিগণ এরূপ মহাদান করিয়া আসিতেছেন। উমেশ চন্দ্র তাঁহার মাতার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নাই। তিনি মাতাকে বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে স্বীয় ভদ্রাসনে পণ্ডিত উদ্ধব চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা প্রায় এক বৎসর ধরিয়া মহাভারত পাঠ ও ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীর সোণারপুরাস্থিত তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে এরূপ সময়ে হঠাৎ সরস্বতী দেবীর হৃৎক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া মুখাগ্নি করেন। তিনি সিমুলিয়া ৬৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীটের বাটীতে আদ্যশ্রাদ্ধ করেন। উক্ত আদ্যশ্রাদ্ধ মহাদানসাগর রূপ ধারণ করিয়াছিল, এবং উহাতে প্রায় ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধবাসরে দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উক্ত ক্রিয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন C. I. E। উক্ত কার্য্যে সর্ব্বোচ্চ বিদায় ছিল ৬৪৲ টাকা ও পাথেয়। সর্ব্বসমেত ৮০০ আট শত ব্রাহ্মণ বিদায় হইয়াছিল। এরূপ জাঁকজমকের শ্রাদ্ধ কলিকাতা মহানগরীতে অনেক দিন হয় নাই। সভারোহণ দিনে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানের তদানীন্তন যাবতীয় গণ্য

মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যথা মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, K. C. S. I, রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, কাশীমবাজারের মহারাজার প্রতিনিধি, পুঁটিয়া মহারাজার প্রতিনিধি, দ্বারবঙ্গ মহারাজার প্রতিনিধি, বর্দ্ধমান মহারাজার প্রতিনিধি; মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, K. C. I. E, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহদুর, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, C, S. I, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রমানাথ ঘোষ, ত্রৈলোক্য নাথ ঘোষ, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার চন্দ্র মাধব ঘোষ, উমাকালী মুখোপা-ধ্যায়, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তদানীন্তন যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী, যথা—মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ৫০০০ পাঁচ হাজার ভিখারী বিদায় হয়। ভিখারীদিগের প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ককে ॥০ ও ছোট বালক বালিকাকে ।০ দেওয়া হয়। ৭ দিন ভোজ চলিয়াছিল।

উক্ত মহাদানসাগর শ্রাদ্ধে ভূমিদান, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিতরণ হইয়াছিল। কেবল "দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্" এই শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। একজন ভাট উক্ত শ্রাদ্ধে এক প্রকাণ্ড বগ্‌লা করিয়া জামার মধ্যে সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন লুকাইতে-ছিল। জনৈক পরিবেশক তাহা সত্যধন বাবুর দৃষ্টি গোচর করেন, তাহাতে তিনি বলিলেন "উহাকে অধিক করিয়া সন্দেশ দাও, যতপারে তুলুক, তাহাতে আমাদের ভাণ্ডার ফুরাইবে না—উহার অভাব, সেই জন্য তুলিতেছে—উহাকে অধিক করিয়া দাও।" এরূপ শ্রাদ্ধ ইদানীং দেখা যায় না। উমেশ চন্দ্রের মাতৃভক্তি প্রগাঢ় ছিল বলিয়াই তিনি এরূপ শ্রাদ্ধের খরচ বহন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং যে পিণ্ডদান করিতে পারেন নাই তজ্জন্য তিনি অহর্নিশি অশ্রুপাত করিতেন।

তিনি তাঁহার খুল্লতাতগণের শ্রাদ্ধে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত বটু বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০,০০০ দশ হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া মৃত হন। তিনি সমুদয় দেনা শোধ করিয়া তাঁহার ভদ্রাসন বন্ধক দায় হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার অপর খুল্লতাত ভৈরব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিকট ১০,০০০ টাকা হ্যাণ্ড নোটে কর্জ্জ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত হ্যাণ্ডনোট তিনি স্বহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার মাতুলালয় ৫০০০ হাজার টাকায় বন্ধক দায়ে আবদ্ধ ছিল। মাতৃ-আদেশে তিনি ঋণ শোধ করিয়া বেহাল হইতে মুক্ত করেন। এই সকল দান অতি গোপনীয় ছিল। তাঁহার মত ছিল "Let not thy right hand know, what thy left hand does."

তুমি যে করুণাসিন্ধু।

লেখিকা—শ্রীমতী নগেন্দ্রনন্দিনী দাসী।

হরি! বিপদে ফেলেছ ভালই করেছ,
উদ্ধার করিতে হবে!
নতুবা তোমার "বিপদ্‌-ভঞ্জন"
নামেতে কলঙ্ক রবে!
বৃথা সুখে থাকি না ভজিনু তোমা,
তার প্রতিফল এই,—
ভালবাস ব'লে ফেলেছ বিপদে,
শির পেতে তাহা লই!
বিপদ নহে এ, সম্পদ আমার,
মূর্খ আমি বুঝি নাই,—
প্রভু বারে বারে বিপদ নিস্তারে
তোমা ডাকি আমি তাই!
ভজন-সাধন কিছুই জানি না,
অতি মূঢ়মতি আমি,—
নিজগুণে তার' (অধম পামর)
অধমতারণ তুমি!
যেই কটা দিন সংসারে থাকিব
এই ক'রো তুমি হরি!
আনন্দ অন্তরে তোমায় ডাকিব
সর্ব্বচিন্তা পরিহরি'!
আমার এ সাধ পূর্ণ কর নাথ,
চরণে শরণ লই,—
অধমের প্রতি কৃপা কর নাথ!
কে তারিবে তোমা বই?

দেখা দাও মোরে দয়া করি' হরি!
প্রেমের ভিখারী আমি,—
প্রেম-ভিক্ষা দাও প্রেমকাঙালীরে
প্রেমদাতা যে গো তুমি!
তব প্রেমামৃত পান করি' আমি
সুখে দিন কাটাইব,
সংসারের জ্বালা পশিবে না হৃদে,
সদা আনন্দ পাইব!
করায়েছ যাহা করিয়াছি তাহা,
ভালমন্দ বুঝি নাই,—
করাতেছ যাহা করিতেছি তাহা,
তোমা ছাড়া কিছু নাই!
সুমতি কুমতি যখন যা' দেছ
সেই মত কাজ করি,—
কিবা পুণ্য কাজ, পাপ কার্য্য কিবা,
কেমনে বুঝিব হরি!
তোমার সৃজিত দেহ মন প্রাণ
তুমিই সকলি জ্ঞাত।
যেরূপে আমারে চালাইবে তুমি,
চলিব আমি সেই মত।
তোমারে না দেখে হৃদয় বিদরে,
দেখা দাও দয়া করি';
তোমার চরণে কোটী অপরাধে
অপরাধী আমি হরি!
তুমি দয়াময়, অখিলের পতি,
অনাথ দীনের বন্ধু;
ক্ষমা কর মোরে, নিজগুণে প্রভু!
তুমি যে করুণা-সিন্ধু॥

শাঁখা ও সিন্দূর।

লেখক—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নলিনীকে শ্বশুরালয় পাঠাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। মোক্ষদা নিজ হস্তে নলিনীর বস্ত্রাদি বাছিয়া বাছিয়া গুছাইতে লাগিলেন; এমন কি জীবনে যাহা কখন করেন নাই, মোক্ষদা তাহা করিলেন। বিন্দি দাসীর হাত হইতে নলিনীর ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ কাড়িয়া লইয়া বেণী বন্ধন করিয়া দিলেন, নিজ হস্তে গাত্র মুছাইয়া দিলেন, নিজ হস্তে একে একে গহণার রাশি পরাইয়া দিলেন।

একে স্বভাব-সুন্দরী, তাহার উপর রত্নভূষা নলিনীকে অপূর্ব্ব সুন্দরী করিয়া তুলিল। এ সুষমা যে দেখিল, সেই মোহিত হইল। এক কথায় এ সুষমা বর্ণন করিতে হইলে বলিতে হয়, পাঠক! আপনি যদি কখন নয়নপ্রীতিকরী মনোমোহিনী সুন্দরী রমণী দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের নলিনীকে দেখিয়াছেন, যদি কখন উপকথার পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বা আকাশবিহারিণী মনোরমা অপ্সরার ছবি মনে আঁকিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের নলিনীকে যে একেবারেই আঁকেন নাই, এমন বোধ করিবেন না।

মোক্ষদার আজ বড়ই অমায়িক ভাব। মোক্ষদার কার্য্য যাহারা প্রত্যক্ষ করিল, তাহারা বিস্মিত হইল, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, কেন এমন হইল? কে এমন পরিবর্ত্তন ঘটাইল?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মোক্ষদা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, নলিনীকে শ্বশুরালয় পাঠাইলেও তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধ হইবে; প্রতিবেশিনী মহলে দোষ ঢাকিবে, দুর্নামও ঘুচিবে, নচেৎ মোক্ষদার এত মাথা ব্যথা পড়ে নাই যে শ্বশুরালয় পাঠাইতে নলিনীকে স্বহস্তে বেশ ভূষা পরাইবেন। মোক্ষদার দৃঢ় ধারণা, তিনি ব্রজকিশোরের প্রতি যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার মাতা-পিতার প্রতি যেরূপ অসদাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা নলিনীকে লইয়া সংসার করা দূরে থাকুক, তাহার মুখাবলোকন পর্য্যন্ত করিবেন না, রক্ত-মাংসের শরীরে কদাচ এত অপমান সহ্য হয় না। সহজেই মোক্ষদার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে, তিনি যে

নলিনীকে স্বামী-সঙ্গ করিতে দিবেন না, সে প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হইবে। আবার অন্যদিকে তিনি যে দুর্নামের ভাগী হইয়াছেন, সে দুর্নাম হইতেও নিষ্কৃতি পাইবেন।

সহসা মোক্ষদার মতির পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি ভাবিলেন, শ্বশুর শাশুড়ী যদি নলিনীকে লইয়া ঘর করেন, যদি নলিনীকে আসিতে না দেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইবে। মোক্ষদা অস্থির হইলেন, মনে মনে কি সঙ্কল্প করিলেন, কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মাতার চক্ষে জল দেখিয়া নলিনী ব্যথিত হইল, স্বামী-দর্শন লালসায় মনে মনে যে সুখানুভব করিতেছিল, তাহাতে যেন বাধা পড়িল। মোক্ষদার সদ্ব্যবহারে নলিনী ভাবিয়াছিল, এতদিনে তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। যে মোক্ষদা তাহার শ্বশুর বাড়ীর উপর, স্বামীর উপর খড়্গহস্ত, সেই মোক্ষদার অমায়িকতা দেখিয়া নলিনীর আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু সহসা মোক্ষদার বিমর্ষতা ও অশ্রুবর্ষণ দেখিয়া নলিনী প্রমাদ গণিল, বিমর্ষ হইল, ধীরে বলিল;—

"মা! কাঁদ্‌চ কেন মা!"

প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"দেখ্, নলি! তুই ছাড়া আমাদের আর কেহ নাই! তুইই আমাদের সর্ব্বস্বধন! তোকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়! নলি! তুই সুখী হ! ভগবান তোকে সুখী করুন!"

মার চোখে জল দেখিয়া নলিনীরও চোখে জল আসিল। কিছুই না বুঝিয়া যেমন বালিকা মার চক্ষে জল দেখিয়াই চক্ষের জল ফেলে, নলিনীও তেমনি চক্ষের জল দেখিয়া জল ফেলিল।

নলিনীর চখে জল দেখিয়া মোক্ষদা মনে করিলেন, নলিনীর মতিগতি পূর্ব্বের মতই আছে; তখনই মোক্ষদার মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। পূর্ব্বের মত নলিনীর আর বাচালতা নাই, এখন আর এক কথায় হাজার কথা নাই, দু একটী কথা, বেশী কথা নাই, যেন নলিনী সর্ব্বদাই উন্মনা, কি যেন কি ভাবে বিভোর। তাই স্বার্থসাধন-তৎপরা মোক্ষদা যাইবার আগে নলিনীকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিতে লাগিলেন,—

"না মা! কেঁদনা, তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে, এতে আবার দুঃখ কি? তোমার শাশুড়ীর কথা মনে পড়্‌লে বড় ভয় হয়, পাছে তোমায় গাল দেয়, পাছে তোমায় মারে ধরে, পাছে তোমায় খেতে পর্‌তে না দেয়। তুমি যদি এ ঘরে না জন্মাতে,

তা হ'লে কোন কথা বল্‌তুম্ না, কোন ভাবনাই কর্ত্তুম না। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, তোমার মান ইজ্জৎ আছে। তোমায় একটা কথা বল্লে আমাদের বলা হ'ল। কেন তুমি তাদের পাঁচ কথা শুন্‌বে? কেন তাদের গাল নিন্দে শুনে চুপ করে থাক্‌বে? তুমিও তাদের দু কথা শুনিয়ে দেবে, তখনই চলে আস্‌বে। আমাদের চোদ্দ পুরুষে কাকেও কখন একটা কথা শুন্‌তে হয় নি। আজ তুমি যদি তাদের পাঁচ কথা শুনে চুপ করে থাক, তা হ'লে আমাদের কলঙ্কের সীমা থাক্‌বে না। ভয় কি? কাকে ভয়? কান্না কেন? তোমার অভাব কিসের? কেন তাদের ভয় করে থাক্‌বে? যাদের তিন কুলে কেউ নাই, তারাই শ্বশুর শাশুড়ীকে ভয় করে,—তারাই পাঁচ কথা শোনে। তোমার সবাই আছে, কেন তাদের পাঁচ কথা শুন্‌বে, কেন তাদের ভয় করে থাক্‌বে?

এইরূপ কত কথাই বলিলেন, কত নিন্দাই করিলেন, কত গালি দিলেন। নলিনী নির্ব্বাক—নিশ্চল—নিস্পন্দভাবে সকল কথা শুনিতে লাগিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দুটি নয়ন ঝরিতে লাগিল। মোক্ষদা তাহা দেখিলেন কি না দেখি নাই, বুঝিলেন কি না বুঝি নাই,—কেন অশ্রু ঝরিল, নলিনীও বুঝে না, ঝরিতে হয় ঝরিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নলিনীর শ্বশুরের নাম রামদয়াল। শাশুড়ীর নাম আনন্দময়ী। তাঁহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। রামদয়াল ও আনন্দময়ী উভয়েই সরল; কাহারও কথায় থাকেন না, কাহারও নিন্দা করিতে বা শুনিতে ভাল বাসেন না, নিজেদের নিন্দাও গায়ে মাখেন না,—তবে প্রকৃত নিন্দার কাজে বড়ই লজ্জিত হইতেন।

ব্রজকিশোরের শ্বশুর শাশুড়ীর অহঙ্কারের কথা,—নিন্দার কথা যে রামদয়াল ও আনন্দময়ীর কাণে উঠে নাই তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা তাহা কাণে রাখেন নাই, গায়েও মাখেন নাই। তবে পুত্রবধূকে মোক্ষদা পাঠাইবেন না শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন, একটু রাগেরও উদ্দীপনা হইয়াছিল। ছেলের মা বাপ হইয়া পুত্রবধূকে আনাইয়া ঘর করিতে না পারিলে কাহার না রাগ হইয়া থাকে? বিশেষতঃ তাঁহারা কালের নিয়মে দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছিলেন সংসারের সকল দিক্ দেখিয়া উঠিবার ব্যতিক্রম ঘটিতেছিল। এ সময়ে পুত্রবধূ সত্ত্বেও একমাত্র পুত্রকে সংসারী করিতে না পারিলে, কে নিশ্চিন্ত থাকিতে

পারেন? রামদয়াল মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, হরনাথকে জানাইয়া ইহার একটা নিষ্পত্তি করিবেন, কিন্তু কার্য্যে তাহা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, কারণ তিনি বুঝিলেন যে, হরনাথের অগোচরে এ কার্য্য হয় নাই,—হরনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোক্ষদার সাধ্য কি যে কোন কার্য্য করিতে পারেন? সুতরাং রামদয়াল নিরস্ত হইলেন।

শ্বশুরালয়ে ব্রজকিশোরের অপমানের কথা গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে রাষ্ট্র হইল। রামদয়ালের বাটীতে প্রতিবেশিনীদিগের মহা সমাগম হইতে লাগিল—নীরদা, ধরদা, কামদা, কামিনী, ভামিনী, যামিনী প্রভৃতি প্রতিবেশিনীদিগের বৈঠক হইতে লাগিল। তাহারা আনন্দময়ীর কাছে হাত, মুখ, নাক নাড়িয়া চোখ ঘুরাইয়া মোক্ষদার বিপক্ষে কত কথাই বলিতে লাগিল, নলিনীও নিস্তার পাইল না। কেহ বলিল,—"অমন বৌয়ের মুখ দেখ্‌তে নাই।" কেহ বলিল,—"মেজ্‌দিদ! তোমার ছেলে ভালমানুষ বলেই চুপ করেছেল, আর কেউ হ'লে লাথি মেরে মুখ ভেঙ্গে দিত।" কেহ বলিল,—"বড়্‌দিদি! অমন অলক্ষ্মী বৌকে নিয়ে ঘর না করাই ভাল!" কেহ বা বলিল,—"অমন উনুন্‌মুখো বৌয়ের গায়ে নোয়া পুড়িয়ে ছেঁকা দিলে তবে জব্দ হয়।" এইরূপ যাহার যাহা মনে আসিল, আনন্দময়ীকে তাহাই উপদেশ দিল।

এই সুখের সংসারে উপদেষ্টার অভাব নাই, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, উপদেশ পালকের অত্যন্ত অভাব। রামদয়াল ও আনন্দময়ী উপদেষ্ট্রী প্রতিবেশিনীদিগের কথা অমান্য করিলেন, তাহাদের উপদেশানুযায়িক কার্য্য করিলেন না। যে দিবস মোক্ষদা নলিনীকে পাঠাইবেন না বলিয়া তারিণীর সহিত কলহ করিয়াছিলেন, সেই দিবস রামদয়াল ও আনন্দময়ী বুঝিয়াছিলেন যে, মোক্ষদাই বালিকা পুত্রবধূর সরল স্বভাব বিকৃতির একমাত্র কারণ, মোক্ষদাই সর্ব্ব অনিষ্টের মূল।

দৈবাৎ একদিন নলিনী রামদয়ালের বাটিতে উপস্থিত হইল। নলিনীর মূর্ত্তি এক্ষণে উগ্র নহে,—অনুতাপদগ্ধা। উপস্থিত হইয়াই নলিনী আনন্দময়ীকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করিল। বহুদিবসের পর পুত্রবধূকে পাইয়া আনন্দময়ীর আনন্দের সীমা রহিল না। মোক্ষদার প্রতি তাঁহার যে কিছু বিদ্বেষভাব ছিল, তাহা এককালে তিরোহিত হইল। মোক্ষদার উত্তেজনায় এই পুত্রবধূই যে ব্রজকিশোরের অপমান করিয়াছিল, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মনে মনে বলিলেন, "ঘাট্ ঘাট্! কে আমার এমন বৌমার দোষ দেয়?" নলিনীকে কত

আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এস" বলিয়া আনন্দময়ী কত আদর করিলেন, কত যত্ন করিলেন, হাতে যেন চাঁদ পাইলেন। সেই ক্ষুদ্র পুরীতে আনন্দের রোল উঠিল, আনন্দময়ীর চক্ষে আজ আনন্দাশ্রু বহিল।

মাতার মুখে শ্বশুর শাশুড়ীর বিরুদ্ধে নলিনী অনেক কথা শুনিয়াছিল। তাই শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে শুনিয়া নলিনীর মনে অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল। নলিনী ভাবিয়াছিল শ্বশুর বাড়ী পদার্পণ করিলেই শ্বশুর অপমানিত করিয়া বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন. কিন্তু ফলে বিপরীত ঘটিল। আনন্দময়ীর আচরণ দেখিয়া নলিনী চমৎকৃত হইল। শ্বশ্রূর আচরণে নলিনীর মনে হইল, বিধাতা তাঁহাকে দয়া-মায়ার, স্নেহ-যত্নের, আধার করিয়া গড়িয়াছেন। বস্তুতঃ নলিনীর প্রতি আনন্দময়ীর মনে তিলমাত্র ঘৃণার আবুঞ্চন ভাব নাই। বালিকা-বুদ্ধিতে না জানিয়া, না বুঝিয়া ঘরের বৌ যদি একটা অন্যায় করিয়া ফেলে, তাই বলিয়া কি তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে! আনন্দময়ীর সরল হৃদয়ে তাই ক্রোধের লেশমাত্র দেখা যায় নাই। নলিনীর কপাল ভাল, নচেৎ এমন শ্বাশুড়ী মিলিবে কেন?

নলিনী রামদয়ালের বাটীতে আসিয়াছে শুনিয়া প্রতিবেশিনীরা ছুটিয়া দেখিতে আসিল। তাহারা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল, নলিনীকে দুই এক কথা শুনাইবে, কিন্তু অনুতপ্ত নলিনীকে দেখিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। আবার নলিনীর সৌন্দর্য্যেও অনেক কাজ হইল, তাহাদিগেরও সহানুভূতি প্রকাশ পাইল।

নলিনীতে রতির রূপ দেখিয়া প্রতিবেশিনী যুবতীদিগের মতির বিকৃতি ঘটে নাই এমন কথা বলা যায় না। যাহারা কুরূপ কুৎসিত, তাহারা তিষ্ঠিল না, যাহারা আপনাদিগের রূপের গৌরব করিয়া থাকে, তাহারা নানা দোষ ধরিল। কেহ বলিল,—"নাক সরু," কেহ বলিল,—"চোখ ড্যাব্‌ডেবে," কেহ বা বলিল,—"রংটা কটা।" এইরূপে অতি অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা অতুলনীয়া সুন্দরী নলিনীকে একটা কিম্ভূতকিমাকারে পরিণত করিল। মুখে তাহারা নলিনীর রূপের অনেক দোষ ধরিল বটে, কিন্তু ঈর্ষায় তাহাদের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

নানা লোকের নানা কথা শুনিয়াও শুনিল না, নাক, চোখ ও মুখ নাড়া দেখিয়াও দেখিল না, নলিনী আপন ভাবে বসিয়া রহিল, সেই গর্ব্বিণী আদরিণী নলিনীর আজ কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না, বিনীতভাবে বসিয়া রহিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রজকিশোরের অন্তরে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল, নলিনীর প্রতি রোষাগ্নির উদ্দীপন হইয়াছিল, কিন্তু সে রোষাগ্নি কেহ দেখিতে পায় নাই, কেহ জানিতেও পারে নাই। ক্রমে যখন তাহার অপমানের কথা রাষ্ট্র হইল, তখন ব্রজকিশোরের লজ্জার পরিসীমা রহিল না, লজ্জায় কাহারও সমীপে মুখ দেখাইতে পারিল না, লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন রোষাগ্নি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সময়ে সময়ে তাহার এমনও মনে হইত যে, নলিনীকে কিছু না বলিয়া ভাল করে নাই। নলিনী যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, ব্রজকিশোর যদি প্রতিশোধ লইত, তাহা হইলে তাহাকে এত কুণ্ঠিত হইতে হইত না, লোক সমাজে এত লাঞ্ছিত হইতে হইত না।

নলিনী যদি সেই সময়ে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে অল্পেই সকল গণ্ডগোলের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা থাকিত, মোক্ষদার দোষও অল্পে ঢাকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইল না, নলিনীর অদৃষ্টদোষে তাহা ঘটিল না, দুষ্টবুদ্ধি মোক্ষদার মতির পরিবর্ত্তন ঘটিল না, তিনি তখন নলিনীকে পাঠাইলেন না, পরিচারিকা লইতে আসিল, তথাপি পাঠাইলেন না—প্রথম প্রথম মোক্ষদা মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া শেষে বিবাদ বাধাইলেন। গণ্ডগোলের মূল ব্রজকিশোরের হৃদয়ে আরও দৃঢ় হইয়া বসিল, নলিনীর প্রতি কেমন একটা বিসদৃশ ভাবের পরিপুষ্টি হইতে লাগিল।

নলিনী শ্বশুরবাড়ী আসিল, প্রাণে যে একটা ভয় ছিল, শ্বশুর শাশুড়ীর আচরণে তাহা দূর হইল বটে, কিন্তু তাহার প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

পিতামাতার অনেক আদর যত্ন পাইয়াছে, শ্বশুর শাশুড়ীরও আদর-যত্নের অভাব নাই, তথাপি নলিনীর মনে সুখ নাই, প্রাণে তৃপ্তি নাই, নলিনী সর্ব্বদাই বিমর্ষ; মন যাহা চায়, সেই আকাঙ্ক্ষার বস্তু, আরাধ্য ধন কাছে পাইয়াও পাইতেছে না, তৃপ্তি-সুখানুভূতির অভাবে নলিনী বিষণ্ণ।

স্ত্রীর একমাত্র সহায়, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সোহাগে-বিরাগে সকল অবস্থাতেই পত্নীর সমবেদনা যিনি অনুভব করিয়া থাকেন সেই পতির মত পতি পাইয়াও নলিনী তাহা হইতে বঞ্চিত। সুতরাং নলিনীর মত অভাগিনী আর দ্বিতীয় নাই। রমণীর রূপ-গুণ পতির সুখের জন্য। যে নারী রূপবতী ও গুণ-

বতী হইয়াও পতিকে সুখী করিতে না পারে, তাহার মত অভাগিনী কে ? তাহার রূপ-গুণ থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য নয় কি ? যে নারী রূপ ও গুণের অধিকারিণী, স্বামী-সুখে সুখিনী, তাহার অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী আর কে আছে ? আমাদের নলিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও গুণবতী হইয়াও স্বামি-সুখে বঞ্চিতা। নলিনী অপেক্ষা অভাগিনী আর কে আছে ?

ব্রজকিশোরও সুখী নহে। সুখী হইলে সে বিষণ্ণ কেন ? সদা অন্যমনস্ক কেন ? কে তাহার সুখের অন্তরায় ? নলিনীই তাহার সকল সুখের অন্তরায়, তাহারই জন্য ব্রজকিশোর বিষণ্ণ।

ব্রজকিশোর নলিনীকে যতই ঘৃণা করুন না কেন; যতই তাচ্ছিল্য করুন না কেন, স্বভাবতঃ স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে সৌহৃদ্য ঘটে; তাহা তাহাদের প্রকৃতিগত। মূহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহাদিগের শুভ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, স্বামী-স্ত্রীতে একবার চারি চক্ষের মিলন হইয়া গিয়াছে, তখন হইতেই পরস্পধ পরস্পরের সুখ-দুঃখের অনুভূতি করিতে থাকে,—স্বামী, স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রী, স্বামীর জন্য সমবেদনা অনুভব করে। ব্রজকিশোরের ঘৃণায় ও অবহেলায় নলিনী যত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, ব্রজকিশোর যে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে তাহা নহে; ব্রজকিশোরও ততোধিক যন্ত্রণা পাইতেছে। আবার যখন সে নিদারুণ কথা, গুরুজনের প্রতি দুর্ব্বাক্যের কথা স্মরণ হইত, তখন সহানুভূতির পরিবর্ত্তে নলিনীর প্রতি তাহার বিশিষ্ট ক্রোধের উদ্দীপনা হইত। মায়াবিনী রাক্ষসী ভিন্ন অন্য কিছু মনে স্থান পাইত না। ব্রজকিশোরের মনে হইত মায়াবিনীর কপট দুঃখ দেখিয়া যদি সে মুগ্ধ হয়, তবে তাহার পুরুষত্ব কোথায় ?

ব্রজকিশোরের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে নলিনী কতবার কত চেষ্টা করিল, কত সুযোগ খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু তাহার চেষ্টার সিদ্ধি হইল না। ইচ্ছা—কাকুতি মিনতি করিয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া অপরাধ স্বীকার করিবে, কিন্তু অভাগিনীর ভাগ্যে তাহা ঘটিল না, সুতরাং নলিনীর যন্ত্রণার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক বরং বৃদ্ধি হইতে চলিল। নলিনী অনেক চেষ্টা করিয়াও অনেক সময়ে হৃদয়ের ক্লেশ গোপন রাখিতে পারিত না, সময়ে সময়ে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। আনন্দময়ীর নিকট তাহা গোপন থাকে নাই। পুত্রবধূর বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দময়ীর কষ্ট হইত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পুত্রবধূ বয়স্থা হইয়াছে, এক্ষণে স্বতন্ত্রবাসে বয়স্থা পুত্রবধূর ক্লেশ হইতেছে, ইহা জানিয়াও আনন্দময়ী বধূর অভিলাষ পূরণ করিতে পারেন নাই। ব্রজকিশোর পরীক্ষার জন্য

প্রস্তুত হইতেছে, এ সময়ে তাহাকে বিরক্ত করা রামদয়ালের অভিমত নহে, তথাপি সরল-হৃদয়া আনন্দময়ী সময়ে সময়ে ব্রজকিশোরের কর্ণে সে কথা উত্থাপিত করিতেন। কোন কথায় উত্তর পাইতেন না, ব্রজকিশোরের বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইত। আবার সময়ে সময়ে আনন্দময়ীর এরূপ ইচ্ছা হইত যে, পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সাহস করিতে পারেন নাই। ভয়, পাছে মোক্ষদা কিছু মনে করেন, পাছে নিন্দা হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলেন।

বস্তুতঃই কি পরীক্ষার জন্য ব্রজকিশোর নলিনীর সঙ্গসুখ বিসর্জ্জন করিয়াছিল ? তাহা নহে, ব্রজকিশোরের রোষাগ্নিই ইহার প্রকৃত কারণ। রামদয়াল ও আনন্দময়ী তাহা বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিলে কদাচ এরূপ ঘটিত না, নলিনীকে স্বামী-বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না, যে কোন প্রকারেই হউক ব্রজকিশোরের মনোমালিন্য দূর করিয়া তবে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন।

সরল-হৃদয় রামদয়াল ও সরল-হৃদয়া আনন্দময়ী ব্রজকিশোরের অন্তরের ভাব কিরূপে জানিবেন ? সুতরাং তাঁহারা ব্রজকিশোরের অনভিমতে কিছু করেন নাই। তাঁহাদিগের স্মরণই ছিল না, পূর্ব্বে যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া পুত্র ব্রজকিশোর পুত্রবধূর মুখাবলোকন করে না, পরীক্ষাই ইহার প্রকৃত কারণ বুঝিয়া তাঁহারা একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারা বিপরীত বুঝিলেন, ব্রজকিশোর ও নলিনী অদৃষ্ট পথের অদৃষ্ট ফল ভোগ করিতে লাগিল।

শান্তি।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

শান্তি লভিবার তরে, ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে,
কেহ না চাহিল ফিরে, কিসে শান্তি পাই বল।
স্বজন বান্ধব কেহ, সন্ধান বলিয়া দেহ,
খুঁজিয়া দেখি তা হ'লে কানন পর্ব্বত জল।
সংসার মায়ার জালে, ঘিরিয়াছে সর্ব্বকালে,
জানি না কি হবে কালে, ভাবিয়া কি হবে ফল ?

শ্রীশ্রীচণ্ডী-মঙ্গল বা কালকেতু।

(নাটক)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—স্বর্গধাম। ইন্দ্রাদি দেবগণ
চণ্ডী-পূজা করিতেছেন। মহামায়া বেদীর উপরে আসীনা।
সম্মুখে পূজোপকরণ সজ্জিত।

বৃহস্পতি। (আরতি করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে করযোড়ে স্তব করিতেছেন।)

"শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে!
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি! নারায়ণি! নমোঽস্তুতে।"
দুর্গে দুঃখহরা শিবে,
দয়াময়ী তুমি ভবে,
গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানী।
গীর্ব্বাণী গতিদা গৌরী
গণেশজননী সুরী
মহিষমর্দ্দিনী মাতা মহেশমোহিনী।
বাগীশ্বরী বিদ্যাদেবী
বেদমাতা মহারাবী
কালস্বরূপিণী কালী কমলবাসিনী।
ত্রিনয়না গুণময়ী
ত্রিতাপনাশিনী ত্রয়ী
কাতর-কিঙ্করে রাখ কপর্দ্দীকামিনি! (প্রণাম)

ব্রহ্মা। (করযোড়ে)

প্রলয়ে সাগরজলে সর্ব্ব পরিপ্লুত হ'লে
জগৎ-কারণ হরি ভাসিলেন তায়।
অনন্ত-শয়নে স্থিত যোগে মগ্ন নিদ্রাহত
মহামায়ে! তুমি তাঁর নয়ন পাতায়।
বিষ্ণু কর্ণ মল হতে উদ্ভূত সুরারি মাতে
বেগে ধায় মারিবারে মধু ও কৈটভ।
করিনু তোমার স্তব উঠিল মাভৈঃ রব
দৈত্যদ্বয় চমকিত শুনি সেই রব।
যোগমায়া যোগেশ্বরী
বিষ্ণু প্রবোধন করি
নাশিলা সে দৈত্যদ্বয় ঘুচাইয়া ভীতি
এইরূপে যুগে যুগে, নাশিলা দানবে—রেগে'
মঙ্গলে! মঙ্গল কর করি এ মিনতি। (প্রণাম)

বাসব। (করযোড়ে)

সর্ব্বমঙ্গলের হেতু সর্ব্বাণী শঙ্করী।
সেবকে করুণা কর উমা শুভঙ্করী॥
জয়তি বিজয়া চণ্ডী চামুণ্ডা রূপিণী।
চণ্ডবতী চিন্ময়ী জগৎ-পালিনী॥
সর্ব্বকাল দৈত্যভয়ে ভীত দেবগণে।
রাখ মা চণ্ডিকে শিবে! কৃপাবলোকনে॥
সঙ্কল্প সাধন কর কাতর বাসবে।
শত নীলোপলাঞ্জলী শ্রীচরণে দিবে॥ (প্রণাম)

চণ্ডী। তুষ্ট হইয়াছি স্তবে ওহে দেবগণ!
মনোরথ পূর্ণিব সবার।
কহ দেবগুরো!
কিবা অভিলাষ তব?

বৃহস্পতি। অভিলাষ মাগো! তব চরণকমল—
অনুখণ মনভৃঙ্গ যেন করে পান
তব পদপদ্মমধু।

চণ্ডী। তথাস্তু ধীমান্!

সর্ব্বশাস্ত্রে অসামান্য হও রে বিদ্বান্।
কিবা বর চাহ ব্রহ্মা? বিরিঞ্চি বিধাতা!
বিবরিয়া কহ মোরে!

ব্রহ্মা। তোমারি মহিমা
চারি মুখে অবিরল যেন করি গান
এ মোর প্রার্থনা দেবি!

চণ্ডী। করিনু প্রদান, চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদ
হৌক প্রকাশিত।
কহ ইন্দ্র! অভিলাষ কি আছে তোমার।

বাসব। কি আর রেখেছ মাগো চাহিতে আমার?
না চাহিতে আমি
প্রার্থনার বেশী মোরে বরেছ প্রদান।
আশা মোর মনে (কহিব কেমনে)
পুত্র নীলাম্বরে
যশঃ কুসুমের হারে
ধরণীতে প্রতিষ্ঠিত কর কৃপাময়ি!

চণ্ডী। তথাস্তু বাসব!
অচিরে হেরিবে তব পুত্রের মহিমা। (অন্তর্দ্ধান)

দেববালাগণের প্রবেশ পূর্ব্বক নৃত্য ও গীত।

দেববালাগণ। গীত।

জয়তি জয়দুর্গে! শিবে!
শঙ্করের প্রাণধন!
প্রণত জনে চরণ প্রদানে কর মা বিঘ্ন-বিনাশন।
মঞ্জীর তব নখর ভায়
গুঞ্জরে ঘন মধুর গায়
চৌদিকে কিবা পবন বায় স্নিগ্ধ করিয়া ভুবন।
তুমি মা অভয় দায়িনী।
শঙ্করী সনাতনী সর্ব্বেশ-ঘরণী
শান্তিময়ী তুমি শিব-মোহিনী।

ত্রিশূল ঘুরায়ে কমল করে
বিরাজ অভয়ে! গিরীশ শিবে
তোমারি চরণ স্মরণ করে
বাঁচে দেবাসুর নরগণ। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—ইন্দ্রের সভা।

দেবগণ আসীন। নারদ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

ইন্দ্র। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) আসুন, আসুন,
দেবর্ষে! (প্রণিপাত।)
বহুদিন হেরি নাই ও পদপঙ্কজ
কুশলে আছেন তাত? অথবা এ প্রশ্নের
কিবা প্রয়োজন? হরি-পাদপদ্ম-ভৃঙ্গ-জনের
কুশলাকুশল কিবা? পবিত্র হইনু দেব!
তব দরশনে। বসুন আসনে, পবিত্রিয়া বৈজয়ন্তধাম।

নারদ। জয়োঽস্তু দেবেন্দ্র! এতদিন ছিলাম যথায়
শুন তার কথা।
নিবাত-কবচ বংশে জন্ত নামাসুর
করিল মহৎ যজ্ঞ। জিনিবারে ত্রিদশনিলয়
ভক্তিভাবময় হ'য়ে, পূজিল ঈশান শিবে।
মহেশ-পূজন-ফলে বিক্রম বিশাল
আকাশ পাতাল কাঁপিতেছে
হুঙ্কারে তাহার।

ইন্দ্র। দেব! শিব সারাৎসার
হৃষ্ট হৈলা তাঁর প্রতি যদি,
নিরবধি আক্রমণ করিবে আমায়,
ধরি পায়, অনুপায়ে বল সদুপায়। (পদধারণ।)

নারদ। শুন পুরন্দর! ভবেশ শঙ্কর
তুষ্ট যার প্রতি, ভবে কি অভাব তার?
ভেবে দেখ মৃকণ্ড তনয়,

অল্প-আয়ুঃ হ'য়ে, মরিল কৈশোর কালে,
কিন্তু শিব পূজা ফলে
মৃত্যু তাঁরে করিলা অমর।
তাই বলি, পূজহ শঙ্কর নিরবধি
ভবব্যাধি ঘুচিবে তোমার।
নিশায় জাগ্রত রবে শিব নাম জপি
দিবা দশ দণ্ড হতে পূজা সমাপন
করিবে নিয়ম মত। রবে অতন্দ্রিত
অনলস, হবে বশীভূত চরাচর
আশুতোষ শিবের কৃপায়।

ইন্দ্র। কি নিয়মে করিব পূজন
কহ তপোধন!
কিসে হবে জম্ভের বিনাশ মহাবলী?

নারদ। শত পুষ্প তুলি শুদ্ধমতি!
দিবা দশদণ্ড হ'তে পূজি পশুপতি
হোম যজ্ঞ করিবে সাধন।
শত বিল্বপত্র সাজ্য, শিখী-শিখামাঝে
দিবে শিব মন্ত্র জপি,
থাকি উপবাসী সপুত্র বনিতা
পালিবে শঙ্কর-ব্রত একচিত্ত হ'য়ে।
শুন ইন্দ্র! যোগীন্দ্র ত্রিশূলী আর চক্রী
বনমালী, দোঁহে প্রক, এক দোঁহা।
ভিন্ন ভাবে করিলে ভাবনা
মিলিবে না হরি দরশন।
হ'য়ে একমন কর শঙ্কর পূজন
অচিরাৎ জম্ভাসুর হইবে দমন। (প্রস্থান)

নীলাম্বরের প্রবেশ।

নীলাম্বর। (প্রণিপাত পুরঃসর) কি কারণে করিলা স্মরণ?
পিতৃদেব!

ইন্দ্র। বৎস! দেবর্ষি নারদ আজি জানাইলা মোরে

দৈত্যপুরে জম্ভাসুর হ'য়েছে উদয়।
নাহি করে ভয় ত্রিভুবনে।
আসিবে ত্বরায় সৈন্যসনে
আক্রমিতে বৈজয়ন্তধাম।
পূর্ণকাম শিবের কৃপায়।

নীলাম্বর। কিবা তায় শঙ্কা পিতঃ! সুরসৈন্য যত,
পার্ব্বতীনন্দন বীর কার্ত্তিকের আদি
যুঝিবে দৈত্যের দলে মহাভুজবলে,
দেবকুলে আমি মাত্র অধম দুর্ব্বল।
না শিখিনু অস্ত্র বিদ্যা জয়ন্ত সমান
কিবা মান দেবের সমাজে?
দেবরাজপুত্র বলি সম্ভাষে সকলে
নতুবা আমায়, ঘৃণাভরে না কহিত কথা
দেবতায়।

ইন্দ্র। কিবা ক্ষোভ বৎস নীলাম্বর!
করিব তৎপর তোমা জয়ন্ত-সমান,
কিংবা ততোধিক বীর হইবে ক্রমেতে।
শুন মন দিয়া বৎস!
নন্দন উদ্যানে গিয়া অতি উষাকালে
আনিবে শতেক পুষ্প স্নানি গঙ্গানীরে।
নিত্য এ প্রকারে দ্বাদশ দিবস রাত্রি
শিবের পূজন, হোম, সংকীর্ত্তন, যথাবিধি,
করিব নিয়ম করি। যদি ত্রিপুরারি
কৃপা করি বরদান করেন আমায়,
হইব জগৎ-জয়ী শিবের কৃপায়।

নীলাম্বর। শিরোধার্য্য আদেশ পিতার।

ইন্দ্র। আরো শুন, বৎস!
চারিদণ্ডে পূজিব মহেশে শতফুলে।
শত বিল্বপত্র চক্রহীন আনিবে পৃথক্ করি,
ত্রিপুরারি বিল্বপত্রে হরষ-অন্তর।

ধুতুরা মল্লিকা জাতী যূথি কোবিদার
করবীর শ্বেতপদ্ম রঙ্গণ নীহার
আনিবে প্রয়াস করি। যাও নীলাম্বর,
দেবগুরু বৃহস্পতি আনহ হেথায়।

(নীলাম্বরের প্রস্থান।)

(জয়ন্তের প্রবেশ।)

জয়ন্ত। কি হেতু স্মরিছ পিতঃ ? (প্রণাম)

ইন্দ্র। শুন যশোধন !
মানস করেছি ব্রত শিবের অর্চ্চন।
দ্বাদশ দিবস রাত্রি শঙ্কর সেবনে
সংকল্প করিব আজি। তুমি লহ ভার
গুরুদেব পরিচর্য্যা, দেবের সৎকার
আয়োজন পূজিবার দ্রব্য সমুদায়।

জয়ন্ত। যথা আজ্ঞা।

(বৃহস্পতির প্রবেশ)

বৃহস্পতি। জয়োঽস্তু বাসব ! বুঝিলাম সঙ্কল্প তোমার
ত্রিপুরারি পূজা কর, হইবে মঙ্গল।

ইন্দ্র। (প্রণিপাত পুরঃসর) গুরুদেব ! আপনার শুভদ বচন
করুক মঙ্গল সদা দেবের ভবন।
করিয়াছি সংকল্প যাহার
প্রসাদে তোমার কার্য্যসিদ্ধ হইবে নিশ্চয়।
দেখুন সুকাল কিংবা অকাল এখন।

বৃহস্পতি। পুরন্দর ! শুভকার্য্যে নাহি কালাকাল।
বিশেষতঃ মহাদেবে পূজিবে যখন
কালবিলম্বন উচিত নহেক আর ;
আজি গুরুবার, শুভকর্ম্মে ব্রতী হও ত্বরা।

ইন্দ্র। যথা আজ্ঞা তব।
জয়ন্তে পূজার দ্রব্য করিতে সংগ্রহ
করিছি আদেশ। নীলাম্বরে পুষ্প হেতু
নিদেশ করেছি তাত। আর কিবা হবে

অনুমতি, দেব-পতি বলুন দাসেরে।

বৃহস্পতি ! চল পুরন্দর, মন্দির ভিতর এবে,
সকল কর্ম্মের চক্র নিভৃতে উচিত। (সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য—নন্দন-কানন।

দেববালাগণের প্রবেশ।

নৃত্যগীত।

দেববালাগণ। মন্দমলয়ে; নন্দনালয়ে, মন্দার কুসুম ফুটেছে কিবা।
গুঞ্জরে অলি, ফুলে ফুলে বুলি, মঞ্জরী দলি মধুর লোভা॥
কুরুবক, বকুল, কুন্দ করবীর
তুলসী, অতসী, লবঙ্গ, কুড়চির
কণার কৈরব, সুরভির বৈভব, হাসিছে গরবে বাঁধুলি জবা।
হের সখি কুঞ্জে সেফালিকা পুঞ্জে
সূর্য্যমুখী রাজে রবি মন রঞ্জে
কুমুদ-কোবিদার মল্লিকা শোভাসার
আলোকিত করিয়াছে যামিনী দিবা॥ (প্রস্থান)

(নীলাম্বর সাজি হস্তে প্রবিষ্ট হইলেন।)

নীলাম্বর। তুলিয়াছি নানা ফুল নন্দন-কাননে
কিন্তু শত পুষ্প নাহি হ'ল, একি বিড়ম্বনা ?
আনিতে ত্রিদল মন্দাকিনী তীরে যাই,
ধবল ধুস্তুর ফুল কোথায় বা পাই ? (পদচারণ।)
কুন্দ শেফালিকা জবা অপ্রিয় শিবের।
ত্রিপত্র ধুস্তুরে তুষ্ট সদা আশুতোষ।
যাই তবে সুরধুনী তীরে
তুলিবারে ত্রিপত্র ধুস্তুর। (প্রস্থান।)

পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। ঈশানী আদেশে আজি মায়াজাল পাতি
ফুলহীন করিব নন্দন।
শিবের পূজন, শত পুষ্প না মিলিবে
প্রহর বেলায়।

তৃতীয় দৃশ্য—নন্দন উদ্যান।

অগ্রে ফুলপূর্ণ ডালি মস্তকে পদ্মাবতী, পশ্চাতে নীলাম্বরের প্রবেশ।

পদ্মার গীত।

রমণী নিরমিলা বিধি কেমনে।
ছানিয়া কুসুম বাস, বদনে দিয়েছে হাস,
দশদিক্ পরকাশ নীল নলিনে।
সুবীণার তান দিলা বিধু-বদনে॥
পরুষ-পুরুষগণে রসাইতে ফুলবাণ,
কুসুম-নিকরে গড়ে ফুলধনুঃ ফুলবাণ,
টঙ্কারি তীর, বিন্ধিয়া বীর দুটি প্রাণ এক ঠাঁই বাঁধে যতনে।
এস যদি চাহ কেউ কুসুম-রতন
মনঃমধু সনে দিব নবীন যৌবন
যাবে প্রেম-ক্ষুধা ভরি প্রেম-সুধা
মনঃ প্রাণ ডালি দিব কুসুম সনে॥

(গমন করিতে লাগিল)

নীলাম্বর। কেবা ঐ দেববালা?
ফুলডালা লয়ে মাথে, নিজ সাথে
নিজে কথা কয়ে
যৌবনের তরঙ্গ খেলায়ে যায়।
"এস যদি চাহ কেহ কুসুম রতন"
করিছে ঘোষণ,
চাহি মম কুসুম-নিকর।
(প্রকাশ্যে) দাঁড়াও বারেক তন্বি! চাহি মম ফুল।
ফুল ডালা লয়ে মাথে করিয়া আকুল
নন্দনের মধুকরগণে, চলিছ গোপনে
কোন্‌খানে?
দাঁড়াও খানিক অয়ি চারুনিতম্বিনি!
হেরি তব রূপরাশি অনঙ্গ-মোহিনি!

(মুগ্ধভাবে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলেন।)

বৈষ্ণবাপরাধ সমস্যা নির্ণয়।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাসদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ।

সাধনা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, ভক্তপ্রবর মহাশয় স্ত্রীসঙ্গী বৈষ্ণবের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার লেখা উচিত হয় নাই বা তৎসম্বন্ধে যাঁহারা কটাক্ষ করিয়া তাঁহার মত মহৎপ্রাণ মহাশয় ব্যক্তিকে যে "বৈষ্ণবাপরাধী" বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে করযোড়ে বিনয় করিয়া জানাইতেছি যে, একবার বিচার পূর্ব্বক অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাঁহারা যদ্যপি এ বিষয়ের সূক্ষ্ম সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী হয়েন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন তাঁহাদের অসন্তুষ্ট প্রতিবাদ করা উচিত হয় নাই। কারণ, মনে করুন কেহ যদি আমার দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক আমার নিন্দাবাদ প্রচার করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমাকে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে হইবে যে আমার চরিত্রে সে সব দোষ আছে কি না—কেন না আমি শ্রীভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি—তাঁহার করুণা লাভের জন্য আমাকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে—তাহাতে যেন আমার কোন প্রকার অপরাধ বা পাপ না ঘটে, তাহার জন্য আমাকে সর্ব্বদা সতর্ক এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক অচলা ভক্তিতে আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে—কারণ উদ্দেশ্য আমার শ্রীভগবান—তাহাই যদি আমার প্রাপ্তি না হয় তাহা হইলে এ বিড়ম্বনার বা আত্মবঞ্চনার প্রয়োজন কি? কত আরাধনায়, কত তপস্যায়, কত তন্ময়তায়, কত নিষ্ঠায়, কত প্রেম-ভক্তির দ্বারায় শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমার পাওয়া যায়, তাহা একবার প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিতে চেষ্টা করুন। শাস্ত্র লিখিতেছেন,—

"অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাং গতিং"

কিন্তু সেই সাধনার মূলে যদি আমার দোষ লক্ষিত হয় তাহা হইলে আমার ইষ্ট কৃপালাভের প্রত্যাশা কোথায়? অতএব তাহা সর্ব্বপ্রথম পরিত্যাগই

করিতে হইবে। তাহা না করিয়া কেহ যদি ডুব্ মারিয়া জল খাইতে থাকেন তাহা হইলে ক্ষতি কার—অপরাধ কার—পাপ কার? যে দেখাইয়া দেয় তাঁহার না যে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া চলে তাঁহার? নিজের মানসে এইরূপ বিচার বুদ্ধি আসিলে একজন লিখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে আক্রমন করিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিতে হইবে ইহার মানে কি? যদি আমার দোষ থাকে সংশোধন করিয়া লইব, না থাকে ভাল কথা আমার তাতে ক্রুদ্ধ হইবার কিছুই নাই—বরং তাহাতে আমিও অনুমোদন করিব। ক্ষণভঙ্গুর জীবন লইয়া তৃণাদপি লঘুত্ববাদের পাদমূলে দাঁড়াইয়া পরনিন্দা ও আত্মবঞ্চনা কেন করিয়া চলিব? যদি করিয়া চলি তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বঞ্চক। এক্ষণে দেখা যাক্, স্ত্রীসঙ্গী বাবাজী ভগবদ্দর্শন লাভে অধিকারী কি না। যদি হয়, তাহা কোন্ ফাঁকি অবলম্বন করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ বিচার করিয়াই জানিতে হইবে যে স্ত্রীসঙ্গী বৈরাগিগণের পতন সম্ভব কি না? "স্ত্রিয়াসঙ্গোঽস্যাস্তীতি" এই যদি স্ত্রীসঙ্গী শব্দের অর্থ করিয়া লয়েন তাহা হইলে কেমন করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে? নিজের বুকে হাত দিয়া বুঝিয়া লউন ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত বিহীন হইয়া শূন্যমার্গে ভক্তিটুকু লাভ করিয়া কোন ব্যক্তি আমার প্রেমময় শ্রীহরিকে পাইয়াছেন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন। বিবেক উদয়ের পরে শত অনুতাপ ও অশ্রুর বিনিময়ে অনেক স্খলিতপদ ভক্তও পরিশেষে এই ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত সাধনের পাদমূল আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উল্লঙ্ঘন করিয়া শাস্ত্র বিধি না মানিয়া যদৃচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলিব কেমন কথা? স্ত্রীসঙ্গী বৈরাগীর বৈষ্ণবত্বই নাই, কেন না যাহাদের জীব হিংসা বর্ত্তমান রহিয়াছে তাঁহারা কেমন করিয়া বৈষ্ণব হইতে পারেন। কেন না বৈষ্ণবের প্রাণে হিংসা থাকিবে না—জীবের প্রতি দয়াই তাহাদের সাক্ষ্য প্রদান করিবে; সেই জীবের প্রতি যাহার দয়া নাই সে বৈষ্ণব নয়। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গী বৈরাগীদিগের সম্বন্ধে সাধনা পত্রিকায় সমালোচনা করাতে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের বৈষ্ণব অপরাধ হয় নাই।

যাঁহার করুণায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম আজ জগতে শীর্ষস্থানীয়, আমার সেই কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভু কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন, তারপর তীব্র প্রতিবাদ বা ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন, দুঃখ নাই।

তিনি কি প্রকারে কোন শাসন অবলম্বন করিয়া লোক শিক্ষা প্রদান করিতেছেন যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ পড়িয়াছেন—তাহাতে তাঁহারা কি এ কথা পাঠ করেন নাই যে পরম বৈষ্ণব শ্রীভগবান্ আচার্য্যের অনুরোধে মহাপ্রভুর

কীর্ত্তনীয়া শ্রীছোট হরিদাস শ্রীশিখি মাহিতীর ভগ্নী পরমবৈষ্ণবী বৃদ্ধা তপস্বিনী শ্রীমাধবী দেবীর স্থানে চাউল "মাগিয়া" আনিয়াছিলেন। ভোজনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ঐ শালি তণ্ডুল তিনি শ্রীছোট হরি দাসের দ্বারা "মাধবী দেবী পাশ মাগি আনাইলা।" অন্নের প্রশংসা করিয়া প্রভু ভোজন করিলেন, কিন্তু গম্ভিরায় আসিয়া শ্রীগোবিন্দকে বলিলেন,—"আজি হইতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা। ছোট হরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা।" হরিদাস ইহা শুনিয়া দুঃখিত চিত্তে উপবাস করিয়া থাকিলেন। তিন দিন অতীত হইলে শ্রীস্বরূপ প্রভৃতি পার্শ্বদগণ হরিদাসের অপরাধ কি জিজ্ঞাসিলে

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

পরে বলিতেছেন,—"প্রকৃতি সম্ভাষা বৈরাগী না করি দর্শন॥" এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,—

"মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে।
প্রিয় ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম বুঝাইতে॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
সঙ্কোচো ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে॥"

এক বৎসর পর হরিদাস প্রয়াগে ত্রিবেণী-প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন

"শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি সম্ভাষণ কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥

তাহা হইলে যে সকল বৈরাগী প্রতিনিয়ত স্ত্রী সঙ্গ করিতেছে তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের কি বিধান হইবে?

যে মাধবী দেবীর নিকট তণ্ডুল মাগিয়াছিলেন তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীছোট হরিদাসকে চিরতরে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন দেখা যাউক তিনি কে? কবিরাজ গোস্বামী ইহাঁর যে পরিচয় দিয়াছেন নিম্নে তাহার অবিকল উদ্ধৃত হইল,—

"মাহিতীর ভগিনী সেই—নাম মাধবী দেবী।

বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী ॥
প্রভু লেখা করে—রাধা ঠাকুরাণীরগণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিন জন ॥
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি মোহিতী, আর তার ভগ্নী অর্দ্ধজন ॥"

এ হেন পুণ্যময়ী, তপস্বিনী, যশঃস্বিনী, বয়স্যাদী মাধবী দেবীর সঙ্গে কথাবলার অপরাধে বিরক্ত বৈষ্ণব শ্রীছোট হরিদাসকে মহাপ্রভু চির-বর্জ্জন করিলেন। আর যাহাকে বর্জ্জন করিলেন তিনি কে? মহাপ্রভুর লীলাপরিকর। কেন বর্জ্জন করিলেন?—লোকশিক্ষার জন্য অর্থাৎ পরবর্ত্তীকালে বিরক্ত বৈষ্ণবগণ যাহাতে মহাপ্রভুর আদেশ স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে।

(১) এখন দেখা যাউক এই শ্রেণীর অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী তথা-কথিত বিরক্ত বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর আদেশ কিরূপে পালন করিতেছেন।

(২) তাঁহারা বিরক্ত বৈষ্ণব নামের যোগ্য কি না?

(৩) হিন্দু সাধারণ তথা গৃহী বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত কি ব্যবহার করিবেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইলেই আনুসঙ্গিক ভাবে অপর দুইটী প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হইবে। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুযায়ী তিনটী প্রশ্নের স্বতন্ত্র উত্তর দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

১ম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে এই শ্রেণীর বৈরাগীগণ একাধিক পরস্ত্রী নিজ আবাসে রাখিয়া এবং অনবরত তাহাদের সঙ্গ করিয়া মহাপ্রভুর আদেশ সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন তো করিতেছেনই অধিকন্তু মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের ঘোরতর অপমাননা এবং তাহাকে লোকচক্ষে হেয় করিয়াছেন ও করিতেছেন।

(২) এইসকল বাবাজী "বিরক্ত বৈষ্ণব" দূরের কথা "বৈষ্ণব" অথবা "বৈরাগী" নামের সর্ব্বথা অযোগ্য।

(৩) অতএব মহাপ্রভুর সর্ব্বথা ত্যজ্য, সুতরাং গৃহীগণ এবম্প্রকার স্ত্রীসঙ্গীর সংস্রব যত্ন পূর্ব্বক ত্যাগ করিবেন।

কুলীন গ্রামের বসুগণ বৈষ্ণব কাহাকে বলে এবং বৈষ্ণব চিনিবারউপায় কি? এই প্রশ্ন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন "যাঁহার দর্শনে মুখে কৃষ্ণ নাম আইসে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।" এখন আলোচ্য বৈরাগীদিগকে দর্শন করিলে মুখে কৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে "ইহার কয়টী বৈষ্ণবী বা

সেবাদাসী আছে" এই প্রশ্নই মনে আসে। বৃন্দাবন দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। সহরে, তন্নিকটবর্ত্তী বনে ও পঞ্চক্রোশীর বাহিরে সাধন ভজনশীল অনেক নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবদর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বনবাসী বৈষ্ণবগণ কেহ গুম্ফায়, কেহ পর্ণকুটীরে থাকিয়া সাধন ভজন করেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে অযাচিত-বৃত্তিপরায়ণ অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্য কেহ আনিয়া দিলে খান অন্যথা উপবাস। অবশিষ্ট বৈষ্ণবেরা মধুকর-বৃত্তি পরায়ণ। সাধন ভজন প্রভাবে ইহাঁদের মুখখানি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণ পূর্ণ। দেখিলে আপনা হইতেই মস্তক অবনত হয়। যথার্থ বিরক্ত বৈষ্ণবের আদর্শ যে ইহাঁরা তাহা একবার দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। এবং সত্যই ইহাদিগকে দর্শন করিলে মুখে না হইলেও অন্তরে কৃষ্ণস্মরণ হয়। নবদ্বীপেও ভজনশীল অকিঞ্চন বৈষ্ণব আছেন; তাঁহারা আখড়াধারী নহেন, কোন প্রকারে মধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীগৌরগোবিন্দ উপাসনায় দিন অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহারা এই সকল অসৎ আলোচনা বা হৈ চৈর মধ্যে নাই, কিন্তু আখড়াধারী বাবাজীদের ভিতরে বোধ হয় একটীও স্ত্রীসঙ্গ ছাড়া আছেন কি না সন্দেহ। একজন গৃহী যদি পরদার লইয়া বাস করে তবে সেই ব্যক্তি লোক সমাজে হেয় এবং নিন্দনীয় হয়। আর অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী বাবাজীগণ কি তাহা শ্লাঘার বিষয় মনে করেন এবং এই জন্যই কি নবদ্বীপে কোন কোন আখড়ার মহান্তকে (?) সেবাদাসী বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতে দেখা যায়? অতএব দেখা যাইতেছে এই সকল পরদার-রত বাবাজীগণ আর যাহাই হউক বৈষ্ণব নহে। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করায় রাধা-গোবিন্দ বাবুর বৈষ্ণব অপরাধ হয় নাই। যার মাথা নাই তার আবার মাথা ব্যথা কি? যার বৈষ্ণবতাই নাই তার সম্বন্ধে আলোচনায় আবার বৈষ্ণব অপরাধ কোথায়? পূর্ব্বে নবদ্বীপে স্ত্রীসঙ্গী বাবাজীদিগকে বৈষ্ণবের পঙ্গতে বসিতে দেওয়া হইত না; আর এখন সে বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা দেখা যায় না। কালের পরিবর্ত্তনে হয় ত অদূর ভবিষ্যতে স্ত্রীসঙ্গী না হইলে তাঁহাকে পঙ্গতে বসিতে দেওয়া হইবে না।

তারপর সাধন ভজনাদি বিষয়ে শাস্ত্র কি সাবধানতার বাণী প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্‌গোষ্ঠিং পরিবর্জ্জয়েৎ।"

গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥'

মহর্ষি মনু বলিতেছেন—

"ইন্দ্রিয়ানাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম।
সংনিযম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি।"

তাহা না হইলে আমার গোবিন্দকে পাইবার উপায় নাই, বিন্দুক্রটী সত্ত্বে পাইবার আশা একেবারেই নাই। শ্রীভগবানের আরাধনায়, ভক্ত সাধকের বড় সাবধানে থাকিতে হয়—শুধু কামেন্দ্রিয় জয় বলিয়াই নয়, মহর্ষি আরও বলিতেছেন—

"ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা ধৃতে পাত্রাদিবোদকং ॥
বশেকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনূং ॥"

এই সব সাবধানের বাণী—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষয়েৎ ॥
ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্।
তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েৎ বুধঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যন্মৈথুনাদি গৃহমেধি সুখং হিতুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ দুঃখং।
তৃপ্যন্তিনেহ কৃপণা বহু দুঃখভাজঃ
কণ্ডুতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥"

গীতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করিতেছেন—

"শক্নোতিহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষনাৎ।
কামক্রোধদ্ভবং বেগং স যুক্ত স সুখী নরঃ ॥"

নতুবা হইবার নয়—পাইবার নয়। সংসার বিরক্ত ত্যাগী বৈষ্ণবের এই সাবধন ও আশ্বাসের বাণী।

অতএব রাধগোবিন্দ বাবুকে বৈষ্ণবাপরাধী বলা উচিত হয় নাই। আর মহামান্য শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন প্রভুকে "সাধনা' পত্রের নিয়ামক বলিয়া যে দোষ প্রদর্শন করাইতে চাহেন তাহা একেবারেই অনুচিত। এরূপ

ঋষিকল্প সদুদার প্রভুসন্তানকে তাঁহারা যে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারাই অপরাধী হইয়াছেন। তাঁহারা এই সতত বিনয়াবনত বক্তৃপ্রধান, উদারচরিত, পরমভাগবত গোস্বামী পাদকে বৈষ্ণবাপরাধী বলিতে গিয়া নিজেরাই বৈষ্ণবাপরাধী হইয়াছেন তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারেন নাই। অতএব মহৎ নিন্দা পরিহার পূর্ব্বক আমার শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম লইয়া আনন্দ করুন এই নিবেদন ও উপসংহার। অলমতি বিস্তরেণ।

সন্তান বিক্রয়।

(সত্যঘটনামূলক গল্প।)

লেখক—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়।

বহু চেষ্টা করিয়া স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ করিয়াও যখন ৯০০০ টাকার বেশী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, হরিহর মুখোপাধ্যায়, অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াও ভাবী বৈবাহিক যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রায় বারোটার সময় নিজ গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন, সেই সময় শ্রীমান্ ইন্দু কমল চট্টোপাধ্যায় আসিয়া জোড় হস্তে পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং নিজের সোনার চেন, ঘড়ী, হীরার আংটি ও বাল্যকালের সোনায় কোমর পাট নিমফল প্রভৃতি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিল, "আপনি হতাশ হইবেন না, এই সব বান্ধা দিয়া আর এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনুন।" হরিহর বাবু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় একেবারে অবাক্ হইয়া ইন্দু বাবুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, আনন্দে তাঁহার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া গেল, কিন্তু একটুকু প্রকৃতিস্থ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

ঘটনাটি হচ্ছে এই, আগড়পাড়ার যদুনাথ বাবু একজন ব্যবসায়ী ধনবান্ ব্যক্তি এবং সদাশয় বলিয়া তল্লেশে প্রসিদ্ধ। সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা তিনি আজ একজন জমীদার হইয়াছেন। তিনি সত্যবাক্, জিতেন্দ্রিয় এবং কৃপণও নহেন, মজুদও বিলক্ষণ আছে, বিলাসী নহেন; সুতরাং কোনও অভাব

নাই, এবং উদ্যোগী বলিয়া দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিও হইতেছে। এ হেন যদুনাথ বাবুও নিজের পুত্রের বিবাহের পণ ১০,০০০ দশ হাজার টাকা স্থির করায়, মধ্যবিত্ত হরিহর বাবু তাতেও সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ ৯০০০ টাকার বেশী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, তাহাই লইয়া যদুনাথ বাবুর কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যদুনাথ বাবু সত্য সংকল্পে যাহা স্থির করেন, তাহার পরিবর্ত্তন করা তাঁহার স্বভাব নাই বলিয়া বা অন্য কোনও কারণে কিছুতেই ৯০০০ টাকায় সম্মত হইলেন না, তখন অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও আহারাদি না করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে হরিহর বাবু বাটী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। যদুনাথ বাবুর পুত্র ইন্দু কমল সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইল এবং তাহার বেগ সামলাইতে না পারিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার অবসরটুকুও না লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে পথের মাঝে আসিয়া গোপনে হরিহর বাবুর হতাশ প্রাণে অমৃত সেচন করিল।

হরিহর বাবু প্রথমে এইরূপ ভাবে সাহায্য লইতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন ইন্দু কমল স্পষ্ট কথায় তাঁহাকে বলিল যে, "আমার পিতা মানুষ, পশু নহে; আপনি নিঃসঙ্কোচে আমার কথায় সম্মত হউন, ইহাতে কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, আমি আমার পিতাকে সব চেয়ে ভাল জানি," হরিহর বাবু আর আপত্তি করিতে পারেন নাই।

যদুনাথ বাবুর দুই কন্যা, এক পুত্র। কন্যা দুইটির বিবাহ হইয়াছে। পুত্র ইন্দু কমল চট্টোপাধ্যায় এম, এ. বি, এল। এক্ষণে তাহার বয়স ২৫ বৎসর, সে ২৩ বৎসর বয়সে বি, এল পাশ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করে; কিন্তু কিছুদিন মধ্যে ঐ ব্যবসায়ে অনেক অসত্য ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পিতার কারবারে যোগ দেয় এবং সততার সহিত কাজ করায় যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। যদুনাথ বাবু কন্যাদ্বয়ের বিবাহে ১৫।১৬ হাজার টাকা বরপণ দিতে বাধ্য হওয়ায় মনে মনে সঙ্কল্প করেন যে দশ হাজার টাকার কমে পুত্রের বিবাহ দিবেন না এবং উক্ত টাকা কেহ দিতে সম্মত না হওয়ায় এ পর্য্যন্ত ইন্দু কমলের বিবাহ হয় নাই। আর এদিকে হরিহর বাবুর অবস্থা তত ভাল না হইলেও একমাত্র কন্যা, তাহার উপর সে অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী, এই জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার আকাঙ্খা তাঁহার বলবতী হইয়াছিল। যেরূপ ইচ্ছা হয়, তদনুরূপ চেষ্টাও হইয়া থাকে। অবশেষে দশ হাজার টাকাই দিতে স্বীকৃত হইয়া ইন্দু কমলের সহিত বিবাহ স্থির করিলেন।

(২)

যথাসময়ে ইন্দু কমলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুখের কথা, বিবাহের দিবস বরপক্ষের সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে কন্যাপক্ষের লোকদিগকে উপদ্রুত হইতে হয় নাই, বরযাত্রী অধিক লোক ছিল না এবং যাহারা ছিল তাহারা শিষ্ট-শান্ত। বরের বন্ধুরূপে যে কতকগুলি অদ্ভুত জীব আজকাল প্রায়শঃই উপস্থিত হয়, তাহাদিগের তোয়াজ করিতে করিতে যে কন্যাকর্ত্তার প্রাণান্ত ঘটে, এ বিবাহে সেইরূপ কোনও ব্যাপার ছিল না। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! যখন বরকর্ত্তা যদুনাথ বাবু পুত্র ও পুত্রবধূ সহ ফিরিয়া যাইবেন তখন বর কোথায়? বরকে খুজিয়া পাওয়া যায় না। বহু অনুসন্ধান করিয়া যখন তাহাকে পাওয়া গেল, তখন সে স্পষ্ট বলিল "পিতা দশ হাজার টাকা লইয়া আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন, অতএব আমি বাটী যাইব কেমন করিয়া।" চারিদিকে মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হইল। কর্ত্তাকে এ সংবাদ কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে, সকলে এই কথা ভাবিয়াই আকুল, আজ অতি শান্ত পিতৃআজ্ঞা-পরিপালনকারী পুত্রের মুখে একি কথা? এই কি পিতৃভক্তি? ইত্যাদি বহুরূপ জল্পনা চলিতে লাগিল। অবশেষে যুবক তেজস্বী পুরোহিত মহাশয় কর্ত্তার নিকটে সমস্ত বিষয় জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না, শ্রীমান্ ইন্দু কমল যাহা বলিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। আপনি যদি ধীর স্থিরভাবে আমার কথা শোনেন তবে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।" কর্ত্তা অর্থাৎ যদুবাবু নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। পুরোহিত মহাশয় আবেগ ভরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর শ্রোতৃবৃন্দ ক্রমশঃ সমবেত হইয়া অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "দেখুন কর্ত্তা মহাশয়! এইরূপ ভাবে পণ গ্রহণ করায় সহৃদয় মাত্রেরই প্রাণে ভীষণ ভাবে আঘাত করা হয়, সহৃদয় ইন্দু সেই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়াই আজ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদরূপে ঐরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছে, ইহাতে তাহাকে দোষী অপেক্ষা নির্দ্দোষী অধিক মনে করি। এই ব্যাপারে তাহার হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, স্নেহশীলতা, পরোপকারিতা, পরদুঃখাসহনশীলতা তাহাকে ভাবিবার অবসর দেয় নাই; বিশেষতঃ যে চিরকাল পরের দুঃখে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিয়াছে, সে কখনও একজন নির্দ্দোষ সরল ব্রাহ্মণের দুঃখ অনুভব করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। আমি আরও মনে করি, পুত্রবধূ গ্রহণ করিবে গৃহলক্ষ্মীরূপে, গ্রহণ করিবে আনন্দময়ী

জননীরূপে, গ্রহণ করিবে হাস্যময়ী স্নেহ প্রতিমারূপে। আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন তাহাতে কি আনন্দ? যে বালিকা পিতা-মাতার সর্ব্বস্ব ধ্বংসের কারণরূপে নিজেকে মনে করে সে কি আনন্দময়ী হইতে পারে? সে ত বিপদের প্রতিমূর্ত্তি—চির অমঙ্গলের সহযাত্রী। সেই অমঙ্গলরূপা দীর্ঘ নিশ্বাসে বিষাদ বিষ ছড়াইতে ছড়াইতে যখন আপনার গৃহে গমন করিবে, তখন কি সে বাটী কল্যাণময় হইতে পারে? সেই বধূ কি পিতৃ ধনাপহারক স্বামীকে পূজনীয় মনে করিতে পারিবে? তাই বলিতেছিলাম ইন্দু বাবু বিশেষ অন্যায় কাজ করেন নাই। জানি না আপনার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তিরও এইরূপ পণ গ্রহণ করার ইচ্ছা কেমন করিয়া হইল এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াই বা আপনি কেমন করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে কালযাপন করিতেছেন? আশা করি আপনি বিশেষ বিবেচনা করিবেন। একবার ভুল করিলেই যে তাহা আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।"

যদুনাথ বাবু এতক্ষণে স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন, তিনি কি অন্যায় কাজ করিয়াছেন। তাঁহার অসৎ প্রবৃত্তি সকল দূরে পলাইল, সৎ প্রবৃত্তি সব জাগরিত হইল সামান্য, অস্থায়ী অর্থের মোহ আর তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুত যানে নিজ বাটী গমন করিলেন এবং সেই দশ হাজার টাকা লইয়া আসিয়া বৈবাহিক মহাশয়কে দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

(৩)

আজ কি আনন্দ! বৈবাহিক বৈবাহিকের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। চারিদিক হইতে, "জয় যদুনাথ বাবুর জয়, ইন্দু কমলের জয়, আর জয় যথার্থ উপযুক্ত পুরোহিত কালীকান্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের"—এই ধ্বনি উঠিল। অল্প সময়ের মধ্যে চতুর্দ্দিকে এই অভাবনীয় ঘটনার কথা প্রচার হইয়া পড়িল, চারিদিক হইতে কাতারে কাতারে জনস্রোত যদুনাথ বাবুকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। আনন্দের আর সীমা নাই। পাঠক! কখনও দেখ নাই চিরন্ময়ী-আনন্দময়ী আনন্দ! কিন্তু আজ প্রাণ ভরিয়া দেখ নারীরূপিণী আনন্দময়ী সরলাবালা দেবীর আনন্দ। ইনিই আমাদিগের সদাশয় যদুবাবুর পুত্রবধূ এবং শ্রীমান্ ইন্দু কমলের সহধর্ম্মিণী।

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫শ বর্ষ | ১৩৩৬ সাল, আশ্বিন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মায়ের আসা-যাওয়া।

লেখক—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

ভাই! সেই যে একটা চল্‌তি কথা আছে,—'ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিতেছেন কি যাইতেছেন, বুঝা ভার,'—জানো কি?

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তেল চুক্‌চুকে নেড়া মাথা, তার উপর তিলকের বহরটা বেজায়,—একেবারে এদিকে নাকের ডগা হইতে ও দিকে ঘাড়ের শেষ পর্য্যন্ত! কাজেই কোন্‌টা তাঁহার সম্মুখ, কোন্‌টা পশ্চাৎ, হঠাৎ দেখিয়া বুঝা ভার। তাই তাঁহার সম্বন্ধে রসিক ব্যক্তির ঐ ব্যঙ্গ-উক্তি।

ঐ ব্যঙ্গ-বাণী কিন্তু জগজ্জননীর আগম-নির্গম সম্বন্ধে অনেকটা খাটে। মা'য়েরও আমার আসা-যাওয়া বুঝা ভার।

কেন,—তাহা বলি শুন। যে স্থান হইতেই আসা হউক, আর যে স্থানেই যাওয়া হউক, আসা আর যাওয়া বলিতে গেলে দুইটা স্থান বুঝিতে পারা যায়। যেমন, অমুক ব্যক্তি অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে আসিল, অথবা, অমুক ব্যক্তি অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে গমন করিল। তোমার আমার কিম্বা এখানকার অপর কাহারও সম্বন্ধে এরূপ কথা খাটিতে পারে। কেননা, তুমি আমি বা অপর কেহ তো আর সকল সময়ে সকল স্থানে থাকিতে পারি না? এক স্থানে থাকি তো আমরা অপর স্থানে নিশ্চয়ই থাকিতে পারি না। তাই আমাদের আসাও আছে আর যাওয়াও আছে। শুধু এ জীবনের কথাই বা ধরি কেন,

এ সংসারে আমরা কতরূপে কতবার যে আসা-যাওয়া করিতেছি, তাহারও ইয়ত্তা নাই। যখন স্বর্গে আমরা থাকি, তখন মর্ত্ত্যে নাই; আবার মর্ত্ত্যে যখন থাকি, তখন স্বর্গে নাই। পশু-শরীরে যখন থাকি, তখন মানব শরীরে নাই, আবার মানব শরীরে যখন থাকি, তখন পশু-শরীরে নাই। অথচ চিরদিন আমরা একই স্থানে বা একই শরীরে থাকিতে পারি না। কর্ম্মের প্রেরণায় এখানে-ওখানে এ-শরীরে ও-শরীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেই হয়। কাজে কাজেই আমাদের আসাও আছে, আর যাওয়াও আছে।

মা তো ভাই! আমাদের মতন পরিচ্ছিন্ন ন'ন, তাই তাঁহার আসা-যাওয়া একই কথা। অথবা বলিতে হয়—মা'র আমার আসাও নাই, যাওয়াও নাই।

এই অপূর্ব্ব প্রহেলিকার মর্ম্ম-ব্যাখ্যা বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত "শ্রীচণ্ডী" নামে প্রসিদ্ধ শ্রীদেবীমাহাত্ম্যে আমরা দেখিতে পাই,—সুরথ রাজার প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপে মেধস-মুনি মা'য়ের স্বরূপাদি বর্ণনা করিতেছেন,—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

* * * *

নিত্যানন্দময়ী মাতা অনিত্যা নহেন—নিত্যা,
বিদ্যমান হ'ন সর্ব্বক্ষণ।
এ জগৎ তাঁর মূর্ত্তি, শক্তিরূপে পান স্ফূর্ত্তি,
এ সংসার তাঁর বিরচন॥

* * * *

অর্থাৎ মেধস মুনি বলিতেছেন কি?—মা আমার—নিত্যা। 'নিত্যা' কি? সর্ব্বদাই তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন: তাঁহার অস্তিত্বের কখনও বিলোপ হয় না। এই বিশ্ব-সংসার যাহা কিছু দেখিতেছ, এ সমস্তই সেই মায়েরই মূর্ত্তি। মা আমার কারণরূপে সকল সামগ্রীতেই অনুস্যূত রহিয়াছেন। তা বলিয়া বিশ্বের বিলয়ে মায়ের বিলয় হয় না। কারণরূপিণী মা'য়ে জগতের দৃশ্য-অবস্থার নিবৃত্তি হইয়া যায় মাত্র। যেরূপ—মাটীর ঘট। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে মাটীর বিলোপ হয় না; ঘট-অবস্থারই নিবৃত্তি হয় মাত্র। সুবর্ণের বলয়। বলয় ভাঙ্গিয়া গেলে সুবর্ণের বিলয় হয় না; বলয়-অবস্থারই নিবৃত্তি হয় মাত্র। ঠিক এইরূপ।

যেমন, মাটী দিয়া ঘটের গঠন হয়, সুবর্ণ দিয়া বলয় নির্ম্মিত হয়, তেমনই মা দিয়াই এই বিশ্ব বিরচিত। সুতরাং মাটী যেমন ঘটের উপাদান-কারণ, সুবর্ণ

যেমন বলয়ের উপাদান-কারণ, মা-ও তেমনিই বিশ্বের উপাদান-কারণ।

মৃত্তিকাদি যে সকল সামগ্রী দিয়া ঘট-টটের গঠন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই হইল—ঘট-টটের উপাদান-কারণ। আর কুম্ভকার-স্বর্ণকার প্রভৃতি, যাহারা ঘট-টট গড়িয়া থাকে, তাহারা হইল—নিমিত্ত কারণ।

এ সংসারে ঘট-টট প্রত্যেক সামগ্রীরই উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়। কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না মা-আমার নিজ অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে এ বিশ্বের উপাদান-কারণও বটেন এবং নিমিত্ত-কারণও বটেন। মা'য়ের উপাদান দিয়াই এ বিশ্বভাণ্ড বিনির্ম্মিত এবং মা-ই এই বিশ্বভাণ্ডের বিনির্ম্মাণ-কারিণী। বিশ্ব গড়িবার মাল-মশলাও তিনি, আর বিশ্ব গড়িবার কারিগরও তিনি।

শাস্ত্র বলেন—কার্য্য ও কারণে ভেদ নাই। তাই, কারণরূপিণী মা-আমার কার্য্যরূপী বিশ্ব হইতে ভিন্ন নহেন। ফলে মা আমার বিশ্বমূর্ত্তি বা জগন্মূর্ত্তি! তবে কি জান ভাই! অর্জ্জুনের মত "দিব্যচক্ষু" লাভ না করিলে তো আর মা'য়ের এই বিশ্ব-বিগ্রহের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। তুমি আমি চর্ম্ম-নয়নে মা'য়ের এ জগৎজোড়া ভুবন-ভরা মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি কি করিয়া অনুভব করিব বল?

হয় তো ভাই, তুমি বলিবে—মা'য়ের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস করো না বলিয়াই বলিবে,—ইহাও কি কখন সম্ভব হয় যে, একই বস্তু কি কখন উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে? তোমার এ কথার উত্তর দিবার জন্য করুণা-ময়ী মা আমার মাকড়সার সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাই রে, মাকড়সা তাহার মুখ হইতে বা নাভি হইতে নিঃসৃত লালা দিয়া জাল নির্ম্মাণ করে, ইহা বোধ হয় দেখিয়াছ। লালা দিয়া যখন জাল রচিত হইয়া থাকে, তখন লালাই হইল জালের উপাদান-কারণ। আর যে মাকড়সার লালা দিয়া জাল নির্ম্মিত হয়, সেই মাকড়-সাই তাহার হাত-পা দিয়া জালের গঠন নিষ্পন্ন করে। সুতরাং রচয়িতা হিসাবে জালরূপ কার্য্যের নিমিত্ত-কারণও সেই মাকড়সাই। ইহা তো ঠিক! তবেই দেখ ভাই! এ জগতের সসীম শক্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট মাকড়সাই যখন জাল-কার্য্যের প্রতি একাই উপাদান এবং নিমিত্ত—এই উভয়বিধ কারণ হইতেছে,—তখন অমিত-শক্তিসম্পন্না মা আমার তাহা না হইতে পারিবেন কেন?

ভাই রে! মা আমার "জগন্মূর্ত্তি" বলিয়া, প্রতিমা গড়িয়া যেরূপ তাঁহার আমরা পূজা করিয়া থাকি, তাঁহার সেই দশদিক আলো করা দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি নাই, এ কথা যেন কেহ মনে করিও না,—ঐ মূর্ত্তি আমাদের খেয়ালের খেলা বলিয়া মনে করিও না। ঐ শুন আমাদের প্রাচীন আর্য্যগণ এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন,—

"অধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃ ভাবেন গঙ্গাদিতীর্থবৎ একস্যৈব ব্রহ্মণোদ্বৈরূপ্যেণ প্রকাশঃ। তত্র অধিষ্ঠানরূপং গঙ্গাদিদ্রববৎ অসান্দ্রং জ্ঞানরূপম্। অধিষ্ঠাতৃরূপং তু গঙ্গাদি দেবতাবৎ সান্দ্রং মূর্ত্তম্।" ইতি।

(বেদান্তদর্শন, গোবিন্দভাষ্যবিবৃতি, ৩।২।১৭)

অর্থাৎ আচার্য্যপাদগণ বলিতেছেন যে;—অধিষ্ঠান এবং অধিষ্ঠাতা ভাবে একই ব্রহ্ম দুইরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। কি কি দুইরূপ?—জ্ঞানরূপ এবং শ্রীবিগ্রহ রূপ। কাহার ন্যায়?—গঙ্গাদি তীর্থের ন্যায়। আমরা যে দ্রবীভূত গঙ্গার তরল জলে স্নানাদি করিয়া আপনাকে পবিত্র করিয়া থাকি, সেই জল হইলেন মা গঙ্গার "অধিষ্ঠান"। আর আমরা গঙ্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিমা গড়িয়া যে মা গঙ্গার পূজা করিয়া থাকি, তিনি হইলেন মা গঙ্গার ঘনীভূত দেবতামূর্ত্তি। ইনিই হইলেন মা গঙ্গার অধিষ্ঠাতৃরূপ!

পঠদ্দশায় আমরা যখন "উত্তররামচরিত" গ্রন্থ পাঠ করি, তখন তাহাতে দেখিয়াছিলাম—শ্রীরামচন্দ্র যে সময় দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন, সে সময় তমসা ও মুরলা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এই তমসা ও মুরলা দুইজনেই হইলেন—ঐ নামে প্রসিদ্ধ নদী। এখন বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না যে, শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যাঁহারা দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নদীর অধিষ্ঠানরূপ জলপ্রবাহ নহেন, প্রত্যুত সেই সেই নদীর অধিষ্ঠাতৃরূপ ঘনীভূত দেবতা মূর্ত্তি।

ভাই রে! তরল জলে মূর্ত্তি গড়া যায় না, কিন্তু ঘন জমাট বাঁধা জলে বা বরফে মূর্ত্তি গড়া যায়। তরল ব্রহ্মের মূর্ত্তি নাই, কিন্তু ঘন ব্রহ্মেই মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহা হইল তরল অঘনীভূত জ্ঞানরূপের কথা। 'মা আমার জগন্মূর্ত্তি' ইহাও সেই তরল অঘনীভূত জ্ঞানরূপের কথা। কিন্তু ঐ জ্ঞানই ভক্তির পাকে ঘন হইয়া শ্রীমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলে। ভক্তির সাহায্য ব্যতীত শত সাধনাতে ভাই! ঐ শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ করা যায় না। বৈষ্ণবাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন,—"তন্মূর্ত্তত্বং খলু ভক্তি ভাবিতেন হৃদা গ্রাহ্যং, গান্ধর্ব্ববাসিতেন শ্রোত্রেণ রাগমূর্ত্তত্বমিব।"

(গোবিন্দভাষ্য ৩।২।১৭)

ভাই রে! ওস্তাদ গায়কের মুখে গান শুনিয়া শুনিয়া যদি তোমার কাণ তৈয়রী হইয়া থাকে, তবেই তোমার কাণে রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি প্রকাশ পাইবে। গান শুনিলেই বুঝিতে পারিবে,—ইহা অমুক রাগ বা অমুক রাগিণী। অপরে কিন্তু তাহা পারিবে না। এইরূপে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির সাধন করিতে করিতে

যাঁহাদের হৃদয় তৈয়ারা হইয়াছে, তাঁহাদের কাছেই সাকার শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অপরের কাছে নহে।

ভাই রে! অন্তরে ভক্তি নাই বলিয়াই আমরা শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারি না। তা বলিয়া বড় গলা করিয়া "মায়ের মূর্ত্তি নাই" বলাটা কি আমাদের সাজে,—না ভাল দেখায়? নয়ন নাই বলিয়াই আমি সূর্য্যের প্রকাশ দেখিতে পাই না। তাই বলিয়া কি আমি বলিব যে,—সূর্য্যের প্রকাশ নাই? আমারই মত যাহারা অন্ধ, তাহারা আমার এ কথায় সায় দিলেও, যাঁহারা চক্ষুষ্মান তাঁহারা তাহাতে সায় দিতে পারিবেন না।

ভাই রে! এই ভক্তিনয়ন-খোলা বিশ্বভোলা মহাজন কেবল অন্তরে নহে, বিশ্ব জুড়িয়া বাহিরেও মায়ের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। শুধু দর্শন নয় রে ভাই! মাকে লইয়া ভাবের অনুরূপ কত খেলাই খেলিয়া থাকেন। সে নয়নে বঞ্চিত আমরা, সে খেলার খবর কি করিয়া রাখিব বল?

ভাই রে! করুণার প্রেরণায় মা আমার আপনাকে বিশ্ব জুড়িয়া বিছাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বড় আদরের বড় সোহাগের বড় ভালবাসার সন্তান আমরা কোন অলক্ষ্য কারণে কোন অনিরূপিত কাল হইতে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আছি। এটা কিন্তু তাঁহার আদৌ ভাল লাগে না। তিনি চান যে, আমরা সংসারে ধুলা কাদা মাখিয়া যে খেলায় মাতিয়া আছি, সে খেলা ছাড়িয়া একবার তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখি। তাহা হইলেই তিনি আমাদের মুখে চুমা খাইয়া কোলে টানিয়া তুলেন। তার পর আস্তে আস্তে ধুলাকাদা মুছাইয়া "মায়ের ছেলে" বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত করিয়া তুলেন। কিন্তু ভাই! তাঁহার করুণার চেয়ে যে আমাদের দুর্দ্দৈবের মাত্রা অত্যন্ত অধিক। তাই না চাহিতে চাহিতে দেখা পাইবার মত নিকট হইতেও নিকটতম প্রদেশে তিনি নিরন্তর আপনাকে রাখিয়া দিলেও, অভাগা আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না,—তাঁহার সোহাগভরা সুধার বাণীও শুনিতে পাই না। মা! মা! মা! এ দুর্দ্দৈব আমাদের কবে ঘুচিবে মা?

ভাই রে! এই করুণাময়ী মা আমার যখন সন্তান আমাদের জন্য জগৎ জুড়িয়া আপনাকে রাখিয়া দিয়াছেন, তিনি নাই এমন কোন ঠাঁই-ই যখন নাই, তখন তাঁহার আসাই বা কি, আর যাওয়াই বা কি? তাঁহাতে ভরা এ বিশ্বের কোন্ স্থান হইতে অন্য কোন্ স্থানেই বা তিনি আগমন করিবেন?

ভাই রে! মায়ের আগম-নিগম সমস্যার ঐরূপ সমাধান করিয়া জ্ঞানী যিনি,

তিনি আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত যিনি, তিনি উক্ত সমস্যার ওরূপ সমাধান করিবেন না। তিনি বলিবেন,—মা আমার করুণাময়ী, আমাদের একরত্তি দুঃখও তিনি দেখিতে পারেন না। তাই, যখন আমাদের হৃদয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য—তাঁহার শোভন মুখের মোহন বাণী শুনিবার জন্য—ভাবময়ীর অঙ্গে অঙ্গে ভাব-কদম্বের বিকাশ-রঙ্গ উপভোগ করিবার জন্য,—তাঁহাকে দুইটা প্রাণের কথা শুনাইবার জন্য,—মান-অভিমান জানাইবার জন্য,—আরও কত শত কত বিষয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তিনি যেখানেই আর যে ভাবেই থাকুন না কেন, না আসিয়া কিছুতেই থাকিতে পারেন না। প্রাণের সাড়া একটু পাইলে হয়, অমনি তিনি আসিয়া উপস্থিত! আসিয়া তিনি করেন কি? —অমিয় বাণীতে—ভক্তিধনে ধনী ভক্তবৃন্দকে আশ্বস্ত করিয়া—মিলিয়া-মিশিয়া কত কি ভাবের খেলা খেলিয়া—তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া—চলিয়া যান। ভক্তের কাছে ইহাই হইল—মা'য়ের আসা যাওয়া।

আমি যে ভাই! ভাগ্যদোষে ভক্ত, জ্ঞানী, কোন শ্রেণীরই নই,—মা'য়ের এ আসা-যাওয়ার মর্ম্ম কি বুঝিব ভাই? মাটীর মধ্যে মজিয়া আমি যে ভাই মাটীই হইয়া গিয়াছি। চিন্ময়ী মা-টীকে ভাই! কি করিয়া চিনিব? চিন্ময়ী মা আমার কাছে মৃন্ময়ী হইয়া গিয়াছেন। তাই আমি মৃন্ময়ী প্রতিমার আসা-যাওয়াই মা'য়ের আসা-যাওয়া বুঝিয়া থাকি। আমার মত বিষয়ীর কাছে ইহাই হইল—মা'য়ের আসা-যাওয়া।

মা, মা, মা! শুনিয়াছি—তোর আসা-যাওয়ার মর্ম্ম বুঝিলে, এ সংসারে আসা-যাওয়া চিরতরে ঘুচিয়া যায়। সন্তাপে ভরা এখানকার সংসারের পরিবর্ত্তে তোর আনন্দ সাম্রাজ্যই লাভের বিষয় হয়। সাধনহীন ভজনহীন আমরা তো তাহা বুঝিলাম না; আমাদের গতি কি হইবে মা?

শব্দ।

শব্দ হি তালা, শব্দ হি কুঞ্জি,
শব্দ হি শব্দ ভেয় উজিয়ারা।
যো জানে শব্দ কি ভেদা,
আপে কর্ত্তা আপে দেবা॥

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ

দরিদ্রালয়ে দশভুজা।

(১)

মিত্রবর * * * দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
"দেড়খানা" ঘরে করি অসাধ্য সাধন,
ক'রেছেন মাতৃপূজা আনি মূর্ত্তি দশভুজা,
আমার কি সাধ্য তাহা করিব বর্ণন।

(২)

হেরিয়াছে বহু পূজা অভাগা জীবনে,
কভু হেন ভাব তার জাগেনি পরাণে।
বিনা অর্থ লোক বল, ল'য়ে চক্ষে অশ্রুজল,
অসম্ভব দুর্গাপূজা ভাবিত সে মনে।

(৩)

হেরি এই পূজা তার হয়েছে ধারণা,
ভক্তিতেই হ'তে পারে দেবী-আরাধনা।
আছে যার প্রাণে ভক্তি, সে লভে হৃদয়ে শক্তি,
দারিদ্র্য রোধিতে নারে তাহার বাসনা।

(৪)

মর্ম্মভেদী পুত্রশোকে ঔদাস্য ভীষণ,
করিয়াছে অধিকার যাহার জীবন,
পরম ভকতিভরে নিজে মাতৃপূজা করে,
স্থাপি মৃত পুত্র চিত্র সম্মুখে আপন।

(৫)

এ হেন অদ্ভুত দৃশ্য করি দরশন,
স্তম্ভিত হইয়া ছিনু পাষাণ যেমন।

হায় কতক্ষণ ধ'রে অম্বিকা আনন হেরে
করিলাম বহুকষ্টে শোক সম্বরণ।

(৬)

ভাই! ধন কিংবা তেজোগর্ব্ব ছিল না তোমার;
সকলেরি দেখি আছে কিছু অহঙ্কার।
গর্ব্বহীন পূজা যার কিসের ভাবনা তার
আপনি আসেন দুর্গা করিতে উদ্ধার।

(৭)

চির প্রচলিত প্রথা জীব বলিদান,
কেন যে হ'ল না তার কে বুঝে সন্ধান।
ছাগাদিতে এবে মার হয় নাক তৃপ্তি আর
ইচ্ছা তাঁর দাও বলি স্বার্থ অভিমান।

(৮)

পুরাকালে বহুনিধি ছিল সবাকার,
এখন হয়েছে যাহা অভাব তাহার,
তাই শুধু ভাগ্যধনে, প্রার্থিত দেবী-চরণে,
দারিদ্র্য কবল হ'তে পাইতে নিস্তার।

(৯)

এখন মোদের দশা করিয়া স্মরণ,
ভাবি হেন কামনার নাহি প্রয়োজন।
মনের বাসনা যাহা, ব্রহ্মময়ী পদে তাহা
সমর্পি নিশ্চিন্ত হোক সাধু ভক্তজন।

(১০)

নিষ্কাম পূজার বিধি শাস্ত্রে যদি থাকে
বড় সাধ সেই ভাবে পূজ তুমি মাকে।
শাস্ত্রী মহাশয় যিনি, অধ্যাপক শিরোমণি
এ তত্ত্ব মীমাংসা কোরো জিজ্ঞাসি তাঁহাকে?

শ্রীঃ—

দিবস ও রজনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

দিবস-পতি অস্তাচলে উপনীত। নিশানাথও ক্ষীণ দৃষ্টিতে অবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সায়ংকাল উপস্থিত। কি আশ্চর্য্য! আমি একাকী এই নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়া প্রকৃতি মণ্ডলীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। কি এক ব্যাধি জন্মিয়াছে, কেবল তর্ক আর মীমাংসা। হে বিশ্বকর্ত্তা! তুমি মানুষের মনকে কি আশ্চর্য্য ভাবে সৃষ্টি করিয়াছ। এ নির্জ্জন প্রদেশে কে আমার তর্ক, মীমাংসা শুনিবে? এস তুমি আমার সখা-ভাবে পার্শ্বে দাঁড়াও, তোমাকেই মনের কথা বলিব। আচ্ছা সখা, জিজ্ঞাসা করি, দিবস কি জানিতে হইলে দিবস-পতি কি আগে জানা আবশ্যক। ইনি প্রতিদিন যথা সময়ে আগমন করিয়া জীবগণকে কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছেন, আবার যথা সময়ে অদৃশ্য হইতেছেন। ইনি কে? আমি দেখিতেছি ইনি অনন্ত কালের পরিমাণ কর্ত্তা। এই যে দিবস ও রজনী, মাস ও সম্বৎসর, যুগ ও যুগান্তর পরিগণিত হইতেছে, এই পরিমাণের কর্ত্তাই ইনি।

দিবস ও রজনী! বিশ্বের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! আমরা অভ্যাস বশতঃ এই ভীষণ ভাবান্তরকে সাধারণ ভাবে দেখিতেছি। যাঁহার দ্বারা এই ভীষণ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, নিশ্চয় তিনি অসীমশক্তিসম্পন্ন। যিনি কালচক্র ঘূর্ণনের কর্ত্তা, যিনি জন্ম, মৃত্যু, সুষুপ্তি, চৈতন্য, অজ্ঞান ও অন্ধকারের কর্ত্তা, তিনিই বিশ্বনিয়ন্তা।

হাঁ সখা! তবে কি ওই উজ্জ্বল রত্নই তুমি? কোটী কোটী জ্যোতিতে পাঞ্চভৌতিক জীবের দেহে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে সজীব করিতেছ, কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ? তুমিই সকল জীবের জীবন। জীবগণ এই সূর্য্য ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না। অতএব এই সূর্য্যই তোমার মূর্ত্তি। অথবা একমাত্র সূর্য্যই তোমার মূর্ত্তি, কেমন করিয়া বলি। আমি যখন তোমাকে এই বিশ্বের

প্রত্যেক বস্তুতে বিভিন্ন ভাবে অবলোকন করি, তখন তোমার স্বরূপ নির্ণয়ে আমার বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়, কিন্তু আমি এই দীপ্তিমান অসীম শক্তি সম্পন্ন পরমাদ্ভুত বস্তুকে সন্দর্শন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইতেছি, কারণ যখনই ঐ উজ্জ্বল পদার্থের বিশ্বের উপর শক্তির আলোচনা করি তখনই ইঁহাকে এক মহাশক্তি-সম্পন্ন এক মহাপুরুষ বলিয়া অনুমান হয়। এই দেখুন, কি ভ্রম! মহাশক্তি-সম্পন্ন মাহপুরুষ! তুমি বই আর সে কে? আবার ঘুরে ফিরে সেই এক কথা। কিন্তু মনটা তোমাকে আদিত্য বলিয়া ধরিতে ইতস্ততঃ করে, কেন করে যদিও তাহার বিশেষ কারণ বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, তথাপি মনে হয় তুমি কি এক অব্যক্ত ব্যক্তি; সমুদয় দৃশ্যমান পদার্থের কর্ত্তা, পরিচালক। যাক্, কোথাকার কথা কোথায় আনিলাম। দিবসের বিচার! না, এখন তোমার বিচার আরম্ভ হইল বুঝিয়াছিলাম দিবসপতির স্বরূপত্ব, প্রভুত্ব ও কার্য্যকারিত্ব নির্ণীত হইলে দিবসের কার্য্যকারিত্ব নির্ণীত হইবে। এই নির্জ্জন প্রদেশে তোমাকেই সখা ভাবে সম্বোধন করিয়া সেই বিষয়ের তর্ক ও মীমাংসা আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি যেমন অদৃশ্য হইয়া দৃশ্যমান্ পরমাত্মীয়ের ন্যায় মনের প্রীতি ঘটাইতে পটু, ইনিই তেমনি দৃশ্যমান্ হইয়াও নিজ পরিচয় দানে কৃপণ। যখন দিবসপতির গুণ গরিমার ইয়ত্তা করা যায় না, তখন দিবসের বিচার কিরূপে সম্ভব। আমার ন্যায় জীবের এরূপ গুরুতর বিষয়ের তর্ক ও মীমাংসা করিবার চেষ্টা করাই ধৃষ্টতা। আমাদের মহর্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের যোগ্য। কারণ তাঁহাদের বাক্য সারগর্ভ, ভাবপূর্ণ ও সত্য। তাঁহারা বলেন, ঐ অসীম তেজা আদিত্যই অমৃত, আদিত্য হইতেই মেঘমালা উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতেই বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে রস ও শস্যাদি, রস ও শস্যাদিই অমৃত। বুধগণ আরও বলেন তুমি আত্মা-রূপে সমুদয় জগতে পরিব্যাপ্ত আছ। সূর্য্যরশ্মিও সমুদয় জগৎ উদ্ভাসিত করিতে-ছেন, মোক্ষপরায়ণ মহাত্মাগণ তোমাকে তেজঃস্বরূপ ভাবিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন। আরও দেখ সখা! আমাদের ব্রাহ্মণগণ দিবসে তিনবার আদিত্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বেদ বিহিত আদিত্যের উপাসনা স্থলে বলিয়া থাকেন, "হে পরম পুরুষ! তুমি দেবগণের চক্ষু, স্থাবর জঙ্গমের আত্মা, সর্ব্বদেবময়; তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই রুদ্র, তোমার জ্যোতিই জীবের আত্মা—জন্ম, মৃত্যু, ভয় বিনাশক, চৈতন্যরূপা; আমরা ঐ জ্যোতিরই ধ্যান করিতেছি।" তাহা হইলে সখা, আদিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে মোহ প্রাপ্ত হইবার কারণও বিলক্ষণ রহিয়াছে। যাহা হউক বুঝিলাম দিবস ও দিবসপতির শক্তি অসীম, অব্যক্ত, অচিন্তনীয়। যাক্

সখা! দিবস কি তাহার যথেষ্ট মীমাংসা হইয়াছে। এইত সূর্য্যদেব অদৃশ্য হইয়া-ছেন, নিশাপতি উদিত। আর রজনী কি, এ কথা লইয়া তর্ক করিব না। এখন জিজ্ঞাসা করি, দিবস ও রজনী এ দুয়ের মধ্যে ভাল কোন্‌টী। আগে উভয়ের দোষ-গুণ বিচার আবশ্যক, তাহার পর বিচার ও মীমাংসা। সখা! তোমার সংসারে বিপরীত ভাবাপন্ন পদার্থই বিস্তর। সেই গুলিতেই জগৎ সজীব হইয়া চলিতেছে। যেমন আলো ও আঁধার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। আলোক উল্লাসকর, আঁধার ভয়াবহ। তাহাই যদি হইল তাহা হইলে কি দিবস আনন্দময়, রজনী ভীতিপ্রদ। তাহাই বা কি করিয়া বলি। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, অন্ধকার হিংস্র ও তমোগুণসম্পন্ন জীবের পক্ষে ভাল, কিন্তু সেই অন্ধকারই আবার মোক্ষপরায়ণ মহাত্মাদিগের বাঞ্ছনীয়। যাক্, দিবস রজনীর বিচার করিলে এত উচ্চ ভাব ধরিলে বিচার ঠিক হইবে না, সাধারণ ভাবে দোষ গুণ বিচার করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে।

প্রথমতঃ এই দেখা যায় মানুষ উদয়াস্ত গুরুতর পরিশ্রম করিয়া রজনীতে শয্যা গ্রহণ পূর্ব্বক আঃ শান্তি বলিয়া নিদ্রাদেবীর বশীভূত হয়। রজনীই জীবের ক্লেশ ভার লাঘব করে, কিন্তু সখা! এ কথাও ত বেশ বলা চলে, সেই ক্লেশাপনোদনের অনুভূতি প্রভাতেই হইয়া থাকে। রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় সে সুখের অনুভব হয় না। যে সময়ে সুখের অনুভব হয়, সেই সময়ই উত্তম, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে রজনী অপেক্ষা দিবস মানুষের পক্ষে অধিক সুখদায়ক। বাস্তবিক, কি এক রোগ জন্মিয়াছে, এ মীমাংসাতে সন্তুষ্ট হইতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, কেন না মানুষ যেমন জাগরিত হইল, রাত্রির নিদ্রার সুখ অনুভব করিতে না করিতে অনন্ত চিন্তা পর্ব্বতের ন্যায় মাথার ভিতর প্রবেশ করিল। সেই ক্লিষ্ট মস্তকে আবার ছোটাছুটী, দৌড়াদৌড়ি, আবার হাস্য, রোদন, চীৎকার বিবিধ ভঙ্গী। আবার দেখ সেই দুঃখ অবসানের উপায় নিদ্রা। শান্তি স্বরূপিণী মনো-মোহিনী বিভাবরী আবির্ভূত হইয়া ঘুমপাড়া মন্ত্রে সকলের উন্মত্ত ভাব দূরীভূত করেন। তাহাহইলে সখা! সুখদায়িনী রজনীকে দিবস অপেক্ষা অধিক প্রীতিপ্রদ বলিতেই হইবে।

বড়ই বিপদে পড়িলাম, দেখিতেছি কোন মীমাংসাই হয় না, তুমিও কিছু বলিবে না, কেবল মনের মধ্যে গোলমাল লাগাইয়া পাশে দাঁড়াইয়া হাঁসিতেছ।

যাক্, এ কথা সত্য সমস্ত রজনী কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা যাওয়া কিছু নয়। সাধক কবি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,—

"আধ জনম হাম নিদে গোঁয়াইনু
জরা শিশু কত দিন গেলা,
যৌবন যুবতী রস রঙ্গে মজিনু
তোঁহে ভজব কোন্ বেলা ?"

দিবস রজনীকে যখন যে ভাবে ধরিতেছি তখন সেই ভাবই মনোরম হইতেছে। বুঝিয়াছি তোমার সব ভাবই ভাল। দেখ, দিবস রজনীর অন্য সংজ্ঞা কাল বা তুমি। সে কালটীর আদি অন্ত স্থির হয় না। মনে কর, সে কালটী একটী কাষ্ঠফলক তাহার আদি অন্ত নাই। কাষ্ঠফলকটী কাল ও সাদা রঙ্গে চিত্রিত, তাহার উপর একটী সাদা দাগ ও একটী কাল দাগ আছে। এখন বিচার আরম্ভ হইল কোন দাগটী মনোরম, সাদাটী না কালটী ? এখন দেখিতেছি একের মনোহারিত্ব অপরটীর দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহা হইলেই বুঝিতেছি তোমার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কোন্‌টী ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহার মীমাংসা তুমিই করিতে পার, মানুষের দ্বারা হয় না।

প্রেম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাস।

সর্ব্ব জীবে সম দৃষ্টি, নাহি ভিন্ন জ্ঞান,
পর কষ্ট হেরি যার ব্যথিত পরাণ,
আপনার মত ভাবি—পরের সেবায়
নিয়োজিত করি প্রাণ—সময় কাটায়,
পরদুঃখ স্মরি' যার সদা আঁখি ঝরে,
সেই প্রেম অধিকারী ভুবন ভিতরে।
প্রেম রাজ্যে সেই প্রেমী,—নতুবা সকল
স্বার্থময়, প্রবঞ্চনা, কৌশল কেবল।

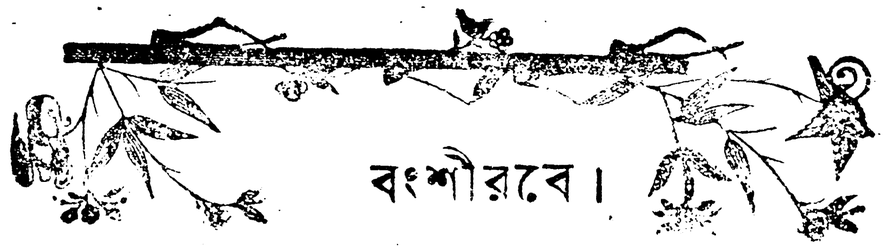

বংশীরবে।

রাধার নামে সাধা বাঁশী দিন দুপুরে বাজলো যবে।
বইলো উজান যম-অনুজা প্রেমের ভাবে আকুল রবে॥
মুখের তৃণ ফেলিয়া ভূমে পুচ্ছ তুলি ধাইল ধেনু।
ধাইল গোপাল গো-পাল সহ যথায় বাজে মোহন বেণু॥
ব্রজের মাঝে শ্রীরাধিকার হইল অতি আকুল হিয়া।
দিন দুপুরে কেমনে যাবে লোক-লোচনে ধুলি দিয়া ?
ডাক্‌লো রাধা আপন মনে—'শুন ওহে বংশী-বদন।
দিন দুপুরে কর্‌চো কেন আমার নামে বংশী বাদন॥
দুরজন শাশুড়ী গেহে, প্রহরিণী তায় ননদিনী।
কেমন করে মিশবো গিয়ে বল ওহে শ্যাম গুণমণি!
জলে যাবার নয়কো সময় কেমন করে যাই হে জলে।
বাজইও না মোহন বাঁশী শুন্‌লে বাঁশী হিয়া জ্বলে॥
তোর কারণে বল্‌ছে বাঁশী কুলের কলঙ্কিনী সবে।
সরম ভরম সকল গেল কেবল বাঁশী তোমার রবে॥'

বসন্ত ও তাহার প্রতিকার

Pox and its remedy.

লেখক—রাজবৈদ্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন কবীন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

নানা উপদ্রবযুক্ত ঘোরতর জ্বর বিশিষ্ট মসূরিকাকেই "শীতলা" বলে। "পানি বসন্ত" (Chicken Pox) এক জাতীয় সংক্রামক তীব্র বিস্ফোটক জ্বর। ইহা অতিশয় মৃদুপ্রকৃতির রোগের মধ্যে পরিগণিত। ইহাতে ভীষণ লক্ষণাদি প্রায় কখনও জন্মিতে দেখা যায় না। ইহা বসন্তের (small pox) সহিত এক সময়ে একই রোগীতে লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বসন্তরোগ হইতে

উৎপন্ন হয় না। "পানিবসন্ত" প্রধানতঃ বাল্যবস্থাতেই আক্রমণ করে। বসন্ত বিস্ফোটকের ন্যায় পানিবসন্তের বিস্ফোটকও বিবিধ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। ইহারাও যথাক্রমে প্রথমতঃ শক্তদানা (শক্তগোটী), তৎপরে জলপূর্ণ ও পূঁজপূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রবল বা কষ্টদায়ক কোন লক্ষণ সচারাচর দৃষ্ট হয় না। মৃদু প্রকৃতির বসন্ত ও কঠোর প্রকৃতির "পানিবসন্তের" পার্থক্য নির্ণয় সময় সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। নিতান্ত শিশু, দুর্ব্বল, সম্যক্ অপরিপুষ্ট ও অপরিবর্দ্ধিত শিশুগণ ব্যতীত ইহাতে প্রায় সকল স্থলেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে না। ইহাতে রোগারোগ্যের পর গাত্রের দাগ স্থায়ী হয় না।

"হাম" ও (Measles) একপ্রকার তীব্র বিস্ফোটক জ্বর। ইহা সংক্রামক ধর্ম্মবিশিষ্ট। বসন্ত রোগের ন্যায় ইহাও শীতাবসানে বসন্ত ঋতুর সমাগমে প্রাদুর্ভূত হয়। ইহা শৈশব ও বাল্যকালের রোগের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ছয়মাস বয়সের পরেই শিশুদের শরীরে ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক দৃষ্ট হয়। এক বা দুই বৎসর বয়সকালে জননীর পক্ষে শিশুদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত লালন পালন করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। ইহা করিলে অনেক সময় হামের আক্রমণ হইতে শিশুদিগকে রক্ষা করা যায়। কারণ—জননীর স্তন্য বিকৃত না হইলে কিম্বা তাহার শরীর অসুস্থ না থাকিলে শিশুদিগের রোগ সম্ভাবনা খুবকমই হইয়া থাকে। ইহা বিক্ষিপ্তভাবে দুই একজন বা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে সংক্রামিত হয় না। প্রায়ই ইহা "জনপদ সংক্রামক" ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে রোগীর তালুতে কঠিন রক্তবর্ণ দানা সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহাই হামের (Measles) আক্রমণ নির্ণয় করিবার প্রথম অবলম্বন। ইহার সহিত প্রায়ই কফ প্রাধান্য ও তজ্জনিত লক্ষণাদি, প্রতিশ্যায় (নাসাস্রাব) রক্তাভ চক্ষু, অশ্রুপ্রবাহ, শুষ্ক ভগ্ন স্বর বিশিষ্ট কাশ বিদ্যমান থাকে। বায়ুনালী ও ফুস্‌ফুসের প্রদাহই ইহার সর্ব্বপ্রধান উপসর্গ। প্রথম আক্রমণ অবস্থাতেই ইহা অধিক সংক্রামক হয়।

ইহাতে পর পর তিনটি অবস্থা হইয়া থাকে। কফপ্রাধান্য, বিস্ফোটক ও শোষণ অবস্থা। ইহাদের কোনটরই স্থিতিকালের কোনও নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন সময় কফপ্রধান অবস্থা ২০ দিন বা ততোধিক সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। কোন কোন স্থলে কফ থাকেও না, আবার কোন কোন স্থলে বিস্ফোটকশূন্য "হাম" ও দৃষ্ট হইয়া থাকে! গ্রীষ্ম বা শীতকালের অধিক প্রাখর্য্য, দূষিত জল ও বায়ু, অযথা আহার ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চরণে বিঘ্ন প্রভৃতি কারণে ইহার

মারাত্মকতা অধিক হয়।

শ্বাসগ্রহণ, নাসিকা ও শ্বাস নালীর স্রাব, অশ্রুজল, ও বিস্ফোটকের শুষ্কত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা ইহার বিষ জনান্তরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। রক্তিম জ্বরের বিষ অপেক্ষা ইহার বিষ অধিক প্রবল, কিন্তু "বসন্তের" বিষ অপেক্ষা হীনবল।

আয়ুর্ব্বেদে "মসূরিকা" বলিলে বসন্ত জাতীয় রোগ বুঝায়। আয়ুর্ব্বেদ ইহার নানাপ্রকার ভেদ বর্ণিত থাকিলেও এই প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ ৩টি মাত্র প্রধান ভেদ বলা হইতেছে।

(১) বসন্ত (মসূরিকা বা শীতলা small pox,) (২) পানিবসন্ত (Chicken pox) এবং হাম (measles) রোগের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি :—

(১) যদাহ মাধবনিদানে—"মসূরিকা" (small pox)

কটুম্লবণক্ষার বিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ।
দুষ্ট নিষ্পাবশাকাদ্যৈঃ প্রদুষ্টপবনোদকৈঃ॥
ক্রূরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষাঃ সমুদ্ধতাঃ।
জনয়ন্তি শরীরেঽস্মিন্ দুষ্টরক্তেন সঙ্গতাঃ॥
মসূরাকৃতি সংস্থানাঃ পিড়কাঃ স্যুর্মসূরিকা।
তাসাং পূর্ব্বং জ্বরঃ কণ্ডূর্গাত্রভঙ্গোঽরতির্ভ্রমঃ।
ত্বচি শোথঃ সবৈবর্ণ্যো নেত্ররাগশ্চ জায়তে॥

(১) মাধব নিদানে মসূরিকা (বসন্ত বা শীতলা) রোগের নিদান যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। কটু (ঝাল), অম্ল, লবণ ও ক্ষারদ্রব্য ভোজন, মিলিত দুগ্ধ মৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন, বিষ কুসুমাদির সংস্পর্শে দূষিত বায়ু ও জলের সেবন এবং দেশের প্রতি শনি প্রভৃতি ক্রূর গ্রহের দৃষ্টি প্রভৃতি কারণে প্রকুপিত বাতাদি দোষ সংক্রামক বিষ দ্বারা প্রদুষ্ট রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূর কলায়ের মত আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট যে পিড়কা সমূহ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে মসূরিকা বা বসন্ত বা শীতলা বলে। এই রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে জ্বর, কণ্ডূ (চুলকানি), গাত্র বেদনা, চিত্তের অস্থিরতা, ভ্রম, চর্ম্মের স্ফীততা ও বিবর্ণতা এবং চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(১ক) যদাহ চরকসংহিতায়াং—মসূরিকা (smali pox.)

"যাঃ সর্ব্বগাত্রেষু মসূরমাত্রা মসূরিকাঃ পিত্তকফাৎ প্রদিষ্টাঃ।
বিসর্পশান্তৌ বিহিতা ক্রিয়া যা তাং তাসু কুর্য্যে চ হিতাং বিদধ্যাৎ॥"

(১ক) চরক সংহিতায় মসূরিকা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত

হইতেছে। প্রদুষ্ট পিত্ত ও কফ হইতে সমস্ত শরীরে মসূর কলায়ের পরিমাণ যে শোথ জন্মে, তাহাকেই মসূরিকা, বসন্ত বা শীতলা বলে। ইহাতে পিত্ত-শ্লেষ্ম জনিত বিসর্পোক্ত এবং পিত্তশ্লেষ্মজনিত কুষ্ঠোক্ত বিধান সমূহ পালন করা কর্ত্তব্য।

(১খ) যদাহ সুশ্রুত সংহিতায়াং—মসূরিকা (small pox)

"দাহ-জ্বর-রুজাবন্তস্তাম্রাঃ স্ফোটাঃ সপীতকাঃ।
গাত্রেষু বদনে চান্তর্বিজ্ঞেয়া স্তা মসূরিকাঃ॥"

(১খ) সুশ্রুত সংহিতায় মসূরিকা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে। শরীরে, বদনে ও দেহাভ্যন্তরে দাহ জ্বর ও বেদনাযুক্ত যে সকল তাম্রবর্ণ ও পীতবর্ণ পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে "মসূরিকা" বসন্ত বা শীতলা বলে।

(১গ) যদাহ অষ্টাঙ্গহৃদয়ে—মসূরিকা (small pox.)

"গাত্রেস্বন্তশ্চ বক্ত্রস্য দাহজ্বররুজান্বিতাঃ।
মসূরমাত্রাস্তদ্বর্ণাস্তৎসংজ্ঞা পিটিকাঘনাঃ।
ততঃ কষ্টতরাঃ স্ফোটা বিস্ফোটাখ্যা মহারুজাঃ॥

(১গ) অষ্টাঙ্গহৃদয়ে মসূরিকা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে। সর্ব্বশরীরে, বদনাভ্যন্তরে ঘন সন্নিবিষ্ট মসূর পরিমাণ ও মসূরবর্ণ, দাহ, জ্বর ও বেদনাযুক্ত যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে মসূরিকা, বসন্ত বা শীতলা বলে। ইহা হইতে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও ক্লেশকর যে সকল স্ফোটক জন্মে, তাহারা "বিস্ফোটক" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(১ঘ) যদাহ সিদ্ধান্তনিদানে—বৃহন্মসূরিকা—

"ভূবায়ুর্জলদোষাদের্ভবন্ত্যাগন্তু হেতবঃ।
সংক্রামিণ্যো বিশেষেণ নিদাঘাদৌ মধৌ চতাঃ॥
মসূরাকার পিড়কাঃ সান্দ্রা গাত্রেষু সর্ব্বতঃ।
ভবন্তি পাকং গচ্ছন্তি লীয়ন্তে চ দ্রুতং যতঃ॥
নানোপদ্রবসংযুক্তো জ্বরো যত্র চ দারুণ।
বৃহন্মসূরিকা নাম শীতলা চেতি সা স্মৃতা॥
তারতম্যেন দোষাণাং বিষস্যচ বলাবলাৎ।
পৃথগ্ বাহত্যন্তসান্দ্রা বা সরক্তা বা ভবন্তি তাঃ॥

(১ঘ) সিদ্ধান্তনিদানে মসূরিকা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে। ভূ, বায়, জল এবং মসূরিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে দোষ

হইতেই এই আগন্তুহেতুসম্ভূত মসূরিকা বসন্ত বা শীতলা রোগ জন্মে। বিশেষতঃ ইহা গ্রীষ্মের আদিতে বসন্ত ঋতুর প্রাক্কালে সংক্রামক হইয়া থাকে। ইহার পিড়কা সমূহ মসূরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও সমস্ত শরীরে ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে জন্মে। উহারা শীঘ্র পাকে ও শীঘ্রই লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাতে নানা উপদ্রব যুক্ত ঘোরতর জ্বর হইলে তাহাকে "বৃহৎ মসূরিকা" বা "শীতলা" বলে। প্রদুষ্ট দোষের তারতম্য অনুসারে ও বিষের বলাবল অনুসারে পিড়কা সমূহ পৃথক্ ভাবে সন্নিবিষ্ট, অত্যন্ত ঘন সান্নিবিষ্ট, কিম্বা সরক্ত হইয়া থাকে। উক্ত "শীতলা মসূরিকা" ভাবপ্রকাশে "শীতলাধিষ্ঠাতা মসূরিকা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"তাসাং পূর্ব্বং জ্বরঃ কণ্ডূর্গাত্রভঙ্গোঽরুচি ভ্রমঃ।
ত্বচি শোথঃ সর্ব্ববর্ণ্যো নেত্ররাগশ্চ প্রায়শঃ॥"

এই রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে জ্বর, কণ্ডূ (চুলকনা), গাত্রবেদনা, অরুচি, ভ্রম, শরীরের চামড়ার উপর শোথ ও বিবর্ণতা সহ রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়ই হইয়া থাকে।

(২) যদাহ মাধবনিদানে—"ত্বগ্‌গতা মসূরিকা" (Chicken pox.)

"তোয়বুদ্বুদসঙ্কাশাস্তগ্‌গতাস্তু মসূরিকাঃ।
স্বল্পদোষাঃ প্রজায়ন্তে ভিন্নাস্তোয়ং স্রবন্তি চ॥"

ত্বগ্‌গত মসূরিকা (পানি বসন্ত)সম্বন্ধে মাধব নিদানে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে—

ত্বগ্‌গত (রসগত মসূরিকা) (পানিবসন্ত) জলের বুদ্বুদের মত আকৃতি-বিশিষ্ট হয়, ইহাতে দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) সামান্য কুপিত হইয়া থাকে। ইহারা বিদীর্ণ হইলে, তাহা হইতে জলবৎ স্রাব হইয়া থাকে।

(২ ক) যদাহ সিদ্ধান্তনিদানে—'লঘু মসূরিকা' (Chicken pox.)

"বিরলাঃ কতিচিৎ যস্য পিড়কাঃ শীঘ্রসম্ভবাঃ।
জ্বরঃ স্বল্পশ্চ তস্যেয়ং জ্ঞেয়া লঘুমসূরিকা॥"

সিদ্ধান্তনিদানে "লঘু মসূরিকা" (পানি বসন্ত) সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

রোগীর পিড়কা সমূহের সংখ্যা অল্প, তাহা শরীরের দূরে দূরে সন্নিবিষ্ট, শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন এবং তৎসহ সামান্য জ্বর হইলে, তাহাকে "লঘু মসূরিকা" বা পানি-বসন্ত বলে।

(৩) যদাহ মাধব নিদানে—"রোমান্তা" (Measles) বা হাম।

"রোমকূপোন্নতি সমা রাগিণ্যঃ কফপিত্তজাঃ।
কাসারোচকসংযুক্তা রোমান্ত্যো জ্বরপূর্ব্বিকাঃ॥"

মাধবনিদানে রোমান্তী (হাম) মসূরিকা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে। লোমকূপের ন্যায় উচ্চ ও রক্তবর্ণ, পিত্ত-কফজ, জ্বর, কাস ও মুখে অরুচিযুক্ত পিড়কাসমূহকে "রোমান্তী" (হাম) বলে।

(৩ ক) যদাহ চরক সংহিতায়াং—"রোমান্তিকা" (Measles) বা হাম।

"ক্ষুদ্রপ্রমাণাঃ পিড়কাঃ শরীরে, সর্ব্বাঙ্গগাঃ সজ্বরদাহতৃষ্ণাঃ।
কণ্ডূযুতাঃ সারুচিপ্রসেকাঃ রোমান্তিকাঃ পিত্তকফাৎ প্রদিষ্টাঃ॥"

(৩ ক) চরক সংহিতায় যাহা "রোমান্তিকা" সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

প্রদুষ্ট কফ ও পিত্ত হইতে সর্ব্বশরীরে ক্ষুদ্র অবয়ব বিশিষ্ট, চুলকনাযুক্ত, অরুচি-সম্পন্ন এবং জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণাযুক্ত যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে "রোমান্তিকা" (Measles) বা হাম বলে।

আয়ুর্ব্বেদে "মসূরিকা" রোগের সংখ্যা ২৭ প্রকার। যথা—বাতিক ৮, পৈত্তিক ৮, শ্লৈষ্মিক ৮, সান্নিপাতিক ১, চর্ম্মদল ১ ও বিশিষ্ট-সান্নিপাতিক ১।

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মসূরিকা সুখসাধ্য (১), কতকগুলি কৃচ্ছ্রসাধ্য (২) এবং কতকগুলি অসাধ্য (৩) বলিয়া ঋষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

(১) পিত্তশ্লেষ্মজ ত্বগ্‌গত (রসগত) পিত্তশ্লেষজ রক্তগত (রক্তদুষ্টির আধিক্য না থাকিলে), পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ "মসূরিকা" সকল সুখসাধ্য।

(২) মেদোগত ও মাংসগত বাতজ, মেদোগত ও মাংসগত বাত-পিত্তজ, মেদোগত-মাংসগত বাত-শ্লেষ্মজ মসূরিকা সকল কৃচ্ছ্রসাধ্য। ইহাদের চিকিৎসা ধীরতা সহকারে ও অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য।

(৩) প্রবালের ন্যায় লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট, জামফল সদৃশ, সান্নিপাতিক, বিশিষ্ট সান্নিপাতিক, চর্ম্মদল, অস্থিমজ্জাগত এবং শুক্রগত মসূরিকা সকল অসাধ্য।

মসূরিকারোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তৃষ্ণার্ত্ত ও "অপতানকাদি" বাতব্যাধি-রোগগ্রস্ত হয় এবং মুখ ব্যতিরেকে কেবল নাসিকা দিয়াই যদি দীর্ঘশ্বাস বাহির করে, তাহা হইলে তাহাকে গতাসু বুঝিবে।

মসূরিকা রোগের নিবৃত্তির পরে কখনও কখনও কনুয়ে, হাতের কব্জিতে এবং স্কন্ধদেশে দুশ্চিকিৎস্য ও অতি কষ্টপ্রদ শোথ উৎপন্ন হয়, ইহাও অসাধ্য, এবং নিম্নোক্ত উপসর্গাদি লক্ষণযুক্ত মসূরিকা সকলও অসাধ্য। যথা—কাস, হিক্কা,

চিত্তবিভ্রম, অতি কষ্টপ্রদ তীব্র জ্বর, প্রলাপ, অস্থির-চিত্ততা, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, অতিনিদ্রা, মুখ, নাসিকা ও চক্ষু হইতে রক্তস্রাব, কণ্ঠে শ্লেষ্মার ঘুর ঘুর শব্দ এবং অতিশয় বেদনার সহিত শ্বাস নির্গম প্রভৃতি।

উপরে যে সকল "মসূরিকা" রোগের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোন মসূরিকা বিনা যত্নে, কোন কোন মসূরিকা যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসায় প্রশমিত হয় এবং কোন কোন মসূরিকা কিছুতেই প্রশমিত হয় না।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীমন্মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী
ও
তাঁহার উপদেশাবলী

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যে মহাত্মার বিষয় স্মরণ করিয়া এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে, তিনি বালানন্দ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত। ইনি শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত যোশী মঠের অন্তর্ভূত আনন্দ-সম্প্রদায় নির্দ্দিষ্ট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য কিরূপ তাহা পরে বিবৃত হইবে। এই মহাত্মা বৈদ্যনাথধামের উপকণ্ঠে অবস্থিত কেরাণীবাদ ও তপোবন নামক স্থানে আজ প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ অবস্থান করিতেছেন। এই বৈদ্যনাথধাম বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশীয় সাঁওতাল পরগণা নামক জেলার অন্তর্গত দেওঘর নামক মহকুমায় অবস্থিত। ইহা ই, আই, রেলওয়ের কর্ড লাইনে যে জসিডি নামক জংসন ষ্টেশন আছে সেখান হইতে পূর্ব্বদিকে ৫ মাইল দূরব্যাপী যে ব্রাঞ্চ লাইন গিয়াছে তাহারই এক মাত্র ষ্টেশন। কলিকাতা হইতে জসিডি ও বৈদ্যনাথধাম নামক ষ্টেশনদ্বয়ের দূরত্ব যথাক্রমে ২০১ ও ২০৫ মাইল। উপরোক্ত বৈদ্যনাথধাম নামক ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে কেরাণীবাদ ও তপোবন যথাক্রমে প্রায় দেড় ও পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

এই বৈদ্যনাথধাম ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে দ্বাদশ

জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বৈদ্যনাথ নামক শিবলিঙ্গ প্রকটিত আছেন। কিরূপে এ তীর্থস্থানের প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। এই প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থানে ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধু ও গৃহস্থগণ তীর্থোপলক্ষে অনবরত গমনাগমন করিয়া থাকেন। এখানে শিবরাত্রি ও অন্যান্য পর্ব্বোপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয় ও বিরাট মেলার প্রতিষ্ঠান হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত এই বৈদ্যনাথ একটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান। এখানকার আব-হাওয়া প্রায় সকল সময়েই উত্তম অবস্থায় থাকে। এজন্য ব্যাধিগ্রস্ত বহু ব্যক্তি ডাক্তারগণের উপদেশমত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এখানে আগমন করেন। এ কারণে এখানে বাঙ্গলাদেশের ও অন্যান্য প্রদেশের বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি মনোরম অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন ও সেখানে আসিয়া বৎসরের কয়েক মাস অবস্থান পূর্ব্বক দেবদর্শন ও স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করেন। ইহা ভিন্ন এই স্থানে বহুপ্রকারের ব্যবসাবাণিজ্যও হইয়া থাকে।

এই বৈদ্যনাথধামে যে সমুদয় ব্যক্তি আগমন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই উপরোক্ত মহাত্মা বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখের অমৃত ময় সুমধুর উপদেশবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। তাঁহার কেরাণীবাদের আশ্রম সনাতন ধর্ম্মের আকর ও কর্ম্মাদি প্রচার কল্পেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে রীতিমত ভাবে দেবসেবা, গোসেবা, অতিথিসেবা, সাধু মহাত্মা গণের প্রতি মর্য্যাদা প্রতিপালন, অন্নদান, বস্ত্রদান, অবৈতনিক চিকিৎ-সার দ্বারা ঔষধিদান ও বিদ্যার্থীগণকে বিনাব্যয়ে টোলপ্রথানুসারে সংস্কৃত বিদ্যাদানের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিদিনই অতি প্রত্যুষ হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত ক্রমান্বয় বেদপাঠ, শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ ও শাস্ত্রীয় নানা বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে প্রায়ই নানারূপ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এ সমুদয় আশ্রমের অনুষ্ঠিত বিষয়গুলি ব্যতীত এখান-কার সহরবাসীরা যাহাতে পরমার্থমার্গে উন্নতি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য উক্ত মহাত্মা নানাভাবে বহু বিষয়ে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে যে তপোবনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা একটী ক্ষুদ্র পাহাড়। সেখানে তপোনাথ নামক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই স্থানই উপরোক্ত মহাত্মার এই বৈদ্যনাথধামে আগমনের প্রথমাবস্থায় অবস্থিতি স্থান ও তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র। এই তপোবনের যাহা কিছু উন্নতি ও প্রসিদ্ধি লাভ, তাহা উক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই মহাত্মা বালানন্দ মহারাজ অযাচিত ভাবে সকলকেই নানাবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। এ সমুদয় উপদেশ শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করিলে লোক সবিশেষ ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ অধম লেখক অনেক সময়ে তাঁহার চরণ সমীপে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার মুখারবিন্দনিঃসৃত জীবনের ঘটনাবলী ও উপদেশ সমূহ আকৃষ্টহৃদয়ে শ্রবণ করিয়াছে ও নিজের স্মরণ জন্য অনেকগুলি লিপিবদ্ধ রাখিয়াছে। এ লেখক তিন পুরুষ ধরিয়া উক্ত মহাত্মার চরণের সেবক। লেখকের খুল্লতাত স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বহুপূর্ব্বে এক সময়ে বঙ্গবাসীর সম্পাদক ছিলেন তিনিও এই মহাত্মার এক পুরাতন ভক্ত শিষ্য ছিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর হইল এ লেখকও উক্ত মহাত্মার শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষালব্ধ শিষ্য। লেখকের একটী পুত্রও সাতবৎসর হইল গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে দীক্ষিত হইয়া উক্ত মহাত্মার চরণ সেবায় নিযুক্ত আছে। এই সমুদয় কারণে এই লেখক দীর্ঘকাল যাবৎ নানাভাবে উক্ত মহাত্মার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইল যে বর্ণিত বিষয়গুলি লেখক নিজের জন্যই নোটবুকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা যে কোনকালে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবে, এরূপ সংকল্প ছিল না। লেখক বৃদ্ধ হইয়াছেন ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় এ সমুদয় প্রকাশের অবসরও আর দেখা দিতেছিল না। অনেকে লেখকের লিখিত বিষয়গুলি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া এইগুলিকে ছাপাইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও লেখক উদাসীন ছিলেন। কিন্তু ভগবদ্ ইচ্ছায় আজ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি "জন্মভূমি"র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত উক্ত বিষয়টী জানিতে পারিয়া লিখিলেন, "জীবনে যদি কোন কামনা থাকে, তন্মধ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বালানন্দজীর শ্রীচরণ দর্শন অন্যতম। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বালানন্দ মহাত্মার জীবনী ও উপদেশাবলী কৃপাপূর্ব্বক সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত ও উপকৃত করিবেন।" যতীন্দ্র বাবুর এই পত্র পাইয়া লেখকের ভগ্নহৃদয়ে কি যেন একপ্রকার উৎসাহ আসিয়া উদয় হইল ও সেই উৎসাহবশেই ইহা "জন্মভূমি"তে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তবে ইহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে এই লেখকের দু চারটী বিনীত নিবেদন আছে। উক্ত মহাত্মার মাতৃভাষা হিন্দি ও লেখক হইতেছেন বাঙ্গালী। মহাত্মা উপদেশ ও ঘটনাবলীর বর্ণনা করিয়াছেন হিন্দি ভাষায়। লেখক ইহা বাঙ্গলা ভাষায় ও বাঙ্গালীদিগের জন্য প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এইজন্য ইহাতে মহাত্মার

মুখনিস্থত হিন্দিভাষার মধুরতা ও তাঁহার সাধুহৃদয়ের উচ্ছ্বাসসমন্বিত ভাব কোন-রূপে পাইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য প্রথমতঃ এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

আর একটু নিবেদন আছে। লেখক সামান্য একখানি পত্র লিখিবার পূর্ব্বেও "শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ" না লিখিয়া পত্র লেখা আরম্ভ করেন না, সুতরাং এই জীবনী ও উপদেশাবলী প্রকাশের পূর্ব্বে তিনি শ্রীগুরুপদ স্মরণ পুরঃসর যে "মঙ্গলাচরণ" "মহাত্মার বদ্ধ জীবকে আকর্ষণ।" "বৈদ্যনাথধাম ও তীর্থ মাহাত্ম্য ও গুরুতত্ত্ব" বিষয় লইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলকে ধীরভাবে পাঠ করিতে হইবে। এ বিষয়গুলি সাধারণের সহিত সম্পর্ক বিবর্জ্জিত, সুতরাং তাঁহাদের এ গুলি রুচিপ্রদ হইবে কি নাজানি না। তাহা হইলেও লেখক বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছেন যে, তিনি এইগুলি লিখিবার সময় যে আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন, পাঠকবর্গও সেই আনন্দে যেন যোগদান করেন। ইহা অভিরুচি না হইলে এই কয়েকটী বিষয় তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াই যাইবেন।

উপক্রমণিকা।

(ক) মঙ্গলাচরণ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

দেব! আপনার শ্রীচরণে এ দাস সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছে। কৃপা পুরঃসর এ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর লইয়া এই বৈদ্যনাথধামে আপনার শ্রীচরণে, একান্ত নির্ভরতা রাখিয়া নীরবে অবস্থান করিব, এইরূপ সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়াই এতদিন বসিয়াছিলাম। শ্রীমুখ হইতে উপদেশ পাইয়াছি,—

"লোকানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা, ত্যক্ত্বা দেহানুবর্ত্তনম।
শাস্ত্রানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা, স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥
লোককামনয়া জন্তোঃ, শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহ বাসনয়া জ্ঞানং, যথাবন্নৈব জায়তে॥"

বিবেকচূড়ামণি ২৭২।৭৩।

অর্থাৎ লোকের অনুবর্ত্তন (সংসর্গ), দেহের অনুবর্ত্তন ও শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন পরিহার করিয়া, তুমি নিজ অভ্যাসের নিরাকরণ কর। লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও শরীরগত বাসনা, এই সকলের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

শ্রুতিও ঠিক এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, যথা—"মুক্তি-কোপনিষদ" ২।৪, অন্যস্থানে আরও বলিয়াছেন যে,—"পুত্রৈষণায়া বিত্তৈষণায়শ্চ লোকৈষণায়াশ্চ বুদ্ধ্যায়াথভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।" (বৃঃ আঃ ৫।৫।)

শ্রীমুখ হইতে প্রাপ্ত, এই সমুদয় শাস্ত্রীয়োপদেশ হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, নীরবে অবস্থান করিব, এই ভাবনাই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম. এবং এজন্য সময়ে সময়ে কিছু লিখিয়া প্রদান করিব, এইরূপ একটা প্রবৃত্তি যাহা হইতেছিল, তাহা দমন করিবার চেষ্টা বরাবর করিয়া আসিয়াছি। আজ কিন্তু তাহা অন্যরূপ হইল। ইহাতে বুঝিলাম যে, এ সংসারে নিজের ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি বা সাময়িক ইচ্ছা, পরম করুণাময়ের অনন্ত ইচ্ছার নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ। তজ্জন্য এক্ষণে, এই যে প্রবৃত্তি ভিন্নস্রোতে যাইবার জন্য অন্যাভিমুখিনী হইল, সেজন্য এইমাত্র বলিতেছি,—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

কারণ, আমি বেশ বুঝিতেছি যে, একদিন যিনি তাঁহার মধুর উপদেশ দ্বারা এই লিখিবার প্রবৃত্তিরূপ স্রোত বন্ধ রাখিয়াছিলেন, আজ তিনিই পুনরায় সেই স্রোত খুলিয়া দিতেছেন। ভাই! তজ্জন্য আমি বলিয়া রাখিতেছি যে ইহাতে আমার "আমিত্ব" কিছুমাত্র নাই।

আরও একদিন, শ্রীমুখ হইতে এই উপদেশ পাইয়াছিলাম যে, "প্রস্ফুটিত সুগন্ধময় গোলাপ পুষ্পোদ্যানের চতুর্দ্দিকে কণ্টকাকৃত বেষ্ঠনে আবৃত রাখাই উত্তম। ইহার কারণ, এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, বাহির হইতে কেহ বায়ু ভরে প্রবাহিত সুগন্ধ নাসারন্ধ্রে গ্রহণ করে করুক, কারণ তাহা বন্ধ করিবার উপায় নাই। কিন্তু যাঁহারা গুরুমুখরূপ একটী মাত্র প্রবেশ দ্বার দিয়া, উক্ত উদ্যানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহারাই ভিতরে যাইয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে উক্ত সুগন্ধ সম্যকরূপে সেবন করে, ইহাই সমীচীন পন্থা। নতুবা উক্ত গোলাপ উদ্যানের চতুর্দ্দিক যদি উন্মুক্ত থাকে তবে, ঐ সুগন্ধ নানালোকে নানাভাবে লইবে ও হয়ত উহা অরুচিকরও হইবে; অথবা পশ্বাদি জন্তুরা এই উদ্যানকে একেবারে উন্মুক্ত পাইয়া, উহা অযাচিতভাবে ব্যবহার করিবে ও পরিশেষে হয়ত উহার ধ্বংস সাধন করিয়া বসিবে।

ইহা যে অতি মহৎ উপদেশ, তাহা নানা দৃষ্টান্তদ্বারা পরিলক্ষিত হইয়াছে। অধুনা, এই ভারতবর্ষের অনেক বিষয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও গুরুমুখী বিদ্যা বা

প্রবেশদ্বার, এখনও সকলের নিকট উন্মুক্ত নাই বলিয়াই এখনও এই কর্ম্মভূমিতে অনেক অমূল্য ধন লুক্কাইত আছে। এই কথাগুলি আমাদের আধুনিক শিক্ষাভিমানী ভ্রাতৃবর্গের রুচিকর হইবে না তাহা বুঝিতেছি, তবে আপাততঃ আভাষ ইঙ্গিতে এইটুকু মাত্রই বলিতেছি যে, যেখানে অন্ধ বিশ্বাস নাই, অথচ আত্মাভিমান আছে; সাধনা নাই, অথচ আকাঙ্খা আছে; শ্রীগুরুতত্ত্ব-বোধ নাই, অথচ শিক্ষাভিমান আছে; গুরুমুখে শাস্ত্রের অধ্যয়ন নাই, অথচ মুদ্রিত পুস্তক নিজ নিজ বোধানুরূপে পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান হইয়াছে— সেরূপ স্থলে উক্ত গুরুমুখী বিদ্যালাভ যে কি বস্তু, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তর্ক-বিতর্ক না উঠাইয়া, এক্ষণে এতটুকু মাত্রই বলা হইল। ইহা শুনিয়াই এখন ক্ষান্ত হইতে হইবে। কারণ, উপরোক্ত বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে পরে পরিস্ফুট করা হইবে। তবে হিন্দু ভ্রাতৃগণকে আমি আরও দুই চারিটী কথা শুনাইব। এই সাধনপথে যাইতে হইলে, বর্ণাশ্রম বিশ্বাসী হইতে হইবে; জন্মান্তর স্বীকার করিয়া নিজ নিজ প্রাক্তন সংস্কার স্বীকার করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে এই ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিবার প্রারব্ধও লাভ করিতে হইবে। এই সমুদয় বিষয় অতিশয় জটিল, এজন্য এককথায় কেন এরূপ করিতে হইবে, বুঝাইবার উপায় নাই। ইহা আধুনিক পাণ্ডিত্যাভিমানীর নিকট অত্যন্ত বিরোধীভাব বিশিষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হইবে। কিন্তু মঙ্গলাচরণ করিতে বসিয়া, আর অধিক বলা উচিত নয়; এই জন্য ক্ষান্ত হইলাম।

ভগবন্! যে প্রবৃত্তি বন্ধ রাখিয়াছিলেন, পুনরায় তাহা কেন উন্মুক্ত করিতেছেন? এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, আপনার যে অনির্ব্বচনীয় শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহা কি বাহিরে একটু প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন? পাঠকগণ! হয়ত হাস্য করিতেছেন। ভাই! অচিন্তনীয়া শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখনও কি চিন্তা করিয়াছেন? এ সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলিতেছেন একবার অবধান করুন—

"তয় হোবাম যং বৈ সোমৈতমনিমানং ন নিভালয়ম্।
এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽনিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি॥"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১২।২

বৎস! যদিও তুমি নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া, এই বীজ কণাটীর মধ্যে যে একটি অতিশয় সূক্ষ্ম অঙ্কুর কণিকা জন্মিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইতেছ না; তাহা হইলেও জানিও, এইরূপ অদৃশ্য ও সূক্ষ্ম অঙ্কুর কণিকা হইতেই, শাখাপ্রশাখাশালী এই বিশাল বটবৃক্ষটি উৎপন্ন হইয়াছে।

বেদমাতা শ্রুতির এই উপদেশ ও জ্ঞানলাভের ঈঙ্গিত শ্রবণ করিলেন? এক্ষণে অপরদিকে, এই ব্যবহার জগতে, আমরা সচরাচর যাহা দেখিতে পাই, তৎপ্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা দেখিতে পাই যে, অতি সূক্ষ্ম হোমিওপ্যাথিক ঔষধের, অতি উচ্চক্রম বা Dilution ব্যবহার ক্ষেত্রে, যদিও অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু উহা ব্যবহৃত হইলে, উহা অতিকষ্টদায়ক শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির শান্তিলাভ করাইয়া উহার অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আবার আজকাল নানা বিজ্ঞানের গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, অতি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মভাবে নানারূপ ব্যাধির বীজাণুসকল অদৃশ্যভাবে জলবায়ুর বীজাণুর সহিত পরিচালিত হইয়া, উহা প্রকাশ্যরূপে নানারূপ উৎকট উৎকট ব্যাধির ও উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

এইটুকু মাত্র বলিয়া, আমি এই নিবেদন করিতেছি যে, শ্রীভগবানের এই অচিন্ত্যশক্তির ক্রীড়ায় কখন কি হয়, ইহা কে বলিতে পারে? এ অধমের এ হৃদয় ক্ষেত্র অতি তুচ্ছ, কিন্তু ইহাতে যে অচিন্ত্য গুরুশক্তির ক্রীড়া করিতেছে তাহাকে ভাই! তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিও না। এই গুরু-শক্তি ধ্যান হইতেছে—

"ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং ত্বং নমামি॥

আপনারা ভাই! এইরূপ ধ্যান করিতে থাকুন। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে ধ্যান করিয়া লইতেছি।

"নিত্যানন্দং পরমপুরুষং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে
নিষ্ঠং নিত্যং তপস্বিনিরতং যেনেযুক্তং মহান্তপং
শান্তং দান্তং পরহিতরতং সুপ্রসন্নাননং শ্রী
বালানন্দং পরমশিবদং সদ্‌গুরুং ত্বং নমামি॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া পুনরায় আমি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শ্রীপাদপদ্মে এই বলিয়া প্রণাম করিতেছি—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভগবন্! প্রণামান্তে এ দেহতরী আপনার শ্রীপাদপদ্মে ন্যস্ত করিলাম। কাতর প্রাণে বহু প্রার্থনা করিতেছি যে দেব! অমানিশার ঘোর অন্ধকারে যেন চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যেন নানারূপ ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা বিধ্বস্ত হইবার মত হইয়াছে। আধিব্যাধিতে জনসাধারণ যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ কর্ম্মক্ষেত্ররূপ ভারতবর্ষ যেন রাজধর্ম্ম প্রজাধর্ম্ম ও আমার ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইবার মত হইয়াছে। তীর্থস্থান সকল কলুষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেব! এই কালিমাপূর্ণ পথে যেন কিঞ্চিৎ আলোক সর্ব্বদা দর্শন করিতে পারি, শ্রীপাদপদ্মে এ দাসের ইহাই একান্ত মিনতি।

(ক্রমশঃ।)

যৌবন।

লেখক—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নাথ রায়।

দুই ধারে দুইজনা সায়াহ্ন প্রভাত;
তরুণ স্বপনে মগ্ন সুখদ সুন্দর,
স্থবিরুগ্ন জীর্ণদেহ লভিয়া অপর,
দারুণ বেদন-ব্যথা অশ্রু একসাথ;
প্রমত্ত অনল-তপ্ত লালসা-সমীর,
বিষম কটাক্ষ-তীক্ষ্ণ সঘন নিশ্বাস,
তাণ্ডব নর্ত্তন ঘোর, তীব্র-শুষ্ক হাস
প্রলয় হুঙ্কার—নাদ প্রচণ্ড গভীর।
মাঝখানে সবা'ল'য়ে খেলে অনুখন;
ভীষণ মধ্যাহ্ন সেই—দুরন্ত যৌবন॥

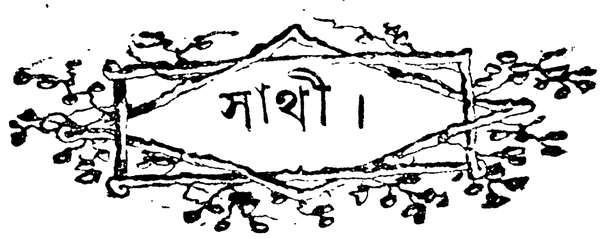

লেখিকা—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু, বি, এ।

তুমি কেবল সাথী হলেই
তবেই ত আমি খেল্‌তে পারি—
এই দেখ না যূঁথীর বনে
বেঁধেছি আমার খেলার বাড়ী—
তুমি রত আপন কাজে,
আমি আমার পুতুল সাজে,
কেমন ক'রে তোমার সাথে
তবেই বল খেল্‌তে পারি?—
তুমি বল সময় নাই,
আমার আছে প্রচুর তাই;
সারাদিন মনন কাজে,
আচ্ছা যখন গগন-মাঝে
তারার ফুল সারে সারে
জেগে উঠে বারে বারে,
তখন কি গো আস্‌তে হেথা
পার না তুমি, তুলে বারেক কাজের সারি।

সুলভ গার্হস্থ্য ঔষধাবলী।

লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ বি, এ, এল, এম, এস।

রোগ আমাদিগের নিত্য সহচর। ধনী, নির্দ্ধন; অবস্থাপন্ন ও নিঃসহায়; সকল লোককেই সময়ে সময়ে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যা হইতেছে

এই যে, কি উপায়ে সহজে ও স্বল্পব্যয়ে রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ইংরাজ আমলে প্রবর্ত্তিত এলোপ্যাথি চিকিৎসা প্রভৃতি প্রসার লাভ করিয়াছে। সমস্তএলোপ্যাথিক ঔষধ আমাদিগের দেশের জল, বায়ু ও শারীরিক গঠন হিসাবে প্রযুজ্য কিনা সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, হিসাব করিলে ইহা দেখা যায় যে ভারতের জন সংখ্যার মধ্যে মাত্র শতকরা দশভাগ লোক ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করিতে পারে। তাহার প্রধান কারণ ডাক্তারি ঔষধের মহার্ঘতা। যে দেশে অনেক লোকই দু'বেলা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, সে দেশে উচ্চ মূল্যের ঔষধ যে ব্যবহৃত হইবে তাহা আশা করা বৃথা।

পূর্ব্বে দেশীয় ঔষধের দ্বারাই আমাদের অভাব মোচন হইত। অনেক সময় গৃহিণীগণই সহজ-লভ্য গাছ-গাছড়া দ্বারা যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতেন তাহাতেই পরিবারবর্গের ব্যাধির উপশম হইত। সে সময়ের সাধারণ স্বাস্থ্য যে বর্ত্তমান অপেক্ষা হীনতর ছিল তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। বহুদিনের অবহেলায় একদিকে যেমন কবিরাজী চিকিৎসা আবর্জ্জনাগ্রস্ত হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানও প্রায় লোপ পাইয়াছে। সুখের বিষয় যে বিগত কয়েক বৎসর হইতে দেশবাসীগণ এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ও হাকিমি চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক বিধানে সংস্কার ও প্রচারের বহুল চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু তাহা হইতে জনসাধারণের উপকার হওয়ার এখন অনেক বিলম্ব আছে। যাহাতে সাধারণ গৃহস্থ সহজে ও স্বল্পব্যয়ে, ডাক্তার কবিরাজ ডাকার সমস্যায় না পড়িয়া, সাধারণ রোগ সমূহের উপশম করিতে পারেন—তাহাই আমাদিগের এখন একান্ত প্রয়োজন। পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই, সহরেও অতি সামান্য ব্যয়ে বণিকের দোকানে যে সব গাছগাছড়া ও অন্যান্য ঔষধের দ্রব্য পাওয়া যায় তদ্বারা অনেক ব্যারাম চিকিৎসা করা চলে। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যতীত এই সমুদয় দ্রব্যের ব্যবহার অবস্থা বিশেষে বিপদজনক হইয়া পড়ে। সাধারণে যদি জানিতে পারেন যে বিশেষ বিশেষ ব্যাধির জন্য নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিলে উপকার হয়, তাহা হইলে সহজেই তাঁহারা সেরূপ ঔষধ ঘরে তৈয়ারী করিয়া লইতে পারেন। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই এস্থলে কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করিতেছি।

বিগত মহাযুদ্ধের সময়, যখন বিলাতী ঔষধ সমূহের আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে সময় অনেক দেশীয় ঔষধ ব্যবহারে আইসে। যে সকল প্রসিদ্ধ ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এইপ্রকার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছেন,

তন্মধ্যে লক্ষ্ণৌর সিভিল সার্জ্জেন লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ কর্ণেল বার্ডউড্‌ অন্যতম। তাঁহার অধুনা প্রকাশিত Practical Bazar Medicine নামক গ্রন্থে সর্ব্বপ্রকার রোগের জন্য সহজলভ্য দেশীয় ঔষধ ব্যবহারার্থ প্রায় ২ শত প্রেসক্রুপসন্‌ আছে। সরকারী ও বেসকারী বহু ডিস্‌পেন্‌সারি ও হাঁসপাতালে রোগীদিগকে এই সকল ঔষধ দিয়া প্রকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। বার্ডউড্‌ সাহেব পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"If a medical man has a good knowledge of these (medicines), he can treat many minor maledies and relieve much suffering at a very little cost * * At the big medical schools * * bazar medicines are practically never prescribed, so that men leave the medical schools with little practical kuowledge of prescribing bazar medicines." অর্থাৎ যদি কোন চিকিৎসকের এই সমস্ত ঔষধ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তিনি অনেক উৎকট ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন ও সামান্য ব্যয়ে অনেক রোগ যন্ত্রণার উপশম করিতে পারেন। বড় বড় চিকিৎসা-শিক্ষালয়ে বাজারের ঔষধাবলী প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না; তাহার ফলে বাজারের ঔষধ প্রয়োগের কোন অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই ছাত্রগণ শিক্ষা সমাপ্ত করে। এই কথাগুলি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিরই ভাবিবার বিষয়; এই উক্তির মধ্যেই আমাদিগের দেশের চিকিৎসা সমস্যা সমাধানের বীজ নিহিত রহিয়াছে। কারণ যতদিন না ঘরে ঘরে দেশীয় ঔষধ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়, ততদিন স্বাস্থ্যোন্নতির কোন আশা নাই।

আমরা আপাততঃ বার্ডউড্‌ সাহেবের প্রেস্‌ক্রুপসন্‌ অনুযায়ী নিম্নলিখিত কয়েকটী ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সাধারণের পরীক্ষার্থ প্রচার করিতেছি। যাহারা উপরোক্ত পুস্তকের সহিত প্রেস্‌ক্রুপসন্‌ মিলাইতে চান তাঁহাদিগের সুবিধার্থ পৃষ্ঠা সংখ্যাও উল্লিখিত হইল। আশা করা যায় যে, এই ঔষধগুলি সাধারণ গৃহস্থের, অনেক উপকারে আসিবে।

ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যধী সমূহে প্রয়োগের ব্যবহার লিপিবদ্ধ করিলাম।

(প্রত্যেক প্যাকেটের গাত্রে ঔষধ সমূহের নাম ও পরিমান দৃষ্ট হইবে।)

১। Bronchities Cough Powders—P. 125.

শ্লেষ্মান্তক চূর্ণ।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, অতিবিষ। প্রত্যেকটী সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ১ ড্রাম।

মাত্রা ঃ—৩০ গ্রেণ দিবসে তিনবার।

২। Cholera Pill (incipient) p. 127.

ওলাউঠা-নিবারক বটিকা।

শুঁট ৩ গ্রেণ, লঙ্কা ১ গ্রেণ, হিং ১ গ্রেণ, কর্পূর ১ গ্রেণ, আফিং অর্দ্ধগ্রেণ। সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ১টি বটিকা হইবে।

৩। Colic—p. 128. শুলনাশক চূর্ণ।

জোয়ান ১ ড্রাম, এলাচ ১ ড্রাম, গোলমরিচ ৩০ গ্রেণ, শুঁট ৩০ গ্রেণ।

মাত্রা ঃ— ১ড্রাম প্রত্যহ দুইবার।

৪। Diarrhœa—p. 132. উদরাময় চূর্ণ।

ফটকিরি ৫ গ্রেণ, খয়ের ১০ গ্রেণ, দারুচিনি ১০ গ্রেণ, মিশ্রিত করিয়া একটী চূর্ণ হইবে। মাত্রা ঃ— ১টি চূর্ণ দিবসে দুইবার।

৫। Digestive Powder—p, 135. অগ্নি-বর্দ্ধক চূর্ণ।

হরিতকী, আমলকী, জোয়ান, বড় মৌরী, শুঁট, সৈন্ধব লবণ, জীরা, সাধারণ লবণ। প্রত্যেকের সমান ভাগ। মাত্রা ঃ—আহারের পর ১-২ড্রাম।

৬। Dysentery Powder—p. 141. আমাশয় চূর্ণ।

ইস্বগুল ২০ গ্রেণ, ইন্দ্রযব ৫ গ্রেণ। মাত্রা ঃ—১টি চূর্ণ দিবসে দুইবার।

৭। Dyspepsia Powder—p. 142. অজীর্ণ চূর্ণ।

শুঁট, বড় মৌরী, জাঙ্গি হরিতকী, বীট লবণ, সাধারণ লবণ। প্রত্যেকটি সমভাগে ২ ড্রাম। মাত্রা ঃ—আহারের পর ১০—৩০ গ্রেণ।

৮। Laxative Powder—p. 151. মৃদু বিরেচক চূর্ণ।

সোণামুখীপাতা ১০ গ্রেণ, জৈষ্ট মধু ১০ গ্রেণ, গন্ধক ৫ গ্রেণ, জীরা ৫ গ্রেণ।

মাত্রা ঃ—১টি চূর্ণ

৯। Malarial Fever Powder—p. 154. ম্যালেরিয়া জ্বরঘ্ন চূর্ণ।

কালা দানা ৫ গ্রেণ, শুঁট ৫ গ্রেণ, গোলমরিচ ৫ গ্রেণ, নাটা করঞ্জা বীজ ১০ গ্রেণ। মাত্রা ঃ—১টি চূর্ণ দিবসে দুইবার।

১০। Piles with constipation—P. 157.

কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত অর্শ।

হরিতকী ১ ড্রাম, আমলকী ১ ড্রাম, বহেড়া ১ ড্রাম, বড় মৌরী ১ ড্রাম, শুঁট ১ ড্রাম, সোনামুখীপাতা অর্দ্ধ ড্রাম, বীট লবণ অর্দ্ধ ড্রাম।

মাত্রাঃ—রাত্রে শয়নের সময় গরম দুগ্ধের সহিত ১ ড্রাম।

১১। Spleen Powder.—p. 164. প্লীহা চূর্ণ।

শুঁট ১০ গ্রেণ, রেউচিনি ৫ গ্রেণ, হিরাকষ ২ গ্রেণ, কুইনাইন ২ গ্রেণ।

মাত্রা ঃ—আহারের পর এক চূর্ণ দিবসে দুইবার।

১২। Tonic powder.—p. 167. বলকারক চূর্ণ।

গোলঞ্চের পালো ১০ গ্রেণ, অতিবিষ ১০ গ্রেণ, নাটা করঞ্জা বীজ ১০ গ্রেণ।

মাত্রা ঃ—এক চূর্ণ দিবসে দুইবার।

দ্রষ্টব্য ঃ—উপরে ঔষধগুলির পরিমাণ ইংরাজী হিসাবেই দেওয়া হইয়াছে। দেশীয় হিসাব আবশ্যক হইলে ১ তোলা বা ১ টাকার ওজন ১৮০ গ্রেণ অর্থাৎ তিন ড্রাম বলিয়া ধরিলেই হইবে। ইহাও জানা আবশ্যক যে ঔষধ দ্রব্য প্রথমে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পরে মিশ্রিত করিতে হয়।

যাত্রা।*

লেখক—শ্রীযুক্ত উমানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।

১। রাজ অধিরাজ বেশে চলিয়াছি আমি,
সে গৌরব পাইয়াছি তব তরে দেবি!
তুমি মোরে করিয়াছ অনুপম আজি
তোমা তরে ধরিয়াছি এ কি সাজ আজ!

২। তুমি আছ ব্রীড়াময়ি! মোর প্রতীক্ষায়;
আমারে যেতেই হ'বে ভবিতব্য লিপি,
যুগে যুগে চলিয়াছি জন্ম-জন্মান্তরে
আজিও আষাঢ় সন্ধ্যা আনে সে আহ্বান।

---

*সপ্তম বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

৩। তাই আমি চলিয়াছি অপূর্ব্ব রথেতে
চারিদিকে দীপমালা—মহা সমারোহ,
বেণু বীণা বাদ্যরবে মুখরিত পথ—
শত শত যাত্রীবন্ধু চেয়ে মুখ পানে।

৪। মাথায় মুকুট মোর গলে দোলে মালা
সৌরভ-মন্থর-সন্ধ্যা মগ্ন স্বপ্নতলে
চন্দন-চর্চ্চিত ভাল পট্টাম্বরে সাজি
চলিয়াছি চিরযুগের পাওয়ারে আনিতে।

৫। এমনি গিয়াছি আমি কত শতবার
আনিয়াছি গৃহলক্ষ্মী কুটিরে আমার
কখনো চলেছি আমি কৃষ্ণ অশ্ব চড়ি
হেরি সবেমোরে বলে সর্ব্ব গুণাধার।

৬। দৈত্যপুরীর মাঝে অন্ধকার পথ
তোমারে উদ্ধার করি বসায়েছি কাছে
আসন্ন সন্ধ্যায় কিছু দেখা নাহি যায়
শুধুই করিছে ধূ ধূ তেপান্তর মাঠ।

৭। ঘনঘটাচ্ছন্ন কভু প্রাবৃট সন্ধ্যায়
আকাশের বক্ষ চিরে বিজলীর রেখা
দিগন্তে ঝিলিক্ হানি' ধায় এঁকে বেঁকে
চলিয়াছি অজানার যাত্রী আমি একা।

৮। জানি না কতদূরে কোথা কোন্ পুরে
কোথা তুমি রাজকন্যা সুপ্তি নিমগন
ঘুমন্ত সে পুরীর কেহ পায়নি সন্ধান
স্বপ্ন মোরে ভালবাসি জানায়েছে পথ।

(ক্রমশঃ।)

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫শ বর্ষ | ১৩৩৬ সাল, কার্ত্তিক। | ৭ম সংখ্যা।

শ্রীমন্মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী ও তাঁহার উপদেশাবলী

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) দাসত্ব জীবন হইতে অব্যাহতি লাভ।

(মহাত্মার বদ্ধ জীবকে আকর্ষণ করিয়া কৃপা বিতরণ।)

যেখানে মানুষ নিজের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া অপরের প্রেরণায় কার্য্য করে, সেখানেই পরাধীনতা। আর পরের বেতনভোগী হইয়া, এইরূপ পরাধীনতা স্বীকার করার নামই হইল দাসত্ব। এই শরীরের এরূপ দাসত্ব ছিল ও তাহা হইতে এক্ষণে অব্যাহতি ঘটিয়াছে। এইরূপ হইবার পর সময়ে সময়ে নিজেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "কেমন আছ ?' ইহাতে উত্তর পাইয়াছি—"বেশ আছি।" বড়ই আনন্দময় উত্তর। এখন জিজ্ঞাসা করি, "এত আনন্দ তোমার কি জন্য ?" ইহাতে উত্তর পাইতেছি, "তুমি (১) দাসত্বের শৃঙ্খল কাটাইয়াছ, (২) এই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বৈদ্যনাথধামে বাস করিতেছ, (৩) শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতেছ- আবার তুমি কি চাও ?" এখন ভাবিয়া দেখি, এগুলি যথার্থই আনন্দের বিষয় কি না ? প্রথমতঃ এই প্রথম আনন্দের বিষয়টিই কিছু কিছু পরিস্ফুট করা যাউক।

প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ, এ ক্ষুদ্র শরীর ৩১ বৎসর কাল গভর্ণমেণ্ট কার্য্যে নিয়োজিত ছিল। শ্রীগুরুদেব ইহাকে এক ব্যবহারিক যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া থাকেন। এক্ষণে তাঁহার কৃপায় এ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি। এজন্য আনন্দ কেন, ইহাই বলিতেছি। দীর্ঘকাল এই বহুমূল্য জীবন যে ভাবে তোমার অতিবাহিত হইয়াছে, এখন সে বিষয়ে একবার চিন্তা কর। তুমি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক। ইহা চতুর্বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্ণ। এই বর্ণ শ্রীভগবান্ সৃষ্টির আদিতেই সৃজন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশ্য।" এ বর্ণের গুণ ও কর্ম্ম কি? শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"অধ্যয়নমধ্যাপনং যাজনং যজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানাম কল্পয়েৎ॥"

অথবা, "শমোদমস্তপ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥"

ইহার অর্থ অতি সরল, এজন্য বঙ্গানুবাদ দেওয়া অনাবশ্যক। এখন ভাবিয়া দেখ যে, উক্ত সুদীর্ঘ ৩১ বৎসরকাল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট উক্তরূপ ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্ম কি তুমি পরিস্ফুরণ করিবার রীতিমত অবসর পাইয়াছিলে? নিশ্চয় স্বীকার করিবে যে, উক্ত ব্যবহারক্ষেত্রে তুমি ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা পরিহার করিয়া, রজঃ ও তম ভাবেই জীবনের অধিকাংশই ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছ। এজন্য যদি আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তবে উহা হইতে অবসর লাভ করিয়া, নিশ্চয়ই আনন্দলাভ ঘটিয়াছে। আবার আরও বলি শুন। অন্যদিকে যখন পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন বলিয়া থাক যে, তুমি ভট্টনারায়ণ-বংশোদ্ভব, স্বভাবকুলীন, ফুলিয়ারমেল ও ৺রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান। হয় ত এই পরিচয় দিয়া নিজেকে গৌরবান্বিতও মনে কর। এখন এই কুলীনেশ্বর বিষয় কি কিছু চিন্তা কর? যদি এ বিষয়ের সম্পূর্ণ স্মরণ না থাকে, তবে মনে করিয়া দিতেছি যে, এই কুলীনত্ব সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিতে হইলেই, বঙ্গদেশের দুইজন নরপতি,—আদিশূর ও বল্লালসেনের—বিষয় এক একবার মনে করিবে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য লাভের সময় যখন বঙ্গদেশে যথার্থ বেদোক্ত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অবনতি ঘটিয়াছিল, তখন নরপতি আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া, উক্ত বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আদিশূর কোন বংশীয় নরপতি ছিলেন, ইহা কোন ঐতিহাসিক যথার্থরূপে নিরূপণ করেন নাই, তবে বহু ঐতিহাসিক, তাঁহাকে হিন্দু নরপতি বলিয়াই প্রকাশ

করিয়া গিয়াছেন। তবে যজ্ঞাদি কার্য্যে তাঁহার আস্থা দেখিয়া, তাঁহাকে ক্ষত্রিয় নরপতি বলিয়াই বিশ্বাস হয়। যাহা হউক, কান্যকুব্জ হইতে আনীত উক্ত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ যে তোমার এই বঙ্গদেশের আদি-পুরুষ, তাহা তুমি বিস্মৃত হইবে না।

অপর নরপতি বল্লালসেন যে বৈদ্য বংশজ, ইহা এক আবুলফাজন ব্যতীত আর সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই সেন বংশীয় নরপতি পরে তোমাদের কান্যকুব্জ বংশীয় ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য নবধা-গুণবিশিষ্ঠ যে কুলীনগণের শ্রেণী বিভাগ করেন, তাহা তোমাদের বংশের কিরূপ গৌরব-জনক কথা, তাহা কি একবার স্মরণ হয় না? সে নবধা গুণ কি কি?

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥"

এখন ভাবিয়া দেখ যে, যে বংশে তুমি জন্মিয়াছ, সে বংশের আদি-পুরুষ ৺ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী এইরূপ নয়টী গুণশালী ছিলেন। এই কুলীন বংশজ হইয়া কতরূপে তোমার চাকরী হইতে ব্যবহারক্ষেত্রে অবস্থান করিবার সময় এই মর্য্যাদা সঙ্কুচিত করিয়াছ, তাহা চিন্তা করিবে ও ইহা করিলে কি তোমার তজ্জন্য আক্ষেপ হইবে না? আর এইরূপ জীবন হইতে এক্ষণে অব্যাহতি লাভ করিয়া, আনন্দ-লাভ করিবে না? মনে মনে বেশ বুঝিয়া দেখিবে যে, যে করুণাময় গুরুদেবের কৃপায় উক্তরূপ ৩১ বৎসরকাল অকারণে ব্যয় করিবার পরও তোমার ৫৫ বৎসর বয়স পরিপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তুমি উক্তরূপ দাসত্ব হইতে অবসর লইতে পারিয়াছ, সে বিষয় একবার চিন্তা করিয়া তুমি কি খুব আনন্দ অনুভব করিবে না? এ যে দয়াময়ের অপার কৃপা। কিরূপ কৃপা সকলকে একবার শুনাও।

এই সমুদয় শুনিয়া কেহ যেন মনে স্থান না দেন যে, শ্রীগুরুদেব গভর্ণমেণ্ট কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণকে বড় অবহেলা করেন। যাঁহারা এইরূপ সরকারী কার্য্য করেন, সে সমুদয় কর্ম্মচারীগণকে গুরুমহারাজ বরং বড়ই প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন। তিনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, গভর্ণমেণ্ট সরকার অতি বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ লোকদিগকেই তাঁহাদের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। আরও বলেন যে এই সমুদয় কর্ম্মচারীগণ যেন এক একজন কর্ম্মবীর। তাঁহাদের এই কর্ম্মবীরভাব বিষয় লইয়া সময়ে সময়ে নানারূপ পরিহাসও তিনি করিয়া থাকেন। সুতরাং সরকারী কর্ম্ম বা কর্ম্মচারী হিসাবে কেহই তাঁহার অপ্রিয় নহেন; বরং তাঁহারা

প্রীতিভাজন, ইহা যেন সকলেই মনে রাখেন।

তিনি এরূপ কর্ম্মচারীগণকে পাইলে তাঁহাদেষ সহিত কিরূপ রঙ্গরস করেন, তাহার কিছু শুনাইতেছি। পুলিস কর্ম্মচারীগণকে নিকটে পাইলেই, তিনি তামাসা করিয়া বলেন যে, তাঁহারা ত কর্ম্মবীর। সর্ব্বদাই তাঁহারা বাহিরের লোকের অনুসন্ধানে ফিরিতেছেন, এবং তাহাদিগকে জব্দও করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহাদের অতিসন্নিকটে যে ছয়টী প্রবল চোর রহিয়াছে ও তাহাদের একজন দলপতিও আছে, তাহাদিগকে কেন শাস্তি দিবার বা জব্দ করিবার চেষ্টা না করেন ? পুলিস অফিসারেরা এরূপ চোরের বিষয় অবগত নহেন জানাইলে, তখন গুরুদেব বুঝাইয়া দেন যে বাহিরের চোর অপরের সর্ব্বস্বাপহরণ করে, আর নিকটের ষড়োর্ম্মিরূপ যে চোর ও তাহাদের দলপতি যে মন সে নিজের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। কর্ম্মবীর হইয়া ইহাদের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখাত অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে সরকারী ডাক্তারগণকে নিকটে পাইলে বলেন যে, তাঁহারা দ্রব্যশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রতি বেশ আস্থাবান ইহাত দেখিতে পাই। আবার শব্দশক্তিও (ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক) যে তাঁহারা একেবারে অস্বীকার করেন, তাহাও নহে ; কারণ এখনই বর্ণযুক্ত একটী শব্দরূপ গালাগালি দিলেইত তাঁহারা উঠিয়া পালাইবেন। যদি এইরূপ শব্দশক্তিতে বিশ্বাস থাকে তবে শ্রীগুরুদত্ত শব্দশক্তির প্রতি তাঁহাদের এত অবিশ্বাস কেন ? আরও বলেন যে, তাঁহারা কর্ম্মবীর হইয়া সর্ব্বদা প্রাণীর দৈহিক আধিব্যাধি নিবারণ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকেন কিন্তু ভবব্যাধি কিরূপে দূর হয় ও ইহা একবার দূর করিতে পারিলে যখন পুনরায় আক্রমনের সম্ভাবনা নাই, তখন তাহার উপায় সম্বন্ধে চেষ্টা না করেন কেন? ইহার পর বুঝাইয়া দেন যে, গুরুদত্ত মন্ত্ররূপ শব্দশক্তিলাভ করিয়া এই ভবব্যাধির উপায় নিরূপণ করিলেই তাঁহাদের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে। তাঁহাদের মত কর্ম্মবীরের পক্ষে ইহা খুবই সহজ সাধ্য ও করা উচিত।

সরকারী বিচারকগণকে নিকটে পাইলেই, গুরুদেব তামাসা করিয়া বলেন যে, তাঁহারা সর্ব্বদাই বিচার কার্য্য লইয়াই বিব্রত থাকেন, তবে তাঁহার একটী ক্ষুদ্র বিচার আছে, ইহা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে ও এই বিচার যেন এমন বিচার হয়, যে ইহার আপীলে রায় উল্টাইয়া না যায়। কোন জঙ্গলে এক অন্ধ ও এক পঙ্গু বাস করিত। হঠাৎ সেই জঙ্গলে এক অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। এরূপ অবস্থায় দুজনেরই প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাহারা পরস্পরের সাহায্য লইল। অন্ধব্যক্তির স্কন্ধে পঙ্গু উঠিয়া, তাহারা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল,

কিন্তু পরে একজন অপরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া, নিজের শ্রেষ্ঠতা পাইতে ইচ্ছা করিল ও বিবাদ উপস্থিত করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। এক্ষণে বিচার করিয়া বলিয়া দিতে হইবে যে, এ উভয়ের ভিতর শ্রেষ্ঠ কে ? অনেক হাকিমই ইহার বিচার করিয়া উঠিতে না পারিলে, মহারাজ বলিয়াছেন যে, ইহার বিচার আছে। রাজা অপর এক ব্যক্তিকে ডাকিলেন ও বলিলেন, সে যেরূপ অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে হয় তাহার চক্ষু দুইটী নষ্ট করিয়া দিতে হইবে, আর না হয় তাহার দুইটী পা পঙ্গু করিয়া দিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় সে নিজে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করা যাইবে। এরূপ অবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তিটী বলিল যে, সে চক্ষু নষ্ট করাইতে চাহে না। তখন রাজা অন্ধ ও পঙ্গুকে বুঝাইলেন যে এই তৃতীয় ব্যক্তি হইতেই, তাহাদের বিবাদের নিষ্পত্তি হইল। হাকিমগণ এই বিচার শুনিয়া নিজেদের পরাজয় স্বীকার করিয়া থাকেন। এখানে অন্ধ পঙ্গুর ন্যায় হইতেছে শাস্ত্র বা গুরুজনের প্রতি অন্ধবিশ্বাস। এখানে Reasouing চলে না।

সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত কোন উকীলগণকে নিকটে পাইলেই, গুরুমহারাজ জিজ্ঞাসা করেন যে, বাবুগণ! আপনারা সর্ব্বদাই তর্কযুক্তি (Reasoniug) লইয়াই তো ওকালতি করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস করেন কি না ? এ তর্কবুদ্ধি হইতেছে নিজের জ্ঞানেন্দ্রিয়জনিত একটা জ্ঞান ; আর অন্ধ বিশ্বাস হইতেছে অপরের বাক্য একেবারে মানিয়া লওয়া। এ অন্ধবিশ্বাসের নাম শুনিয়া অনেকে এরূপ বিশ্বাস করেন না বলিয়া নানারূপ তর্ক উথাপন করিতে থাকিলে, যখন ক্রমে ক্রমে গুরুদেব বুঝাইয়া দিতে থাকেন যে, এ ব্যবহার জগতে অন্ধবিশ্বাস ভিন্ন কাহারও একপাও চলিবার উপায় নাই, তখন উকীলগণকেও স্বীকার করিতে হয় যে, হাঁ, ঐরূপ বিশ্বাস তাঁহারা করিয়া থাকেন। এ বিষয়টি পরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইবে। যখন এইরূপ অন্ধবিশ্বাস করেন বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন, তখন উকীলগণকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি সেইরূপই হয়, তবে শাস্ত্র ও গুরুবাক্য পরমাত্মা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে তাঁহারা কেন পরাঙ্মুখ হইবেন ? ইহা যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও মহাত্মাগণের অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান।

এইরূপ মহারাজের প্রীতিকর সরকারী কর্ম্মচারীরূপে এ হতভাগ্যকে ৩১ বৎসর কাল নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কৃপায় ও উপদেশে ও কিরূপ ঘটনাক্রমে এ শরীর উহা হইতে অবসর লইতে পারিয়াছিল, তাহাও জানা-

ইতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহা হইতে মহাজনের কৃপা, কখন কিরূপ হয়, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। সকলই তাঁহার দয়ায় হয়। অমঙ্গল হইতে মঙ্গল হয়। উপরোক্ত সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার মধ্যে. এ লেখকের তিনটি কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হইল ও ৪টি পুত্রের উপনয়নাদি ক্রিয়াও ক্রমে ক্রমে হইয়া গেল। ইহার পর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বি, এ পড়িবার সময়ে ও তাহার বিবাহ হইবার এক বৎসর পরেই, ইহলোক পরিত্যাগ করিল। তিনটি কন্যা হইবার পর মধ্যম পুত্রটি জন্মিয়াছিল; সেইজন্য সে তাহার মাতার বড়ই স্নেহভাজন ছিল। এই পুত্রটি Dhanbad H. E. School হইতে প্রথম বিভাগে Matriculation পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতা Scottish Church Collegeএ I. A. পড়িতেছিল ও OgilvieHostel থাকিয়া বেশ পড়াশুনা করিতেছে ও পরীক্ষা দিবে, ইহা আমরা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। এমন সময় লেখকের তৃতীয় পুত্র, যে St. Xavier's Collegeএ পড়িতেছিল, সে হঠাৎ একদিন সংবাদ দিল যে, তাহার মধ্যম ভ্রাতা হোষ্টেলে সমুদয় ত্যাগ করিয়া ও সঙ্গে সামান্য ২।১ খানি বস্ত্র লইয়া ও কেবলমাত্র ৫।৬টি টাকা সঙ্গে লইয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে। এ সংবাদ পাইয়া সকলের হৃদয়ে এক কালিমা আসিয়া পড়িল। ক্রমে নানাস্থানে সন্ধান লইবার পর, সংবাদ আসিল যে, সে একেবারে কেরাণীবাদে (দেওঘর) আসিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে স্মরণ লইয়াছে ও গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া পুত্রের মাতা তাহাকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিবেন এইরূপ মনস্থ করিলেন ও আমার অনুমতি লইয়া নিজে গুরুমহারাজের আশ্রমে চলিয়া গেলেন। কয়েকদিন উক্ত আশ্রমে অবস্থান করিয়া ও পুত্রকে নানারূপ বুঝাইয়াও যখন তিনি পুত্রের মনের গতির পরিবর্ত্তন করাইতে পারিলেন না ও ফিরাইয়া লইয়া আসিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা তিনি বিফল মনোরথ হইয়া পুরুলিয়ায় আমার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সমুদয় ঘটনা ক্রমশঃ হইয়া যাইবার পরও কিন্তু এ হতভাগ্য তাহার শরীর সরকারী কার্য্যে অটলভাবে ন্যস্ত রাখিয়াছিল।

এতদিন এই শরীর লইয়া যিনি ব্যবহার-জগতে ক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনিই পরে ইহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন। কিরূপ ভাবে ইহা করিলেন, তাহা জানাইবার ইচ্ছা হইতেছে।

একদিন মফঃস্বলে বাহির হইয়াছি। মানভূম চাণ্ডিল ষ্টেশনের সন্নিকটে এক সরকারী Inspection Bunglowতে যাইয়া অবস্থান করিতেছি। এই বাঙ্গালাখানি বড়ই সুন্দরস্থানে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত ময়দান অবস্থিত ও ইহার দক্ষিণভাগে এক সুদীর্ঘ পর্ব্বতমালা অতি সন্নিকটে বিরাজিত আছে। এ স্থানে অবস্থান কালে হঠাৎ প্রবল জ্বর আসিয়া এই শরীর আক্রান্ত করিল। সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও চাপরাসী যদিও থাকিত তথাপি এ শরীরের অভ্যাস একটু অন্যরকমই ছিল। প্রত্যুষে ৩।৪ টার সময় শয্যাত্যাগ ও শৌচাদি ক্রিয়া ও পূজা আহ্নিক সমাপনের পর নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন প্রস্তুত করা বরাবর অভ্যাস ছিল। এদিন আর ইহা রীতিমত ভাবে হইল না। সঙ্গীগণ বুঝিল যে, শরীরে আজ ভাবান্তর হইয়াছে। কিন্তু নিজের এ কাতরতা সকলকে না জানাইয়া জ্বরের কম্পনের সহিত বাঙ্গালার সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া আমি বসিলাম ও একদৃষ্টে পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলাম। এরূপ করিতেই ঐ মূর্ত্তি যেন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময়ে তিনি যেন হাসিতে হাসিতে অন্তর হইতে এ শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন। স্পষ্টভাবে এইরূপ উপদেশ সূচক বাক্যগুলি যেন শুনিতে লাগিলাম। "ওরে মূর্খ! গীতাশাস্ত্র ত তুই সর্ব্বদাই পাঠ করিতেছিস। কিন্তু এ গীতা পাঠ করিয়া তোর কি জ্ঞান হইল. একবার স্মরণ করিয়া দেখ দেখি! দস্যু রত্নাকর 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে অক্ষম হইয়াও, নারদের উপদেশ মত 'মরা মরা শব্দ উচ্চারণ কর'তে, পরে শ্রীভগবানের রাম নামের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ তুমি যদি অনবরত গীতাপাঠ না করিয়া কেবল মুখে 'গীতা গীতা' শব্দ উচ্চারণ করিতে, তবে গীতা পাঠের সার বস্তু "ত্যাগী" হইবার জ্ঞান ত তোর লাভ হইত! আবার আরও ভাবিয়া দেখ, —"অর্থং অনর্থং ভাবয়নিত্যং" এই যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অমূল্য উপদেশ ইহা ত তুই কতবার পাঠ করিয়াছিস্। কিন্তু হৃদয়ে তুই ইহার কিছুই ত ধারণা করিতে সক্ষম হ'স্ নাই। যদি ইহা হইত তবে অর্থের জন্য তোর এ বহুমূল্য ব্রাহ্মণের শরীর কেন দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিতেছিস্? আবার আরও বলি—"দেহৈষণা, পুত্রৈষণা, চিত্তৈষণা"—করিবে না,—এরূপ উপদেশ ত কতবার পাইয়াছিস্? কিন্তু হৃদয়ে ইহার ত কিছুই ধারণা হয় নাই। এখন দেখ পুত্রগণ তোকে কি শিক্ষা দিয়া গেল? তোর যে জ্যেষ্ঠপুত্রকে, তুই "আমার আমার" বলিতেছিলি ও ভাবিতেছিলি যে, সে মানুষ হইবে ও তোর কত কি করিবে। এই যে কত কত আশা ছিল, তোর সে আশা ত উড়িয়া গেল। তোর এই "আমিত্বের" অভিমান চক্ষুর উপর ধ্বংস হইয়া গেল। যদি তোর 'আমিত্ব' বলিয়া বা নিজস্ব বলিয়া বোধ ছিল, তবে সে নিজস্ব জিনিষ ধরিয়া রাখিতে কেন

পারিলি না ? এদিকে নিজের তারও দুর্ব্বলতা একবার ভাবিয়া দেখ ? মধ্যম পুত্র, অনায়াসেই মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন কাটাইয়া, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। নিজের দেহোপযোগী সুখের আসবাব সমুদয় তুচ্ছ করিয়া দিল ও ব্রাহ্মণের যে ভিখারীর বেশ বড়ই আদরের, যে বেশ একদিন, উপনয়নের সময় গ্রহণ করিয়া, "ভগবতী ভিক্ষাং দেহি" বলিয়াছিলে এক্ষণে তাহাকেই সুখকর বোধ করিবে। অনায়াসেই সেই সংকীর্ণতার গণ্ডী প্রসারিত করিয়া, বলিয়া উঠিল "মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বর, বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ, স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্" দেখ্! এ কত উচ্চ ভাব। কিন্তু কৈ তোর দুর্ব্বলতাত গেল না ? ভাবিয়া দেখ্, এই যে তোর প্রবল জ্বর দেখা দিয়াছে, ইহা যদি আরও প্রবলতর হইয়া উঠে ও এই জনশূন্য স্থানে ও আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিত অবস্থায়, তোর প্রাণপাখীটীকে দেহ পিঞ্জর হইতে লইয়া যায়, তবে তোর "গুরুগঙ্গাবারাণসী", ইহার কিছুইত শেষ জীবনে প্রাপ্তি হইবে না ; ওই কাঙ্গাল বেশে চলিয়া যাবি।

এ সব মর্ম্মভেদী ও সুস্পষ্টভাবে প্রদত্ত বাণী ও উপদেশ, আমি নীরবে শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। ইহা শুনিতে শুনিতে হৃদয়ে এক নূতনভাব আসিয়া দেখা দিল এবং তৎক্ষণাৎ যেন একটা সংকল্পও স্থির হইয়া গেল। জ্বর লইয়া পুরুলীয়ায় ফিরিয়া আসিলাম ও হঠাৎ ছুটীর এক দরখাস্ত দিয়া বসিলাম। সহধর্ম্মিণী মনের ভাব না বুঝিয়া, উহা যেন হঠাৎ না করি তজ্জন্য কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও নানারূপ ওজর আপত্তি তুলিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। ক্রমে আমার মনের ভাব কতকটা বুঝিয়া, উপরিতন কর্ম্মচারীর দ্বারা আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হৃদয়ের অটলতা কেহই দূর করিতে পারিলেন না। ছুটী লইবার কিছুদিন পরে, বৈদ্যনাথধামে আসিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম। তখনও চাকরী হইতে অবসর লইবার দুই বৎসর বাকি আছে, এজন্য অনেকের ধারণা হইল, ছুটী শেষ হইলেই, হয়ত পুনরায় চাকরীতে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ক্রমে ছুটীর পর ছুটী বৃদ্ধি করিতে লাগিলাম শরীর বেশ সুস্থ আছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় ডাক্তারের নিকট হইতে কিরূপে মিথ্যা Certificate লইব, এক একবার এরূপ চিন্তায় আসিতে লাগিলাম। কিন্তু কৃপাময়ের কৃপালাভ হইলে কিছুরই অভাব হয় না। দেওঘরে কিছুদিন অবস্থান করিতে করিতে, হঠাৎ বাতব্যাধি আক্রমন করিল। ইহাতে সহধর্ম্মিণীর বাধাও চলিয়া গেল ও মিথ্যা Certificate লইবার দায় হইতেও অব্যাহতি লাভ করিলাম

ক্রমে এ ছুটীও শেষ হইয়া আসিতে লাগিল ও পুনরায় নানাদিক হইতে তাড়না আসিতে লাগিল যে, কর্ম্মে ফিরিয়া যাই। ইহার পর একরূপ একটী ঘটনা ঘটিল যাহা বড়ই হিতকর ; তজ্জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। Commissioner of Excise সাহেব দেওঘরে Tourএ আসিয়াছিলেন। তাঁহার Tonr Assistant আমার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু। তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও নানারূপ বাক্যালাপের পর, আমার মধ্যম পুত্রটীকে ও শ্রীশ্রীগুরুদেবকে একবার দর্শন করিবেন, এইরূপ অভিলাষ করিলেন। এজন্য আমার সহিত শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশ্রমে যাইলেন। সেখানে নানা উপদেশ ও কথা প্রসঙ্গে বন্ধুবরটী যাহাতে আমি পুনরায় চাকরীতে ফিরিয়া যাই, এরূপ প্রস্তাব তিনি স্বয়ং গুরুদেবের নিকট উত্থাপন করিলেন। মহারাজ হাসিতে হাসিতে একটী গল্প শুনাইলেন ও বলিলেন যে, এই গল্প শুনিয়া উক্ত প্রস্তাবের উত্তর মিলিয়া যাইবে। সেই গল্পটী এই—

কোন নগরের মধ্যে এক প্রশস্ত রাজপ্রাসাদ ছিল। উহার সর্ব্বোচ্চ গৃহে রাজা ও রাণী বাস করিতেন। সে উচ্চ গৃহ হইতে নগরের প্রায় সর্ব্বাংশই দৃষ্টিগোচর হইত। এক সময়ে উক্ত নগরের কোন স্থানে এক সুন্দরকান্তি নবযুবক জহুরী ব্যবসার জন্য আসিয়া বাস করিতেছিল। রাণীর দৃষ্টি ক্রমে এই যুবাপুরুষের উপর পতিত হয় ও তাহার রূপে তিনি মোহিত হইয়া যান। কিরূপে তাহাকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া আসিবেন, সর্ব্বদা এই চিন্তা তিনি করিতে লাগিলেন। নিজে কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, পরিশেষে নিজের মনোভাব তাঁহার বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে ব্যক্ত করিলেন। পরিচারিকা রাণীর মনোভাব বুঝিল ও কি প্রকারে মিলন সংঘটন হইতে পারে, তাহার এক উপায় স্থির করিল। সে বলিল যে, রাজা যে সময় মন্ত্রণা গৃহে রাজকর্ম্মচারীগণের সহিত তিনচারি ঘণ্টা কালব্যাপী রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, সে সময় রাণী যদি অন্দরমহলে আসিবার খিড়কীত্বয়ার উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে পারেন, তবে অনায়াসে সে উক্ত যুবক জহুরীকে, গোপনে তাঁহার শয্যাগৃহে লইয়া আসিতে পারিবে। রাণী ইহাতে সম্মত হইলেন।

এই মন্ত্রণা হইবার পর, পরিচারিকা যাইয়া ক্রমে সেই জহুরীর সহিত আলাপ পরিচয় করিল ও ক্রমে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাব জন্মিল। ইহার পর এই যুবকের নিকট রাণীর মনোভাব ঝিটী ব্যক্ত করিল। উক্ত যুবক এ প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমতঃ অস্বীকার করিল। সে বলিল, এ প্রকার কার্য্য অতি বিপজ্জনক;

এমন কি ইহাতে তাহার প্রাণনাশও হইতে পারে। কিন্তু ঝিটী নানারূপ প্রলোভন বাক্য শুনাইল। উপরের গৃহ হইতে জহুরী নিজেও রাণীর সম্মতি-সূচক প্রস্তাব সচক্ষে দেখিল। এজন্য স্থির প্রস্তাব গ্রহণ করিল। সমুদয় এরূপে স্থির হইলে পর, একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, যে সময় মন্ত্রণাগৃহে রাজা নিযুক্ত ছিলেন, সে সময়ে পরিচারিকা, উক্ত যুবকটীকে সঙ্গে লইল ও পশ্চাৎ দ্বারের খিড়কী দিয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিল ও রাণীর উপরতলার শয্যাগৃহে জহুরীকে লইয়া গেল। রাণী যুবককে পাইয়া বড়ই প্রফুল্লিত হইলেন ও সবেমাত্র তাহার সহিত প্রেমালাপ করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন এরূপ সময়ে যে দাসীরা বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজা উক্ত গৃহে আসিতেছেন। রাজা কখনও এ সময়ে অন্তঃপুরে আসেন না, অথচ সেদিন হঠাৎ আসিতেছেন, ইহা জানিয়া রাণী, পরিচারিকা ও জহুরী সকলেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সকলেই নিজ নিজ প্রাণনাশের সম্ভাবনা বুঝিল। স্ত্রীলোক-দিগের বুদ্ধি এরূপ ব্যাপারে প্রায়ই প্রখর হয়। এজন্য অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, রাণী ও পরিচারিকা খুব লম্বা লম্বা কাপড় বন্ধন পূর্ব্বক, উহার সাহায্যে সেই যুবক জহুরীকে পায়খানার মধ্যে নামাইয়া দিল। এ পায়-খানার দুয়ার বাহির হইতে বন্ধ থাকিত। মেথর কেবলমাত্র প্রতিদিন সকালে উহা একবার পরিস্কার জন্য উন্মুক্ত করিত। এরূপ অবস্থায় পায়খানায় প্রবেশ লাভ করিয়া, সেখান হইতে জহুরীর পলাইবার উপায় ছিল না; ওদিকে প্রাণনাশের ভয় উপস্থিত। সুতরাং সে পায়খানায় ময়লা সমীপে নীরবে বসিয়া রহিল। রাজার এ সময়ে হঠাৎ আসিবার আর কোন বিশেষ কারণ ছিল না। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় হঠাৎ তাঁহার মলবেগ উপস্থিত হইয়াছিল, এজন্য অন্তঃপুরে আসিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক মলত্যাগ করিয়া, পুনরায় ফিরিয়া যাইবেন, এরূপ মনস্থ করিয়া শয্যাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অন্তঃপুরে আসিবার পর রাণী ও পরিচারিকাকে ইহা জানাইয়া, রাজা পায়খানায় যাইয়া মলত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য, রাজার সে মলমূত্র কতক কতক যাইয়া জহুরীর শিরে পড়িল ও সে উহা নীরবে সহ্য করিয়া পায়খানার ভিতর বসিয়া রহিল। এইভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রত্যুষে মেথর আসিয়া যেমন দ্বার উন্মুক্ত করল, অমনি তাহার ভিতর সে জহুরিকে দেখিয়া চোর বলিয়া মনে করিল ও যেমন উহাকে ধরাইয়া দিবে বলিয়া চিৎকার করিতে যাইবে, অমনি জহুরী উক্ত মেথরের পদতলে পড়িয়া প্রাণ ভিক্ষা করিল ও তাহাকে পিতা বলিয়া

সম্বোধন করিল। ইহার পর মেথরকে নানারূপ পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইল ও যাহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হয়, অতি কাতরতা সহকারে তাহা নিবেদন করিল। পরে সেখানে অবস্থানের হেতুও জ্ঞাপন করিল। যুবকের সে অবস্থা দেখিয়া, মেথরের দয়ার সঞ্চার হইল এবং তাহার প্রার্থনা মত উহাকে গঙ্গার পথ দেখাইয়া দিল। যুবক এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া গঙ্গার জলে স্নানাদি করিল ও নিজেকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিল। মেথর যথাকথিত পুরস্কার পাইয়া, এ ঘটনা কোন স্থানে প্রকাশ করিল না।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে, রাণীর সেই দাসী আসিয়া উক্ত যুবকটীকে পুনরায় সেই ভাবে তাহার সহিত রাণীর নিকট যাইবার প্রস্তাব করিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, পুনরায় সে দাসীর সহিত যাইবে কি না? ইহার উত্তরে বোধ হয় সকলেই বলিবেন যে, আর কদাচ যাওয়া উচিত নয়। তবে এই উত্তরই যদি সকলে দেয়, তবে আমার চাকরীতে যাওয়া উচিত কি না, তাহার উত্তরও তাহাই —অর্থাৎ আর যাওয়া উচিত নয়। ইহা এই আখ্যায়িকাটির দ্বারা গুরুদেব সহজেই বুঝাইয়া দিলেন।

এক্ষণে এ গল্পের রূপক যদি প্রকাশ করা যায়, তবে সংক্ষেপে এই বলা হইবে যে, রাজা এস্থানে পরমাত্মা, রাণী মায়া, পরিচারিকা অবিদ্যা, যুবক জহুরী সংসারী জীব, মেথর হইতেছে গুরুস্বরূপ রক্ষাকর্ত্তা। ইহার সহিত মিলাইলে এই বলা যাইবে যে চাকরীগত পরাধীনতা ও বিপদ কাটাইয়া গঙ্গাজলে স্নানরূপ পবিত্রতা অর্থাৎ তীর্থস্থানে বাস ও গুরুপাদমূলে অবস্থানরূপ সুখ যে লাভ করিয়াছে, তাহার পুনরায় এরূপ বিপদ সঙ্কুল কার্য্যে আর কি যাওয়া উচিত।

আমার বন্ধুটী শ্রীশ্রীগুরুদেবের এই উপদেশপূর্ণ গল্প শুনিয়া অমনই বলিয়া ফেলিলেন যে, মহারাজ আর অবিদ্যারূপী ঝি হইয়া ইহাঁকে (আমাকে) পুনরায় চাকরীতে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে তিনি পারিলেন না।

শ্রীগুরুদেবের এই অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া পুনরায় চাকরীতে ফিরিয়া যাইবার ক্ষীণ ইচ্ছা যাহা ছিল তাহাও চলিয়া গেল। ইহার পর পেনসনের দর-খাস্ত করিলাম ও ক্রমে তাহা মঞ্জুরও হইয়া গেল।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, "বেশ আছি" ইহার তিনটী হেতু আছে। ইহার প্রথম হইতেছে "দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত।" ইহা পরম করুণাময়ের কৃপায় কি প্রকারে পর্য্যবসিত হইল ও তাঁহার হৃদয় শিষ্যের প্রতি কিরূপ কৃপাবান, ইহা

এক্ষণে সকলে একবার চিন্তা করিবেন। এরূপ মহাত্মার অমূল্য উপদেশ ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী, ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। সকলের নিকট এই প্রার্থনা, যেন ইহা সফল হয়।

ইহা ত একটী সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র। এই মহাত্মার আশ্রিত শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী কতরূপে যে তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন।

(ক্রমশঃ।)

বন্দনা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

বঙ্গে সুবিদিত, বীরভূমি খ্যাত,
কবিবর যথা চণ্ডীদাস।
বাশুলী পূজিয়া প্রসাদ পাইয়া
প্রেমিকের সার "চণ্ডীদাস" ॥

জয়দেব যাঁর সুসন্তান মার
কেন্দুলী উজলি রয়।
(১) "অজয়ে আনিলা গঙ্গার ধারা
এমন প্রেমিক হয় ?

নিতাই যথায় অবতরি হায়,
পতিতে তারিলা নামে।
নদীয়া ভাসিল পাষাণ গলিল
(শ্রী) চৈতন্য দেবের প্রেমে ॥

---

(১) কথিত আছে জয়দেবের জন্য মাতা জাহ্নবী, অজয় নদীতে প্রবাহিত হইয়াছিলেন। কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলী জয়দেবের লীলাক্ষেত্র।

জগাই মাধাই তরিল হেথায়
নিতায়ের কৃপা বলে।
নিজে সহি দুঃখ বিকশিত মুখ
ভেসেছে নয়ন জলে ॥

গুপ্ত বৃন্দাবন হেথা প্রকটন
"এক চক্রা" বলি যারে।
"বীরচন্দ্রপুর" রসে ভর পূর
(শ্রী) বঙ্কিম ঠামে হেরে ॥

উত্তরে "ব্রহ্মাণী" পবিত্র তটিনী
বংশ নদী সুবিমলা।
"দ্বারক" বিরাজে বীরভূমি মাঝে
যথায় মায়ের খেলা ॥

তারাপুর খ্যাত যথা সুবিদিত
"বামা ক্ষেপা" মার ছেলে।
ত্রিতাপনাশিনী শঙ্করী ভবানী
কৃপা করি দেখা দিলে ॥

"মা মা" রবে বাম পূর্ণ মনস্কাম
শিমুল তলায় সিদ্ধ।
ভক্তের কারণে তারিণী এখানে
জাগ্রত সদাই বদ্ধ।

নিরমল নীর বহে ধীর ধীর
তরুলতা উভ তীরে।
সাধনার স্থান গুপ্ত কাশীধাম
কত সাধু বাস করে ॥

বিজনে শ্মশানে "তারা নাম গানে
বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনি।
প্রদানিলা বর স্থান মনোহর
"সিদ্ধপীঠ" পুরাতনী ॥

তীর্থ "বক্রেশ্বর" যথা মহেশ্বর
উষ্ণোদকে করে স্নান।
মহিমা অপার মুক্তির আগার
মহা সাধনার স্থান॥

কীর্ত্তনের ধাম "ময়না ডাল" গ্রাম
প্রভুর যথায় বাস।
মধুর কীর্ত্তন হয় অনুক্ষণ
মিত্র ঠাকুরেরা "দাস"॥

এমন মহিমা কেবা দিবে সীমা
কীর্ত্তন শিখিয়া কত।
অপ্রেমিক জন প্রেমে নিমগন
সাধু হইলা সুপূজিত॥

হোথায় "ফুল্লরা" হর-মনোহরা
বিরাজেন বীরভূমে।
শিবাকুল যাঁর সেবায় প্রচার
করিছেন নিশিদিন॥

অনুপম স্থান কি করিব গান
বীরভূমি মল্লভূমি।
কত কবি আসি কীর্ত্তি অবিনাশী
রাখি গেছে সুরভূমি॥

পূর্ব্বে গঙ্গাধারা পবিত্র সুধারা
সরস করিছে দেশ।
সুফলে সুজলে শ্যামপাতা দোলে
নাহিক দুঃখের লেশ॥

জয় "বীরভূমি"। তব পদ নমি
অবোধ অক্ষম দ্বিজ।
কৃপা কর দীনে যেন তব গানে
পাই তব পদরজঃ।

ঊর্দ্ধে শোভিত জাহ্নবী যাঁর পদতলে দামোদর,
বক্ষে অজয়, দ্বারকা, ব্রহ্মাণী বংশনদ খরতর,
কত সাধকের পদরেণুপূত তীর্থ সকল সাজে,
পীঠ উপপীঠে মায়ের মহিমা মধুর মধুর বাজে—
সেই বীরভূমি নতশিরে নমি যথায় নিতাই প্রভু
হরিনাম দিয়া তারিতে পাতকী অলস নহেন কভু॥

জয়দেব গীতে উজ্জ্বল যে দেশ শ্রীগীতগোবিন্দ নামে,
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম রাধাপ্রেম গুণগানে,
অকবিও যথা কবিতা রসের ঝরণা হেরিতে পায়,
যাঁর নাম শুনি সাধু মহাজন প্রেমেতে সুনাম গায়,
সেই বীরভূমি নতশিরে নমি যথায় নিতাই প্রভু
হরিনাম দিয়া পাতকী তারিতে অলস নহেন কভু॥

একদা যথায় মধ্যম পাণ্ডব পরহিতে প্রাণ দিতে
গিয়াছিলা সেই একচাকাপুরে জননী আদেশমতে
সেই স্থান আজ সাক্ষী রহিয়া পরহিতে অনুক্ষন
বদ্ধ-কোমর সাধু মহত্তর হরিনামে নিমগন,
নিত্য প্রসাদ পাইয়া যথা মহাপ্রভু কৃপায় করিলা বাস
(১) "কদমখণ্ডী" "বীরচন্দ্রপুর" মনোহর "গর্ভবাস"
সেই বীরভূমি, নতশিরে নমি যথায় নিতাই প্রভু
হরিনাম দিয়া পাতকী তারিতে অলস নহেন কভু॥

---

(১) কদমখণ্ডী প্রভৃতি স্থান বীরচন্দ্রপুরের নিকটস্থ গ্রাম। "গর্ভবাস" নিতাই প্রভুর জন্মস্থান। বীরচন্দ্রপুরে ৺বঙ্কিম রায় বিরাজিত। তথায় নিত অন্নের ভোগ হয়। সকলেই যথাযোগ্য প্রসাদ পায়। মল্লারপুর ষ্টেশন (ই, আই, আর) হইতে ২৷৷০ ক্রোশ পূর্ব্বে বীরচন্দ্রপুর। তাহার একটু পূর্ব্বে একচক্রা নগরীর ধ্বংসাবশিষ্ট গ্রাম। নাম তুড়িগ্রাম ও তন্নিকটস্থ স্থান।

বসন্ত ও তাহার প্রতিকার

Pox and its remedy.

লেখক—রাজবৈদ্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কবীন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

এক্ষণে বসন্ত, পানিবসন্ত ও হামের "প্রতিষেধ-চিকিৎসা" বলা হইতেছে। কোনও রোগের আলোচনা হইবার পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বিজ্ঞান তত্ত্বে জ্ঞানলাভ অপরিহার্য্য যে শাস্ত্রের সাহায্যে দীর্ঘায়ুলাভ করা যায়, আয়ুর বিষয়ে হিতাহিত জ্ঞান জন্মে এবং রোগের "নিদান" ও তাহার "আরোগ্য" জ্ঞাত হওয়া যায়, ঋষিগণ তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বা আয়ুর্ব্বিজ্ঞান নামে অভিহিত করিয়াছেন। "সুস্থজনের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগের আক্রমন নিবারণ (প্রতিষেধ) এবং পীড়িতজনের রোগ-বিমোচন (প্রশমন)" এই ত্রিবিধ মহৎ কার্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সাহায্যে সংসাধিত হইয়া থাকে। প্রায় সমস্ত ভয়ানক রোগেই "প্রতিষেধ" ও "প্রশমন" এই দ্বিবিধ চিকিৎসাবিধি অবলম্বিত হইয়া থাকে। "বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম" যে প্রকার ভয়ানক রোগ, তাহাতে অতি পুরাকাল হইতেই ইহাদের প্রতিষেধ ক চিকিৎসাও উদ্ভাবিত হইয়াছে। বসন্তের বিষম বিভীষিকা ও সংহারিণী শক্তির প্রতিষেধের জন্য শাস্ত্রে পূজা, জপ ও হোমাদির অনুষ্ঠান ও শীতলা রোগের ব্রতাচরণ প্রভৃতি যত কিছু রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে "মসূর্য্যাধানের" টীকার) কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ষদাহ সিদ্ধান্তনিদানে :—

"কৃতকমসূরিকা গোমসূরিকা চ।"

বৃহন্মসূরীত্বক চর্ম্মণ্যুৎকীর্ণা বিধি পূর্ব্বকম্।
কতিচিৎ পিড়কাঃ কৃত্বা প্রতিষেধায় কল্পতে।
পরং প্রাণাত্যয়ঃ ক্বাপি ততঃ স্যাদিতি কেচন।
গোমসূরীরসেনৈব প্রতিষেধন্তি তং গদম্।
বৃহন্মসূরিকা গোষু সংক্রান্তা গোমসূরিকা।
তদ্রসঃ প্রচ্ছিতে চর্ম্মণ্যর্পিতঃ প্রতিষেধকঃ।

তত্রাদ্যপ্রতিষেধো যো যাবজ্জীবং স তিষ্ঠতি।
নিরত্যয়ো ভবেদন্যঃ প্রতিষেধস্তু নশ্বরঃ॥"

"মসূর্য্যাধানের" অর্থ—"মসূরী" বা "বিস্ফোটের" রস সুশ্রুতোক্ত লেখনী শস্ত্র দ্বারা বাহুতে রেখাপাত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশিত করা অর্থাৎ বাঙ্গলা ভাষায় যাহাকে "টীকা দেওয়া" বলে।

অতিপ্রাচীনকাল হইতে সার্ব্বজনীন বিশ্বাস এই যে, "টীকা-প্রদান-প্রথা" এই পাপরোগের একমাত্র প্রতিষেধ। সুস্থ ব্যক্তিকে টীকা দিলে তাহাকে জীবনে কখনও এই পাপরোগসমূহ আক্রমণ করিতে পারে না। পৃথিবীতে দ্বিবিধ "মসূর্য্যাধান" প্রচলিত দেখা যায়। "নৃ-মসূর্য্যাধান" (Inoculation) ও গো-মসূর্য্যাধান (Vaccination)। "নৃ-মসূর্য্যাধান" অতি প্রাচীন প্রতিষেধ ব্যবস্থা। মসূরিকা-বিস্ফোটকসমূহ রক্তবর্ণ হইয়া স্তর লইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই টীকার বীজ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে সংগৃহীত "টিকা-বীজ" প্রয়োগ দ্বারাই সুফল হইয়া থাকে। নৃ-মসূর্য্যাধান দ্বারা মনুষ্য-শরীর জাত বসন্ত রোগের সংক্রামণ বিষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপর মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। বঙ্গদেশে ইহাকে বাঙ্গলা-টীকা বলে। ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথমে এই টীকা-প্রদান প্রথার সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এখনও প্রাচীন সভ্য চীন ও উত্তর আফ্রিকার স্থানে স্থানে এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। "নৃ-মসূর্য্যাধান"—অভীষ্ট ফলোৎপাদক ও নিশ্চিত বটে, কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইহা একবার মাত্র গ্রহণেই যথেষ্ট ফল হইয়া থাকে। প্রথাটী পৃথিবীর সকল স্থানেই ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ ভারতে রাজ-বিধি দ্বারা এই প্রথাটী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গো-বসন্তের বিষ হইতে টীকা-গ্রহণকে গোমসূর্য্যাধান বলে। সচরাচর ইহাকে "ইংরাজী টীকা" বলে। এই টিকা-প্রদান প্রথা সমধিক নিরুপদ্রব অথচ কার্য্যকরী সুতরাং রাজাদেশে ভারতে এখন গো-মসূর্য্যাধানের প্রথাই প্রচলিত হইয়াছে। এই টীকা একাধিকবার দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ ইহার প্রভাব ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। "মসূর্য্যাধান" বা "টীকা"র উপকারিতা কেবলমাত্র এই যে, টীকা গ্রহণের পরে রোগ আক্রমন করিলে, তাহার প্রকৃতি মৃদু হয়, প্রায়ই প্রবল হয় না বসন্ত রোগের উক্ত দুইটী প্রতিষেধক ক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রতিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থা যাহা আছে, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

(১) সেবন :—হেমন্তের মধ্যভাগ হইতে বসন্তের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রত্যহ

প্রাতে কণ্টকারীর মূল (৬ রতি), নিমপাতা (৬ রতি), গোলমরিচ চূর্ণ (২রতি) শীতল জলসহ বাটিয়া খাইলে,—শেপুন্নের মূল (৬ রতি) ও গোলমরিচ চুর্ণ (২ রতি) শীতল জলসহ বাটিয়া খাইলে,—নিমপাতা, বহেড়া বীচির শাঁস ও কাঁচা হলুদ সমভাগে শীতল জলসহ বাটিয়া খাইলে,—রুদ্রাক্ষ চুর্ণ (৩ রতি) ও গোল-মরিচ চুর্ণ (৩ রতি) বাসি জলসহ মিলাইয়া খাইলে,—গর্দ্দভ দুগ্ধ (১ড্রাম) ও রুদ্রাক্ষ চুর্ণ (২ রতি) একত্র মিলাইয়া খাইলে,—সামান্য পরিমাণ কাঁচা হলুদ সম পরিমাণ ইক্ষুগুড় সহ চিবাইয়া খাইলে এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের আদিভাগে কতক অন্ন উচ্ছে, হিঞ্চা ও ব্রাহ্মীশাকের ঝোল সহ মিলাইয়া খাইলে বসন্ত, পানি-বসন্ত ও হাম রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না।

(২) পাচন :—তেলাকুচা পাতা, মাধবী লতা, অশোক ছাল ও বেতের ডগা প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধ তোলা, ৴॥০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাকিয়া খাইলে বসন্তাদির আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই পাচন-জল চৈত্র মাসে পান করিতে হয়।

(৩) স্থাপন :—চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে শনি বা মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্দ্দশী তিথিতে ৺শীতলাদেবীর পূজা করিয়া একখানা সিজের ডাল একটা শ্বেতরঙ্গে রঞ্জিত মৃত্তিকাপূর্ণ কলসীতে পুতিয়া, তাহাতে লালরঙ্গের পতাকা রাখিয়া বাসগৃহের চালার বা ছাদের উপর রাখিলেও যতদিন ঐ সিজের গাছটী জীবিত থাকিবে, ততদিন উক্ত বাসগৃহে বসন্তাদির ভয় থাকিবে না।

(৪) ধারণ :—স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ও পুরুষের দক্ষিণ হস্তে হরিতকীর বীজ বা রুদ্রাক্ষ তামার তারে গাঁথিয়া ধারণ করিলে, বসন্তাদি রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৫) দৈব —(ক) অঙ্গে যতসাখ্যক বসন্তাদির দানা বহির্গত হইবে, চালতে গাছ হইতে তত সংখ্যক চাল্‌তে পাতা রোগীর নামোল্লেখ করিয়া ছিন্ন করিবে। ইহা দ্বারা বসন্তাদির দানা (গোটী) আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

(খ) বিষয় সিদ্ধমন্ত্রাদি দ্বারা রোগীর সর্ব্বশরীরে পুনঃ পুনঃ সম্মার্জ্জন করিলেও বসন্তাদির দানার বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

(৬) কল্কপান :—সামান্য কাঁচা হলুদ ও তেঁতুল পাতা (২টি) একত্র বাটিয়া শীতল জল সহ খাইলে বসন্তাদি হওয়ার ভয় থাকিবে না, কিম্বা অল্প হইলেও তাহা নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে।

(৭) সংশোধন ও সংশমন :—

"সংশোধন-ক্রিয়া" যথা—(ক) বমন ও (খ) বিরেচন।

বসন্তাদি জ্বর রসধাতুগত হইলে বমন প্রয়োগ করিবে।

(ক) বমন— (i) পটোল ১ তোলা, নিমছাল ১ তোলা, বাসক ১ তোলা = (কষায়ে)+বচ ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফল = (কল্ক) ৸০ বার আনা। ওজন প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে। (ii) ব্রাহ্মীশাকের রস + মধু (iii) হিঞ্চাশাকের রস + মধু—এই উভয় দ্রব্যের স্বরস দ্বারাও রোগীকে বমন করাইবে।

এই সকল "যোগ" দ্বারা রোগীর বমন হইয়া অনেক পিত্তশ্লেষ্মা উঠিয়া যায়। তাহাতে বসন্তের বিষ প্রবল হইতে পারে না।

(খ) বিরেচন— (i) করল্লাপাতার রস (৪ তোলা) হরিদ্রা চূর্ণ (॥০ অর্দ্ধ তোলা) সহ সেবনে মলভেদ হইয়া বিশেষ উপকার হয়।

এতদুভয় "বমন ও বিরেচন" ক্রিয়া দ্বারা রোগীর ভেদ ও বমি হইয়া রোগের বিষ অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া গেলে, তাহার বসন্ত-দানা সমূহ নির্ব্বিকার, অল্প পূঁজ ও অল্পবেদনা হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

"সংশমন-ক্রিয়া" যথা :—

সংশমন-প্রতিষেধ-ক্রিয়া দুর্ব্বল রোগীকে প্রদান করিবে। যথা :—করল্লা-পাতার রস (১ তোলা), হরিদ্রাচুর্ণ (।০ সিকি পরিমাণ) মিলাইয়া রোগীকে সেবন করাইলে রোমান্তী-জ্বর, বিস্ফোটক ও মসূরিকা-জ্বর অচিরে বিনষ্ট হয়।

(৮) মনুষ্য-শরীরে বসন্ত (মসূরিকা) প্রথম দৃষ্ট হইলে, নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ সমূহ প্রয়োগ করিলে, বসন্তরোগ অচিরে বিনষ্ট হয়।

মুষ্টিযোগ সমূহ :—

(ক) কুমারিয়ালতার মূল ২ তোলা, ৴॥০ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৵০ অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া, তাহাতে "হিং" ৵ আনা ওজনে প্রক্ষেপ দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রোগীকে পান করাইবে।

(খ) জয়ন্তী বীজ ২৫টী, সামান্য পরিমাণে ঘৃতের সহিত বাটিয়া বাসি জলের সহিত রোগীকে পান করাইবে।

(গ) সুপারির মূল ও ঘৃত বাসি জলের সহিত বাটিয়া রোগীকে পান করাইবে।

(ঘ) নাটাকরঞ্জার মূল ও ২৫টি গোলমরিচ, বাসি জলের সহিত বাটিয়া রোগীকে পান করাইবে।

(ঙ) অনন্তমূল বা গোক্ষুর মূল চেলেনি জলের সহিত বাটিয়া রোগীকে পান করাইবে।

(চ) শেয়ালকাঁটার মূল বাসি জলের সহিত বাটিয়া রোগীকে পান করাইবে।

(৯) বাসি জলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বসন্তের দানা ও তজ্জনিত দাহ নিবারিত হয়।

(১০) বসন্তাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শৌচার্থে "শৃতশীত জল" খদির কাষ্ঠ ১ তোলা, চাল্‌তে ছাল ১ তোলা, ⁄২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ⁄১ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে। শীতল হইলে তদ্দ্বারা বাহ্যের পর শৌচ কর্ম্ম করিবে।

(১১) বসন্তরোগীর বিছানাতে নিমপাতা ও হরিদ্রা চুর্ণ ছড়াইয়া রোগীকে তদুপরি শয়ন করাইবে। সর্ব্বদা নিম্বপত্রের গুচ্ছদ্বারা গা চুলকাইয়া দিবে।

(১২) বসন্তাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পানার্থে "শৃত শীতল জল" :—

(ক) পানীয় জল ⁄১ সের অগ্নিতে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট (অর্দ্ধসের) থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে ছাকিয়া বসন্তরোগীর পানার্থে ইহা ব্যবহার করিবে।

(খ) খদির কাষ্ঠ ॥০ তোলা পিয়াশাল (অশন) ॥ তোলা, ⁄১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄॥ অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে। শীতল হইলে বসন্ত রোগীর পানার্থে ইহা ব্যবহার করিবে।

(গ) রক্তচন্দন, বাসকছাল, মুথা, গুলঞ্চ ও কিস্‌মিস্‌ মিলিত ২ তোলা, ⁄১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄॥ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে। শীতল হইলে বসন্তরোগীর পানার্থে ইহা ব্যবহার করিবে।

(১৩) বসন্তাদি যথোচিত প্রস্ফুটিত ও পুষ্ট না হইলে অথবা কতক প্রকাশ হওয়ামাত্রই লোপ পাইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে :—

(ক) নিমপাতা, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পল্‌তা কট্‌কি, বাসকছাল, দুরালভা, ধাইফুল, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ইহাদের প্রত্যেক পদ ⁄ তিন আনা ওজনে গ্রহণ করিয়া, ⁄॥ সের জলে মিলাইয়া অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিবে। যখন অর্দ্ধ পোয়া জল অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহা ছাকিয়া লইবে। শীতল হইলে ইহাতে চিনি ॥ অর্দ্ধতোলা মিশাইয়া রোগীকে পান করাইবে। ইহা সেবনে বসন্তাদি একবার উঠিয়া বসিয়া গেলেও পুনরায় তাহা বহির্গত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ত্রিদোষজ মসূরী-জ্বর ও বিসর্পজ্বর নিশ্চয় বিনষ্ট হয়।

খ উচ্ছেপাতা বা করল্লা পাতার রস ১ তোলা, শোধিত আমলাসা গন্ধক

প্রত্যেক ⁄০ ওজনে গ্রহণ করিয়া ⁄॥০ অর্দ্ধসের জলে মিলাইয়া অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিয়া ⁄৵০ অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ইহা ঠাণ্ডা করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে তাহার বাতজ ও বাতশ্লৈষ্মিক বসন্তাদির শান্তি হইয়া থাকে।

(গ) দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, চিরতা ও কট্‌কী প্রত্যেক দ্রব্য ⁄॥০ অর্দ্ধ তোলা ওজনে গ্রহণ করিয়া ⁄॥০ অর্দ্ধসের জলে মিলাইয়া অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিয়া ⁄৵০ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। শীতলাবস্থায় রোগীকে ইহা সেবন করাইলে তাহার পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বসন্তাদির শান্তি হয়।

(ঘ) "হামবসন্তে" শ্লেষ্মার দোষ বেশী হইলে—"দশমূল পাচন" শাস্ত্রীয় বিধানে আগুনে জ্বাল দিয়া লইয়া তাহার ১ তোলা পরিমাণ পাচনের সঙ্গে "মকর ধ্বজ অর্দ্ধ রতি+পিপুল চুর্ণ ২ রতি" মধু সহ নিশাইয়া দিবসে ৩।৭ বার রোগীকে খাওয়াইলে শ্লৈষ্মিক দোষ শীঘ্র প্রশমিত হয়। ইহা দৃষ্টফলপ্রদ মহৌষধ।

(ঙ) গুলঞ্চ, বাসকছাল, পল্‌তা, মুথা, ছাতিমছাল, দারুহরিদ্রা, খদিরকাষ্ঠ অনন্তমূল, নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ, প্রত্যেক দ্রব্য ⁄১॥০ রতি ওজনে গ্রহণ করিয়া ⁄॥০ অর্দ্ধসের জলে মিশাইয়া অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। শীতলাবস্থায় রোগীকে ইহা সেবন করাইলে তাহার পৈত্তশ্লৈষ্মিক মসূরিকা রোগের নিশ্চয়ই শান্তি হইয়া থাকে।

(চ) খদিরকাষ্ঠ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমপাতা, পল্‌তা, গুলঞ্চ ও বাসকছাল প্রত্যেক দ্রব্য। এক সিকি ওজনে গ্রহণ করিয়া ⁄॥ অর্দ্ধসের জলে মিলাইয়া অগ্নি তাপে সিদ্ধ করিয়া ⁄৵ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে, ইহা ঠাণ্ডা করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে তাহার রোমান্তী (হাম), মসূরী (বসন্ত,)কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোটক ও কণ্ডূ প্রভৃতির শান্তি হইয়া থাকে।

(১৮) স্নায়বিক বিক্ষেপজনিত কণ্ঠনালীর সঙ্কীর্ণতারূপ বিষম উপসর্গ এই রোগে জন্মিতে দেখা যায়। তাহাতে নিম্নলিখিত যোগসমূহ ব্যবহারে অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখা গিয়াছে।

ক "খদিরাষ্টক" পাচনের অর্দ্ধপোয়া জলে শোধিত "মহিষাক্ষ গুগ্‌গুল" চুর্ণ ⁄০ দু আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করাইলে তাহার কণ্ঠনালীর সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় এবং কণ্ঠ শোধিত হয়।

(খ) অবলেহ :— পিপুলচুর্ণ ও হরীতকীচুর্ণ সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া যথোপযুক্ত মধুর সহিত মিলাইয়া অবলেহ করিলে মুখ কণ্ঠ বিশোধিত হইয়া থাকে।

(গ) কবল ঃ — জাতিপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, চিকিস্থপারি, শমীছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু প্রত্যেকদ্রব্য সাড়ে চারআনা ওজনে গ্রহণ করিয়া ⁄১ এক সের জলে মিলাইয়া অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিয়া ⁄।০ একপোয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। মুখে সহ্যমত উষ্ণাবস্থায় ইহা দ্বারা কবল করিবে। এই কবল দ্বারা কণ্ঠনালীর সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় এবং কণ্ঠ বিশোধিত হয়।

(ঘ) আয়র্ব্বেদোক্ত "অষ্টাঙ্গাবলেহ ও আদ্রকাদি কবড়" দ্বারাও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(১৯) "দৃষ্টিগত মসূরিকায়" নিম্নলিখিত সেক, অশ্চ্যোতন ও প্রলেপাদি ব্যবহারে প্রভুত উপকার হইয়া থাকে।

(ক) গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু সমভাগে একত্রে বাটিয়া পোট্টলিবদ্ধ করিয়া পিড়িত চক্ষে সেক দিলে "গড়গড়ে বা গোরক্ষ চাকুলে ও যষ্টিমধুর" ক্বাথ দ্বারা পিড়িত চক্ষের অভ্যন্তরে সেচন করিলে দৃষ্টীগত নেত্রমধ্যস্থ বসন্তাদির নিশ্চয় শান্তি হয়।

(খ) যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মূর্ব্বামূল গোড়াচক্র , দারুহরিদ্রা, দারচিনি, নিলোৎপল, উশির, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা অথবা সমষ্ঠি দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত কালে অর্দ্ধাবশিষ্ট জল থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ইহা দ্বারা পিড়িত চক্ষুতে অশ্চ্যোতন পরিষেক করিলে এবং উক্ত দ্রব্যাদির প্রত্যেকের বা সমষ্টির প্রলেপ পিড়িত চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ও ভিতরে দিলে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ বসন্তাদি পাকিয়া গলিয়া যায় না, নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়।

(২০) বসন্তরোগান্তে কখনও কখনও একটী ভয়ানক উপসর্গ হইতে দেখা যায়। তাহাতে কোনুয়ে, হাতের কব্জিতে ও স্কন্ধদেশে বিষম শোথ উৎপন্ন হয়। তাহা নিবারণের উপায় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(ক) কনকধুতুরার মূল বাটিয়া তাহাতে সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া ইষদুষ্ণ করিয়া শোথ স্থানে দিনে ২।৩ বার প্রলেপ দিলে এবং শেওড়ার ছাল কাঁজি দ্বারা বাটিয়া পিড়িত স্থানে প্রলেপ দিলে বাতিক শোথ অতি সত্বর উপশমিত হয়।

(খ) "পুনর্ণবা, দেবদারু, সজিনা ছাল, দশমূল ও শুঁট" ইহাদিগকে জল দিয়া নির্ম্মল করিয়া বাটিয়া ইষদুষ্ণ করিয়া শোথ স্থানে প্রলেপ দিলে অতি কঠিন শোথও প্রশমিত হইয়া থাকে।

(২১) বসন্তাদির চুম্‌টী (মাম্‌ড়ী) অতি সহজ উপায়ে ফেলিবার বিধান নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(ক) ছোলঙ্গ নেবুর কেশর; কাঁজিতে পেষণ করিয়া বসন্তাদির চুম্‌টীর উপর

(৬ রতি) ও বিশুদ্ধ মধু ১০।১২ ফোটা সহ দিনে ২।০ বার তিন দিবস রোগীকে খাওয়াইলে, তাহার অন্তস্থ বসন্তাদি সমূহ বহির্গত হয়।

গ মেথি, বাবুই তুলসীর শুষ্ক পাতা, কুড় ও ছোট লাল পেঁয়াজ প্রত্যেক দ্রব্য ॥• অর্দ্ধতোলা ওজনে গ্রহণ করিয়া ⁄।০ অর্দ্ধসের জলে মিলাইয়া অগ্নিতাপে জ্বাল দিয়া ⁄৵০ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। শীতল হইলে ইহা খাওয়াইলে কিম্বা শুধু মেথি সিদ্ধ জল খাওয়াইলে বসন্তাদি নিশ্চয়ই সম্যক্ বহির্গত হয়।

ঘ রক্তকাঞ্চন ছাল ২ তোলা ওজনে গ্রহণ করিয়া ⁄।০ অর্দ্ধসের জলে মিশাইয়া অগ্নিতাপে জাল দিয়া ⁄৵০ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ইহাতে শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম ⁄০ দু আনা প্রক্ষেপ দিয়া শীতলাবস্থায় খাওয়াইলে অন্তলীন বসন্তাদি পুনরায় বহির্গত হয়।

ঙ শিরিষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অনন্তমূল, কুমারিয়ালতার মূল, নিমগুলঞ্চ ও নিমছাল প্রত্যেক দ্রব্য ৸⁄১০ সাড়ে তের আনা ওজনে গ্রহণ করিয়া ⁄২॥০ আড়াই সের জলে মিলাইয়া অগ্নিতাপে জাল দিয়া ⁄।⁄০ পাঁচ ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। শীতল হইলে, তাহাতে একখানা তোয়ালিয়া গামছা ভিজাইয়া রোগীর সমস্ত শরীর দিনে ১ বার করিয়া ২।৩ দিবস মুছাইয়া দিলে প্রস্ফুটিত বসন্ত মসূরিকা সমূহ যথোচিত পুষ্ট হইয়া উঠিবে।

১৩ প্রস্ফুটিত ও পুষ্ট বসন্তাদি যথোচিত না পাকিলে নিম্নলিখিত উপায়সকল অবলম্বন করিবে।

ক বদরীচূর্ণ কুলচূর্ণ ২ তোলা ও ইক্ষুগুড় ২ তোলা মিলাইয়া রোগীকে লেহনার্থ প্রয়োগ করিবে। দিনে ২।৩ বার করিয়া ২।৩ দিবস ইহা লেহন করাইলে রোগীর বাতপৈত্তিক ও কদাত্মক বসন্ত মসূরিকা সমূহ পাকিয়া উঠিবে। ইহা ত্রিদোষজ বসন্ত মসূরিকা সমূহ শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া উঠিবে।

খ নিমগুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, ইক্ষুমূল ও দাড়িম্ব প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে গ্রহণ করিয়া, অর্দ্ধসের জলে মিশাইয়া অগ্নিতাপে জ্বালদিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে গরম গরম ছাকিয়া লইয়া তাহাতে ইক্ষুগুড় ॥০ অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিয়া রাখিবে। শীতল করিয়া রোগীকে ইহা পান করাইলে তাহার বায়ু প্রকুপিত হয় না এবং বসন্তদানা সমূহ অতি সত্বর পাকিয়া উঠে। ইহারাই মসূরিকার "সংরূহন কার্য্যাদি" জানিবে।

১৪ পাদসম্ভূত পাঁড়কা সমূহ "পাদদাহ" রোগ জন্মাইয়া থাকে। তাহাতে

শ্রীশ্রীচণ্ডী-মঙ্গল বা কালকেতু।

(নাটক।)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর।

ষষ্ঠদৃশ্য—সঞ্জয়কেতুর গৃহ।

পুরোহিত সোমাই ওঝা ও ধর্ম্মকেতু সঞ্জয়কেতুর কন্যা চাক্ষুষ করিতে আসিলেন।

সঞ্জয়। (সোমাই ওঝাকে প্রণাম করিয়া পদধুলি লইলেন এবং ধর্ম্মকেতুকে নমস্কার করিলেন।)

আসুন, আসুন, দেব! আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে ওঝা মশায়ের শ্রীচরণ পেলেম। আসন গ্রহণ করুন। (ধর্ম্মকেতুর প্রতি) কুলপাবন বংশধরের নির্ম্মল বীর মহিমায় আপনি সর্ব্বদাই মহিমান্বিত; দীন আমি আপনার দর্শনে আজ বড়ই কৃতার্থ হলেম। বসুন দাদা!

ধর্ম্মকেতু। যে আশায় আজ তোমার কাছে এসেছি ভায়া, ভগবান শঙ্করের কৃপায় সে আশাটী পূর্ণ হ'লেই পরিশ্রম সার্থক হবে। মেয়েটি কোথায় তাকে নিয়ে এসো দেখি।

(সঞ্জয় ভিতরে গিয়া ফুল্লরাকে আনিলেন।)

সোমাই। অই দেখ দেখি সাক্ষাৎ মেনকার কন্যা গৌরী! এস ত মা! তোমার বাম হাতখানা দেখি।

(ফুল্লরার হাত দেখিয়া সোল্লাসে) হু বহু মিল হু বহু মিল! করে কোষ্ঠিতে এবঞ্চ আমার দৃষ্টিতে হু বহু মিল! হু বহু মিল! এমনটি আর হয় না। চন্দ্রের যেমন রোহিণী দেবী, ইন্দ্রের শচীদেবী, অগ্নির স্বাহা যেমন, তেমনি বীর কালকেতুর এই ভাগ্যবতী মা আমার! রাজাধিরাজ যোটক। সব সেই মঙ্গলময়ী মঙ্গলার ইচ্ছা।

সঞ্জয়। সব কাজই মা আমার জানে। রাঁধাবাড়া, লোকজনকে পরিবেশন ক'রে খাওয়ান, এ সব ত নিত্যকর্ম্ম। তা ছাড়া ওর মায়ের সঙ্গে

হাট বাজার ক'রে এবং মুখেই হিসাব রাখে।

সোমাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমায় আর বল্‌তে হবে না। অনুমানই প্রমাণ। তা'হলে শুভকর্ম্ম শীঘ্রই সম্পন্ন কর। আগামী ২৭শে ফাল্গুন বসন্ত বাতাসে কি বল? হয়ে যাক্। শুভস্য শীঘ্রম্।

সঞ্জয়। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। (ধর্ম্মকেতুর প্রতি) আপনার মতামত?

ধর্ম্ম। তোমার মতই আমার মত জেনো। সঞ্জয় ভাই! আজ হ'তে আমাকে সখা বলে' আলিঙ্গন দাও। (আলিঙ্গন)

সোমাই। ওহে ওহে, শুধু কি কোলাকুলিই হবে?

সঞ্জয়। ঠাকুর মশায়! কৃপা করে অনুমতি দিন। আপনার জন্য আহারের ব্যবস্থা করি। আর উনি ত আমার দাদা। শাক ভাত যা আছে আহার করবেন। কেমন দাদা? অমত নাই তো?

ধর্ম্ম। কিছু না। এমন শুভকর্ম্মে কেউ কি অমত করে? কিন্তু অত ব্যস্ত হ'য়োনা ভাই। ঠাকুর মশায়ের ব্যবস্থা কর গিয়ে।

সঞ্জয়। ব্যস্ত হবো না? বল কি? ব্যস্ত হবো না? আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। মা ফুল্লরা! বাড়ীর মধ্যে যাও মা, আমাদের জন্য আহারের যোগাড় কর। যাও মা! (ফুল্লরার প্রস্থান)

মাতাল অবস্থায় কিঙ্করের প্রবেশ।

কিঙ্কর। খুড়ো সঞ্জয়! তুমি ত গাঁয়ের লোকের খুড়ো, আমারও খুড়ো কাজে কাজেই খুড়ো, হুড়ো মেরোনা। একটা কথা বল্‌ছি। বলি ফুলিত আমার সঙ্গে একরকম বাক্যদত্তা। আবার তাকে অন্য পাত্রে দিচ্ছ কেন? ব্যাধ হ'লে কি তার জাত বিচার নাই? খুড়ো খুব সাবধানে এ কাজ করবে। নৈলে বিপদ ঘট্‌বে জেনো। (টলিতে লাগিল)

সোমাই। এ কি অনর্থ। বুক্কুর ব্যাটা কিঙ্করটা অতিশয় মাতাল হ'য়েছে ওকে কি কিছু বলেছ সঞ্জয়?

সঞ্জয়। কিছু না কিছু না, তবে মেয়ে ছেলের একটা কথার কথা বলেই থাকে, তা হ'লে তাই কি ধরে নিতে হবে? কিঙ্কর! সুস্থ হ'য়ে বাড়ী যাও বাবা। এঁরা সব এয়েছেন, মনে কি করবেন? যাও যাও!

/॥০ অর্দ্ধসের জলে মিলাইয়া অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিয়া /৶০ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে খৈর ছাতু ।০ অর্দ্ধ তোলা ও মিছরি চুর্ণ ১ তোলা মিলাইয়া রোগীকে ভোজন করিতে দিবে।

ঙ বেদানা, কিস্‌মিস্‌, কমলালেবু ও আনারস প্রভৃতি ফল এ রোগে সুপথ্য।

চ এ রোগে উদরাময়াদি ও জ্বর না থাকিলে বিশেষতঃ বসন্তের দানা (গোটি) পাকিবার সময় —দুধ ও উৎকৃষ্ট চালের পায়স, সুসিদ্ধ অন্ন ও উচ্ছে সহ কাঁচা মুগের যূষ গব্য ঘৃতের সন্তরা , গব্য ঘৃতে ভাজা লুচি ও গব্যঘৃতের তৈয়ারী হালুয়া প্রভৃতি নির্ভয়ে খাইতে দিবে। এ অবস্থায় উপবাসে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীশ্রীচণ্ডী-মঙ্গল বা কালকেতু।

(নাটক।)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর।

তৃতীয় দৃশ্য—নন্দনউদ্যান।

নীলাম্বরের পুনঃ প্রবেশ।

নীলাম্বর। (উদ্ভ্রান্ত ভাবে) কৈ—কৈ সে মনোমোহিনী?
কমল-কুসুম লয়ে কমল-বদনী
লুকাইলা কি কমলের বনে চন্দ্রাননী?
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভাপ্রায় দেখা দিয়ে,
মন প্রাণ আকুল করিয়ে,
হেসে হেসে সুকেশিনী লুকাল কোথায়?
আহা মরি! মরি! অই হেরি সুচারুদশনা
অলঙ্কার বিনা (ও) সমুজ্জল বরাঙ্গ তাঁহার।
কুসুমের হার গলে, পৃষ্ঠে দোলে কালভুজঙ্গিনী—

বাঁধিতে কামীর মন; সুবেণী লম্বিত।
হে নারিরতন!
দাঁড়াও খানিক অই অশোকতলায়
হেরি আমি অনিমিখে তনু মনোহর!
(কিয়দ্দূর গমন করিয়া)
একি হ'ল! একি হ'ল! চঞ্চলা হরিণী?
পশ্চাতে তাহার
ব্যাধ এক ধনুঃ সর্পাকার
কাঁধে লয়ে; তূণ হ'তে বাছিয়া বাছিয়া,
এড়িল প্রদীপ্ত শর, অতি খরতর,
অই অই উড়িল অম্বরে, দিব্যকান্তি ধ'রে
প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা আকাশে মিশায়!
হায়! হায়!
আর তাঁরে দেখা নাহি যায়।
অতুল্য রূপসী বামা—
কোথায় লুকাল?
(আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অবস্থান)

অমরনন্দিনীগণের গীত।

দেববালাগণ। আনন্দে গাও সবে হরিহর নাম।
বল ব্যোম্ বল ব্যোম্, হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
ভাস্কর সোমরূপে নয়নে যাঁহার—
স্ফুরিত কিরণরাশি বহে অবিরাম!
সর্ব্ব রূপেতে ক্ষিতি মূর্ত্তি যাঁহার—
জলরূপী ভবনামে পৃথিবী প্রচার,
রুদ্ররূপী হর! কৃশানু আকার ধর,
উগ্র প্রকৃতি শিব ধরি বায়ুনাম।
আকাশ মূরতি তুমি ভৈরব ভীম
গাহ ব্যোম্ ব্যোম রবে বাজে ড্রিম্ ড্রিম্
পশুপতি যজমান!
রবিরূপী হে ঈশান!

সোমরূপী মহাদেব ! নয়নাভিরাম ।
শ্মশানে বিষাণ লয়ে গাহ রামনাম ।

(গান শুনিয়া নীলাম্বর প্রকৃতিস্থ হইলেন ।)

নীলাম্বর । মিথ্যা সব দিবার স্বপন !
আমি বাসব-নন্দন, পুষ্প তুলি যেতে হবে শিব নিকেতন
কিন্তু ভুলি রমণী মায়ায়, বিসর্জ্জিনু হায় !
কর্ত্তব্য আপন ! ছিছিঃ ! এই কি রে দেব আচরণ ?
প্রাকৃত মানব যথা রমণীর রূপে
ভবকূপে মণ্ডূকের প্রায় ঘুরিয়া বেড়ায়,
সেই মত দেবে যদি হয় আচরণ
ধিক্ সে দেবতা নামে, দেবের অধম !
প্রিয়া মম সখীগণে ল'য়ে দেবালয়ে
আনন্দেতে শিবগুণ গেয়ে
শঙ্করের প্রিয় কর্ম্ম করিছেন কিবা !
আমি হায় ! কুসুম চয়নে আসিয়া উদ্যানে
ভুলিনু সকল এক রমণীর মোহে
ধিক্ মোরে, ধিক্ মোর কর্ত্তব্যসাধনে ।

(দূরে ধূর্ম্মকেতুর মূর্ত্তি হেরিয়া)

আহা মরি মরি ! অপূর্ব্ব মাধুরী
কেবা অই পুরুষ-রতন ?
কেশরীর কটিসম সুবলিত কটিদেশ কিবা !
বেষ্টিত লতিকা জালে সুকেশ সুন্দর !
পৃষ্ঠে ধনুঃ, বাণ পূর্ণ তূণ, কিবা ধনুর্গুণ
টঙ্কারে কম্পিত করে কাননবাসীরে ।
এইরূপে যদি মুক্তাকাশে বিহঙ্গের প্রায়
বীর সাজে হায় !
ভ্রমিতে পেতাম ধরাতলে
বীরেন্দ্রমণ্ডলে
আনন্দে নন্দিত মোরে প্রশংসা-কুসুমে ।
বীর কার্য্য না করিয়া, ব্রাহ্মণের মত

ভ্রমি অবিরত,
কোথা পাই কোথা পাই কুসুম-চন্দন !
ধিক্ এ জীবনে ! ধিক্ এ জীবনে !
দেবরাজ ইন্দ্রসুত ; কিন্তু ধনুঃ ধরিতে না জানে ।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য ।

ইন্দ্রালয়ে শিবপূজা নিরত ইন্দ্র ।

পার্শ্বে নীলাম্বর, জয়ন্ত, শচী, ছায়া ও অন্যান্য দেবগণ ।

ইন্দ্র । এষ পুষ্পাঞ্জলি নমঃ শিবায় নমঃ । (তিনবার)
নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাশিপানয়ে
নমস্ত্রৈলোক্য নাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ।
বাণেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায়
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায়
কর্পূর-কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়
দারিদ্র-দুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায় ।
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মনং ত্বংগতি পরমেশ্বর ।

(সকলের প্রণাম)

মহাদেবের আবির্ভাব

মহাদেব । পুরন্দর ! বড় তুষ্ট করিয়াছ আমার অন্তর ।
কিবা বাঞ্ছা কহ যশোধন
করিব পূরণ সমুদায়—
বরদাতা আশুতোষ জানেহে সবাই ।
ঐশ্বর্য্য সমগ্রবীর্য্য প্রশংসা নির্ম্মল
প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি প্রেম সুমঙ্গল
অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা
কিবা চাহ বিবরিয়া কহ আখণ্ডল !

ইন্দ্র। (করজোড়ে) দয়াময়! অন্তরের মধ্যে অন্তর্য্যামী আপনি, সমুদায়
অন্তরের কথাই জানেন; কেবল সকলকে অবগত
করাবার জন্যই প্রকাশ কর্ত্তে আদেশ কর্চ্ছেন। দেবর্ষি
নারদের মুখে যদবধি মহাবার জম্ভাসুরের অভ্যুদয় বার্ত্তা
শ্রবণ করেছি, তদবধি শঙ্কিত মনে আপনার চরণ পদ্ম
চিন্তা করছি। হে ভবভয়বারণ প্রভু, অনাগত শঙ্কার
কারণ নিরাকরণ করুন। আপনার শ্রীচরণ কমলে
কাতর কিঙ্করের এই প্রার্থনা।

মহাদেব। বাসব! তজ্জন্য তোমার চিন্তা নাই।
জম্ভাসুর মম বরে যাদও প্রধান,
না গণে অমরগণে বাহুবলে' সদা।
তথাপি স্বকর্ম্মফলে মরিবে দানব
হিংসা করি সুররাজে। আর দিবা চাহ?
কহ বিবরিয়া বৎস! পূর্ণি মনস্কাম।
বিফল না হয় কভু সাক্ষাৎ আমার।

ইন্দ্র। কি আর প্রার্থিব তব চরণপঙ্কজে?
অদেয় তোমার
কিছু নাহি আর
যেজন অঞ্জলি ভরি ত্রিপত্র ধুস্তুর
অর্পিয়াছে শ্রদ্ধাভরে শ্রীপদরাজীবে
পূর্ণকাম সেইজন। করিণু দর্শন,
মহাবীর সে ভস্ম লোচন,
তোমার চরণ সেবি লভিল প্রার্থিত বর।
বরের শঙ্কায়
দেবগণ নিদ্রা নাহি যায়
ভাবে হায়, কোন্ কালে আসিয়া দানব
ভস্ম শেষ করিবে অমরে।

মহাদেব। হাসিয়া কি হইল তারপরে?

ইন্দ্র। তারপর সেই দৈত্য পরীক্ষিতে বর
পশ্চাতে তোমার হায়! ছুটে নিরন্তর

বর দিয়ে বরদাতা আপনি অস্থির।
ধীরমতি দেবর্ষি নারদ
হেরি সমূহ বিপদ
কহিলেন, "ওহে বীর! নিজের মাথায়
নিজে হাত দিয়া
লহ পরীক্ষিয়া শিব-বর।"
সহর্ষে দানব তবে মস্তক উপরে
হাত দিলা পরীক্ষিতে,
উড়ে আচম্বিতে ব্যোম্ পথে তার শিরঃ।

মহাদেব। এইরূপে পরিত্রাণ পাইল সকলে।
ভস্ম হ'ল দৈত্যবর স্বীয় কর্ম্মফলে।

ইন্দ্র। তাই বলি, তব কৃপাবলে মহেশ্বর!
সকলি সম্ভব হয় অবনামণ্ডলে।
সর্ব্বজীবে সমভাব, সর্ব্ব সমন্বয়
ক্ষুদ্র জাতি বলি
ঘৃণা তব নাহি পশুপতি!
হেলায় শ্রদ্ধায় যেবা লয় তব নাম
অনায়াসে ত'রে যায়, পূর্ণ মনস্কাম।

মহাদেব। নীলাম্বর! কেন হেরি চিন্তিত অন্তর তব?
বনান্তরে, পুষ্প তুলিবারে
গিয়াছিলে যবে,
ভাবিলে কি ভাবে জন্ম লব ধরাতলে।
মোর পূজা হইলা বিস্মৃত
মোহিনী নারীর রূপে হইলে মোহিত।
হেরিয়াছ ব্যাধের নন্দনে মহাবীর!
সেরূপে মোহিত হয়ে করিয়াছ স্থির
ব্যাধজন্ম বড় ভাল। তাই হোক্ তবে,
ত্বরিতে মহীতে জন্ম লহ নীলাম্বর!

নীলাম্বর। (পদধারণ করিয়া) ক্ষম আশুতোষ! ক্ষমা কর দীনজনে,
রোষ দূর কর প্রভু কাতর সন্তানে।

লঘু অপরাধে কেন গুরু অভিশাপ
নিদারুণ ! হয়োনা বিগুণ
স্বগুণেতে পরিত্রাণ করেছ সংসার।
পানিপুটে কালকুট করিয়া গ্রহণ
করিয়াছ বিশ্বের রক্ষণ
আজি কেন নিরদয় অধম কিঙ্করে ?

ইন্দ্র। (করযোড়ে) হায় ! হায় ! শিব পূজে এই পরিণাম ?
আচম্বিতে বজ্রাঘাত সম, অভিশাপ
করিলে প্রদান প্রভু ! আর কেবা লবে
শিব নাম ? রুদ্র বলি ডাকিবে সকলে।
শশাঙ্ক কিরণরাশি করে বরিষণ
জুড়াইতে জীবগণে। হুতাশন শিখা
কেবা করে অভিলাষ তায় ?
চন্দনে দুর্গন্ধ কভু না হয় উদ্ভূত !
ক্ষমা কর তাত ! ক্ষমাসার আশুতোষ তুমি !

শচী। (পদ ধরিয়া) শুভঙ্কর ! তোমার নাম নিলে যে অশুভরাশি দূরে যায় প্রভু ! অজ্ঞান নীলাম্বর তোমার পূজার জন্য পুষ্প চয়নে গিয়ে যে রমণীর রূপজালে মোহিত হ'য়েছিল তিনি কে ? বলুন প্রভো ! পুত্রের অপরাধ হলে পিতামাতাই তার শাস্তি বিধান করে। নীলাম্বর আপনার ভক্তপুত্র তাঁর প্রতি এত নিষ্ঠুরতা উচিত হয় না।
ক্ষমা করুন প্রভু !

(নেপথ্যে ভগবতী)

ভগবতী চণ্ডী। দেবী ইন্দ্রাণি ! তোমার ভক্ত পুত্রের জন্য দুঃখ করোনা। এই যশোধন নীলাম্বর দ্বারা পৃথিবীতে একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হবে। দৈবীমান চারিমাসে নীলাম্বর শাপ মুক্ত হয়ে নন্দন উদ্যানে আগমন কর্ব্বেন। আর পতিপ্রাণা ছায়া দেবীও পতির অনুগমম করে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবেন। (ক্রমশঃ)

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫শ বর্ষ | ১৩৩৬ সাল, অগ্রহায়ণ। | ৮ম সংখ্যা।

শ্রীমন্মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী ও তাঁহার উপদেশাবলী

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাল্যজীবন।

(১) সাধু মহাত্মাদের জীবনচরিত আলোচনা করিলে কত সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। তাঁহাদের আদর্শ-পথে যদি কেহ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন বা তাঁহাদের অনুভব-সিদ্ধ উপদেশাবলী হৃদয়ে ধারণা পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তবে নিজ নিজ কল্যাণের সহিত মানব সমাজের বহুবিধ কল্যাণ যে তাঁহারা সাধন করিবেন, ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন।

এ জীবনচরিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পাঠকগণের নিকট দুই চারিটী নিবেদন আছে। এই পরমযোগী মহারাজ বালানন্দ ৯ম বৎসর বয়সে যজ্ঞোপবীত ধারণের অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মচারী অবস্থায় গৃহত্যাগ করেন। এ অবস্থায় বাহির হইয়া ও গুরুকৃপালাভের পর জীবনের মধ্যাবস্থা পর্য্যন্ত তিনি কেবল পর্য্যটনে ব্রতী থাকেন। প্রায় প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলে আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺ রামচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংশ্রবে আসেন। ইহার পূর্ব্বে এ বঙ্গদেশে তিনি কাহারও নিকট পরিচিত ছিলেন না। এ জন্য অতি প্রাচীন

কোন বঙ্গবাসীর নিকট তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই।

গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করিয়া যাঁহারা অন্য আশ্রম গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের পূর্ব্বাশ্রমের বর্ণনা করা তাঁহাদের আশ্রম বিরুদ্ধ নিয়ম, কারণ শাস্ত্রে আছে।

সন্ন্যস্য তু যতিঃ কূর্য্যান্নপূর্ব্ববিষয়স্মৃতিং।
তাং তাং তৎ স্মরণে তস্যজুগুপ্সা জায়তে তেঃ ॥

এজন্য লেখক ও অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ মহারাজকে পূর্ব্বাশ্রমের কোন কোন বিষয় স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াও নিরুত্তর ভিন্ন কখনও স্পষ্ট উত্তর পান নাই। এ বিষয়গুলি জানাইবার তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা দেখিয়া,সকলে এ সব অনুসন্ধান লইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন। এ কারণে সঠিক ধারাবাহিকও পুঙ্খানুরূপে এই মহাত্মার বাল্যজীবন লিপিবদ্ধ করিবার উপায় নাই। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে এই ভারতবর্ষের বহুস্থান বহুকাল ধরিয়া তিনি পর্য্যটন করিয়াছেন। আজকালকার ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় Diary রাখিয়া নানাস্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা বা জনসমাজে এ সমুদয় প্রচার করিবার প্রবৃত্তি এ ভারতের প্রাচীনসাধুসমাজে প্রচলিত ছিল না। এ সমুদয় ভ্রমনও হইয়াছে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীরপূর্ব্বে সুতরাং সে সকল ধারাবাহিক ভাবে স্মরণও মহারাজের নাই। কথা-প্রসঙ্গেযে সমুদয় ঘটনা তাঁহা কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইতেই কতকটা বিবৃতকরা হইয়াছে।

যে দেশে ও যে বংশে এই মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন ও যে সময়ে আবির্ভূত হন, তাহা প্রায় শতবৎসরের ঘটনা হইয়াছে ও সে বংশেরও কেহ এখন জীবিত নাই। যে স্থানে বসতবাটী ছিল, তাহার কোন চিহ্নমাত্র নাই। সে সময়ের সাময়িক লোকও কেহ জীবিত নাই। লেখক সে স্থানে গিয়া ও নানারূপ চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ের ঘটনা জানিতে কিছুমাত্র সফলকাম হয়েন নাই। এই মহাত্মা যখন নবম বৎসরে গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার গর্ভধারিণী জীবিতা ছিলেন। বহুকাল অতীত হইলে, যখন এই মহাপুরুষ তপোবনে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময়ে তাঁহার মাতৃদেবী বহুদূরস্থ জন্মভূমি হইতে আসিয়া তপোবনে পুত্রের সহিত মিলিত হন ও অত্যল্পকাল পরেই সেখানে দেহত্যাগ করেন। সেও আজ প্রায় ৩৫ বৎসরের ঘটনা। লেখকের এই মাতৃদেবীকে দেখিবার সুযোগ হয় নাই। দুই চারিজন প্রাচীন ভ্রাতৃবর্গের এ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারাও কেহ মাতৃদেবীর নিকট হইতে মহারাজের বাল্য জীবনের ঘটনাবলী জানিয়া কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াও যান নাই। এ এক মহা সুযোগ নষ্ট হইয়াছে।

পাঠকগণের প্রতি আরও একটু নিবেদন যে, সাধুমহাত্মাদের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী জানিয়াও কিছু ফল নাই। এ শৈশবকাল কেবল বাল্যচপলাতেই পরিপূর্ণ। সাধুমহাত্মাদের প্রকৃত জীবন আরম্ভ হয়, যখন তাঁহারা গুরুকৃপালাভ পূর্ব্বক সাধন পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

তথাপিও মহারাজের বাল্যজীবনের যাহা যাহা প্রকাশ করিব, তাহা হইতেই সকলে বুঝিবেন যে, Child is the father of man অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের ভাব এ বাল্যজীবনেও বীজভুত ভাবে দেখা যায়। ইংরাজী লেখকগণ Napoleon ও Nelsonপ্রভৃতির জীবন চরিত বর্ণনা কালে ইহার কিছু কিছু নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই মহাত্মার বাল্যজীবনেও সেরূপ কিছু পাইবেন।

আরও একটু নিবেদন, এ ভারতের সাধুবর্গের জীবনচরিত যেরূপ নানা অজ্ঞাত কিম্বদন্তির উপর স্থাপিত হয়, ইহা সেরূপ নহে। ইহা মহাত্মার নিজ মুখ নিঃসৃত বিষয় লইয়াই প্রকাশিত হইতেছে। ইহার কোন অংশ কল্পনাপ্রসূত নহে। যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহার বাহুল্যাংশ পুনরায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইবার পর সংশোধিত হইয়াছে।

অবন্তিকা নগরী মহারাজের জন্মস্থান। এই অবন্তিকার আধুনিক নাম উজ্জয়িনী। ইহা ভারতবর্ষের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ও ইহা বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ সহর। ইহা এখন মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত সিন্ধিয়া রাজ্যভুক্ত ও অবন্তী নামক নদীকূলে ও রেলওয়ের পার্শ্বে অবস্থিত। "উজ্জয়িন্যাং মহাকালং" ইহা অনেকেই অবগত আছেন অর্থাৎ শ্রীবৈদ্যনাথের ন্যায় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহাকাল নামক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ এখানেই প্রকটিত আছেন। হরিদ্বার, প্রয়াগ ও নাসিকের ন্যায় এখানে দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভস্নান ও তদুপলক্ষে বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রাচীন রাজধানী ও কালীদাস প্রভৃতি ভারত প্রসিদ্ধ নবরত্নের প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। বিক্রমাদিত্যের প্রচলিত অব্দ সংবৎ নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে ইহাঁর সিংহাসন দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার উপর স্থাপিত ছিল ও ইহাই "বত্রিশ সিংহাসন" নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর মানমন্দির হইতেই ভারতবর্ষের পঞ্জিকা গণনা হইত। এখনও এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রস্তরনির্ম্মিত তোরণদ্বারের অংশ, তাঁহার ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির গুহা ও শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দিমুনির আশ্রমের চিহ্ন লোকে যাইয়া দেখিয়া থাকে।

এই অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) নগরীতে এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মপরায়ণ, সারস্বত

ব্রাহ্মণকুলে এই মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতৃদেবের কি নাম ছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; তবে এইমাত্র জানা গিয়াছে যে, মহারাজের যখন শৈশবকাল, তখন ইহাঁর পিতা ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর মাতৃদেবী নর্ম্মদা বাই নামে খ্যাত ছিলেন। এই মাতৃদেবীর পিতৃভবন ছিল, উক্ত অবন্তিকা নগরীতে ও মহারাজের পিতৃভবনের সন্নিকটে। পিতার পরলোকের পর, এই মহাত্মার পিতৃভবনে তাঁহার মাতা ব্যতীত অপর কেহ আত্মীয় বা অভিভাবক ছিলেন না। অপরদিকে তাঁহার মাতামহ ভবনেও মাতুল বা অন্য আত্মীয় পরিজন কেহ ছিলেন না। এ কারণে মহারাজ বাল্যকালে তাঁহার মাতৃদেবীর সহিত তাঁহার মাতামহের (নানার) নিকটেই প্রতিপালিত হন। এই উভয় পরিবারের কয়েক ঘর যজমান ছিল। ইহাঁদের সাহায্যে মধ্যবিৎ অবস্থার ব্রাহ্মণপরিবার যেরূপ ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেইরূপ ভাবেই ইহাঁরা সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। ইহাতে এতদূর বুঝা যায় যে, মোটামুটী ভাবে তাঁহাদের কোন সাংসারিক কষ্ট ছিল না। গৃহে আর ছেলেপিলে না থাকায়, তাঁহার মাতামহ ও মাতৃদেবীর ইচ্ছা হইয়াছিল যে, মহারাজ ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করেন। এজন্য নিকটস্থ এক পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট তাঁহাকে পাঠাভ্যাসে নিযুক্তও করা হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ নিযুক্ত করিলে কি হইবে, মহারাজ বাল্যকালে লেখাপড়ায় বড়ই উদাসীন ছিলেন। এ কারণে সকলে তাঁহাকে বড়ই তাড়না করিত। এ তাড়নায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া, এই লেখাপড়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রায় গৃহ হইতে পলাইয়া ইতস্ততঃ সময়ক্ষেপ করিতেন। এই বাল্যকালেই তিনি অতিশয় দুঃসাহসী ছিলেন।

এখনকার উজ্জয়িনী সহরের পূর্ব্বাপেক্ষা বহুরূপেই আকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহার সমীপে বহু প্রাচীন ভগ্ন গৃহ পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। মহারাজের বসতবাটীর সন্নিকটে এরূপ একটা ভগ্ন বাটী ছিল। ইহাতে ভূত বাস করে বলিয়া প্রবাদ ছিল এবং এজন্য ভুতের ভয়ে কেহ উহাতে প্রবেশ করিতে চাহিত না। কিন্তু মহারাজ সেই বাল্যকালেই কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সেই গৃহে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লুক্কায়িত থাকিতেন। বহু সন্ধানের পর, কেহ কেহ যাইয়া তবে সেখান হইতে তাঁহাকে বাহির করিত। অতুচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিবার তাঁহার এক বিশেষ শক্তি ছিল। পূর্ব্বোক্তরূপে পড়াশুনা হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা করিয়া মহারাজ কখন কখন নিকটস্থ কোন উচ্চবৃক্ষের

শিরোদেশে লুকাইয়া অবস্থান করিতেন; এবং কিরূপে সকলে তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছে, তাহা সেখান হইতে বসিয়া বসিয়া দেখিতেন। যখন দেখিতেন যে, কেহ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিল না, তখন অল্পবিস্তর সাড়াশব্দ দিয়া হাসিতে হাসিতে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিতেন। কখন কখন দুই তিন দিন গৃহ হইতে পলাইয়া অন্যত্র অবস্থান করিতেন এবং বাটী হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরেও চলিয়া যাইতেন এবং যেখানে সেখানে বাস করিয়া দিন রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এরূপ অবস্থায় ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, কচি কচি তেঁতুলের পাতা খাইয়া কখন কখন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। এরূপ পলায়নকালে কোন বালক কখনও তাঁহার সঙ্গী হইত এবং কখনও বা তিনি একাকীই পরিভ্রমণ করিতেন। যখন কেহ সঙ্গী থাকিত তখন সেই সঙ্গীগণ বাটীতে ফিরিয়া আসিলে ও তাহাদের নিকট সন্ধান পাইলে, কেহ কেহ তাঁহার সন্ধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইত ও তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসিত। সহর হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে এক গোলাকার জলের ঘূর্ণী ছিল এবং উহা এখন পর্য্যন্তও বিদ্যমান আছে। মহারাজ কখনও সেই স্থানে যাইয়া, ঐ জলে তৃণাদি ফেলিতেন এবং কি প্রকারে উহা জলের সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে থাকে, তাহা নিবিষ্টচিত্তে দেখিতেন। সহরের অনতিদূরে দুই একটী স্থানে কতিপয় ভগ্নগৃহ ছিল এবং তথায় সকলের এরূপ ভুতের ভয় ছিল যে, কেহ সেখানে দিনেও যাইতে সাহস করিত না। মহারাজ ক্লান্তিবোধ করিলে অনায়াসেই সেরূপ স্থানে প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। একপ্রকার বিষাক্ত ফল তাঁহার জানা ছিল এবং তিনি শুনিয়াছিলেন যে, উহা খাইলে লোক মরিয়া যায়। একদিন মনে পড়াশুনার তাড়নার জন্য অতিশয় গ্লানি বোধ করেন ও নিজের প্রাণনাশ করিবেন, এই সংকল্প করেন। এজন্য উক্ত বিষাক্ত ফলের কয়েকটি ভক্ষণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত এক ভগ্ন পরিত্যক্ত ভুতের বাড়িতে রাত্রিতে পড়িয়া থাকেন! কিরূপ অবস্থায় রাত্রি কাটিয়াছিল, তাঁহার সে বোধ ছিল না; কিন্তু যখন প্রত্যুষ হইয়াছে, তখন চতুর্দ্দিকে আলো দেখিলেন ও তাঁহার বোধ হইল যে তিনিও মরেন নাই। তখন সেই ভুতের গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। একজন কৃষক অতি প্রত্যুষে এদিকে গিয়াছিল; সে এত ভোরে ঐ গৃহ হইতে তাঁহাকে বাহির হইতে দেখিয়া, প্রথমতঃ তাঁহাকে ভূত বলিয়াই আশঙ্কা করে এবং তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করে না। পরে বহুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে দেখিয়া তাঁহাকে সে মানুষ বোধ করে ও নিকটে যাইয়া তাঁহার সহিত কথা কহে ও পরে তাঁহার পরিচয় পাইয়া ও কি ভাবে রাত্রিবাস করিয়াছিলেন,

জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দেয়।

বাল্যকাল এরূপ নানা দুরন্তপনার সহিতই কাটিতে লাগিল। এরূপ বাল্য চপলতার মধ্যে মহারাজের মাতা একদিন তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন যে, তিনি ত সংসার ধর্ম্ম কিছু দেখিবেন না ও লেখাপড়াও কিছু শিখিলেন না; তবে কি তিনি সাধু হইবেন? মহারাজ বলিয়াছেন যে, এ কথাগুলি তাঁহার মাতার মুখে শুনিবার পর কে যেন তাঁহার এক পূর্ব্ব সংস্কার আনিয়া দিল। তিনি মনে ধারণা করিলেন যে, সংসারের কাজকর্ম্ম না করিয়া ও লেখাপড়া না শিখিয়া ত তবে সাধু হইতে পারা যায়। ইহা শুনিবার পর, মহারাজের গায়ে যে একটী কুর্‌তা (জামা) ছিল, তাহা তিনি পুড়াইয়া ফেলিলেন এবং উহার ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত করিয়া, এক বালক সাধুর বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক, মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মায়ী! দেখ্, হাম তো সাধু হো গিয়া" মাতার মনে তখন কিছু মাত্র বোধ আসিল না যে, এ বালক তাঁহার যথার্থ সাধু-মূর্ত্তির বেশ তাঁহাকে দেখাইল। মাতৃদেবী মহারাজের উক্ত সাধু বেশ ও তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ দিয়া, যাহাতে গৃহ কর্ম্ম তিনি দেখাশুনা করেন ও মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করেন, এ বিষয়ে বহু সদুপদেশ দিলেন। কিন্তু মহারাজের পূর্ব্বোক্ত বালাচপলতা ও লেখা-পড়ার প্রতি উদাসীনতা সমভাবেই রহিয়া গেল। এরূপ ভাবে চলিতে চলিতে, মহারাজ নবম বৎসরে উপনীত হইলেন ও তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই উপনয়ন হইবার তিন চারিদিন পরেই, মহারাজ কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। উপনয়ন হইবার সময়ে, তাঁহার হাতে বালা, গলায় হার ও কাণে মাকড়ী প্রভৃতি গহনা দেওয়া হইয়াছিল। এ সব লইয়াই, তিনি পথে বাহির হইয়াছিলেন। একটী অল্পবয়স্ক বালকের গায়ে এতগুলি গহণা রহিয়াছে ও সে একাকী বাহির হইয়াছে, ইহা দেখিয়া একজন লোভ পরবশ বা দয়াপরবশ হইলেন এবং এরূপ ভয় দেখাইলেন যে, গায়ে এরূপ ভাবে গহনা থাকিলে, পথে নানারূপ বিপদ হইতে পারে। এরূপ ভয় দেখাইয়া ও উপদেশ দিয়া উক্ত ব্যক্তিই গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া লইল। মহারাজ চলিতে লগিলেন। তাঁহাকে বালক দেখিয়া, পথে অনেকেই দয়া করিতে লাগিল। ভারতবর্ষের এ অংশে ভিক্ষান্ন লাভ করিতে বড় কষ্ট পাইতে হয় না। মহারাজেরও এজন্য কষ্ট পাইতে হয় নাই। এরূপ অবস্থায় কখনও একাকী ও কখনও কাহারাও সঙ্গলাভ করিয়া চলিতে লাগিলেন ও নর্ম্মদার অভিমুখী হইলেন। এ সময়ে পথিমধ্যে ধ্যানানন্দ নামক এক সাধুর সহিত

তিনি মিলিত হন ও তাঁহার সহিত নর্ম্মদা তার পর্য্যন্ত যাইয়া উভয়ে নর্ম্মদা পরিক্রম আরম্ভ করিলেন। এইরূপ পরিক্রম না করিতে করিতে উভয়ে গঙ্গোপথে আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এখানেই জন্মান্তরের তাঁহাদের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ আবদ্ধ ছিল। এজন্যই পরম গুরুদেব আমাদের মহারাজকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন ও তাঁহার আশ্রমে স্থান দান ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে শিষ্য করিলেন। গুরুদেবই আমাদের পরম গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রথম শিষ্য। এখানেই ব্রহ্মচারীরূপে পরমগুরুদেবের নিকট তিনি সাধন ভজনের শিক্ষালাভে ব্রতী হইলেন। দীক্ষালাভের পর এই গঙ্গোনাথে মহারাজ ৭।৮ মাসের অধিক অবস্থান করিলেন না। পুনরায় তিনি নর্ম্মদা পরিক্রমণে বাহির হইলেন। ইহা কতকটা তাঁহার বালচপলতার জন্যই হইয়াছিল, কারণ পরম গুরুদেবকে না বলিয়াই পরিক্রমায় বাহির হন। এইরূপ পরিক্রমা করিতে করিতে, তিনি গৌরীশঙ্কর মহারাজের নিকট উপস্থিত হন। এই মহাত্মার নিকট মহারাজ সাত বৎসর অবস্থান করেন। সেখানে তিনি উক্ত মহাত্মার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হন। গৌরীশঙ্কর মহারাজের নির্দ্দিষ্ট কোন আশ্রম ছিল না। তিনি নর্ম্মদা তীরে, পরিক্রমা করিয়াই বেড়াইতেন। কোন কোন স্থান বিশেষ তিনি অবস্থানের অনুকুল বোধ করিলে, সেখানে হয়ত কিছুদিন থাকিয়া যাইতেন। এইরূপ পরিক্রমা সহ তিনি নর্ম্মদার একস্থান হইতে অন্যস্থানে আসন উঠাইতেন। গুরুদেব যাইয়া যে সময়ে এই মহাত্মার সহিত মিলিত হন, তখন তিনি গঙ্গোনাথ হইতে অধিক দূরে ছিলেন না। আমাদের পরম গুরুদেব ব্রহ্মানন্দও এই মহাত্মা গৌরীশঙ্কর মহারাজ উভয়েই উভয়ের পরিচিত ছিলেন ও উভয়ের মধ্যে বেশ প্রীতিভাবও ছিল। আমাদের গুরুমহারাজ বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই বাল্যা-বস্থায় যখন তিনি নর্ম্মদা প্রদেশে গমন করেন, সে সময়ে তথায় দুই মহাসিদ্ধপুরুষ অবস্থিত ছিলেন। গঙ্গোনাথের মহাত্মা আমাদের পরমগুরুদেব মহারাজ ব্রহ্মা-নন্দ ছিলেন গুপ্ত সিদ্ধপুরুষ। "গুপ্ত" বলিবার কারণ এই যে, তিনি অসাধারণ যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ হইয়াও সর্ব্বদাই যেন লোকচক্ষুর নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিতে ইচ্ছা করিতেন। আর উপরোক্ত গৌরীশঙ্কর মহারাজ প্রকটমূর্ত্তিতে সাধারণের নিকট ব্যক্ত ছিলেন। তাঁহার যোগবিভূতি ও ঔষধিদান, সদাব্রত প্রভৃতি বড়ই প্রচারিত ছিল।

তিনি যেখানে যাইয়া আসন পরিগ্রহ করিতেন, সেই স্থানেই নানারূপ সাধু

গৃহস্থের সমাবেশ হইত এবং এজন্য সর্ব্বদা সে স্থান "দীয়তাং ভুজ্যতাং" রবে পরিপূর্ণ। উক্ত মহাত্মার সহিত বহু লোকও সর্ব্বদা পর্য্যটন করিত। এরূপ পরিক্রমাবস্থায় গঙ্গোনাথে আসিয়াও ২।১ বার তিনি 'চাতুর্ম্মাস্য' সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। এ সময়ে পরমগুরুদেব তাঁহাকে বিশেষরূপে সংকার করিতেন।

আমাদের গুরুমহারাজ বালানন্দ এইরূপে উক্ত গৌরীশঙ্কর মহারাজের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার সহিত নর্ম্মদা পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। সাত বৎসরকাল এরূপ ভাবে তাঁহার সহিত অবস্থান জন্য মহারাজ এ মহাত্মার নিকট বহু প্রকার শিক্ষা লাভ করেন। এজন্য ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যেরূপ আমাদের গুরুদেবের দীক্ষাগুরু, সেইরূপ এই গৌরীশঙ্কর মহারাজও তাঁহার এক শিক্ষাগুরু। সুতরাং, এই দুই মহাত্মাই আমাদের পরমগুরু। এই কারণে, গুরুদেবের জীবন চরিতের সহিত এই দুই মহাপুরুষের বিষয়ও কিছু কিছু নিবেদন করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

যাত্রা।

লেখক—শ্রীযুক্ত উমানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।

৯। চলিয়াছি স্বপ্নে দেখা মুখপদ্ম স্মরি'
নয়নে ভাসিয়া ওঠে মেঘের বরণ
চিক্কণ আগুল্ফদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশদাম
নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ নীলাম্বর ছায়া

১০। জলভরা ঘনমেঘে মেদুর অম্বর
সজল কাজল আঁখি চোখে ভাসি আসে
বহু দীর্ঘপথ বহি মোর অভিযান
যৌবনের আশা সাধ কামনার লোকে ;

১১। সেথা চিরসৌন্দর্য্যের মিলনের ধাম
যেথা আছ প্রিয়তমা ভূতল শয়ান

বহুদূরে কল্পনার অলকের মাঝে
মানসসুন্দরী মোর যেথায় বিরাজে ;

১২। ক্ষীণ কটিতটে বাঁধি রক্ত করবী
লোধ্ররেণু মাখি মুখে আবেশবিহ্বল
যেথা আছ করভোরু ধূপধূম্রময়
সুরভিত বাসরের আসর উজ্জ্বলি।

১৩। সেই চির মাধুর্য্যের রাজলক্ষ্মী করি
চলিয়াছি নদী গিরি প্রান্তর ভেদিয়া,
হেরিয়াছে কি ছবি যে মুগ্ধ দু'নয়ন !
সে সুষমা মর্ম্মে মোর গাঁথা হ'য়ে আছে।

১৪। তোমারে লইয়া পার্শ্বে বহু দীর্ঘ পথ
অশ্বারোহী ফিরে আসি আপন আলয়ে,
দুরু দুরু বক্ষে তুমি এক হস্তে তব
আলিঙ্গন পাশে মোরে বদ্ধ রাখিয়াছ।

১৫। গুরু গুরু ডাকে দেওয়া, অন্ধকার নামে
ব্যাকুল হ য়েছ ভীরু অজ্ঞাত কি ভয়ে,
আরো সুনিকটে আসি' জড়াইছ মোরে
গল্প সুরু করি আমি ভুলাবার তরে।

১৬। হয়তো সাহস নামে হৃদয়ে তোমার
হয়তো নীরব রহ কি ভাবি কি জানি ?
বলিবার ছলে আমি অশেষ কাহিনী
পেলব কপোল তব চুম্বি অনিবার।

১৭। আবার পড়িছে মনে কোন জন্মে যেন
অকূল অসীম সিন্ধু জলে চলে তরী,

তারি মাঝে বসে আছি মোরা দুটী প্রাণী
দিন নাই রাত্রি নাই ভাসিছে তরণী।

১৮। দু-সন্ধ্যার গোধূলীর স্বপ্নময় বেলা
ফেলিয়াছে কি না জানি অপরূপ ছায়া,
তব রক্ত পট্টাম্বরে রক্তিম আননে
সে যে মোর অন্তরের রক্ত অনুরাগ।

১৯। ঊর্ম্মি-মুখর সিন্ধু উঠেছে উচ্ছসি
সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ে সোণাজল নাচে,
সে লাবণ্যে মুক্তাকাশ পড়িয়াছে ঢলি
কি রহস্যপুরে মোরা চলিয়াছি রাণি!

২০। সাগরের শেষ নাই, জল কলরব
শ্রবণে ভাসিয়া মোর রচিতেছে মায়া,
সাগরের তল হ'তে হেনকালে হেরি
অত্যাশ্চর্য্য চন্দ্রোদয় রজত নিশায়।

২১। জ্যোৎস্নায় ভরি' যায় আকাশ সাগর
হৃদয়-গগনে মোর প্রেম পূর্ণিমা যে,
সুরভি কুন্তল তব কভু বায়ু ভরে
বিকার আনছে মোর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া;

২২। বিথারিছ কি সে মায়া তোমার পরশে
প্রমোহ কি ইন্দ্রজাল স্বপন কুহক।
বিবশ হৃদয় মোর স্পর্শে স্পর্শে তব
অনুভবে কি যে সুখ-সুখের বেদনা!

(ক্রমশ)

বসন্ত ও তাহার প্রতিকার

Pox and its remedy.

লেখক—রাজবৈদ্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কবীন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

উপসংহার।

ইতিপূর্ব্বে "বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম" রোগের নিদানাদি ও তাহার চিকিৎসাদি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পথ্যাদি সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। উপসংহারে উক্ত ত্রিবিধ রোগ সম্বন্ধে সতর্কতা (Precautionary measures) এবং রোগী-পরিচর্য্যা (Nursing) সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

পুরাকালে ভারতের বিজ্ঞান-বিশারদ ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছেন যে—

"বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব প্রমুচ্যতে।
ন তু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥"

অর্থাৎ ঔষধ ব্যতীত কেবলমাত্র পথ্য দ্বারাও রোগ নিবর্ত্তিত হয়। পথ্য-বিহীন রোগী শত ঔষধ দ্বারাও আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। আহারীয় পদার্থই কেবলমাত্র পথ্য নহে। যাহা কিছু রোগীর পক্ষে হিতকর বা উপযুক্ত সেই সমুদয়ই তাহার পথ্য। রোগী-পরিচর্য্যাসংক্রান্ত যাবতীয় হিতকরী ক্রিয়াই রোগীর পথ্য মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং ঔষধ-ব্যবস্থার ন্যায় রোগীর হিত ও অহিত সকল বিষয়েরই সদ্ব্যবস্থা-বিচার করাও ভিষকের মুখ্য-কার্য্য। সাধারণতঃ "রোগ সম্বন্ধে সতর্কতা" দ্বিবিধ। (১) শারীরিক ও (২) মানসিক। (১) প্রথমতঃ শারীরিক সতর্কতা বর্ণিত হইতেছে। "শরীরং ব্যাধি-মন্দিরম্" অর্থাৎ মনুষ্য-শরীরকে "ব্যাধি-মন্দির" জানিবে। সমগ্র রোগরাজির আধার এই শরীরের ব্যাধি-প্রতিকারের জন্য, ইহা সুরক্ষিত হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। "স্বাস্থ্য-সংরক্ষণই" পার্থিব জীবনের মহদুদ্দেশ্য, ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ। মানব জীবন মহদুদ্দেশ্যমূলক। জীব-সৃষ্টির কোনও না কোনও উদ্দেশ্য আছে। কেবলমাত্র আহার বিহার প্রভৃতি অনিত্য প্রলোভন-বর্দ্ধক উপভোগ্য সম্ভোগ করিবার জন্যই জীব-শ্রেষ্ঠ মানবের সৃষ্টি হয় নাই। পার্থিব জীবনে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ বা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তিই একমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান। আবার উহা

প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—আরোগ্য বা সুস্থাবস্থা। সুতরাং স্বাস্থ্য-সংরক্ষণই মানব-জীবনের মুখ্য-ব্রত বলিয়া জানিবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হইলে মানব সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। সুরক্ষিত স্বাস্থ্যই সর্ব্বপ্রধান "রোগ-প্রতিষেধক।" স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে কোনও রোগ কাহাকেও সহসা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই প্রধান লক্ষ্য "স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে" বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

(২) দ্বিতীয়তঃ মানসিক সতর্কতার আবশ্যকতা অপরিমিত জানিবে। সচারাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে রোগীর মনই রোগের উৎপাত্ত ও পরিপুষ্টির প্রধান সহায়। আস্থির-চিত্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া স্বয়ং রোগীই অনেকস্থলে "রোগ-বৃদ্ধির" কারণ হইয়া থাকে। মনে ভয়ের সঞ্চার, শোক, চিন্তা, উত্তেজনা, ক্রোধ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় অসদ্বৃত্তি সমূহ রোগীর বিশেষ অনিষ্ট-কারক, এমন কি, সময়ে সময়ে মারাত্মক পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ, সাহস সঞ্চয় ও উৎসাহ-সংগ্রহ প্রভৃতি শুভকর অনুষ্ঠানই তাহার প্রধান অবলম্বন জানিবে।

(৩) চিকিৎসক, আত্মীয়বর্গ, শুশ্রূষাকারী ও পরিচারক প্রভৃতি সকলের উপরই রোগীর শুভাশুভ নির্ভর করে। বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি দ্বারা "রোগী-পালন ও পরিচর্য্যাদি" সাধিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যাহাতে রোগীর মন উৎসাহপূর্ণ ও ভয়-বিমুক্ত থাকে এবং মানসিক উত্তেজনা-বর্দ্ধক ক্রোধাদি (অসৎ-বৃত্তি সমূহ) রোগীর মনে স্থান না পায়, সেদিকে বিশেষরূপে লক্ষ্যরাখা প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রকার মানসিক উত্তেজনার কারণ যথাসাধ্য দূর করিতে পারিলে "রোগী-পরিচর্য্যার" প্রধান অঙ্গ প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

"বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম" রোগের ন্যায় কলুষিত, জঘন্য, অপকৃষ্ট, জনপদ-ধ্বংসী ও দুঃসাধ্য ব্যাধি পৃথিবীতে আর দুইটী দৃষ্টি-গোচর হয় না। অনেক সময়ে এই ব্যাধি এরূপ অপকর্ষ অবস্থাপন্ন হয় যে সহবাসী জন বিশেষতঃ পরিচর্য্যাকারী-দের জীবনও বিপদাপন্ন বলিয়া মনে হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সেই বিগলিত পচন-শীল অবস্থায় রোগ-বিষের সংহারিকা শক্তি মানবজীবনকে কি না করিতে পারে? সুতরাং পীড়িত অবস্থায় সতর্কতা ও যথাবিধি পরিচর্য্যার আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক। রোগীর পথ্যাপথ্য বিচার, ঔষধ-বিচার অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। রোগীর হিতাহিত সকল বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ, পথ্য ও পরিচর্য্যাদি বিশেষ সতর্কতার সহিত করা আবশ্যক। জল, বায়ু ও আহারাদি

বিশুদ্ধাবস্থায় যেমন রোগনাশের প্রধান সহায় হইয়া থাকে, বিকৃতাবস্থায় তাহারা তেমনই রোগোৎপাত্ত ও পরিপুষ্টির প্রধান কারণ হইয়া থাকে।

(৪) "বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম" রোগের সূত্রপাতের লক্ষণ অনুভূত হইলেই রোগীকে অসংশ্লিষ্ট করা আবশ্যক। বহুদর্শী মনস্বীগণ রোগীকে পরিষ্কৃত শীতল, মনোরম, মনঃশান্তিপ্রদ, নির্জ্জন এবং বিশুদ্ধ শীতল ভু-বায়ু প্রবাহিত স্থানে রাখিতে ব্যবস্থা করেন। তাহাকে সংসারভুক্ত দ্রব্যাদি ও আত্মীয়স্বজনের সংস্রব হইতে স্বতন্ত্র রাখাই শ্রেয়ঃ। স্বতন্ত্রীভূত করিবার অভিপ্রায় অন্য লোক তদ্বারা সংক্রামিত না হয়। রোগী পরিচর্য্যার দিকেও কোনপ্রকার ত্রুটী বা অবহেলা না হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পরিষ্কার ও শীতলবায়ু প্রবাহিত স্থানই উক্ত রোগীদের পক্ষে প্রশস্ত। পরিষ্কৃতি, পরিচ্ছন্নতা, শুচি,মনস্তুষ্টি ও চিত্তবৃত্তির নিরোধ প্রভৃতিতে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া রোগীকে চলিতে হইবে। জল, বায়ু, ও আহার্য্য দ্রব্যেরও পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধি কঠোর ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। রোগীর পরিধান ও আবরণ বস্ত্রাদি এবং শয্যা প্রত্যহ পরিবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পরিবর্ত্তিত বস্ত্রাদি জলে সিদ্ধ করিয়া পুনরায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ব্যবহার্য্য জলও বিশেষরূপে পরিষ্কৃত ও পরিশোষিত হওয়া আবশ্যক। রোগীর পানার্থে বিশুদ্ধ শীতল জল অথবা ঔষধনির্ম্মিত জল সর্ব্বদা ব্যবহার করিবে। তাহার আহারাদি বা পথ্যাদিও সুব্যবস্থিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। রোগের প্রথম অবস্থায় উপবাস বা স্বল্পাহার, রোগারম্ভাবস্থা হইতে সর্ব্বদাই রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কারের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। রোগীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পাদনও প্রধান কার্য্য বলিয়া লক্ষ্য রাখিবে। তাহার শারীরিক অবস্থানুসারে যথোপযোগী নিম্নলিখিত পথ্যাদিও নির্ভয়ে দেওয়া যাইতে পারে :—

পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন, ছোলা, মুগ বা মসুর ডালের যূষ, যবের মণ্ড, যবের রুটী, খই, মুড়ী, কিস্‌মিস্, মনক্কা, বেদানা ও দাড়িম্ব, গব্যঘৃতের ভাজা লুচি ও হালুয়া প্রভৃতি সুপথ্যাদি।

রোগীর অপথ্যাদি যথা :—

তৈল ব্যবহার বা মর্দ্দন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, মনের কু-প্রবৃত্তি সকলের উত্তেজক কোনও কার্য্য, রৌদ্রসেবন, রাত্রি জাগরণ, দূষিত জল ও দূষিত বায়ু সেবন, "অপরিমিত, অবথা ও অসময়ে আহার বা পান," শাক, সিম, আলু, অধিক পরিমাণে লবণ, কটুদ্রব্য ও অম্লদ্রব্য প্রভৃতি।

প্রাণবায়ুর পুষ্টির জন্য সর্ব্বদা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন স্থানে বিশুদ্ধ ভু-বায় সেবন, সমভাবে ও সমসময়ে নিশ্বাস ও শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ এবং যাবতীয় স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ অনুষ্ঠানের পালন প্রভৃতি দ্বারাই "অক্ষুণ্ণ-স্বাস্থ্য" লাভ হইয়া থাকে। অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য রোগ- প্রতিষেধক হইয়া থাকে।

"বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম" এই ত্রিবিধ রোগের নিদানাদি, চিকিৎসাদি ও পথ্যাদি সংক্ষেপে যাহা কিছু লিখিত হইল, সে সমস্তই আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রত্যক্ষ-ফল-প্রদ মহৌষধ জানিবে।

অব্যক্ত, অচিন্তনীয় ও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর স্বীয় অসীম শক্তি-সমুদ্রের কণিকা দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। চেতন ও অচেতন সমগ্র জগৎ সেই অসীম শক্তির আধার। জড়দেহের সজীবতা-সম্পাদিকা চৈতন্যশক্তিকে জীব-জাতির জীবনী-শক্তি বলা যায়। এই জীবনী-শক্তিই বিশ্ব-শক্তি বা ঐশীশক্তি বলিয়া খ্যাত। যাবতীয় চেতন পদার্থের মূল সেই বিশ্বশক্তি বা ঐশীশক্তি। দৈহিক ও মানসিক কার্য্যকলাপে তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। গ্রহ, নক্ষত্র-মণ্ডলী, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি সেই ঐশীশক্তিরই বিকাশমাত্র। সর্ব্বত্র সকল অচেতন পদার্থেও ঐশীশক্তি বিরাজমানা। অচেতন শিলাখণ্ডও ঐশীশক্তিময়। অন্তর্নিহিত সেই মহাশক্তির প্রভাবে চেতন ও অচেতন সকল সজীব। এই মহাশক্তির প্রভাবে ঔষধি-দ্রব্যাদিও যাবতীয় রোগারোগ্যকরী-শক্তিসম্পন্ন। তাহাদের রোগারোগ্যকরী-শক্তি অনন্ত ঐশীশক্তিরই কণিকা মাত্র। জড় ঔষধ স্বীয় জড়স্বভাব-প্রযুক্ত রোগ প্রশমন করিতে অক্ষম। উহাদের অন্তর্নিহিত গুপ্তশক্তিই "রোগারোগ্যকরী বিশ্বশক্তি" বলিয়া জানিবে। যতক্ষণ না ঐ গুপ্ত-শক্তি প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ কোন ঔষধই রোগারোগ্যকরী শক্তিসম্পন্ন হয় না। অলমতি বিস্তরেণ।

স্বর্গীয় ডবলিউ. সি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

উমেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী।

বহুবাজারনিবাসী ৺নীলমণি মতিলালের কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবী উমেশচন্দ্রের

সহধর্ম্মিণী। উমেশচন্দ্রের যখন ১৫ বৎসর মাত্র বয়স এবং হেমাঙ্গিনীর ১০ বৎসর বয়স তখন তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্ম মতে বিবাহ হয়। উমেশচন্দ্রের সহোদরা মোক্ষদা দেবী "বনপ্রসূন" "সফল-স্বপ্ন" "কল্যাণ-প্রদীপ" এই গ্রন্থত্রয়ের রচয়িত্রী। এই বিদুষী রমণী তাঁহার ১৩৩৫ সালে লিখিত "কল্যাণ-প্রদীপে"র ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "৺হেমাঙ্গিনীর অর্থাৎ উমেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর গুণের কথা লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র পুথির প্রয়োজন। আমরা দুইজনেই সমবয়সী, ১০।১১ বৎসর বয়সে আমাদের দু'জনার পালটী ঘরে বিবাহ হয়। আমার প্রায় ৭০ বৎসরের স্মৃতিতে হেমাঙ্গিনী জড়িত। আমি বিবাহেরপর প্রথম বউ হইয়া হেমাঙ্গিনীর পিত্রালয়ে যাই। তাঁহার পিতা বৌবাজারের সুবিখ্যাত ৺নীলমণি মতিলাল। তিনি আমার স্বামীর বড় মামা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার বিবাহের পর আমার দাদার বিবাহ হয়। হেমাঙ্গিনী বৌ হইয়া আমার পিতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি গিরীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিমলার বাটীতে উঠেন। আমাদের ঘনিষ্ঠতা এত নিকট আমাদের দুইজনার ভিতর প্রণয় এত গাঢ় ও মধুর যে, ননদে ভাজে এমনটী প্রায় দেখা যায় না। তাই ইচ্ছা আছে এই পুস্তকে তাঁর ও আমার দাদার ছবি দুইখানি দিব। তাঁদের দুইজনের জীবনী লিখিবার সাধ থাকিলেও আর সাধ্য নাই। আশা করি আমাদের সন্তানসন্ততিদের ভিতর কেহ না কেহ উহা লিখিতে সাহসী হইবে।"

"আমার দাদা যে ব্যারিষ্টারিতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে কংগ্রেসের একজন প্রধান স্রষ্টা ও উহার প্রথম ও অষ্টম প্রেসিডেন্ট হইতে পারিয়াছিলেন, এ সমস্তই আমার বিশ্বাস আমার ভাজের স্বামী-ভক্তির গুণে, ত্যাগস্বীকারের বলে। আমার দাদার জীবনী কেহ না কেহ অবশ্যই লিখিবেন। তিনি কেবল বাংলা দেশের নহেন, সমগ্র ভারতের। তাঁহার জীবনী লেখা না হইলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। যে মহাত্মাই সেই কার্য্যে ব্রতী হউন তিনি যেন সেই সঙ্গে তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনীকে না ভুলেন।" মোক্ষদা দেবি অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে (১৯২৯ সালের) জুনমাসে পরলোক গমন করেন।

উমেশচন্দ্র বিলাত যাইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পত্নীকে ইংরাজী ধরনে লেখাপড়া শেখান এবং বিলাতে অর্থাৎ Croydonএ বাটী কিনিয়া তথায় রাখিতেন। উমেশচন্দ্র বৎসরের মধ্যে সাড়ে তিনমাস অর্থাৎ Augnst মাস হইতে November মাসের অর্দ্ধেক

পর্য্যন্ত বিলাতে থাকিতেন। হেমাঙ্গিনী পরের দুঃখে কাতর হইতেন। যখন উমেশচন্দ্র জন্মস্থান খিদিরপুর সোনাইতে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, হেমাঙ্গিনী দুপুর বেলা গাড়ি চড়িয়া তাঁহার বাটীর পার্শ্বস্থিত দরিদ্র পরিবারবর্গের বাটী যাইয়া তাহাদের সংসারে চাল, ডাল, লবণ, তৈল, বস্ত্র, ইন্ধন প্রভৃতি যাহার যাহা অকুলান পড়িত তাহাকে তাহা বিতরণ করিতেন। তাহারা তাঁহাকে অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিত। তাঁহারও গুপ্ত দান অনেক ছিল। তিনি তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর পাথুরিয়াঘাটা Strand Roadস্থিত Mayo Hospitalএ "উমেশচন্দ্র হেমাঙ্গিনী ward" নাম দিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হিন্দুরমণীগণের চিকিৎসার্থ ১৫টী Bedএর খরচা জমা দিয়া তাহাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দু রমণী ব্যতীত অপর কোন জাতীয় রমণী উক্ত ওয়ার্ডে চিকিৎসিত হইবে না। যে দিবস উক্ত ওয়ার্ডের দ্বার উদ্ঘাটন হইয়াছিল, সে দিন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Lawrence Hugh Jenkins সাহেব সভাপতি ছিলেন। তিনি এক ওজস্বিনী বক্তৃতায় উমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম, কর্ম্মশক্তি ও বাগ্মিতার যথাযথ সুখ্যাতি করেন। হেমাঙ্গিনী দেবী বিলাতে বাস করিয়া ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি তথায় Christian lady missionaryগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দ্বারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে বিশেষরূপ আকৃষ্টা হন এবং নিজের মনোভাব জানাইয়া স্বামীকে এক পত্র লিখেন। তাহাতে উমেশচন্দ্র অত্যাশ্চর্য্য religious tolerationএর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার ধর্ম্ম বিশ্বাসে আমি হস্তক্ষেপ করিতে চাই না। যদ্যপি তুমি যথার্থই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আকৃষ্টা হইয়া থাক, তুমি উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পার, কিন্তু আমার উক্ত ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। আমি আমার পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িব না। আমি জানি, হিন্দুসমাজে আমার স্থান অতি সংকীর্ণ, তথাপি আমার পিতা পিতামহের ধর্ম্ম—যাহাতে তাঁহারা আশ্বাস পাইয়া প্রাণবায়ু ত্যাগ করিয়াছেন, উহা আমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই।" তদনুসারে তাঁহার পত্নী খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, কিন্তু তিনি যে হিন্দু সেই হিন্দুই রহিলেন। তিনি পরোপকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াই জানিতেন। তাঁহার স্বজন-প্রীতি, স্বদেশানুরাগ, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, ভগ্নীস্নেহ, স্বজন-প্রতিপালন প্রভৃতি সকল গুণই 'স্ব' হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার 'স্ব' এর গণ্ডী অতিশয় ব্যাপক ছিল। তিনি চাকরবাকর প্রভৃতির উপর অতিশয় দয়ালু ছিলেন! তিনি বলিতেন, "আমার চাকর কষ্ট পাইবে তাহা হইবে না।"

নিজের ধর্ম্ম, নিজের দেশ, নিজের পৈতৃক ভিটা, নিজের পৈতৃক ঠাকুর, নিজের ভাইবোন প্রভৃতির উপর তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ছিল—সেরূপ স্নেহ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

উমেশচন্দ্রের সহোদর ও সহোদরাগণ।

উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর কৈলাস চন্দ্র ৩।৪ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ডাকনাম ছিল "মুতো" অর্থাৎ "মতি"। তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে মতি বলিয়া ডাকিতেন।

উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠের নাম "সত্যধন", তাঁহার ডাকনাম ছিল "ধন"। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইনি সংস্কৃত কলেজের অতি নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া সেখান হইতেই M, A, পাশ করিয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্রের চারি সহোদরা ছিলেন। (১) মোক্ষদা, (২) সুখদা, (৩) পতিতপাবনী ও (৪) রাজলক্ষ্মী। তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভগ্নী ছিল, তাঁহার নাম গঙ্গা। উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী মোক্ষদা দেবী বিদুষী ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে যখন কবি হেমচন্দ্র বঙ্গরমণীকে নিন্দা করিয়া কবিতা লিখেন, মোক্ষদা দেবীই সর্ব্বপ্রথমে তাহার পাল্টা জবাব দেন। তাহা তাঁহার "বনপ্রসূন" নামক কবিতায় লিপিবদ্ধ আছে! ইনি ভগলপুরের সরকারী উকীল ৺শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিনী।

মোক্ষদা দেবী তাঁহার "কল্যাণ-প্রদীপে"র ১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে পূজার বন্ধের পূর্ব্বেই কলিকাতায় আমার দাদার (W. C. Banerjee) খুব ব্যারাম হয়। আমার ভাজ শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী তাঁর ছেলে মেয়েদের লইয়া তখন বিলাতে। সেখানে ঐ সময়ে তাঁর বার বৎসরের ছেলে, কিটী (সরলকৃষ্ণ) হঠাৎ মারা পড়াতে আমার দাদার অসুখ আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁর শুশ্রূষার জন্য আমাকে ভাগলপুর ছাড়িয়া প্রায় ছয় মাস কলিকাতায় থাকিতে হয়।

আমার দাদা ১৮৯১ সালের মার্চ্চ মাসে সুস্থ হইয়া উঠিলে আমি ভাগলপুরে ফিরিয়া যাই।"

* * * *

মোক্ষদা দেবী উক্ত পুস্তকের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"আমার দাদা ১৯০২এর এপ্রিল হইতে বিলাতে, তথায় পার্লামেণ্টের সভ্য হইবেন আর প্রিভিকাউন্সিলে প্রাক্‌টিস্ করিবেন বলিয়া একরূপ দেশত্যাগী হইয়াছিলেন!

আমার ছোটভাই সত্যধন বিপত্নীক হইয়া বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিয়াছিলেন। তিনি তিনটী কন্যা রাখিয়া ১৯০২ সালের অক্টোবরে মারা যান।"

* * * *

উক্ত পুস্তকের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে Croydonএর বাটী বিক্রয় করিয়া বিলাতের পাট একরূপ তুলিয়া দিয়া তাঁর অবিবাহিত মধ্যমা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।"

মোক্ষদা দেবীর দুই পুত্র—(১) ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যিনি S. C. Mukherjee & Co. নামক attorney officeএর বড় অংশীদার। অপর অংশীদার এটর্ণি শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়—উমেশচন্দ্রের মধ্যমা ভগ্নীর পুত্র। দেবেশ্বরের দুই সহোদর, জ্যেষ্ঠ শ্রীবিশ্বেশ্বর ও মধ্যম শ্রীভুবনেশ্বর।

উমেশচন্দ্রের চতুর্থ ভগ্নীর এক পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিঃ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ইনি মেদিনীপুরে ওকালতি করেন। তাঁহার পিতা ৺সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরের উকিল ছিলেন।

উমেশচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভুবন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুরের সরকারি উকিল ছিলেন।

উমেশচন্দ্রের তৃতীয় (বৈমাত্রিয়) ভগ্নীর পুত্র ছিল না, কিন্তু তাঁহার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার চুঁচুঁড়ার সরকারি উকিল শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্য নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ইহারই পুত্র শ্রীমান্ সনৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এক্ষণে আলিপুরে অতিরিক্ত District & Sessions Judge.

উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগ্নী রাজলক্ষ্মী পুত্রহীনা। সুবিখ্যাত Florist S. P. Chatterjee মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইহার বিবাহ হয়।

মোক্ষদা দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনোদিনীর গর্ভে Captain কল্যাণ কুমার মুখার্জ্জি I. M. S. জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে দারুণ মহামারী রোগে আক্রান্ত হইয়া মেসোপোটিমিয়ায় কুতেল আমারার যুদ্ধে সৈন্যদলের অধিনায়ক জেনেরার সার জে, ই, নিক্সন, K. C. B.র অধীনে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের মধ্য হইতে আহত সৈনিকদিগের উদ্ধারকল্পে উদ্যম ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। "কল্যাণকুমার

১১ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া নিজের মনের দৃঢ়তায়, যত্ন ও পরিশ্রমে লেখাপড়া শিখিয়া এখানে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—নিজের উদ্যম ও চেষ্টায় বিলাত গিয়া—সেখানে সংযতভাবে থাকিয়া এডিনবরা ও কেমব্রিজ এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত যথাযথ ডিগ্রী পাইয়া—সুকঠিন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে ঢুকিয়া—ক্যাপ্টেনের বড় পদ পাইয়া—বীরত্বের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আপন প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞানে কর্ত্তব্য পালন করিয়া এবং সেই কাযে গৌরবান্বিত হইয়া ৩৪ বৎসর ৬ মাস বয়সে জ্বরবিকার রোগে প্রাণ হারাইল।"—এই কথাগুলি তাঁহার অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা দিদিমা তাঁহার দৌহিত্রের জীবনী "কল্যাণ প্রদীপে" লিখিয়াছেন।

মোক্ষদা দেবী কল্যাণ প্রদীপের ১৪৭ পৃঃ লিখিয়াছেন,—"১৮৮৬ খৃঃ অঃ আমার স্বামীর ক্রমান্বয়ে অনেকবার জ্বর হওয়ায় ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁহাকে লইয়া আমাদের ৬ মাস কাল দার্জ্জিলিঙ্গে থাকিতে হয়। তারপর পূজার ছুটিতে আমার দাদা (W. C. Banerjee) ও ভাজ (হেমাঙ্গিনী দেবী) তাঁহাদের সপরিবারে আমাদের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙ্গে এক বাড়ীতে আসিয়া থাকেন। রেলগাড়ীতে উমেশচন্দ্রের সহিত বালক কল্যাণের দেখা হওয়ায় সে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল :—"আচ্ছা, আপনি কি করে বড়মাদের বাড়ীটা চিন্‌লেন, আপনি ত সে বাড়ী দেখেন নি ?" তাতে আমার দাদা উত্তর দেন—"তুমি ত চেন, তুমি আমাদের চিনিয়ে নিয়ে যাবে তাইত তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।" তার পরদিন দার্জ্জিলিঙ্গে ট্রেণ ১ টার সময় পৌঁছিল। আমার দাদা ও ভাজ তাঁদের তিন ছেলে, দুই মেয়ে, ইংরাজী নার্স আয়া, চাকর-বাকর লইয়া নামিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গে দীর্ঘ তিনমাসের মধ্যে এক বাড়ীতে ৪টী ছেলে ২টী মেয়ে একসঙ্গে খেলাধুলা করিত কিন্তু একদিনও ঝগড়া বিবাদ মারামারি হয় নাই। আমার ভাইপো, ভাইঝিদের সাহেবি কেতা, তাদের ইংরাজী কথাবার্ত্তা, ধরণ-ধারণে কল্যাণ খুবই লক্ষ্য রাখত।"

মোক্ষদা দেবী তাঁহার কল্যাণ-প্রদীপের ৭৯ পৃঃ লিখিয়াছেন,—"১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ বিখ্যাত কার্ত্তিকের ঝড়ের পরেই উমেশচন্দ্র ব্যারিষ্টার হইবার জন্য লুকাইয়া বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৬৮ খৃঃ উমেশচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। সেই বৎসর তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তখনই উমেশচন্দ্রের ব্যারিষ্টারীতে সুখ্যাতি কলিকাতার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ ৺সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত এটর্ণি হইয়াছিলেন।"

বৌবাজারের স্বনামধন্য ধনকুবের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মতিলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র

শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলালের কন্যা হেমাঙ্গিনীর সহিত আমার দাদা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল নিজ বিদ্যা ও অর্থেরবলে বড় বড় সাহেবদের সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উঁহার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, স্বনামধন্য ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তাই উমেশচন্দ্রের শ্বশুরবাটীতে সাহেবী-আনা, মদ্য, মাংস আহার করা বেশই চলিয়া উঠিয়াছিল।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী-মঙ্গল বা কালকেতু।

(নাটক।)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর।

হরগৌরীর অন্তর্ধান।

জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ ও গান।

জয়া ও বিজয়া। কিবা দুঃখ, কিবা সুখ, সকলি ত মনের বিকার।
বিরহ মিলন সব, মিথ্যা কথার রব
বিবেকী জনের মনে সবই একাকার।
পুত্র পুত্রি মিতা মধুময় সম্ভাষণ
অনিত্য বিশ্বে রহে হায় কতক্ষণ ?
সত্য সনাতনে
ভজ সদা কায়মনে
শান্তি নিকেতনে রহ অনিবার
বল মুখে "হরি হর" "হরি হর" "হরি হর"
চণ্ডি চরণে মতি হোক্ সবাকার। (প্রস্থান)

ইন্দ্র। (শচির প্রতি) দেবেন্দ্রাণি! শুনিলে ত ঈশ্বরের বাণী,
শুনিলে ত বিজয়ার গান ?
পুত্র মিত্র পরিবার শোকের নিদান।
একমাত্র সত্য তিনি যাঁহা হতে বিশ্বের সৃজন।

চলত্বরা পুত্র লয়ে মন্দাকিনী তীরে।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ-দৃশ্য—মন্দাকিনী তীর।

নীলাম্বর।

নীলাম্বর। দিন দণ্ড পল আদি অনন্ত কালের
পরিমাণ। মন্দাকিণী বক্ষে যথা যায়
ঊর্ম্মিরাশি হাসি হাসি, তথা যায় প্রাণ
অনন্তকালের কক্ষে।
এই দেহ নশ্বর আধার
পড়িয়া রহিবে শুধু। যাবে জীবটুকু
পরমেশ নিদেশেতে জীবের শরীরে।
মন্দাকিনি! সুরনদি! মাতঃ!
ত্যজি দেহ যাই ধরাতলে
অনুমতি দেহ দাসে। অমর নিবাসে
নীলাম্বর নামে আর রহিল না কেহ।
শুভঙ্করি! ইচ্ছা তব লোক্ পূরণ,
কিঙ্করে খেলাও তুমি মনের মতন।
কত খেলা জান মাগো অচিন্ত্যরূপিণি!
কন্দুক সমান বিশ্ব ক্রীড়ার আধার
প্রতিপলে লয় হয় অনন্ত ভুবন।
তোমার ইচ্ছায় মা গো চলিনু ধরায়,
পাই যেন ভক্তিবিন্দু চরণে তোমার।
দেব যদি মুগ্ধ হয়, নরে কিবা দোষ ?
রিপুর অধীন তারা। দয়াময়ি দেবি!
দুর্দ্দিনে চেতায়ে দিও কিঙ্করে তোমার
রিপুমুগ্ধ করো না মা, মিনতি আমার।
নমোনারায়ণায়, নমোনারায়ণায়। (তনুত্যাগ)

(আলুথালু বেশে ছায়ার প্রবেশ)

ছায়া। (নীলাম্বরের পদ বক্ষে ধরিয়া) এই যে নাথ আমার, শান্তিদায়িণী মন্দাকিনীর সুশীতল কোলে আশ্রয় নিয়ে পরমাশান্তি লাভ কচ্ছেন। হা নাথ ! ছায়া যে তোমার ছায়া, কায়ার সঙ্গে ছায়ার যে নিত্য সম্বন্ধ, তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী ছায়াকে পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে ? জীবিতেশ্বর ! যতদিন জীবিত ছিলে, ততদিন কতই সোহাগ আদর ও নম্মানে তোমার চিরসোহাগিণী ছায়াবতীকে তুষেছ। আজ কেন নিদয় হ'লে নাথ ! প্রেমের উৎস কি শুষ্ক হ'ল ? প্রিয়তম ! একবার নয়ন উন্মিলিত করে দাসীর পানে চেয়ে দেখ। তোমার স্নেহময় "প্রিয়ে" সম্ভাষণের অভাবে অভাগিণী স্বামীময়-জীবিতা ছায়ার কি দশা হয়েছে ! বিসর্জ্জন মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রতিমার বিসর্জ্জন হলে পর, শূন্য মন্দির যেমন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে হাহাকার করে ; আজ তোমার বিহনে তোমার আশ্রিতা লতা ছায়াবতীর সেই দশাই হয়েছে !

জীবিতনাথ ! আমি উৎসবে ব্যসনে সর্ব্বত্রই তোমার সঙ্গিনী এবং পরামর্শদায়িনী, আমা ছাড়া তুমি ত কোথাও গমন কর্ত্তে না. আজ কেন বিপরীত ভাব দেখি ? আমায় না বলে ক'য়ে কোন্ স্থানে গেলে ? আমার পরমায়ুঃ নিয়ে ফিরে এস। আমি তোমার পরিবর্ত্তে গমন করি। প্রাণনাথ ! আর যে সহ্য হয় না। তোমার বিমলিন মুখমণ্ডল দর্শন করে ছায়ার হৃদয় ফেটে যায়। ও হো হোঃ দারুণ বিধি করলে কি ? লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিলে ? হায় শম্ভু ! তোমায় লোকে "আশুতোষ" "শঙ্কর" "শিব" প্রভৃতি মঙ্গল-বাচক শব্দে বিশেষিত করে। তুমি "শুভঙ্কর" হয়েও খণ্ড-কপালিনী ছায়ার ভাগ্য—

দোষে আজ বাম হ'লে ?

বামদেব ! তোমার ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক্। নাথ ! তোমার ছায়া তোমার সঙ্গেই চল্লো। দেখো যেন মর্ত্ত্যের মৃত্তিকায় মুগ্ধ ছায়াবতীকে ভুলো না। মাতঃ মন্দাকিনি ! স্বামীসোহাগিনী তুমি : স্বামীর বিরহ যাতনা যে কত বড় শেল, তা তুমি ত জান মা, তাই তোমার শ্রীচরণ-কমলে কিঙ্করীর এই প্রার্থনা, যেন স্বামীধনে প্রাপ্ত হই। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ! হরিবোল ! হরিবোল !! হরিবোল !!! (তনুত্যাগ)

দেববালাগণের গান।

দেববালাগণ দেহ যোগ নহে সত্য মিথ্যা সব মায়া।
অনিত্য সংসার খেলা বিনশ্বর কায়া॥
মুকুন্দ চরণ, কররে সেবন,
ঘুচে যাবে যত ভবের বন্ধন,
নিরমল জ্ঞানে আলোকিত মনঃ
হইবে শান্তি-লাভ—
নারায়ণ পদে মজিবে মানস
উপজিবে মহাভাব।
ধন-জন যৌবন ক্ষণিক রহে
কামনা আগুণে শরীর দহে
কেহ এই ভবে আপনার নহে
মিথ্যা পুত্র জায়া॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—ধর্ম্মকেতুর কুটীর।

(ব্যাধকামিণীগণ নিদয়ার পুত্রকে দেখিয়া)

১মা ব্যাধ স্ত্রী। ওলো, নিদয়ার দিব্যি ছেলে হ'য়েছে। অমন চেহারা রাজপুত্রেরও হয় না। যেমন গায়ের রং তেম্নি গঠন।

২য়া স্ত্রী। তা বেঁচে থাক। শতেক পেরেমাই হোক্। নিদয়া

দিদির মন ভাল। পাঁচ বেটির পর ভাল ছেলেটি হয়েছে, বড়ই আদরের হবে।

৩য়া স্ত্রী। ধর্ম্মকেতু এই বয়সে আবার বে কর্‌বার জন্যে ক্ষেপে ছিল। বলে বংশ রক্ষা চাই, নিদয়ার যখন হলো না, তখন অন্য চেষ্টা করি। তা এখন দাদার দুঃখ গেল।

১মা। ওলো তোরা শাঁখ বাজা না শাঁখ বাজা। ধাই বুড়ি বুঝি নাড়ী ছেদন করেছে। "কে কোথায় একপাশ, পো পোয়াতি দূরে যাস্‌। ভাল মন্দ এক পাশ্‌।"

২য়া। ওগো পিসি! তিনুর মাকে বাড়ীর বার হ'তে বারণ করে দে মা। ওর আবার ন'মাস কি না!

(শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি)

৩য়া। আঁতুর ঘরের ডাইনদিকে ষষ্ঠী পেতে, তাতে সাতকড়া কড়ি আর ধান, দূর্ব্বা, হলুদ, আল্‌তা দাও। ঘরে যেন সদা সর্ব্বদা আগুন রেখো। ছেলেকে ধোঁয়ায় রেখো না। সাবধানে থাকিস্‌ দিদি, আমি দেখি, বৌমার আবার এই সময়ে ঘাট্‌কে যাবার সময়। (নিক্রান্ত)

(বৃদ্ধা আসিয়া প্রবেশ করিলেন)

বৃদ্ধা। বলি এই ঘরখানা কি নিদয়ার নয়? হয় তো ভুলে এইছি মা, তা তোমরা একটু পথ দেখিয়ে দাও না, বুড়ো মানুষ মা!

১মা। এইটেই ত নিদয়ার ঘর। তোমার মনে পড়ছে না? ওষুধ দিয়েছিলে, তার ফলে তোমার বেটির ছেলে হ'য়েছে। দিব্যি ছেলে সোণার চাঁদ। দেখ্‌বে চল।

২য়া। বেশ দিনেই এয়েছ মা. বেশ শুভদিনেই এয়েছ। তোমার পায়ের ধূলো দাও। যেন সম্‌বচ্ছরে বৌমার একটি ছেলে হয়।

(উভয়ের প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)

বৃদ্ধা। (হাসিয়া) বেটা ছেলে হয়েছে? বেশ বেশ! আমি ত বলেছিলুম বেটা হবে। ক্ষেপা ছেলে বলে কিনা বিয়ে

করবো; তা বিয়ের বয়স যায়নি ত? আমার চেয়ে না হয় বছর খানেকই ছোট হবে। তা কি বলছিলুম, বলি, বায়ে বুড়ো করেছে মা, নৈলে এখনো ব্রহ্মাণ্ডখানা ঘুরেই বেড়াই—পেটের দায়ে। পোড়া পেটে কতই যে আঁটে! ধর্ম্মকেতু কৈ? আমায় ছেলে দেখাবে না?

১মা। ওমা! তোমাকে আর ছেলে দেখাবো না? ছেলের সৃষ্টি কর্ত্তাই যে তুমি। এস মা, আজ বড় আনন্দের দিনেই এয়েছ। ব্যাধের ঘরে তোমার পায়ের ধূলো পড়্‌লো—বড়ই ভাগ্যের কথা মা, বড়ই পুণ্যের কথা।

২য়া। ওগো নাটুয়ার দল! তোমরা এই দিকে এসো। আজ নিদয়া দিদির ছেলে হয়েছে। মজা করে ভোজ খাবে। সকলে আশীর্ব্বাদ করো যেন, খোকার আমার শত বছর পেরমাই হয়। চল মা ছেলে দেখাইগে।

(বৃদ্ধাসহ ব্যাধকামিনীর প্রস্থান)

নাটুয়াগণের প্রবেশ ও গান।

নটুয়াগণ। আয় রে আয় সোনার যাদু
মায়ের কোলে আয়।
(ও তোর) হাতে দেব ক্ষীরের নাড়ু
সোনার নূপুর পায়।
(ও তোর) কচি মুখে মধুর হাসি
(যেন) আকাশ মাঝে সোনার শশী
আমি দেখ্‌তে বড়ই ভালবাসি রে
তাই বারে বারে চাই।
(তোর) ননীর মতন নরম তনু
যশোদার নীলমণি কানু
যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু খেলিয়া বেড়ায়।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—সঞ্জয়কেতুর গৃহ।

হীরার কন্যাসন্তান হইয়াছে তাই ব্যাধকামিনীগণের আনন্দে কথোপকথন।

১মা। হীরা দিদি! তোর পেটে যে এমন ছেলে হবে এ যে

স্বপনের অগোচর। যেন সারকুঁড়ে পদ্মফুল!
সাত বেটার পর মেয়েটি এয়েছে, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী!
তা ভাই! এবারে সহজে ছাড়বোনা, কি খাওয়াবি বল্।

হীরা। কি খাবি বল্। যা খাবি বোন্ তাই খাওয়াবো।
তোমাদের পাঁচ পোয়াতির পায়ের ধূলোয় খুকীর আমার
দীর্ঘ পরমাই হোক, এই আশীর্ব্বাদ কর ভাই!

২য়া। (ছেলে কোলে লইয়া) আহা হা, আকাশের চাঁদরে
আমার বুক জুড়ানো ধন! কোন্ রাণী মা এমন চাঁদের
পায়গো দরশন? (চুমা খাইয়া) হারা! লক্ষহীরা
তোর ঘরে এয়েছে। দেখ্ দেখি, এমন আঠো অঙ্গ
সুন্দর গঠন, যেমন চোক্ তেমনি নাক্, তেমনি মুখ
যেন মেনকার গৌরী, যশোদার নীলমণি!

৩য়া। অই দেখ ভাই! জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী এই দিকেই
ধেয়ে আস্‌ছে। হীরাদিদি ছেলে নিয়ে ঘরে যা। কি
জানি কেমন লোক, কে জানে? (হীরার প্রস্থান)

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। সঞ্জয়কেতু! সঞ্জয়কেতু!

(সঞ্জয়কেতুর আগমন)

সঞ্জয়। আসুন! আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। সর্ব্বাঙ্গীন
কুশল ত? (প্রণাম পূর্ব্বক) আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে
কল্য রাত্রে একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। প্রভু!
আসন গ্রহণ করুন। আমার জাতাশৌচ হয়েছে, তাই
ভয় হচ্ছে, চরণধৌতের জল এনে দেব কি?

সন্ন্যাসী। আরে বেটা, তোর কন্যা হয়েছে? বড়ই সু-খবর
দিলি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তোর একটি
কন্যা হয়। তা বেশ হয়েছে; আন্ দেখি একবার দেখি?

সঞ্জয়। আপনার আশীর্ব্বাদেই ত এই সৌভাগ্য হয়েছে প্রভু!
সেই যে আপনি হীরাবতীকে পদপ্রক্ষালন-বারি পান
কর্ত্তে দিলেন, আর বল্লেন যে, সম্বৎসরের মধ্যেই
তোর কোলে ফুল্ল কমলের ন্যায় কন্যা সন্তান শোভা

পাবে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ প্রভু! আজ আমার অন্তরের
আহ্বান শুন্‌তে পেয়েই, কৃপা করে কিঙ্করের গৃহে
আগমন করেছেন। আসুন দয়াল! কুটীরের মধ্যে আসুন

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—হীরা ও সঞ্জয়কেতু

কন্যাকে কোলে লইয়া সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইল।

সন্ন্যাসী। শিবমস্তু। শিবমস্তু। সঞ্জয়! ধন্য তুমি যে এমন কন্যার
জনক, হীরাবতী! ধন্যা তুমি যে এমন সর্ব্ব সুলক্ষণা
দেববালার প্রসূতি হয়েছ। এই কন্যা জগতে "ফুল্লরা"
নামে খ্যাতি লাভ কর্‌বে। ফুল্ল শতদল তুল্য মায়ের
বদনমণ্ডল, তাই এর নাম রাখ্‌লেম আমি 'ফুল্লরা'।
যথাযোগ্য সময়ে এর ইন্দ্রতুল্য বরে বিবাহ হবে। মা
আমার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জগতে
অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন কর্‌বেন। (অন্তর্ধান)

হীরা। (সবিস্ময়) একি হল? একি হল? অকস্মাৎ তিনি
কোথায় গেলেন?

সঞ্জয়। তাইতো! তাইতো! এর মধ্যেই তিনি কোথায়
অন্তর্ধান হয়ে গেলেন? দেবমায়া হীরা দেবমায়া!
মেয়েটি যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তুমি অচৈতন্য ছিলে,
আমি আঁতুর ঘরে যেন শঙ্খধ্বনি শুন্‌তে পেলুম।
এ মেয়ে সামান্য নয় হীরা! এর লক্ষণসমূহ দেখে
মনে হয় কোন দেব কন্যা ছলনা কর্ত্তে মর্ত্ত্যধামে
এই হীন জাতি ব্যাধ গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই
সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ শঙ্কর! ছলনা কর্ত্তে ব্যাধের
ঘরে এসেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

পারিজাতের প্রতি।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

দেবসভা মাঝে প্রেম নৃত্যরস-ভরা
অপ্সরার কম্বু কণ্ঠমালা হ'তে হারা
নন্দনের পারিজাত! পড়েছ কি খসি
নীরব নিশীথে?—যবে নিদ্রাহারা শশী
দেয় ধীরে অবনীর সুপ্ত অঙ্গ পরে
জড়াইয়া জোছনা বসন; বিরহীরে
জ্বালাইতে গায় যবে দূর শাখে বসি
জাগ্রতা কোকিল-বধূ; বায়ু যায় মিশি
জাগাইয়া বনমাঝে পত্রের মর্ম্মর—
তুমি বুঝি এসেছিলে ধরণীর পর,
বাজাতে বিরহী প্রাণে মিলনের স্বর
মোহন বাঁশীতে তব! বলিতে পারি না,
ছিন্নমালা উর্ব্বশীর নৃত্যের ভঙ্গিমা
ছিল অবিকৃত কি না! হয়ত না জানি,
মালা ছিন্ন হেরি, মনে অমঙ্গল মানি
সুখ মাঝে দেবরাজ সহসা চকিতে,
হেরে ছিল শচী-মুখ ম্লান নেত্রপাতে।
মূর্ত্তিমতী প্রেমসম যবে এ ধরায়
এলে তুমি, মনে হয় সহস্র ধারায়
প্রেমের প্রবল বন্যা ছুটেছিল দিকে
দিগন্তরে; মুকুলিত সহকার-শাখে
কুজন-বিরত দুই কপোত কপোতী
সহসা আবেগ ভরে উঠেছিল মাতি;
সে দিন জোছনা রাতে কাতরা চকোরী

ক্ষীণ-কলা-চন্দ্রে হেরি অশ্রান্ত কুকারি,
জাগায়ে তুলিয়াছিল বিরহীর প্রাণে
মিলনের আশা-বাণী অপরূপ গানে।
ম্লান জ্যোৎস্নালোক-মুগ্ধ স্বপন-বিহ্বল
রজনীর কাণে কাণে খুলি হৃদি তল,
লজ্জারাগ-রক্ত মৌনী বিরহী গোলাপ,
সোহাগ-আকুল স্বরে প্রেমের প্রলাপ
কতই কহিয়াছিলে!—
প্রত্যহ উষায়
হের নাকি সখি! পূর্ব্ব আকাশের গায়ে
উষার মিলন আশে রবি আসে ছুটি?
আশাহত হয়ে ফেরে আকাশেতে লুটি,—
বিরহীর হয় না মিলন; তবু চায় মিলনের পানে,
ফলে শুধু জলে মরে বিরহ আগুনে।
অন্তহীন হত যদি মানব জীবন
ভাল কি লাগিত সখি! এখন যেমন?
যদি এই মরণ-সাগর-নীর-মাঝে
ডুব নাহি দেয় জীব, এ বিশ্বে বিরাজে
যাহা কিছু আনন্দ-স্বরূপ, তার কোনো কণা,
তিক্তাস্বাদ প্রাণ লয়ে পেত কোন জনা?
দিন যদি সন্ধ্যাকালে রজনীর কোলে
আপনার শ্রান্ত দেহ নাহি দিত ঢেলে,
পারিত কি পর দিন রবিকর সাথে
হাসিতে পুষ্পের হাসি বিমল প্রভাতে?
তাই গাঢ়তর মিলনের মধু আশা বহি,
আমি আজ বসে আছি—তোমার বিরহী।
ভাবিতেছি তাই জাগি নিদ্রাহীনা নিশি—
অতীতের ইতিহাস উঠিতেছে ভাসি,
স্মৃতির দর্পণে মম ছায়ার মতন,
দূর রজনীর সুখ-স্বপন যেমন।

না জানি সে কোন্ কালে কোন্ আদি প্রাতে,
চির-অন্ধকার-মাঝে আলো-রেখাপাতে,
উজলি উঠিয়াছিলে যবে দশদিশি,
বিশ্বের প্রথম নারী তুমি সাথ, হাসি,
চেয়েছিলে মোর পানে – প্রথম মানব ;—
কর্ণেতে শুনালে মোর কলকণ্ঠ রব,
উতলা করিলে প্রাণ তব আলিঙ্গনে ;
উদ্বেলিত হ'ল হিয়া অঙ্গ পরশনে ।
সেই হ'তে ভেসেছি মোরা অনন্তের স্রোতে,
নিশি দিন ধরি চলি অন্তহীন পথে ;
আলোকে আঁধারে, দুঃখ সুখ মিলন বিরহ,
খেলার সামগ্রী যেন, খেলি অহরহ ।
সাঙ্গ মিলনের খেলা, - বিরহের খেলা
আসিয়াছে ; কিন্তু তাই হয়ো না উতলা ।
কুসুম-কোরক যথা সারা নিশি জাগি;
চেয়ে থাকে আলোকের পরশন মাগি,
তৃষিত চাতক যথা প্রখর কিরণে,
শ্যামল জলদ আশে, আকুল নয়নে
চেয়ে থাকে ঐ নীলনভে, মোর মাঝে বুঝি
বিরহী তৃষিত প্রাণ বেড়াইবে খুঁজি,
ওই চাতকের মত, দুইবিন্দু জল,
হৃদয়ের জ্বালা যত করিবে শীতল ।

জীবন কথা ।

লালগোলার মহারাজ রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় সি, আই, ই, বাহাদুর ।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

যে মহানুভবের গৌরব ও যশোরাশি সমগ্র বঙ্গভূমিতে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত,

যাঁহার অলোকসামান্য বদান্যতার স্রোতে দেশ নিয়ত প্লাবিত হইতেছে, সেই মহাত্মার জীবনী কথা অবগত হইবার জন্য দেশবাসী নিশ্চয় উদ্‌গ্রীব, বঙ্গবাসীর ঔৎসুক্য কতক পরিমাণে নিবারণের উদ্দেশ্যেই বক্ষমান প্রবন্ধের অবতারণা ।

লালগোলা ও কল্‌কলির কথা ।

উত্তর মুর্শিদাবাদের মধ্যে লালগোলা একটী প্রাচীন স্থান । রসাল-পণ-সাদি সুমিষ্ট ফলের আকর । ইহার পূর্ব্বাংশেই ই, বি, রেলপথ, লালগোলা ঘাট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে । উত্তর প্রান্তে অপ্রসস্ত দীর্ঘকায় "কল্‌কলি" বর্ত্তমান থাকিয়া স্বীয় প্রাচীন জলস্রোত জীবনের পরিচয় প্রদান করিতেছে । এককালে এই কল্‌কলি লালগোলার উত্তরাঙ্গ বিধৌত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে, পদ্মার শাখার সহিত সম্মিলিত হইত । বর্ষার প্রবল প্রবাহে স্ফীতবক্ষে যখন কল্‌কলি তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত হইত, তখন ইহার সৌন্দর্য্যে দর্শক মাত্রেই মোহিত হইয়া যাইতেন । কত ধীবর ইহার মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহার সংখ্যা করা যায় না । কত তরণী বহুবিধ পণ্য বক্ষে ধারণ করিয়া ইহার অঙ্গে স্থান লাভ পূর্ব্বক আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত । বর্ষাপগমে সেই কল্‌কলির কজ্জল-কৃষ্ণ শীতল নির্ম্মল বারিরাশির মধ্যে, সমীরণ বিক্ষোভিত তরঙ্গরাজির ক্রীড়া, মনোমুগ্ধ কর অন্যতম দৃশ্য মধ্যে পরিগণিত হইত । তট-বিরাজিত তরুগণ ও বিবিধ বর্ণের মেঘমালা, সঞ্চরণশীল স্বচ্ছসলিলাভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় মধ্যে মধ্যে এক নবীন সৌন্দর্য্যে কল্‌কলিকে পরিশোভিত করিয়া রাখিত । প্রান্তর সংলগ্ন পুলিন প্রদেশে, বহুবিধ জলচর পক্ষীর শ্রুতিমধুর সঙ্গীত কল্‌কলি প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে দর্শকবৃন্দকে একটা মনোহর অভিনয় প্রদর্শন করিত । ভ্রমণশীল ব্যক্তিগণ প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কল্‌কলির বাঁধাঘাটে, বন্ধুবান্ধব সহ উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্বশিল্পীর সেই সকল অপূর্ব্ব শিল্প কৌশল নিরীক্ষণ করিতেন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হইয়া হৃদয়ের প্রফুল্লতা সম্পাদন পুরঃসর স্ব স্বাবাসে প্রত্যাগমন করিতেন ।

অধুনা সেই কল্‌কলি রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও ইহার সেই সকল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র বিলুপ্ত হয় নাই ।* প্রকৃতির কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া কল্‌কলি এখনও দর্শকবৃন্দকে প্রাচীন সকল শোভাই প্রদর্শন করিতেছে । এখনও

---

* কল্‌কলির মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, অধুনা লালগোলার মহারাজ বাহাদুর উচ্চ বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া দিয়া কল্‌কলিকে বহু সরোবরে বা দীর্ঘিকায় বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন । পূর্ব্বে কল্‌কলি একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল । তৎকালে ইহার জলরাশি

তেমনি ভাবে ইহার উপরিভাগে শীতল সমীরণ প্রবাহিত হয়, এখনও অলক্তরাগ-রঞ্জিত দিবাকর ও নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের মেঘমালা ইহার কাচ-স্বচ্ছ গভীর বারিরাশির অভ্যন্তরে নৃত্য করে। এখনও ইহার জল মধ্যে কম্পিত বৃক্ষপত্রের প্রতিবিম্ব দর্শনে দর্শকের মনোনেত্র মুগ্ধ হয়। এখনও ইহার তটদেশে উভচর পক্ষীকুল, সুমধুর কূজনালাপে তীরবিহারীগণের মন প্রাণ হরণ করিতে ত্রুটী প্রদর্শন করে না।

এই কল্‌কলির দক্ষিণাংশে লালগোলার মহারাজ-প্রাসাদ অবস্থিত। প্রহরগণ নিপুণ-দৌবারিকগণ, পরিচ্ছদ বিভূষিত, তীক্ষ্ণধার তরবারি হস্তে সর্ব্বদাই প্রাসাদ-দ্বার রক্ষা করিতেছে। নহবৎখানায়, প্রহরজ্ঞাপক-নহবৎ, সুমধুর সঙ্গীতালাপে অষ্টপ্রহর ধ্বনিত হইতেছে। সময়গণন-কুশল আচার্য্যবৃন্দ ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল ঘটীশর সাহায্যে, সুবৃহৎ ঘটীকাবাদন পূর্ব্বক, গ্রাম গ্রামান্তরবাসীদিগের নিকট দিবারাত্রি সময় ঘোষণা করিতেছে।

মহারাজার পূর্ব্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

মুর্শিদাবাদের যে সকল জমাদারবংশ প্রাচীন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, লালগোলার রাজবংশ তাহাদের অন্যতম। ইহাদের পূর্ব্বনিবাস উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গাজীপুর জেলার পালিগ্রামে। ইহাদের মধ্যে এখনও প্রাচীন আর্য্য উপনিবেশের পৈত্রশাসনপ্রথা (Patriarchal form of government) প্রচলিত আছে; প্রত্যেক গ্রামে একজন দলপতি ও দলপতির উপরে সর্ব্বমণ্ডলেশ্বর, সর্ব্বমঙ্গলেশ্বর সমাজপতি। এই সর্ব্বমণ্ডলেশ্বর বংশে লালগোলার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহিমারায়ের উৎপত্তি। মহিমারায় গাজীপুর ত্যাগ করিয়া রাজসাহী জেলার সুন্দরপুর গ্রামেবাস করিতে থাকেন। মহিমারায়ের মৃত্যুর পর, সুন্দরপুরথর স্রোতা পদ্মার বন্যায় বিধৌত হইয়া গেলে তাঁহার দুই পুত্র দুলাল রায় ও রাজনারায়ণ রায় মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। সে সময় লালগোলানিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। উভয় ভ্রাতার এই স্থানে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, তাঁহারা ইহার "শ্রীমন্তপুর" আখ্যা প্রদান করেন। (ক্রমশঃ)

পদ্মার শাখা দামসের অঙ্গে স্থান লাভ করিত।

লালগোলা রাজবংশীয় মহিমা রায়ের অধস্তণ ৪র্থ পুরুষ ও বর্ত্তমান মহারাজের পিতামহ রামশঙ্কর রায় মহাশয় এক সময় কল্‌কলির কতকাংশের পঙ্কোদ্ধার পূর্ব্বক ২টী ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫শ বর্ষ | ১৩৩৬সাল, পৌষ। | ৯মসংখ্যা।

শ্রীমন্মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী ও তাঁহার উপদেশাবলী

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তীর্থস্থান; তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য ও বৈদ্যনাথধামের প্রসিদ্ধি।

ভারতবর্ষ তীর্থময় দেশ। তীর্থস্থানসমূহের কখন উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। হিন্দুর নিকটে বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয় এবং সৃষ্টিও অনাদি বলিয়া বিবেচিত। সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রুতি শুনাইলেন—"যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" অর্থাৎ পরমেশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পানুযায়ী সৃষ্টি করিলেন। এ সৃষ্টি পরমাত্মার অতি অনায়াস-সিদ্ধ কার্য্য। কারণ শ্রুতি শুনাইলেন—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো।" অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে নিশ্বাসের ন্যায় অনায়াস-প্রসূত ঋগ্বেদ ইত্যাদি। অথবা "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে।" এস্থলে এই শ্রুতিতে দেখিতেছি—'যে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ।' (যজুর্ব্বেদ রুদ্রাধ্যায় ৫ম অধ্যায় ৬১ মন্ত্র।) অর্থাৎ সৃকাহস্তে অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা শোভিত হইয়া যিনি তীর্থস্থানে বিচরণ করেন। এজন্য তীর্থস্থান বেদনির্দ্দিষ্ট বলিয়া ইহার উৎপত্তির সময় কল্পনা করা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত।

সহজ ভাবে ইহার উৎপত্তির কল্পনা করা কিরূপ কঠিন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত

উত্থাপন করা হইতেছে। আমরা সকলেই জানি "হর শিব শঙ্কর মহেশঃ। রুদ্র পশুপতি ঈশানঃ॥" ইহা পরমাত্মার কয়েকটী অভিব্যক্ত মূর্ত্তি। পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, দক্ষপ্রজাপতির কন্যা সতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হয় ও পরে দক্ষযজ্ঞে সতী কলেবর রক্ষা করিলে বিষ্ণু কর্ত্তৃক সেই কলেবর ৫১ অংশে ছিন্ন হইয়া যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহাই ভারতের প্রসিদ্ধ ৫১ পীঠ। এক্ষণে এই মহাদেব সনাতন পুরুষ, দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার মানসজাত পুত্র। সুতরাং এই শিব-সতীর মিলন বা সতীর দেহত্যাগ, ইহা কোন্ সময়ে স্থির করা যাইবে? এ কারণে অনুরোধ হইতেছে, এই আদ্যন্তহীন সৃষ্টি রহস্যের ও তৎসহ তীর্থস্থানের উৎপত্তি রহস্যের বিচার কেহ করিতে যাইবেন না। তবে তীর্থস্থান সম্বন্ধে এতটুকু মাত্রই বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, কোন সময় বিশেষে কোন ভগবদ্ শক্তির প্রকট লীলার দ্বারা এ সমুদয় প্রকটিত হইয়াছে মাত্র।

অপরদিকে সাধু মহাত্মাগণ হইতেছেন দেবশরীরধারী মহাপুরুষ। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ সকলের মাহাত্ম্য লোক সমীপে আরও প্রকটিত করিয়া থাকেন। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

"ভগদ্বিধাভাগবতাস্তীর্থভূতা স্বয়ং বিভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেনগদাভৃতা॥" (১-১৩-১০)

অথবা—

"প্রায়েন তীর্থান্যিগমাপদেশৈঃ।
স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥" (১-২৯-৮)

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বৈদ্যনাথধামে ও তাহার উপকণ্ঠে মহাত্মা বালানন্দ স্বামী আজ ৪০ বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। এই তীর্থস্থান প্রসঙ্গে আরও একটু নিবেদন করিবার আছে। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পুরী ক্ষেত্র ও ধাম নামে আখ্যা প্রাপ্ত হয়। নানা তীর্থস্থানের মহিমা সেই সেই স্থানীয় তীর্থ-মাহাত্ম্যগ্রন্থে প্রকাশিত আছে। ইহার মধ্যে জানিয়া রাখিতে হইবে যে,—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।"

এ সকলের মধ্যে সকলগুলিই প্রসিদ্ধ সমুদ্রতীর বা নদীর উপকূলে অবস্থিত এবং যাহারা পুরী নামে খ্যাত তাহার কারণ—"নৃপাবাসাঃ পুরীপ্রোক্তা বিশাংপুরমশীষ্যতে।" পুনরায় কতকগুলি ক্ষেত্র আখ্যাও প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষেত্র শব্দ

ব্যবহার হইবার কারণ—"ক্ষতত্রানাৎ ক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রশব্দাস্মিন্ কর্ম্মফল নির্ব্বিতেঃ।" (শঙ্কর ভাষ্য—গীতা, ১৩ অঃ ১ম শ্লোক।) এরূপ ক্ষেত্র আখ্যা পাইয়া থাকে —

বারাণসী, কামরূপ, গঙ্গা, নারায়ণী, ভাস্কর (প্রয়াগ), গয়া, পুরুষোত্তম ও বিষ্ণুক্ষেত্র। এই সমুদয় ভিন্ন অন্যান্য অনেকগুলি ধাম নামে বিখ্যাত। ইহা সংস্কৃত "ধামন্" বা যেখানে পরমেশ্বরের তেজ, কিরণ বা প্রভাব সর্ব্বদাই বিরাজিত থাকে তাহারই নিদর্শন স্বরূপ। এ বৈদ্যনাথ এই ধাম পর্য্যায় ভুক্ত।

মহারাজ বালানন্দ এ তীর্থস্থানে প্রকট ভৈরব মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার জীবনী লইয়া আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই তীর্থস্থানের যিনি প্রকট ও অপ্রকট মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠাতা, সেই বাবা বৈদ্যনাথের বিষয় একবার স্মরণ না করিলে মহা অপরাধ হইবে বিবেচনা করায় এই বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য বহুলোকের নিকট বিদিত বিষয় হইলেও লেখক ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তজ্জন্য এ ত্রুটী সকলে মার্জ্জনা করিবেন।

ইহা ভিন্ন লেখক পূর্ব্বে জানাইয়াছেন যে, এখানে অবস্থান করিয়া তিনি তিনটী বিষয়ে লাভবান হইয়া বড়ই কৃতার্থ আছেন। ইহার প্রথমটী মহাপুরুষের আকর্ষণে দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি, পূর্ব্বে জানান হইয়াছে। দ্বিতীয়টী হইতেছে এই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে বাস। এ হিসাবে এই অজ্ঞানী লেখক প্রথমতঃ একবার বাবা বৈদ্যনাথের স্মরণ করিতেছেন।

বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য।

এই তীর্থস্থান সম্বন্ধে শাস্ত্রের স্থানে স্থানে এইরূপ বর্ণনা আছে—

(১) পরন্ত্যাং বৈজনাথং চ ডাকিন্যাং ভীমাঙ্করং।

(২) পূর্ব্বোত্তরে প্রজ্বলিকানিধানে।
সদা বসন্তং গিরিজা সমেতং।
সুরাসুরারাতি পাদপদ্মং।
শ্রীবৈদ্যনাথং তমহং নমামি।

(৩) ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ বক্রেশ্বর তথৈবচ বীরভূমীশঃ সিদ্ধিনাথ, রাঢ়ে চ তারকেশ্বর।

(৪) হার্দ্দপীঠং বৈদ্যনাথে, বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ
দেবতা জয় দুর্গাখ্যা নেপালে জননী মম।

শাস্ত্রে যে ৫১ শক্তিপীঠের বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে এই বৈদ্যনাথ ক্ষেত্রে,

দেবীর হৃদয় পতিত হইয়াছিল. এজন্য ইহার নাম "হার্দ্দপীঠ"। এখানে দেবী হইতেছেন জয়দুর্গা ও ভৈরব হইতেছেন শ্রীবৈদ্যনাথ।

এই বৈদ্যনাথ নামক শিবলিঙ্গকে যখন সকলে পূজা করেন ও বিল্বপত্রাদি নিবেদন করেন, তখন সকলে "রাবণেশ্বরায় বৈদ্যনাথায় নমঃ" এই বলিয়া নিবেদন করিয়া থাকেন। কিন্তু কেন ওরূপ বলা হয় এবং কিরূপেই বা এ স্থানে এই শিবলিঙ্গ প্রকট হয়. তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন ; এজন্য সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রথমে জানিয়া রাখা আবশ্যক।

বহু পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে. বৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণের পরমভক্ত দুই অনুচর ছিলেন। যাঁহাদের নাম ছিল "জয় ও পরাজয়"। ইহাঁরা বৈকুণ্ঠের প্রবেশদ্বারের দ্বার-রক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। কোন সময়ে সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ অবারিত ভাবে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিবার সময়. উপরোক্ত দুই দ্বার-রক্ষক দ্বারা নিবারিত হন। এজন্য তাঁহাদের দ্বারা এই দুইজন এরূপ অভিশপ্ত হন যে, তাঁহাদিগকে যাইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্ম লইতে হইতে হইবে। এ বিষয় অবগত হইয়া শ্রীভগবান যে কথা কয়েকটী বলেন. তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এ সময়ে তিনি বলেন —

"যৎ সেবয়া চরণপদ্ম-পবিত্র রেণুং" ইত্যাদি

শ্রীমদ্ভাগবত ৩-১৬-৭

"যে মে তনূদ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া" ইত্যাদি

ভা-৩-১৬-১০

অর্থাৎ ভুবনপূজ্য ব্রাহ্মণের প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূল আচরণ করে সে কখনও আমার অনুগ্রহ পাইতে পারে না। অপি ব্রাহ্মণ···আমার শরীর।

এইরূপে অভিশাপ প্রাপ্ত হইবার পর. যখন তাঁহারা স্বর্গচ্যুত হইতেছেন, সে সময়ে তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় শ্রীভগবান এইরূপ কৃপা করেন যে মিত্রভাবে পুনরায় বৈকুণ্ঠে আসিতে হইলে তাঁহারা সাত জন্মের পর. আর শত্রুভাবে জন্ম লইয়া, তাঁহা কর্ত্তৃক নিহত হইলে তিনজন্মের পর আসিতে পারিবেন। তিনজন্ম সময় অল্প ইহা জ্ঞান করিয়া, শত্রুভাবে আসিতেই তাঁহারা ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভগবানের এই ইচ্ছামত উক্ত জয় ও পরাজয় একজন্মে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু. দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ ও অপর জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্ম লইয়াছিলেন। এই যে রাবণরূপে জন্মগ্রহণ, ইহার সহিত এই বৈদ্যনাথের প্রাকট্যলীলার সমাবেশ আছে। এ জন্যই এই পৌরাণিক প্রসঙ্গটুকু দেওয়া হইল।

লঙ্কেশ্বর রাবণ নানারূপ উৎকট উৎকট তপস্যা করিয়া, হরপার্ব্বতীর পরমভক্ত হইয়াছিলেন। রাবণ কৃত শিবতাণ্ডবস্তোত্র অতি প্রসিদ্ধ এবং ইহা অনেকেই নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। স্মরণ করাইবার জন্য, ইহার প্রথম শ্লোকটীর অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল।

"জটাটবী-গলজ্জলপ্রবাহ-প্লাবিতস্থলে" ইত্যাদি।

মহিম্নস্তবও অনেকেই নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন ; সেখানে এই রাবণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহারও সামান্যমাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

(১) "অয়ত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈর ব্যতিকরং" ইত্যাদি।

(২) "অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবলং" ইত্যাদি।

মহাদেবের এই পরমভক্ত রাবণকে পরাজয় করিবার জন্য শ্রীভগবানকে রামচন্দ্ররূপে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহাও এ দেশের প্রায় সকলেই অবগত আছেন। এই রাবণকে বধ করিবার জন্য শ্রীভগবানকে, এই রাক্ষসের আরাধ্যদেব মহাদেবকে নানারূপে কিরূপ পরিতোষ করিতে হইয়াছিল. তাহারও উক্তি এই মহিম্নস্তবে কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে. যথা—"হরিস্তে সাহস্রং কমল-বলিমাধায় পদযো" ইত্যাদি। পুনরায় পার্ব্বতীদেবীকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য, শরৎকালে যে দেবীপূজা করা হইয়াছিল ও যাহা শারদীয়া দেবীপূজা নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধা হইয়াছেন, তাহাও অনেকেই জানেন।

এরূপ পৌরাণিক ঘটনায় লিপিবদ্ধ এই রাবণের সহিত এই বৈদ্যনাথধাম কিরূপ সংশ্লিষ্ট, এক্ষণে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে।

দক্ষযজ্ঞ নাশ হইবার পর ও দক্ষপ্রজাপতির ছাগমুণ্ড হইতে ভক্তিব্যঞ্জক শব্দ "ব্যোম" "ব্যোম" শুনিতে শুনিতে, মহাদেব সতীর দেহ স্কন্ধে লইয়া. উন্মত্ত ভৈরবরূপে বাহির হইলেন। বঙ্গদেশের কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহার দশমহাবিদ্যা গ্রন্থে ইহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

"রে সতি. রে সতি, কাঁদিল পশুপতি,
পাগল, শিব প্রমথেশ,
যোগমগন হয়ে, তাপস যতদিন,
ততদিন না ছিল ক্লেশ।

যাহা হউক মহাদেব যখন এরূপে বাহির হইলেন, তখন সৃষ্টিনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া সকল দেবতাগণ মিলিত হইয়া, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। সৃষ্টি রক্ষা মানসে শ্রীভগবান তখন সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীর শবদেহ ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড

করিয়া ছিন্ন করিলেন। উক্ত দেহ ৫১ খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া, এই ভারতবর্ষের যে ৫১ স্থানে পতিত হইয়াছিল. উহাই ৫১ সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত। হিমালয়ের দক্ষিণ প্রদেশে এই "ঝাড়খণ্ড" নামক বনখণ্ডে, উক্ত সতীদেবীর হৃদয় আসিয়া পড়িয়াছিল। এজন্যই ইহাকে "হার্দ্দপীঠ কহিয়া থাকে।

এই সমুদয় পীঠস্থান মহাদেবের অতি প্রিয়, কারণ এই সিদ্ধপীঠে তিনি ভৈরব মূর্ত্তিতে সর্ব্বদাই শক্তির সহিত নিবাস করিয়া থাকেন। সুতরাং এই 'হার্দ্দপীঠ' অতি পুরাকাল হইতেই গুপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই গুপ্তভাব ব্যক্ত করিয়া, ইহা লোকচক্ষুর নিকট প্রকট করিবার ইচ্ছা মহাদেবের হইয়াছিল। এজন্য পরমভক্ত রাবণ দ্বারাই তাঁহার এ প্রকট-লীলা সম্পন্ন করিলেন।

রাবণ দৈববলে বলী হইবার ইচ্ছা করিয়া, করুণাময় আশুতোষ গিরিজাপতির উদ্দেশে নানারূপ উৎকট উৎকট তপস্যা করেন। মহাদেব ইহাতে পরম পরিতুষ্টি লাভ করেন ও তাঁহাকে নানাবিধ বর প্রদান করেন। এই সমুদয় বর পাইয়া, এই পরম ভক্ত দশানন, প্রতিদিন কৈলাশে যাইয়া, উমাশঙ্করের পূজা করিতেন ও পূজান্তে লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। একদিন এরূপ পূজা করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, ইতিমধ্যে পথিমধ্যে তাঁহার ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাবণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ও পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর লঙ্কাধিপতি নিবেদন করিলেন যে, আশুতোষ শঙ্করের বরলাভ করিয়া, তিনি এক্ষণে পরম কুশলেই আছেন। আরও প্রকাশ করিলেন যে, ধরাধামে তাঁহার সমান যোদ্ধা বা বলশালী পুরুষ আর কাহাকেও তিনি এক্ষণে দেখিতে পাইতেছেন না। ইহা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং বলিলেন যে, তাঁহার এ বীরদর্প চূর্ণ করিবার জন্য, অযোধ্যায় মহারাজ দশরথের ঔরসে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। রাবণ ইহা শুনিয়াও যেন তত গ্রাহ্য করিলেন না। নারদ তখন পরামর্শ দিলেন যে, যখন তিনি অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়াই নিজেকে মনে করিতেছেন, তখন তাঁহার দশভুজের বলের পরীক্ষা হইবে, যদি তিনি কৈলাশ গিরি নিজহস্তে উঠাইতে পারেন। ইহা করিতে পারিলে, আশুতোষ নিজেই তাঁহার ভুজবলের পরীক্ষা করিলেন। রাবণ এই কথা শুনিয়া পুনরায় কৈলাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নন্দীকে অবজ্ঞা করতঃ তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নন্দন বনে নিক্ষেপ করিলেন। ইহার পর, বাহুবলে সমস্ত কৈলাশ গিরিকে উঠাইয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন। এ সময়ে ভগবতী ভবানী, কিঞ্চিৎ অভিমানিনী হইয়া, শঙ্করের নিকট হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন ভাবে

অবস্থান করিতেছিলেন। আকস্মিক, রাবণ কর্ত্তৃক উত্তোলিত গিরিকম্পনে, তিনি ভীতা হইলেন ও সহসা তাঁহার মানভঙ্গ করিয়া, মহাদেবের গলদেশ ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। মহাদেব ইহাতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন ও ধ্যানযোগে বুঝিলেন যাহা হইয়াছে ও হইবে। এজন্য, প্রথমতঃ রাবণের বীরাভিমান ত্যাগ করাইবার সংকল্প করিয়া, উক্ত কৈলাশগিরিকে নিজের পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কিঞ্চিৎ চাপিয়া ধরিলেন। এই পাদভরে ভারাক্রান্ত হইয়া, রাবণ পর্ব্বত সহ যেন পাতালে প্রবেশ করিবার মত হইয়াছেন ইহা বুঝিলেন। তখন নিজের বীরাভিমান দূরে রাখিয়া, কৈলাশ পর্ব্বতকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন ও কাতরতা সহকারে শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান মহাদেব আমাদের আশুতোষ। রাবণকৃত স্তব শুনিয়া তিনি বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন ও তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। এই আদেশ পাইয়া রাবণ তখন জানাইলেন যে, "প্রভু! এইবার তিনি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রতিদিন কৈলাশে আসিয়া, তাঁহার শ্রীচরণে পূজা অর্চ্চনাদি না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করেন না। তাঁহার ভৌতিক দেহে, হয়ত এমন আধি-ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, তজ্জন্য কৈলাশে আসিতে অক্ষম হইবেন। এরূপ হইলে, তাঁহার পক্ষে জীবনধারণ করা নিরর্থক হইবে। এজন্য শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার এই মিনতি যে, দয়া করিয়া তাঁহার সহিত লঙ্কায় গিয়া যেন তিনি অবস্থান করেন।"

পরমভক্ত রাবণের এই কাতর বর প্রার্থনা শুনিবার পর, তৎক্ষণাৎ সেখানে সদ্যোত্তপ্ত কাঞ্চনস্তম্ভস্বরূপ এক মহোজ্জ্বল জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভূত হইল। রাবণ ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তখন মহাদেব কহিলেন, "দেখ, তোমার পুরোদেশে এই যে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে, এই লিঙ্গতে ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান করিবে না। কারণ,—

"লিঙ্গম্ শিব শিবঃ লিঙ্গম্ ন ভেদঃ শিবলিঙ্গয়োঃ।
ভেদজ্ঞ ইহ দুঃখানি তত্রান্তে নারকী ভবেৎ॥"

ইহার অর্থ এই "শিব" শব্দ কল্যাণ বাচক, আর "লিঙ্গ" শব্দের অর্থ চিহ্ন। এই যে জ্যোতির্ম্ময় চিহ্ন দেখিতেছ, ইহাই শিবস্বরূপ আমি ইহাদের অভেদ নাই। যদি কেহ ভেদজ্ঞান করে, সে নানারূপ দুঃখ পায় ও দেহান্তে নরকগামী হয়।

ইহা আরও পরিস্ফুট করিয়া বুঝিতে হইলে, ইহা ধারণা করিয়া রাখিবে যে,—

"নামরূপ বিবর্দ্ধিতম্ অস্তি ভাতি প্রিয়াত্মকং, সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম।
অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।

আত্মত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ং ।”

অর্থাৎ অস্তি ভাতি ও প্রীতি বলিয়া যাহা ব্রহ্ম-স্বরূপ বুঝান হয়, তাহা যথার্থ নিরাকার স্বরূপে কেবলমাত্র উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। ইহা হইল তাঁহার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ; ইহা বুঝাইবার ভাষা নাই। তবে ইহাই নাম, রূপ ও ক্রিয়ায় ব্যক্ত করিতে হইলেই উহাই হয় তাঁহার সগুণ সাকার প্রপঞ্চ। যাহা নিরাকার বলিয়া বর্ণিত হইল, তাহা কেবল জ্ঞানগম্য ও অনুভবগম্য। উহা প্রকাশ করিতে হইলেই উহা হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে আসিয়া নাম, রূপ ও ক্রিয়ার দ্বারা বুঝাইতে হইবে। আর তখনই উহা “সাকারত্ব” প্রাপ্ত হইবে। এই ‘সাকারত্ব’ হইতেছে উপাসনা বা ধ্যানগম্য। এরূপ উপাসনা করিতে হইলেই উক্ত নিরাকারত্বকে “চিহ্নিত” করিতে হয় ও ইহা করিয়া কোন আধারবিশেষে বা প্রতিমাতে সময়োপযোগী করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এরূপ না করিলে ধ্যান করা যাইতে পারে না। যেমন সুখ বা দুঃখ, ইহা বুঝাইতে হইলেই, কোন সুখী বা দুঃখী ব্যক্তির নাম বা রূপ সম্মুখে স্থাপন করিয়া, পরে উক্ত “সুখাত্ব” বা “দুঃখাত্ব” রূপ ক্রিয়ার প্রকাশ দেখাইলে তবে উহার ধারণা হয়, ইহাও সেই প্রকার। যে সেজন্য এই জ্যোতীরূপ তেজঃপুঞ্জ তুমি উপলব্ধি করিলে, ইহাই এক্ষণে পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত করিয়া, এই প্রস্তরোপরি রক্ষিত হইল। তুমি ইহাকে আমার স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পার।” এরূপ বুঝাইবার পর মহাদেব রাবণকে বলিলেন যে, “তুমি এই লিঙ্গকে মস্তকে উঠাইয়া ও পাদচারী ব্রহ্মচারী বেশে যত্নপূর্ব্বক লঙ্কায় লইয়া যাইয়া সেখানে ইহাকে সংস্থাপিত কর। এই লিঙ্গই শ্রীমতী ভবানীদেবীর অতিশয় প্রিয়তম “কামনালিঙ্গ”। এই লিঙ্গের যথাযথভাবে যদি কেহ উপাসনা ও পূজাদি করে, তবে তাহার সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়।”

রাবণ ইহা শুনিয়া মাতা পার্ব্বতীর অনুমতি লইলেন। পরে তাঁহারই প্রদত্ত জলে আচমনাদি করিবেন, এই স্থির করিয়া ঐ লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিলেন ও পরে মস্তকে উঠাইয়া কৈলাশ হইতে যাত্রা করিবেন; এরূপ স্থির করিলেন। রাবণ যখন এই লিঙ্গ মস্তকে উঠাইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন হরপার্ব্বতী উভয়েই তাঁহাকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে পথিমধ্যে এই লিঙ্গ কদাচ যেন ভূমিতে রাখা না হয়। এরূপ করিলে এই লিঙ্গকে আর কেহ ভূমি হইতে উঠাইতে পারিবে না। রাবণ ইহা শুনিয়া যখন যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন, অমনি সকল দেবতাদিগের এক বিষম ত্রাস উপস্থিত হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে মহাদেবের বর পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়া, রাবণ একেই অতিশয়

পরাক্রমী ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে, ইহার পর এই “কামনালিঙ্গ” লঙ্কায় স্থাপিত করিয়া ইহার যদি পূজা সে করে, তবে তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইবে ও সে একান্ত অজেয় হইয়া উঠিবে। দেবতাগণ এজন্য সকলে যাইয়া শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবতাগণের ত্রাসের বিষয় অবগত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন ও এই পরামর্শ দিলেন যে, পার্ব্বতী যখন আচমন করিবার জন্য জল দিবেন, সে সময় বরুণদেব যাইয়া যেন সে জলে প্রবেশ করেন। বরুণদেব তাহাই করিলেন। দশানন ইহার কিছুই না জানিয়া, আচমনের সহিত বরুণদেবকে উদরে লইয়া ও জ্যোতির্লিঙ্গ মস্তকে উত্তোলন করিয়া বাহির হইলেন। তিনি কৈলাশ হইতে পাদচারী হইয়া ও নানাদেশ ও পর্ব্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে ঝাড়খণ্ড প্রদেশস্থ সেই পূর্ব্বোক্ত “হার্দ্দপীঠে”র সমীপস্থ হইলেন। এ সময়ে বরুণদেবের আবেশ তাঁহার উপর হইল ও তাঁহার অতিশয় প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হইল। তিনি বিষম চিন্তায় পড়িলেন। সেই মহারণ্য প্রদেশে, তিনি একাকী। প্রস্রাব পীড়ায় অতিশয় কাতর, অথচ মস্তকের লিঙ্গ ভূমিতে রাখিলে আর উঠাইতে পারিবেন না। এদিকে ব্রহ্মচারীস্বরূপে অর্থাৎ অতি শুদ্ধাচারে তাঁহাকে পথিমধ্যে যাইবার আদেশ আছে। সুতরাং লিঙ্গকে মস্তকে রক্ষা করিয়া মূত্রত্যাগ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যখন তিনি এরূপ বিপদগ্রস্থ ও চিন্তিত, তখন সামান্য বেশধারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া রাবণ বড়ই প্রফুল্লিত হইলেন ও তাঁহাকে সমুদয় নিবেদন করিলেন। মূত্রত্যাগ ও সৌচনিষ্ঠ হইয়া আসা পর্য্যন্ত, কিছু সময়ের জন্য ঐ বৃদ্ধটীকে তিনি এই লিঙ্গকে মস্তকে ধারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া বলিলেন যে, তিনি অতিশয় বৃদ্ধ, এজন্য বলহীন। ভিক্ষোপজীবিকা তাঁহার বৃত্তি। এজন্য অধিকক্ষণ লিঙ্গকে মস্তকে ধারণ করা তাঁহার অসম্ভব ; তবে মূত্রত্যাগ করিতে যে সামান্য সময় লাগিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া থাকিবেন। এই কথায় রাবণ অতিশয় প্রীত হইলেন ও লিঙ্গকে ব্রাহ্মণের মস্তকোপরি রক্ষা করিলেন ও মূত্রত্যাগ ও শৌচশুদ্ধির জন্য একটু দূরে যাইলেন। রাবণ যাইয়া প্রস্রাবে বসিলেন, কিন্তু তাঁহার এ প্রস্রাব আর শেষ হয় না, কারণ বরুণদেব তাঁহার শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দুই দণ্ড পর্য্যন্ত শিরে লিঙ্গ ধারণ করিতে পারেন, ইহা পূর্ব্বে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন এই দুই দণ্ড যাইয়া চারিদণ্ড হইল, তথাপি রাবণের মূত্রবেগ প্রশান্ত হয় না। বহুক্ষণ পরে যদিচ মূত্রবেগ শেষ হইল, কিন্তু হস্ত-পদ-মুখ প্রক্ষালনের জন্য জল আর

দেখিতে পান না। পরিশেষে অতিশয় বিরক্ত হইয়া ভূমিতে পদাঘাত করিলেন ও এক প্রকাণ্ড গর্ত্ত হইতে জল উঠাইয়া শৌচাদি শেষ করিলেন। যাহা হউক ইহা করিতে তাঁহার বহু সময় চলিয়া গেল। ওদিকে দুইদণ্ড সময় অতিবাহিত হইলেই, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার মস্তক হইতে শিবলিঙ্গ উঠাইয়া, সেই পূর্ব্বোক্ত "হার্দ্দপীঠে" ভক্তিভাবে স্থাপন করিলেন এবং মানসোপচারে উহার পূজা করিয়া সে স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাবণ সে স্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে ব্রাহ্মণ তথায় নাই ও শিবলিঙ্গ ভূতলে রক্ষিত রহিয়াছে। তিনি ঐ শিবলিঙ্গকে পুনরায় মস্তকে লইবেন, এই ইচ্ছা করিয়া বহুপ্রকারে টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তি ও বলপ্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই উহাকে একটুও নড়াইতে সক্ষম হইলেন না। যখন রাবণের এইরূপ অবস্থা, তখন আকাশবাণী হইল যে, "সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। এ লিঙ্গ যখন ভূমিতে রক্ষা করা হইয়াছে, তখন ইহা সপ্ত-পাতাল ভেদ করিয়া অচল হইয়াছে, ইহা অন্যত্র লইয়া যাওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ, কেন না ইহা অন্যকর্ত্তৃক স্থাপিত এবং "শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ", ইহা শাস্ত্রের আদেশ।"

এজন্য এই শিবলিঙ্গ এ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত রহিল। তবে ইহা যখন তাঁহারই কীর্ত্তিস্তম্ভ, তখন এ লিঙ্গ "রাবণেশ্বর" নামে খ্যাত হইবেন। আর এ লিঙ্গ যে ভক্তিভাবে পূজা করিবে, তাহার সর্ব্বকামনা-সিদ্ধি হইবে, কারণ ইহা পার্ব্বতীর অতি প্রিয় "কামনা-লিঙ্গ"।

ইহা শুনিয়া রাবণ হতভম্ব হইলেন ও পরে যথোচিত ভাবে ইহার পূজা অর্চ্চনাদি করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, "শিবলিঙ্গে"র মধ্যে যে একটী কূপ আছে, তাহা রাবণের পদাঘাতে যে গর্ত্ত হইয়াছিল তাহাই। এ স্থানে বাবা বৈদ্যনাথের সহিত হার্দ্দকুণ্ড, হরলাজ্জরী, নন্দীপাহাড় (নন্দন পাহাড়) ও কোল পাহাড় এই ৪টী স্থানকে অনেকেই প্রসিদ্ধি দিয়া থাকেন। পরে তপোবনের তপোনাথ ও ত্রিকুটের ত্রিকূটীনাথকেও সংযুক্ত করা হয়।

প্রবাদ আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কেশ্বরকে বধ করিয়া পুষ্পকরথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন সময়ে এই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

পাট্‌নী-ক্ষ্যাপার দূতী।

লেখক—শ্রীযুক্ত ভবানী চৌধুরী।

আঁধার ঘরের দীপটী সে মোর
ধাতার গড়া সুখ,
শূন্য প্রাণের পূর্ব্ব-সুহাস
কুমুদ-কুসুম-মুখ।—
পদ্ম-পাতার জলের মত
যোক্ষি তাহার গড়ায় কত;
ভাবি যত মাতায় তত,—
কোথায় আমার দুখ
স্বর্গ-সুধার খনি সে মোর
ধাতার গড়া সুখ!

শিশুকালের চঞ্চলতা,
দুষ্টামী আর হাসি,
দৌড়ে যেতে হোঁচট-খাওয়া
কান্না—দুখের রাশি।—
সবাই সে মোর, আকুল-করা
কান্না-হাসির মিঠে-কড়া,
সাঁঝ লাগিতে ঘুমিয়ে পড়া,
'সাস্ত্র'—সাঁজো-বাসি;
শিশুকালের সে যে আমার
দুষ্টামী আর হাসি!

বছর-ষোলর বড়ই ভালো,
সে যে আমার রাণী,
হৃদয়-বীণার স্পর্শে তাহার
ওঠে মধুর বাণী।—

রক্ত-গোলাপ-গণ্ড তাহার
সরস-নবীন-নারী-বাহার,
অধর তাহার কোমল-সুধার,
স্পর্শে পবন-ছানি,
বাহুলতার মিষ্টি-ঘেরা—
সে যে আমার রাণী !

বয়স-ভাটীর চাট্‌নী মধুর
পাট্‌নী-ক্ষ্যাপার দূতী,
বজ্র-কঠোর ভাবনা হ'তে
ফিরায় আমার মতি।
মাথার ওপর তাঁহার প্রতি
ব্যস্ত আমার সকল স্তুতি—
নাড়ীর আমার গতি-স্থিতি
তাহার নিদেশ-ভাতি,
সতী-সাধ্বী সে যে আমার
পাট্‌নী-ক্ষ্যাপার দূতী।

শ্রীশ্রীচণ্ডী-মঙ্গল বা কালকেতু।

(নাটক।)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর।

চতুর্থ দৃশ্য—বনপথ।

(সন্ন্যাসীর পশ্চাতে ব্যাধবালক বেশে শ্রীকৃষ্ণ)

ব্যাধবালক। ওহে দাঁড়াও না, দাঁড়াও না, খুব জোরেই চলেছ যে।

সন্ন্যাসী। আরে শুভকর্ম্মে পিছু ডাক কেন? ভারি ফাজিল ছেলে ত! কোথায় যাবে তুমি? আমার সঙ্গে যাবে?

ব্যাধবালক। কোথাও নিমন্ত্রণ আছে নাকি? আমি নিমন্ত্রণটা বেশ ভালবাসি। তোমার ঝোলাঝুলিত বেশ মোটাই দেখ্‌ছি। আটা বি ডাল পেয়েছ বুঝি?

সন্ন্যাসী। নিমন্ত্রণ নয়। আমি ইষ্ট পূজার জন্য শ্মশান মধ্যে প্রবেশ কর্‌বো। তুমি কি যমালয় যেতে চাও?

ব্যাধবালক। বাপ্‌রে! যমালয়? অতদূর যেতে পার্‌বো না। আর আমার ত তোমার মত যমালয় যাবার বয়স হয়নি! তুমি যাচ্ছ যাও।

সন্ন্যাসী। বালক! তোমার কথাগুলি বড়ই মিষ্টি। তোমার নাম কি ভাই?

ব্যাধবালক। আমার নাম "মুরলীবদন" কিন্তু পোড়া লোকে "বদন" বলেই ডাকে। আচ্ছা সাধু! তোমার নাম কি?

সন্ন্যাসী। (স্বগত) এই বালকের সঙ্গে কথায় কথায় ক্রমেই মুগ্ধ হ'য়ে পড়্‌ছি। না জানি এর কি মোহিনী শক্তি। (প্রকাশ্যে) বদন! তোমার বদনমণ্ডল দর্শন করে আমার এক চির আকাঙ্খিত বদন মনে পড়েছে। সেই মুরলীবদন আমাকে নিয়ে এম্নি রহস্যই করে। বদন! তোমার বাড়ী কোথায় ভাই?

ব্যাধবালক। আমার বাড়ী যে অনেক দূর। তাই তোমার সঙ্গে যেতে চাইছিলুম। তা তুমিত আমাকে সঙ্গে নেবে না। তাই ভাব্‌ছি, কি করে অতদূর পথ একাকী যাব। হয়তো বনের মাঝে বাঘ ভালুকে খেয়েই ফেল্‌বে।

সন্ন্যাসী। অনেক দূর? কৈলাশ পর্ব্বতের নিকটে কি? আমি ত কৈলাশ পর্য্যন্ত যাব। যদি যেতে চাও তো আমার সঙ্গে দ্রুত এসো। আমার সঙ্গে যেতে না পার্‌লে আমার কোলে এসো।

ব্যাধবালক। (হাসিয়া) আমায় কি কোলে নিতে পার্‌বে দাদা! এই এক কোঁটা ছেলে দেখ্‌তে, কিন্তু দমে ভারী। কোন্ কালে একটা মাটির ঢিবি ভেঙ্গে ফেলেছিনু, তাই এখনো লোকে তামাসা করে বলে "গিরিধর"!

সন্ন্যাসী। গিরিধর ? অাঁ গিরিধর ? আচ্ছা তুমি কত ভারি দেখি
(কোলে তুলিবার চেষ্টায় অসমর্থ হইয়া)
না আর সন্দেহ নাই। গিরিধর ! গিরিধর ! তুমি যে এই পাগল হরের প্রাণধন। নারায়ণ ! যে মায়ায় সমুদ্র মন্থন কালে মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে মহেশের মন মুগ্ধ করেছিলে, যে মায়ায় মহীমণ্ডল বিমুগ্ধ হয়ে রয়েছে, সেই দেবী মায়ার সংবরণ কর। আমি তোমার ব্যাধ-মূর্ত্তি দর্শন করে মোহিত হয়েছি। এসো এসো হরি ! চিরবাঞ্ছিত অমৃতবিন্দু পানে পরিতৃপ্ত হই। এসো আমার বুকে এসো হরি !

(শ্রীকৃষ্ণের স্বমূর্ত্তিতে হরের কোলে আরোহণ)

দেবর্ষি নারদের আগমন।

নারদ। চমৎকার ! চমৎকার !! দুই ঠাকুরে বনের মাঝে বেশ আমোদ কচ্ছেন। হর আর হরি দুইই এক। আবার একই দুই। প্রাণীগণের পাপভার হরণের জন্য যুগে যুগে তোমরা অবতার গ্রহণ কর। আবার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হ'লে, সাধুদের অভ্যুদয় দর্শন করে তোমরা স্ব স্ব লীলার সংবরণ কর। হরিহে ! আজ ব্যাধ বেশে পাগল হরের সঙ্গে যে রহস্য করছিলে, নারদ সে রহস্য উপভোগ করছিল। আর থাক্‌তে পারলুম না। আনন্দের সিন্ধু উথুলে উঠেছে। দুকুল পরিপ্লাবিত করে আনন্দের বন্যা ছুটেছে। হরহরির মধুর মহামিলন দর্শন করে জগৎবাসী একবার উচ্চৈস্বরে বল হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

পঞ্চম দৃশ্য—ধর্ম্মকেতু ও নিদয়া।

ধর্ম্মকেতুর কুটীর।

ধর্ম্ম। নিদয়া ! কালকেতু এখন বড় হয়েছে। ধনুর্ব্বিদ্যায় তার সমকক্ষ বালক ব্যাধপল্লীতে নাই। আমাদের উপযুক্ত বংশধর কালকেতু। তার উপরে সংসারের ভার দিয়ে এখন আমি নিশ্চিন্ত হব। কি বল ?

নিদয়া। আমারও তাই ইচ্ছা ! সে দিন গোলাহাটে গিয়ে

দেখ্‌লাম সইএর মেয়েটী ! অমন সুন্দরী কন্যা কিরাত নগরে আর দেখতে পাই না। নাম ফুল্লরা। সইমা ব'লে কাছে এলো, বড়ই আনন্দ হ'লো। সইকে বল্‌লাম "বলি সই, মেয়েটি আমায় দাও।"

ধর্ম্ম। সই কি বল্‌লে ?

নিদয়া। সই বল্‌লে, "মেয়েত তোমারি সই। আশীর্ব্বাদ কর যেন ভাল বরে বিয়ে হয়।" সইএর ইচ্ছা আমার কালু তার জামাই হয়। এখন তোমার কথায় মনে পড়লো, পুরুৎ ডেকে দুজনের জন্ম-নক্ষত্র দেখদেখি।

(সোমাই ওঝার প্রবেশ)

ধর্ম্ম। আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক্।

(উভয়ে পুরোহিত সোমাই ওঝাকে প্রণাম করিলেন)

এখনি আপনার নাম কচ্ছিলাম।

সোমাই। কেন আমায় স্মরণ করছিলে ?

ধর্ম্ম। কালুর বিবাহের নিমিত্ত আপনি এই কিরাত পল্লীতে সুন্দরী কন্যার তল্লাস করুন।

সোমাই। ওহে এ যে অপ্রত্যাশিত। নিতান্তই আকাঙ্খিত। এ দিকে তুমি ব্যস্ত। ওদিকে সঞ্জয়কেতু ব্যস্ত। বরে ফুল্লরার যোগ্য বর অন্বেষণ করুন। আমি বলি এ নিতান্তই আকাঙ্খিত, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। মৈলে দুজনের মনে একসঙ্গে— আশ্চর্য্য !

নিদয়া। দুজনের নয় ঠাকুর, চারজনের !

সোমাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বটে, তা বটে ! এদিকে এক জোড়া ওদিকে এক জোড়া। তা বেশ মিলন হবে। যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা। ধর্ম্মকেতু ! কালুর জন্ম টিপনিটা দেখাও দেখি।

ধর্ম্ম। (আনিয়া দেখাইলেন) এই দেখুন।

সোমাই। (কিছুক্ষণ কাগজ পত্র দেখিয়া, অন্য হস্তে ফুল্লরার কোষ্ঠি মেলাইলেন, পরে সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন) আহাহা ! চমৎকার ! চমৎকার !! এমন মিল আর হয় না। একেবারে মহারাজাধিরাজ মহারাজ যোটক ! দেবগণ,

ক্ষত্রিয় বর্ণ, ধনুরাশি, বৃহস্পতির দশা, খাসা মিলন হয়েছে কিন্তু।

ধর্ম্ম। তবে আর বিলম্ব নাই। শুভকার্য্য শীঘ্র করাই ভাল। আপনি সঞ্জয়কেতুকে সংবাদ দিয়ে আমার সঙ্গে কন্যা চাক্ষুষ কর্ত্তে চলুন।

সোমাই। তাই হোক্। তুমি শ্রীমান্ কালু বাবাজীকে একবার আনিয়ন কর দেখি! তার করকোষ্ঠি দেখে গিয়ে সঞ্জয় ভায়াকে সব খবর বল্‌তে হবেত?

ধর্ম্মকেতু "যে আজ্ঞা" বলিয়া কালকেতুর সন্ধানে গেলেন।

নিদয়া। ঠাকুর মশায়, কালুর কোষ্ঠিখানি কেমন দেখলেন, বাছার প্রমাই কত?

সোমাই। পরমায়ুর বার্ত্তা এক পরমেশ্বর ব্যতীত কেউ বল্‌তে পারেন না মা, আমিত পরমেশ্বর নই, তবে সামুদ্রিক বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ যা শিক্ষালাভ করেছি তাতে মনে হয় তার পরমায়ু যথেষ্টই আছে। কোন চিন্তা নাই।

নিদয়া। হাঁ বাবাঠাকুর! প্রমাই কি কেউ বাড়াতে পারে না?

সোমাই। সৎকর্ম্মদ্বারা পুণ্যাত্মাগণ দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। তপস্যা সদাচার, সৎসঙ্গ এই সকল দীর্ঘজীবনের অনুকূল।

(ধর্ম্মকেতু সহ কালকেতুর প্রবেশ এবং কালকেতু পুরোহিত সোমাই ওঝাকে প্রথমে প্রণাম করিয়া স্বীয় জননীকে প্রণাম করিলেন।)

সোমাই। দীর্ঘায়ুরস্তু। বৎস! কালকেতু! তোমার অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা কতদূর হ'ল? লক্ষ্যভেদ, শব্দভেদ ইত্যাদি ধনুর্ব্বিদ্যায় বেশ কৃতকর্ম্মা হয়েছ ত?

(বিনয়ের সহিত কালকেতু স্বীকার করিলেন)

ধর্ম্ম। ঠাকুর মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন যেন কালু আমার অস্ত্রশস্ত্রাদি শিক্ষা করে কিরাত জাতির মুখ উজ্জ্বল করে।

সোমাই। তা কর্‌বে। দেখি বৎস! তোমার হাতখানি?

(হস্তরেখা দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া)

ধর্ম্মকেতু! তোমার পুণ্যসেতু স্বরূপ এই কুলপাবন পুত্র কালকেতু জগতে কোনও মহৎকর্ম্ম সম্পন্ন কর্‌বে। এর

সর্ব্ব সুলক্ষণ বিদ্যমান। এই বীরপুঙ্গব পুত্ররত্নের প্রশংসার কথায় পুরী পল্লী মুখরিত হয়েছে। চল চল শীঘ্র সঞ্জয়কেতুর গৃহে গমন করি। (সকলে নিক্রান্ত)

ষষ্ঠ দৃশ্য — সঞ্জয় কেতুর গৃহ।

ফুল্লরা সখী সঙ্গে ফুল তুলিতেছিলেন, সখীগণ মৃদুস্বরে গান করিতেছিল।

গান।

সখীগণ। গোলাপের রাঙা আভায় ঠোঁটখানি তোর লাল!
দেখিস্ দেখিস্ সাম্‌লে থাকিস্ ভোমরা বড়ই কাল্।
চাঁপা কলির আঙ্গুলে তোর চাঁপা ফুল তোলা,
দেখবে যে জন মনের মানুষ তোর্ প্রেমে ভোলা,
রাগিস্‌নি ভাই ভাগ নেবো না
থাক্‌বে তোরই খাসা মাল্।

১মা। সই লো সই মনের মানুষ আসবে কখন তোর?

২য়া। কি জানি ভাই সইএর আমার কাটেনিকো ভোর।

ফুল্লরা। না ভাই হাসিস্ নাকো এই ফুলে শিবের পূজা হবে।
আবার যদি এ সব কথা বলিস্ তবে পালিয়ে যাব!

১মা। পালিয়ে যাবি? থাক্‌বি কোথায়? আন্‌বো জোর করে।
মিনি সুতায় মালা গেঁথে পরাব বরে।

২য়া। তখন ভুলে যাবি আমাদের সই! সয়াকে পেয়ে। দিবা নিশি নেশায় মজে থাকবিলো শুয়ে।

ফুল্লরা লজ্জাবনত মুখী হইল এবং সখীদের প্রতি কোপ কটাক্ষপাত করিতে লাগিল)

১মা। (সস্নেহে গলায় হাত দিয়া) না ভাই, সইকে আর রাগাব না, নৈলে বাসর ঘরে যেতে দেবে না। আচ্ছা সই! বরকে দেখেছিস্?

(ফুল্লরা নিরুত্তরে মাথা হেলাইল)

২য়া। হ্যাঁ দেখিস্‌নি! সে দিন যে কালকেতু সিংহী মেরে বাঘা মেরে লোকের কাছে মালা আর বীরবোলী পেয়েছিল, তখন কে না দেখ্‌তে গিয়েছিল? ব্যাধ পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই তার তারিফ কর্লে। বল্লে এই বয়সে কিরাত

কুলে কেউ সিংহীমারতে পারেনি। ধন্যি বীর কালকেতু।

১মা। দেবীর বাহন কিনা? তাই একেবারে মারেনি। কেবল মাথায় একটি কিল্ দিতেই বেচারা মাটী নিয়েছে। সেদিন দশটা বরা, আর পঁচিশটা হরিণ এনে কি আনন্দই করছিল ভাই, সই লো সই, কালুর সেই ধূলো মাখা বুক-খানা যেন একহাত ফুলে উঠলো। ধন্যি বীর কালু।

(নেপথ্যে সঞ্জয়কেতু—"ফুলি এদিকে আয় মা" বলিয়া ডাকিলেন; ফুল্লরা "যাই বাবা" বলিয়া চলিয়া গেলেন।)

(ক্রমশঃ)

লাইব্রেরী ও তাহার উপকারিতা।

(গত ১লা ডিসেম্বর রবিবার ট্যাংরাস্থ শৈলেশ্বর লাইব্রেরী গৃহে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র লাল দাস, বি, এল উকিল মহাশয় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।)

লাইব্রেরীর অর্থ যদি পড়িবার জন্য কেবল পুস্তক দেওয়া ও তাহা ফেরৎ লওয়া হয়, তাহা হইলে লাইব্রেরীর জন্ম অতি প্রাচীনকালে বলিতে হইবে। মুদ্রা-লিপি প্রচলনের পূর্ব্বেও দেবমন্দিরে পুস্তকাদি রক্ষিত হইত। বস্তুতঃ প্রাচীন যুগে দেবমন্দিরই জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দেবমন্দিরে পুস্তক রক্ষিত হইত, দেবমন্দির জাতির মধ্যে কলাবিকাশের সম্যক্ পরিচয় দিত—অর্থাৎ শিল্পভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কণ, নৃত্যগীত ইত্যাদি বিষয়ে জাতি কতদূর উন্নত হইয়াছে, তাহা দেবমন্দির পরিদর্শন করিলেই পরিচয় পাওয়া যাইত। যাহা হউক, আধুনিক লাইব্রেরী বলিতে আমরা যাহা বুঝি ও আধুনিক লাইব্রেরী আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এখন লাইব্রেরী বলিতে আমরা কেবল পড়িবার জন্য পুস্তক দেওয়া ও ফেরৎ লওয়া বুঝি না। প্রকৃত লোক-শিক্ষা বিস্তারের জন্য লাইব্রেরীকে যথার্থ কেন্দ্র বলিয়া আমরা স্বীকার করি। পাশ্চাত্যে আধুনিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরী আন্দোলন বহু ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে লাইব্রেরীর কার্য্য পুস্তক দেওয়া ও ফেরৎ লওয়াতেই পর্য্যবসিত নহে। সেখানে স্থায়ী লাইব্রেরী

আছে, গতিশীল লাইব্রেরী অর্থাৎ Circulating Library ও আছে। গতিশীল লাইব্রেরীর কার্য্য যে এলাকায় লাইব্রেরী নাই সেখানে পুস্তক লইয়া যাওয়া ও জনসাধারণের মধ্যে ভাল ভাল পুস্তকের বহুল প্রচার করা। বাক্স করিয়া পুস্তক লইয়া যাওয়া হয় ও সুদূর পল্লীতে যেখানে পুস্তকসংগ্রহ দুরূহ ব্যাপার, সেখানে পুস্তকগুলি ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। এইরূপ Circulatiug Library পাশ্চাত্যের বহুদেশে রহিয়াছে। ইহার সাহায্যে সেখানে জনসাধারণের মধ্যে বহু বিষয়ে জ্ঞান বিস্তার হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আধুনিক যুগের লাইব্রেরী আন্দোলন ভারতবর্ষের পক্ষে এখনও নূতন বলিতে হইবে। পুরাকালে এদেশে লাইব্রেরী যে ছিলনা এমন নহে। তক্ষশিলা, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে বহু পুস্তকের সংগ্রহ ছিল এবং এই সকল লাইব্রেরী অল্প সংখ্যক পাঠকবর্গের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। মুসলমানযুগেও ভারতবর্ষে লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের বাহিরে আলেকজেন্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত বিখ্যাত লাইব্রেরী ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগের লাইব্রেরী ও লাইব্রেরী-আন্দোলন এ দেশের পক্ষে এখনও নূতন। অন্যান্য দেশে গভর্ণমেণ্ট দেশের লাইব্রেরী ও লাইব্রেরী-আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করে। সেইজন্য সে সকল দেশে লাইব্রেরীর সংখ্যা ও লাইব্রেরী-আন্দোলনের প্রসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে ভারতবর্ষকে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকেই চলিতে হইবে। এ দেশের গভর্ণমেণ্টের সামরিক ও পুলিস বিভাগের খরচা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু শিক্ষা ও অন্যান্য দেশের মঙ্গলজনক কার্য্যের জন্য ব্যয় করিতে সরকার বাহাদুর যথেষ্ট কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বরোদা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, পুতাকোটা ইত্যাদি স্বাধীন করদ রাজ্যসমূহ বরং এ বিষয়ে আজকাল মনোযোগী হইয়াছে বলিতে হইবে।

ঐ সকল স্থানের লাইব্রেরী আন্দোলন অন্যান্য সভ্যদেশের নিকট ভারতবর্ষের মুখ রক্ষা করিয়াছে। বরোদা রাজ্যে এমন সহর নাই যেখানে কোনও লাইব্রেরী জনসাধারণকে পুস্তক সরবরাহ না করে। প্রায় সকল গ্রামেই লাইব্রেরী আছে। যেখানে নাই সেখানে অন্ততঃ দুইটী গ্রামের জন্য একটী লাইব্রেরী নিশ্চয়ই স্থাপিত হইয়াছে। বরোদার পল্লীগ্রামের লাইব্রেরীর জন্যও ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ রহিয়াছে। সেখানকার শাসনপরিষদের মধ্যে লাইব্রেরীবিভাগ স্থাপন করা হইয়াছে। সহৃদয় গাইকোয়ার মহারাজ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া এ কথা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, free libraries জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

করিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নিজ রাজ্যে লাইব্রেরী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন বরোদার লাইব্রেরীসমূহ, বিশেষ বরোদা নগরীর Central Library,দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। মহারাজ গাইকোয়ারকে "the father of public library movement in India" বলা হয়। মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোরের পাবলিক লাইব্রেরী একটী দেখিবার বস্তু। আমেরিকার আধুনিক পদ্ধতিতে ঐ লাইব্রেরী পরিচালিত হইতেছে। কেবল শ্রেণী বিভাগ ও তালিকা প্রস্তুত করণে যে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা নহে। ঐ লাইব্রেরীতে শিশুদিগের জন্য, কিশোরমতি বালকবালিকাদিগের জন্য, মহিলাদিগের জন্য, এক কথায় সকল শ্রেণীর লোকদিগের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ও বন্দোবস্ত আছে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, লাইব্রেরী কেবল জনকতক শিক্ষিত লোকের জন্য নহে। অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করা, অর্দ্ধশিক্ষিতকে পূর্ণ শিক্ষিত করা, দেশের মধ্যে সদ্‌গ্রন্থ প্রচার করা—এক কথায় দেশবাসীকে সুস্থ সবল সুশিক্ষিত ব্যক্তিতে পরিণত করাই লাইব্রেরী ও লাইব্রেরী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে লোকের এই ধারণা ছিল যে, লাইব্রেরী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। লাইব্রেরীর কার্য্য কেবল বই দেওয়া ও ফেরত লওয়া। এখন কিন্তু এ ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রায় প্রত্যেক জনহিতকর আন্দোলনই লাইব্রেরীর সহায়তায় ও লাইব্রেরী-আন্দোলনের মধ্য দিয়া চালাইতে পারা যায়। ছায়াচিত্র ও চলচ্চিত্র দ্বারা যে লাইব্রেরী শিক্ষা বিস্তার করিতে পারে, এ কথা নূতন নহে। বড় বড় Chart ও নক্সা প্রস্তুত করাইয়া লাইব্রেরী যেরূপ দেশের প্রকৃত অবস্থা—দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারে, অন্যত্র তাহা সম্ভবপর নয়। কেবল সাধারণ জ্ঞানের পুস্তকই লাইব্রেরীতে থাকে না—সমস্ত technical subjects অর্থাৎ সকল ব্যবসার লোকের জানিবার ও জানিয়া উপকৃত হইবার পুস্তক লাইব্রেরীতে পাওয়া যাইতে পারে। লাইব্রেরীর সাহায্যে কথকতা ও ভাল ভাল বক্তাদিগের বক্তৃতা প্রদান করান হয় ও এদেশে হইতেছে লাইব্রেরীর সাহায্যে নির্দ্দোষ আমোদের আয়োজন করা যায়, যদ্দ্বারা জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হইতে পারে। কোনও লেখক লিখিয়াছেন—nothing which conduces to the improvement of man is outside the scope of the working of the Public Library অর্থাৎ মানুষকে যাহা উন্নত করে,

তাহা লাইব্রেরী আন্দোলনের বহির্ভূত নয়।

এ দেশে যখন শতকরা ৯০ এরও অধিক লোক নিরক্ষর, তখন এই লাইব্রেরী আন্দোলনের সাহায্যে আমাদিগকে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া নৈশ বিদ্যালয়, প্রাইমারী স্কুল চালিত হইতে পারে ও অনেক স্থানে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদিগকে লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইতে হইলে এলোমেলো ভাবে কাজ করিলে চলিবে না। Organisation চাই। বরোদায় সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর অধীন জেলার সদরে সদরে লাইব্রেরী আছে। ঐ গুলির অধীন মহাকুমার লাইব্রেরী আছে এবং মহাকুমার লাইব্রেরীর অধীন পল্লীগ্রামস্থ লাইব্রেরী সমূহ আছে। এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ করিলে অনর্থক পরিশ্রমের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে।

সৌভাগ্যের কথা, কয়েক বৎসর হইতে এ দেশে নিখিল ভারত লাইব্রেরী মহাসভার অধিবেশন হইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার সেনেট হলে ঐ মহাসভার ষষ্ঠ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আমি প্রতিনিধিরূপে ঐ সভায় যোগদান করি। সভায় একটী প্রস্তাবও সমর্থন করিবার সৌভাগ্য ঘটে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে লাইব্রেরী আন্দোলন আমাদের দেশে এখনও খুব নিম্নস্তরে রহিয়াছে। তথাপি নিরুৎসাহ হইবার কিছুই নাই। জেলায় জেলায় লাইব্রেরী স্থাপিত হইলে কত মূল্যবান পাণ্ডুলিপি যাহা অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করা যাইত। যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়া পরিচালিত হইলে দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

লাইব্রেরী আন্দোলন বহুমুখী করিতে হইলে দেশবাসীদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। ধরিয়া লইতে হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিবেন না। জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিকে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক লাইব্রেরী স্থাপন করিতে হইবে।

Andrew Carnegie ও আমাদের দানবীর পরলোকগত মহারাজ মনীন্দ্র নন্দীর ন্যায় অন্যান্য ধনী ব্যক্তিকেও লাইব্রেরীর আন্দোলনের জন্য অর্থ দান করিতে হইবে। Carnegie বলিয়াছেন—'I choose free libraries as the best of agencies for improving the masses of people because they give nothing for nothing, They only help those

who help themselves.

কার্ণাগির মতে লাইব্রেরীই হইতেছে জনসাধারণকে উন্নত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা, কারণ লাইব্রেরী সেই ব্যক্তিকেই উন্নত করিবে, যে নিজে উন্নত হইতে চাহে। শ্রমবিমুখ লোক ইহার সহায়তায় উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

উপসংহারে আমি এই কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে, লাইব্রেরীই প্রকৃত জ্ঞানের মন্দির। এখানে এইরূপ পুস্তক সংগ্রহ করা উচিত, যাহা মন্দির কলুষিত না করে। পুস্তক মনোনীত করিবার ভার যোগ্য ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। উপন্যাস না রাখিলে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না বলিয়া হরেকরকম উপন্যাস দিয়া লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করা নিস্ফল। লাইব্রেরীর কর্ত্তব্য হইতেছে সদ্‌গ্রন্থ প্রচারে—যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে সুরুচিপূর্ণ পুস্তকের জন্য taste অর্থাৎ আকাঙ্খা জন্মে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

খেয়াঘাটে।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

সাঁঝের বেলা খেয়া ঘাটে
কত পথিক যায়।
সারা দিনের কর্ম্ম সেরে
সবাই গৃহে ধায়॥
কেউ বা পিতা কেউ বা মাতা,
কেহ ভগ্নী কেহ ভ্রাতা,
অভিনয়ের পরে সবে
সাজের ঘরে যায়।
সাঁঝের বেলা খেয়া ঘাটে
কত পথিক ধায়॥
শৈশবেতে হেসে খেলে,
রং তামাসায় যৌবন কালে,

পরচর্চ্চায় বৃদ্ধকালে,
দিন ত ব'য়ে যায়।
খেয়া ঘাটের কড়ির কথা
ভাব্‌তে নাহি পায়॥
কত লোক আত্মহারা,
মদমত্তে মাতোয়ারা,
ধনে জনে দিশেহারা,
তারাও চলে যায়।
পঞ্চভূতের দেহ তাদের,
তাহাতেই মিশায়॥
সময় হ'লে সবই ফেলে,
পার্থিব সব মায়া ভুলে,
কড়ি নিয়ে অবহেলে,
খেয়ার পানে ধায়।
আপন আপন কার্য্য সেরে
নিজের ঘরে যায়॥
রাজা প্রজা সবাই যাবে,
ধনী নির্ধন কেউ না রবে,
খেয়া ঘাটের তরীতে রে
উচ্চ নীচ নাই।
যখন পরপারে যেতেই হবে
বীরের মত যাই॥

সাধক-সঙ্গীত।

মাটিকে খাঁটি জানরে মন
এই মাটীতে গয়া কাশী এই মাটীতে বৃন্দাবন।
যখন ছিলি মায়ের মস্তকে এলি মায়ের উদরে,
আর এক কব্বর আছে বান্দা মাটীর ভিতরে।
এই মাটী তোর অঙ্গের ভুষণ এই মাটীতে হয় পতন॥

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

জীবনকথা।

লালগোলার মহারাজ রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় সি, আই, ই, বাহাদুর।

লেখক —শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নবাব সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দীখাঁকে বাঙ্গলার মসনদ প্রদানের যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়। আলিবর্দ্দী আজিমাবাদ হইতে সুতিতে উপস্থিত হইলে, নবাব সরফরাজখাঁ লালগোলার অদূরে দেওয়ান সরাইএ শিবির সন্নিবেশ করেন। সে সময়ে দুলাল রায় বহু উপঢৌকন লইয়া নবাব শিবিরে উপস্থিত হন। নবাব তাহার তাক্ষ্ণধী, বাক্‌পটুতা প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জিলাদারী কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তিনি জিলাদারী কার্য্যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কতক সম্পত্তি খরিদ করেন এবং কাশীধামে, ত্রিপুরভৈরবঘাটে উনত্রিশটী শিব স্থাপন করেন। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নীলকণ্ঠ রায় তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। নীলকণ্ঠের সহিত, সুবেদার রাও অরুণ সিংহের কন্যার বিবাহ হয়। অরুণ সিংহের মৃত্যুর পর, নীলকণ্ঠ, সুবেদার নিয়োজিত হন এবং নবাব দরবারে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়া বংশ পরম্পরা ক্রমে "রাও" উপাধি প্রাপ্ত হন। রাও নীলকণ্ঠের পরলোকান্তে তৎপুত্র রাও আত্মারাম রায় কিছুদিন সুবেদারী কার্য্য করিয়াছিলেন, অকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্র; রাও রামশঙ্কর রায়, তাঁহার সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন। এই রামশঙ্কর রায়ই লালগোলা রাজবংশের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও উন্নতির মূল। পিতৃবিয়োগের পর তিনি কিছুদিন সুবেদারী কার্য্য করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব হুমায়ুন্‌জা তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। উত্তর জীবনে রাও রামশঙ্কর রায় বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। লালগোলার উত্তরাংশে প্রবাহিত পদ্মানদীর শাখা রুদ্ধতোয়া কল্‌কলির পঙ্কোদ্ধার করাইয়া তিনি ২টী ঘাট বাঁধাইয়া দেন। আতিথেয়তা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। তিনি রঘুনাথ দেবের মন্দির সংলগ্ন একটী অতিথি শালা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ, কালী, শিব

দধি বামন প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা ভোগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য কতক-গুলি সম্পত্তি দেবত্তর করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে লালগোলার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। রাও রামশঙ্কর রায়ের পুত্র মহেশ নারায়ণ রায় সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় কতিপয় বলিষ্ঠ সিপাহী দিয়া জঙ্গীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এস্‌লি ইডেনকে বিদ্রোহ নিবারণার্থ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভবানীপুর কুঠীর ইংরাজ ম্যানেজারের সহিত মহেশ নারায়ণের বিরোধ হওয়ায় তিনি গোপনে গভর্ণমেণ্টকে লেখেন যে, "মহেশনারায়ণ রায় গোপনে বিদ্রোহীদগকে সাহায্য করিতেছেন এবং কতকগুলি বিদ্রোহী সিপাহী তাঁহার আশ্রয়ে লুক্কায়িত আছে।" এই ঘটনার তদন্তের জন্য যখন জনৈক ইংরাজ কাপ্তেন সাত শত সশস্ত্র সৈন্য সহ লালগোলায় উপস্থিত হন, তৎকালে মহেশ নারায়ণ নির্ভয় চিত্তে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। কাপ্তেন সাহেব মহেশনারায়ণের চরিত্রের দার্ঢ্য ও প্রশান্ত সরল ব্যবহার দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যান। তিনি পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া এক রিপোর্ট দেন যে, "রাও মহেশনারায়ণ রায় রাজভক্ত শান্তিপ্রিয় জমীদার।" যৌবনের প্রারম্ভেই মহেশনারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয়া বিধবা পত্নী রাণী শ্যামাসুন্দরী, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। এই যোগেন্দ্র নারায়ণই বর্ত্তমান লালগোলার জমিদার বংশের রাজা।

মহারাজ বাহাদুরের কথা।

সংসার বিধাতার লীলাক্ষেত্র। বিধির বিধানে এই সংসারে সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ এবং শান্তির পর অশান্তি ও অশান্তির পর শান্তি পালা-ক্রমে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির কোমলাঙ্কে, সহাস্য পুষ্পরাজীর সহিত চুত-মুকুল-গন্ধাপহা-বসন্ত সমীরণের সুমধুর ক্রীড়া, তারকারাশি সুশোভিত সুনীল গগনে পূর্ণচন্দ্রের মনোমোহন হাস্য, যেমন অচিরকালের জন্য লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়, সংসারে সুখ শান্তির বিকাশও তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ী, ভগ-বানের নির্ব্বন্ধে, অল্পদিনের মধ্যেই শ্যামাসুন্দরীর সহিত যোগেন্দ্রনারায়ণের মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। শ্যামাসুন্দরী যোগেন্দ্রনারায়ণকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছুকাল পরেই উক্ত পোষ্যপুত্র কাল কবলে পতিত হয়। তৎকালে রামগোবিন্দ রাহা মহাশয় লালগোলার রাজ সংসারে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রাণীর সহিত যোগেন্দ্রনারায়ণের মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইলে, বহরমপুর সৈদাবাদের প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠ নাথ [illegible]

বাহাদুর যোগেন্দ্রনারায়ণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। বহু অর্থ ব্যয়ের পর বৈকুণ্ঠ নাথের বিশেষ চেষ্টায়, মোকদ্দমা (সোলেনামা দ্বারা) নিষ্পত্তি হইয়া যায়। শুনা যায় যে, বিস্তৃত কাঞ্চন মসিদার ৩০ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি রাণী শ্যামাসুন্দরী এবং অবশিষ্ট যাবতীয় সম্পত্তি যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রাপ্ত হন। শ্যামাসুন্দরীর পরলোক গমনের পর যোগেন্দ্রনারায়ণ কাঞ্চন মসিদাও পুনঃ প্রাপ্ত হন।

যোগেন্দ্রনারায়ণ বুদ্ধিমান, অধ্যবসায়ী ও পরিণামদর্শী মহাত্মা। শৈশবে ও কৈশোরে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা না হওয়ায় উত্তর জীবনে স্বীয় বুদ্ধি ও অধ্যবসায় গুণে তিনি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। এখনও তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে একটী দিনও বিদ্যালোচনা ব্যতিরেকে বৃথা ব্যয়িত হয় না। জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে নানা বিপদে জড়িত হইয়াও তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যগুণে যশস্বী ও স্বীয় জমীদারীর মঙ্গলসাধনে সমর্থ হইয়াছেন। স্বীয় যত্ন, চেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তার বলে এবং তদীয় দেওয়ান স্বর্গীয় বাবু কুঞ্জলাল রায় এবং কোষাধ্যক্ষ উমেশ নাথ বাগচী প্রমুখ কয়েকজন জমীদারী কর্ম্মাভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর কার্য্য কুশলতায় যোগেন্দ্রনারায়ণ অল্পকাল মধ্যেই নিজ সম্পত্তির বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া আজ প্রচুর অর্থের অধীশ্বর হইয়াছেন। আজ তিনি মুর্শিদাবাদের আদর্শ জমীদার ও জমীদারশ্রেণীর শিরোভূষণ। আজ তিনি মুর্শিদাবাদের দেবতা ও আজ তিনি বাঙ্গলার কল্পতরু, বাঙ্গলাদেশের নরনারী সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে।

নিরহঙ্কার, সর্ব্বভুতে দয়া, ক্ষমা ও আড়ম্বরশূন্যতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার। তাঁহার ন্যায় নিরলস ব্যক্তি খুব কমই লক্ষিত হয়। ১৮৭৭ খৃ বাঙ্গলার তদানিন্তন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল, অকপট রাজভক্তি, দরিদ্রগণের সেবা ও দক্ষতার সহিত জমীদারী কার্য্য পরিচালনার জন্য তাঁহাকে একখানি সম্মানসূচক মানপত্র (Certificate) প্রদান করেন। ১৮৯৭ খৃঃ হীরক জুবিলি উপলক্ষে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে আর একখানি মানপত্র বা সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অসাধারণ দানের জন্য তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভুষিত করেন। ১৩১০ সালে তাঁহাকে খিলাৎ দিবার জন্য বহরমপুরে যে দরবার হয় তাহাতে বক্তৃতা কালে ছোটলাট বোর্ডিলন সাহেব যথার্থই বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালারসামাজিক কালের ইতিহাসে গত ১৫।১৬ বৎসর হইতে আমি রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম বিজড়িত দেখিতেছি,

তাঁহার দান সকল লোকের পক্ষে অনুকরণীয়।" ১৯০৯ খ্রীঃ সদাশয় গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রাজাবাহাদুর" এবং তৎপরে "মহারাজ" উপাধি দান করেন।

জগতে কমলার কৃপাপাত্রগণের কথা।

বহু সংখ্যক ধনরত্নের আকর, হেমমণ্ডিত ভারতভূমি, কমলাদেবীর চির আবাস স্থান। অসংখ্য বরপুত্রের সেবার্চ্চনায় সন্তুষ্টা হইয়া লক্ষ্মীদেবী সেই ভারতকে স্বীয় জন্মভূমি বলিয়া কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অতীত জীবনে, অকৃত্রিম ভক্তিপুষ্পে, যোড়শোপচারে কমলাদেবীর অর্চ্চনা পূর্ব্বক যিনি মাতাকে সন্তুষ্টা করিতে পারেন তিনিই ইহজীবনের জন্য মাতার নিকট হইতে বর লাভে সমর্থ হন। তিনিই ইহজীবনে নারায়ণীর বরপুত্ররূপে জগতে সম্মানিত হইয়া থাকেন। অর্থাগমের প্রবল বন্যায় তাঁহার সংসার ভাসিতে থাকে। গোমুখীর মুখনিঃসৃত বারিধারার ন্যায় তৎকালে দেবী, অজস্রধারায় অর্থ বর্ষণ করিয়া সেই সেবক পুত্রের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দেন। সেই সময় পুষ্প চন্দন ও ধূপধুনার সৌরভে সেই ধনাগার সর্ব্বদাই আমোদিত হইতে থাকে। অলক্ষ্যে শঙ্খ নিনাদিত হয়, সহস্র সুবর্ণ দেউটী স্বতই প্রজ্বলিত হইয়া তৎ প্রভায় সর্ব্বদাই সেই মন্দির (ধনভাণ্ডার) আলোকিত হইয়া থাকে এবং মাতা সেই প্রিয় পুত্রের হৃদয় অনুক্ষণ ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া রাখেন। দেবীর এমনি মহিমা যে, মন্দাকিনী ধারার ন্যায় সাধু উদ্দেশ্যে সেই ভাণ্ডার হইতে রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইলেও করুণাময়ী সে ভাণ্ডার কখনই হ্রাস হইতে দেন না। নারায়ণী স্বয়ং সেই ভাণ্ডারের কর্ত্রী, পুত্রগণের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয়ে মায়া মমতা বা স্নেহ দয়ার লেশমাত্র নাই তাঁহাদিগকে তিনি প্রাণের সহিত কখনই ভালবাসেন না। যাঁহারা অপব্যয় বা অসদ্ব্যয়ের প্রলোভনে পতিত হইয়া স্বীয় পূর্ব্ব জীবনের পুণ্যলব্ধ অর্থভাণ্ডার শৃগাল কুকুরের হস্তে লুণ্ঠনের অনুমতি দান পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে, চরিত্র হারাইয়া কেবলমাত্র আহার নিদ্রা ও বিলাসিতায় দিনযামিনী অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের প্রতিও কমলাদেবীর কৃপা অস্থায়ী। আত্মবঞ্চনকারী কৃপণের উপরেও অযাচিত দয়া প্রকাশিত হইলেও সে দয়া স্থায়ী নহে। তাঁহার যে সকল বরপুত্র চরিত্রবান্ পরদুঃখকাতর ও স্বদেশভক্ত, কমলাদেবী তাঁহাদেরই ভাণ্ডারে ধন বৃদ্ধি করিয়া দেন। বহু দানে ও বহু ব্যয়েও তাঁহাদের অর্থভাণ্ডার অক্ষয় মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জগতে বিরাজ করিতে থাকে। মানব উপলব্ধি করিতে পারে না যে, এতাধিক ব্যয় সত্ত্বেও কিরূপে কোথা হইতে নিত্য রাশি রাশি অর্থ আসিয়া, সেই ভাগ্যবান্ কমলার প্রিয় সন্তানের ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করে। তাহারা বুঝিতে

পারে না যে কিরূপে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার বরপুত্রগণের করস্পর্শে মন্ত্র-শক্তিবং ধূলিমুষ্টি, অর্থমুষ্টিতে পরিণত হয়। ভাগ্যবিধাতার অর্থ-জগতের আইন নিয়মাদি স্বতন্ত্র, সুতরাং যাঁহারা সেই আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাঁহারা কখনই এ রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন না।

সংসারে অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা।

"অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যং।
নাস্তি ততঃ সুখলেশ সত্যং॥"

পূর্ব্বকালে যাঁহারা জনকোলাহলের বাহিরে, সিংহশার্দ্দূল সেবিত নিবিড় অরণ্যের একাংশে জীবন যাপন করিবার অভিলাষী হইতেন, তাঁহাদের নিকট অর্থ যাবতীয় অনর্থের মূল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু যে সংসারবাসীকে জীবন সংগ্রামের বহু সংঘর্ষে বাত্যা-বিতাড়িত রজঃ কণার ন্যায় দেশে দেশে ছুটিয়া স্নেহভাজন সন্তান সন্ততির অন্নের সংস্থান ও সংসার যাত্রায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়, তাহার নিকট যে অর্থই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পদার্থ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক সংসারে অর্থ উপার্জ্জন করা অপেক্ষা উপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা করাই অধিক কঠিন। ধনভাণ্ডার রক্ষা করিবার শক্তি ভগবান সকলকে দেন না। যিনি অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে জানেন, ঈশ্বর প্রসাদাৎ অর্থশাস্ত্রে যাঁহার অধিকার লাভ হয়, জগদীশ্বর তাঁহাকেই ধনভাণ্ডার রক্ষার শক্তি দিয়া থাকেন। অর্থের অপার শক্তি ও অপার মহিমা। অর্থ-জগৎ সর্ব্বদাই বৈচিত্র্যময়। মানবের অর্থ না থাকিলে, বিধাতার রাজ্যে সুখে বাস করা যায় না। সমাজে অর্থহীনের স্থান হয় না; স্বজাতির নিকট প্রতিপত্তি হয় না; আত্মীয় কুটুম্ব, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পিতামাতা কাহারও নিকটেই আদর লাভ হয় না। সংসারে অর্থ সর্ব্বদা আবশ্যক। আহারে অর্থ চাই, বিহারে অর্থ চাই, বিলাসে অর্থ চাই, আমোদে অর্থ চাই, বিবাহে অর্থ, সন্তান-সন্ততি হইলে অর্থ উৎসবে অর্থ, খেলাধুলাতেও অর্থের প্রয়োজন। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মানুষের অর্থের আবশ্যক হইয়া থাকে, জীবনে অর্থ, মরণে অর্থ, জীবনান্তের পরও অর্থের উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থ যে কি মূল্যবান সামগ্রী তাহা জগতবাসীর অবিদিত নাই, শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই অর্থের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত। স্নেহ দয়া, দাক্ষিণ্য, মায়া, মমতা, ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি, অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইলেও অর্থ ভিন্ন কোন উপায় নাই। সেই অর্থ উপার্জ্জনের আশায় কেহ সংসারে দিবারাত্রি মস্তকের স্বেদ বিন্দু পদতলে পাতিত করিতেছে,

অর্থের জন্য কেহ জাতিচ্যুত হইতেছে, কেহ সমাজচ্যুত হইতেছে, কেহ চুরি করিতেছে, কেহ ডাকাইতি করিতেছে, কেহ মারামারি করিতেছে, কেহ মামলা-মকর্দ্দমায় লিপ্ত হইতেছে, কেহ বা নরহত্যার পাতকী হইতেছে। জগতে কেহ সদুপায়ে কেহ বা অসদুপায় সর্ব্বদাই অর্থ উপার্জ্জন চেষ্টায় নিয়োজিত। অর্থহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে, অর্থহীন জীবনের কোনই গৌরব নাই।

অর্থব্যবহারের কথা।

অর্থ ব্যবহার সংসারে বড়ই কঠিন সমস্যা। সামান্য জমিদারই হউন, আর কোটীপতিই হউন, ব্যবসায়ী হউন, আর চাকরীজীবীই হউন, বৃথা ব্যয় বা অপব্যয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিলে ধন রক্ষা বা অর্থ সঞ্চয়ের বিষয়ে জগতে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কেহ পাঁচ টাকা বেতনের গোমস্তাগিরি কার্য্য করিয়া ভবিষ্যতে লক্ষপতি হইতে পারেন। আবার কেহ হাজার টাকা বেতনের চাকরী বা উপায়ান্তরে মাসিক তিন, চারি হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াও মৃত্যুকালে অসচ্ছলতা রাখিয়া যান। কেবলমাত্র অর্থের ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা বশতঃই উভয় ক্ষেত্রে এবম্বিধ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। মহারাজ যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর অর্থের সদ্ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়াই তাঁহার চিরজীবন পুণ্যময় হইয়া রহিয়াছে ও রহিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

লালগোলার মহারাজ বাহাদুরের অর্থশাস্ত্র কুশলতার কথা।

মহারাজ বাহাদুরের চরিত্রের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব প্রভাবেই তিনি ইহজীবনে লক্ষ্মী প্রিয়পাত্র হইয়াছেন এবং দেবীর অপার করুণা তাঁহার জীবনকে সর্ব্বদাই পবিত্র ধর্ম্মময় করিয়া রাখিয়াছে এবং সেই কারণেই নিত্য অজস্রদান সত্ত্বেও মহারাজ বাহাদুর তাঁহার নারায়ণীদত্ত ভাণ্ডার অক্ষয় বা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পূর্ণশক্তি ভগবানের নিকট হইতেই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে ইহজীবনে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কমলার বরপুত্ররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পবিত্র যশঃ ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও অর্থশাস্ত্র কুশল না হইলে কখনই ভগবানের নিকট হইতে অযাচিত করুণা প্রাপ্ত হইয়া ইহ জীবনে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিতে পারিতেন না। দেশের অভাব অভিযোগও পূর্ণ হইত না। দীন দুঃখীদেরও কষ্টের লাঘব হইত না। প্রধানতঃ অর্থদুর্গ প্রকৃতির স্বভাব বশতই যে লালগোলার মহারাজ বাহাদুর এতাদৃশ অর্থশৌচ প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, এ কথা

বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

যে যে কারণে মহারাজ বাহাদুর অর্থশাস্ত্রকুশল হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রের সেই সকল বৈশিষ্ট (আমরা যাহা অনুমান করি) নিম্নে প্রদত্ত হইল। মহারাজ চরিত্রের সেই সকল অসাধারণত্ব অবগত হইলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে কিরূপে তিনি এত উন্নত হইয়াছেন। অপব্যয়ের পরিবর্ত্তে দানের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ কেন তাহাও সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রত্যহ অজস্র অর্থ দান করিয়াও কিরূপে লালগোলার মহারাজ বাহাদুর স্বীয় ধনভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন? একদা আমার জনৈক বন্ধু আমার নিকট এ বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। প্রশ্নটী কঠিন হইলেও যাঁহারা মহারাজ চরিত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই এ প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

যাত্রা।

লেখক—শ্রীযুক্ত উমানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।

২৩। তরুণ পথিক কভু পল্লীবীথি দিয়া
গোধূলি ধূসর পথে ফাল্গুন সন্ধ্যায়
চলিয়াছি সাথে লয়ে জীবন সঙ্গিনী
পিককণ্ঠে তরু তব আগমনী গায়!

২৪। পড়েছে সন্ধ্যার আলো মুকুটে তোমার
চূর্ণ কুন্তলে তব ঘুরিছে মলয়
বকুল মুকুলি উঠে সৌরভে আকুল
তোমার আনম্র শিরে ঢালে পুষ্পাসার।

২৫। ক্রমে চিত্রানিশীথিনী ইন্দু সীমন্তিনী
তোমার আননে ঢালে রৌপ্যগলা আলো
'বউ-কথা-কও' পাখী তরু-বীথিকায়
কত না আকূতি ভরে যায় কুহরিয়া!

২৬। সেই গান সে জ্যোৎস্না সেই মুখ হেরি
কত যুগ যুগান্তের কথা মনে হয়!
অন্তরে ঘনায় মোর সে কি অনুভূতি!
সে ভাব ভাষায় কভু বাঁধা নাহি যায়।

২৭। সু-কবচে বর্ম্মে খড়্গে কভু সুসজ্জিত
শরাসন করে লয়ে আমি দিব্যরথী
চলিয়াছি অপহৃতা করিবারে তারে
যে জন করেছে মোর মন অপহৃত।

২৮। সবলে রথেতে তারে করি আরোহিত
দিকে দিকে উঠে তবে মহাকোলাহল
ধেয়ে আসে শস্ত্রপাণি সৈন্য অগণন।
তূরী ভেরী ঢক্কা শঙ্খ ঘোষে মহারণ!

২৯। রথের ঘর্ঘরমন্দ্র ধনুর টঙ্কারে
অসির ঝঞ্ঝনা মিশি বৃংহিত হ্রেসায়
সুবর্ণ কিঙ্কিণী বাজি রথের চূড়ায়
মুহূর্ত্তে কিরূপ সেথা ঘনায়ে তুলিল!

৩০। সারথী হইলে দেবি! মোর পক্ষে তুমি
ভরি গেল কি উৎসাহে মোর বীর বুক!
প্রেম-দীপ্ত মুখ তব নেহারিনু যবে
সে কি সুখ জাগরিল হৃদয়ে আমার!

৩১। মম মর্ম্ম গগণের পূর্ব্বাসার দ্বারে
হে নির্ম্মলে! হে সুন্দরি! এ কি গো বিস্ময়!
তুমি মূর্ত্তিময়ী ঊষা আনিলে সে দিন
মোর পূর্ব্বজনমের অপূর্ব্ব প্রভাত।

৩২। নিমেষে ভাসিয়া গেল সাগরবাহিনী
বিজয় উল্লাসে বক্ষে লইলাম তোমা
একা আমি দিগ্বিজয়ী বীরভোগ্যা অয়ি
পরালে আমার কণ্ঠে বরমাল্য তব।

৩৩। তোমারে জিনেছি আমি রাজন্য সভায়
বিজিত অগণ্য বীর মোর লক্ষ্যভেদে
কোথায় আকাশ-যন্ত্রে মৎস্য সুরক্ষিত
কেহ না সমর্থ হ'ল বিদ্ধ করিবারে।

৩৪। সে দিনের লক্ষ্যভেদে অয়ি বরাঙ্গনে!
সমবেত সভা মোর করে জয়ধ্বনি,
জন্মান্তরে কোন দিন ভেঙেছিনু ধনু
জিনেছিনু সুকোমল তুটি পদ্মকর।

৩৫। স্বয়ংবরারে কভু লভিয়াছি আমি
সবারে তেয়াগি তুমি বরিয়াছ মোরে
কণ্ঠে মোর গন্ধে ঢালা হে লাবণ্যপুঞ্জে!
দিয়াছ মধুক-মালা অনুরাগ ভরে।

৩৬। অতিথি হ'য়েছি কভু তব তপোবনে
তুমি আছ আলবাল-সেচন-নিরত
বসেছি প্রচ্ছায় স্নিগ্ধ সপ্তপর্ণতলে
অদূরে মালিনী মোরে শুনায়েছে গান।

৩৭। মনে পড়ে কভু বনে নিঃসঙ্গ একাকী
নির্ব্বাসিত পরিত্যক্ত বিপন্ন বিজনে
সম্মুখে গম্ভীর নদী নীলাম্বু ফেণিল
অনন্ত তরঙ্গ ভঙ্গে কল্লোল আকুল।

৩৮। পশ্চাতে অজ্ঞাত ঘন বনানী বিপুল
সন্ধ্যার গলিত স্বর্ণ তিমিরে মিলায়
নেমে আসে কালরাত্রি মহাশঙ্কাময়
পথহারা অন্যমনা সৈকতে একাকী।

(ক্রমশঃ)

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫শ বর্ষ { ১৩৩৬ সাল, মাঘ। { ১০ম সংখ্যা।

শ্রীমন্মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী ও তাঁহার উপদেশাবলী

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বৈদ্যনাথধামের শিবলিঙ্গকে "রাবণেশ্বরায় বৈদ্যনাথায় নমঃ" এই বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।" রাবণেশ্বর" কেন বলে, তাহা বলা হইয়াছে। এখন "বৈদ্যনাথ" বা "বৈজুনাথ" এ নাম কেন হইল, ইহা জানিয়া রাখাও উচিত।

এই সম্বন্ধে কিম্বদন্তি এই যে, পূর্ব্বোক্ত "হার্দ্দপীঠে" স্থাপিত যে শিবলিঙ্গ উহা পরে বৈজু গোয়ালা নামক এক গোপের নিকট প্রথম প্রকটিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবাদ যে, উক্ত গোয়ালার একটী দুগ্ধবতী গাভী দুধ মোটেই দিত না। গোয়ালার সন্দেহ হয় যে, রাখাল বালক চুরি করিয়া বোধ হয় দুগ্ধ পান করে। এই চুরি প্রত্যক্ষ করিবে বলিয়া বৈজু একদিন লুকাইয়া উক্ত গাভীটীর পশ্চাদ্ধাবন করে। পশ্চাতে যাইতে যাইতে সে দেখিল যে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে যাইয়া গাভিটী প্রবেশ করিল ও এক শিলাখণ্ডের উপর যাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ইহার কিছুক্ষণ পরেই গাভীর স্তন হইতে প্রবলবেগে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইয়া ঐ শিলাখণ্ডের উপর পড়িতে লাগিল। বৈজু ইহা দেখিয়া পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইল ও এই শিলাখণ্ড যথার্থই কোন জাগ্রত দেবতা ইহা জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে যাইয়া

উহাতে নিজের শির স্থাপিত করিল। এইরূপ করিবার পর, মহাদেব নিজ মূর্ত্তিতে বৈজুকে দর্শন দিয়া বলিলেন যে, সে যদি উহা দেখিতে পাইল, তবে এই লিঙ্গ তাহার নামানুসারে "বৈদ্যনাথ" বা "বৈজুনাথ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। পরে এই বৈজুনাথই এখানে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা ইহার যথাবিধি পূজার্চ্চনাদির ব্যবস্থা করিয়াছে।

তারকেশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে বলিয়া ইহাকে এক সাধারণ প্রবাদ বলিয়াও ধরা যাইতে পারে।

বৈদ্যনাথধাম এক "ভৌম" তীর্থ। "ভৌম" তীর্থ এজন্য বলা হইল যে, শাস্ত্রে "মানস, জঙ্গম ও ভৌম (স্থাবর)" এই তিন প্রকার তীর্থের বর্ণনা আছে। এই সকল তীর্থক্ষেত্রে অবস্থান পূর্ব্বক সাধন ভজন করিলে, মানবগণের পাপরাশি ক্ষয় হইয়া তাহাদের অশেষ পুণ্যের সঞ্চয় হয়। ইহার মধ্যে মানস তীর্থ হইতেছে সত্য, ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, মিষ্টবাক্য, জ্ঞান, ধৈর্য্য, পুণ্য ও মনশুদ্ধি। এই সকলের যতগুলিতে যিনি উৎকর্ষ লাভ করিবেন, তিনি সেইরূপই মানসিক তীর্থের ফললাভ করিবেন। সর্ব্বকাল প্রক ব্রাহ্মণগণ হইতেছেন "জঙ্গমতীর্থ। ইহার কারণ, তাঁহারা একস্থান হইতে অন্য-স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান ও তাঁহাদের পুণ্যকার্য্য ও সৎ উপদেশের সংস্রব লাভ করিয়া বহুলোক পুণ্যশালী হইয়া থাকেন। আর ভূমির অদ্ভুত প্রভাব; জলের অপূর্ব্ব গুণ ও স্থানের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা প্রভৃতির দ্বারা দেবতা বিশেষের অধিষ্ঠানক্ষেত্র হইয়া অপরের অশেষ চিত্তক্লেদ দূর করে ও তাহাদিগকে পবিত্র-ভাবে প্রণোদিত করে, তাহা হইল "স্থাবর বা ভৌম" তীর্থ। কাশী প্রয়াগাদি এরূপ ভৌমতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে এরূপ বহুতীর্থ আছে ও শাস্ত্রে উহাদিগের বিশেষ বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এসব তীর্থস্থানে বাস, সে স্থান দর্শন, সে স্থানে দেহত্যাগ অথবা ঐরূপ স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা ও অর্চ্চনা বা সেখানে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলে বিশেষ বিশেষ শুভ-ফলের উদয় হয়। বহু পুরাণাদি গ্রন্থে তাহারও নানাবিধ উপদেশ আছে। বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থানের কি মাহাত্ম্য তাহা গ্রন্থবিশেষে প্রচারিত আছে। এইরূপ তীর্থস্থানে পূজা ও অর্চ্চনাদি করিয়া অনেকে ইহজীবনেই নানারূপ কাম্য ফল লাভ করিয়াছেন, এরূপ বহু কিম্বদন্তিও প্রচলিত আছে। এই বৈদ্যনাথধামে বাবা বৈদ্যনাথের নিকট "ধরণা" দিয়া অনেকে উৎকট উৎকট ব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, এরূপ বহু সংবাদ প্রচলিত আছে। বৈদ্যনাথধাম এইরূপ

এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া এখানে গৃহস্থ ও উদাসী, শাক্ত ও বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী বা পরমহংসগণ প্রায়ই আগমন করেন। সুতরাং এই তীর্থস্থানে নিয়ত বাস যে পরম কল্যাণকর সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

এই তীর্থস্থান সম্বন্ধে সামান্য দুই একটী শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিতেছি

শ্রীভগবানের স্তোত্রে আছে :—

"তীর্থাস্পদং শিব বিরিঞ্চিনুদং শরণ্যং, ত্রিস্থলং তীর্থরাজেন্দ্রং।"

শ্রুতির রুদ্রাধ্যায়ে আছে :—

"নমস্তীর্থায় চ কুল্যায় চ নমঃ।"

মুক্তিকোপনিষদে আছে :—

"পুনরাবৃত্তিরহিতাং মুক্তিং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
যত্র কুত্রাপি বা কাশ্যাং মরণে স মহেশ্বরঃ।
জন্তোর্দ্দক্ষিণ কর্ণে তু মন্ত্রারং সমুপাদিশৎ ॥"

ইহা হইতে এই উপদেশ লাভ হইল যে তীর্থের রাজাও আস্পদ হইতেছেন শ্রীভগবানবিষ্ণু। আবার মহাদেবও হইতেছেন এই তীর্থস্বরূপ ও ইহার রক্ষাকর্ত্তা বারাণসী তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য এই যে, এই কাশীর যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলে মৃত্যু সময়ে স্বয়ং মহেশ্বর উপস্থিত হইয়া তাহার দক্ষিণকর্ণে তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ দেন ও তাঁহার মুক্তি হয়।

তীর্থস্থান সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

তীর্থস্থান সম্বন্ধে যখন প্রসঙ্গ উঠিয়াছে তখন ইহার সঙ্গে আর দুই চারিটী কথা বলিতে হইবে।

উপরোক্ত তীর্থমাহাত্ম্য শুনিয়া কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, উক্ত বাক্যগুলি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ইহার বিপক্ষে তাঁহারা বলেন যে, শ্রীভগবান ত সর্ব্বব্যাপী, এজন্য তিনি সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে অবস্থান করিবেন। তাঁহার স্থান বিশেষের প্রতি এ পক্ষপাতিত্য ধর্ম্ম কেন থাকিবে? আরও বলেন যে, জ্ঞানপ্রাপ্তি, ভক্তির উৎকর্ষতালাভ বা চিত্তশুদ্ধিলাভ বিনা কাহারও উন্নতি-লাভ হয় না। এজন্য কেহ চিত্তের পরিশুদ্ধি প্রভৃতি লাভ না করিয়া বা সর্ব্ববিধ পাপাচারী হইয়া, কেবল তীর্থদর্শন করিয়া বা তীর্থক্ষেত্রে দেহরক্ষা করিয়াই যদি উৎকৃষ্টগতিলাভ বা মুক্তিলাভ হয়, তবে শাস্ত্রীয় অন্যান্য কর্ম্ম করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। গৃহে অবস্থান করিয়া যদি কেহ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের সম্যক অনুষ্ঠান করে, অথবা পুণ্যাচারী হইয়া চিত্তের মল দূর করে, তাহার

অনর্থক কষ্ট বা ব্যয় স্বীকার করিয়া, ওরূপ তীর্থভ্রমণের আবশ্যকতা কি ? আবার ইহাও কেহ বলেন সঙ্গদোষই বহু অনর্থের মূল। তীর্থস্থানে যে কেবল পুণ্যাচরণই দেখা যায়, এরূপ ত নয়। বহুস্থানে বহু বহু পাপাচারও ত দেখা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কষ্টাদি স্বীকার করিয়া ঐ সব স্থানে গমন পূর্ব্বক পাপ ও পাপীর সঙ্গ জনিত চিত্তের মলিনতা প্রাপ্ত হওয়া ত অবশ্যম্ভাবী। আবার কেহ কেহ বলেন যে, শাস্ত্রকারেরা এ তীর্থস্থানগুলিকে এ মানব দেহেরই রূপকস্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। বাহ্যিক আড়ম্বরে কোন ফল নাই।

এইরূপ বহু প্রশ্ন শুনিয়া ইহাদের কিছু কিছু উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

প্রথমতঃ, আমাদের সনাতনধর্ম্ম-বিশ্বাসী হিন্দু ভ্রাতৃগণকে এই নিবেদন করিব যে, ঋষি প্রমুখ মহাজনেরা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন বা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রমাণস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিয়া লইতে হইলে ও তৎপ্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে নিজ ব্যবহার জনিত জ্ঞান বা বিচার প্রয়োগ করিলে চলিবে না। বেদ পাঠ করিলে কি ফল হয়, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিলে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক ফল হয় কিনা, সন্ধ্যাবন্দনা, পূজার্চ্চনা, নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম করিলে কি ফল হয় ? বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা বা রক্ষার ফল কি ? ইত্যাদি বহুবিষয় যুক্তি ও তর্কের দ্বারা অজ্ঞ হৃদয়ে এক বারের জ্ঞানোৎপাদন করা প্রথমেই বড় অসম্ভব। ইহা মানিতে হইলে দেহ ব্যতীত আত্মা আছে, পাপ পুণ্যের ফল আছে, ইহা স্বীকার করিতেহয়। তাহার পর, বহু বিধফলই হইতেছে অনুষ্ঠান সাপেক্ষ। এজন্য, সময়ভেদে তিথিনক্ষত্র ভেদে, দেশ ও কালভেদে বা গ্রহণাদি ঘটনা সময়ে, শাস্ত্রে যে যে পূজা, উপাসনা বা জপাদি করিবার বিধির উল্লেখ আছে, তাহার যুক্তি এক কথায় বুঝান সাধ্যাতীত। ইহা হইতেছে এইরূপ—কেহ সবে মাত্র জ্যামিতি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সে যদি বিন্দুর পরিভাষা "যাহার অবস্থান আছে, কিন্তু বিস্তার নাই, তাহাই বিন্দু।" ইহা পড়িয়াই তর্ক উত্থাপন করে যে, ইহা অসম্ভব, তবে তাহাকে বুঝান বড়ই কঠিন। কিন্তু ইহা মানিয়া লইয়া যদি কেহ জ্যামিতিশাস্ত্র পাঠ করে, তবে ইহার স্বরূপ উপলব্ধি পরে সে নিজেই করিতে পারিবে। হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্রই হইতেছে বেদ মূলক। কিন্তু এ বেদকে অপৌরুষেও বলিলেই সে যদি হাসিয়া উড়াইয়া, ইহাকে কতিপয় কৃষকের গানস্বরূপ জ্ঞান করে, তাহাদের নিকট এ তীর্থ মহাত্ম্য বলিয়া কোন ফল নাই।

এজন্য প্রথমেই বলিব যে শ্রদ্ধা বা জ্ঞানীগণের উক্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস

স্থাপন ও তৎসহ নিজের অজ্ঞতা জ্ঞান ও পরে বিনম্রভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া একেবারে তর্কবুদ্ধি উঠাইলে সম্যক জ্ঞানলাভ হওয়া বড়ই কঠিন। এই শ্রদ্ধা ও ভক্তিই হইতেছে সাধনার ভিত্তি। আর ঐরূপ বিশ্বাসকেই পূর্ব্বে "অন্ধবিশ্বাস" বলা হইয়াছে। এ অন্ধবিশ্বাস ও অনন্য ভক্তি লইয়া, সাধন করিতে হইবে। ইহা যে কেবল আমিই বলিতেছি তাহা নয়, শাস্ত্রকারেরা ইহা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া গিয়াছেন, তাহার সামান্য মাত্র উক্তি কয়েকটী নিম্নে শুনাইতেছি

(১) "শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যানযোগাদবৈহি ... কৈবল্যোপনিষদ
(২) "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ" ... গীতা
(৩) "অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসারবর্ত্মনি" ... গীতা
(৪) ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য জ্ঞাতুংদ্রষ্টুঞ্চতত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ ... গীতা
(৫) "ভক্ত্যা মামভিজানাতি···ইত্যাদি ... গীতা
(৬) "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য ··ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি" ... গীতা
(৭) "ভক্তি পরানুরক্তিরীশ্বরে" ... শাণ্ডিল্য সূত্রং

সমুদয় উপদেশ শুনিয়া তীর্থস্থান সম্বন্ধে যেরূপ কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিহিত আছে তাহা প্রথমতঃ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লইতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞতাও মানিয়া লইতে হইবে। সুতরাং প্রথমতঃ তীর্থ মাহাত্ম্য মানিয়া লইতে হইবে। তবে ইহার কারণ সম্বন্ধেও কিছু কিছু যুক্তি শুনাইতেছি। যে পরলোক মানে না তাঁহার নিকট "স্বর্গকামায় যজেৎ" এ বাক্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল। সুতরাং তাহাদের জন্য এ সব উক্তি করা হইতেছে না। ব্যাপকতা বলিয়া যাঁহারা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি এই নিবেদন যে, পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞ বুদ্ধিতে সর্ব্বব্যাপক, অনন্ত ও সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের উপাসনা বা পূজা সাধারণের পক্ষে হওয়া অসম্ভব। নিজের রজঃও তমভাবের সহিত অজ্ঞতা ও পরিচ্ছিন্নতা নষ্ট হইয়া গেলে যেমন সত্ত্বগুণের বিস্তার লাভ হইবে, অমনি শ্রীভগবানের ব্যাপকতাও উপলব্ধি হইতে থাকিবে। এ সত্ত্বগুণের ধর্ম্মই হইতেছে,—

(১) "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্" ... গীতা
(২) "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" ... গীতা
(৩) "সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত" ... গীতা

এরূপ দেখিবার শক্তি লাভ করিতে হইলে, শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দেখিবার পূর্ব্বে,"দিব্যং দদামি তে চক্ষু"র ন্যায় প্রকাশময় চক্ষু

লাভ করিতে হয়। এ কারণে উপাসনা করিবার পূর্ব্বে এই বলিয়া মন্ত্র বলিতে হয়।

(১) "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষ ... অত্রতিষ্ঠেদ্দশাপুনং।"

অর্থাৎ এই পরমাত্মার ব্যাপকতারূপকে ধারণা করিবার জন্য ও ইচ্ছানুরূপ তাঁহাকে প্রিয় রূপে সন্নিবেশ করিবার জন্য তাঁহাকে কিছু ছোট করিয়া লইতে হয়।

এরূপভাবে ধারণাপযোগী করিয়া লইলে দেখা যাইবে যে,—

(১) "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

(২) "হৃদা সন্বীশো মনসাভিক্লিপ্তো।" ... শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

একজন বঙ্গীয় কবি এরূপ গাহিয়াছেন,—

"তাই বলি ওরে কান্না, কিছু নয় কেবল মায়া।
ধরলে পরে জ্ঞানের আলোক, লুকায় যে সে ওঁকারে॥

যাহা হউক, এই ব্যপকতা লইয়াই যদি কেহ আরও তর্ক উঠাইতে যান, তবে ইহাও বলা যাইবে যে, সর্ব্বস্থানের ব্যপকতা ধর্ম্মানুসারে তিনিও তীর্থস্থানে আছেন ইহার ত আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, তবে এ তীর্থস্থানে তাঁহার অধিক পরিস্ফুটতার আবশ্যকতা কি? তবে কি তাঁহার পক্ষপাতিত্য আছে? এরূপ প্রশ্ন যাঁহারা উঠাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি কিছু নিবেদন আছে। সূর্য্যদেব আকাশে একভাবেই অবস্থান করেন, ইহা ত সকলেই স্বীকার করিবেন তবে তাঁহার রূপ, প্রতিবিম্ব ও কার্য্য সকল পদার্থে বা সকল প্রদেশে বা সকল সময়ে কি একরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে নির্ম্মল পদার্থে তাঁহার প্রতিবিম্ব অতিশয় প্রস্ফুটীত হয়। মলিন পদার্থে সেরূপ হয় না। আবার দেখ দেশভেদে ও সময়ভেদে এই সূর্য্যদেব কখন ও আমাদের আরামদায়ক ও কখন বা অপ্রীতিকর হইয়া থাকেন। মেঘাচ্ছন্ন হইলে বা গ্রহণের সমাবেশ হইলে, তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হন। অন্যদিকে অপর এক দৃষ্টান্তের দ্বারাও ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করা যাউক। সম্মুখে এক পর্ব্বত, একভাবেই অবস্থান করিতেছে। কিন্তু সেই পর্ব্বতের স্থানবিশেষে যদি কেহ দণ্ডায়মান হয়, তবে উহা একজনের নিকট একভাবে দেখা যাইবে। আবার অপর ব্যক্তি অন্যস্থানে দাঁড়াইয়া উহাকে অন্যভাবে দেখিবেন। ইহা যদি সম্ভবপর হয়, তবে সেই সর্ব্বব্যাপি ভগবানের প্রতিবিম্ব যে স্থানবিশেষে পরিস্ফুট মনোরম হইবে, ইহার কি কোন অসম্ভবনা আছে?

আবার নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ। আজ গৃহে বসিয়া কেহ চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্য দেখিতেছে। ইহা দেখিয়া সে যে ভাবে বিভোর আছে, সে যদি হিমালয়ের পাদদেশে বা সমুদ্রতীরে যাইয়া অবস্থান করে, তবে তাহার হৃদয়ে দেখিবে, নানারূপ মনোরম ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহা হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সময়ের পরিবর্ত্তন। আবার দেখিবে একই ব্যক্তি, সময় বিশেষে তাহার এক এক ভাব আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

যদি ইহা সম্ভবপর হয়, তবে আমাদের তীর্থস্থান সমূহ যেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণস্থানে সচরাচর অবস্থিত আছে, সেখানে যাইলেই শ্রীভগবানের মধুরতাপূর্ণ বিচিত্রতার উপলব্ধি হওয়া কি অসম্ভব? আর এজন্য অর্থাৎ তাঁহার মাধুর্য্য প্রকাশের জন্য তাঁহার নিজের কোন পক্ষপাতিত্য নাই ইহত নিশ্চয়। তিনি এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও এ পার্থক্যরূপ মাধুর্য্যপূর্ণ তীর্থস্থান সকল নানারূপ প্রকাশিত হইয়াছেন মাত্র। অর্থাৎ ইহা স্থানের গুণভেদ জন্য।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীভগবানই "তীর্থাস্পদং"। সুতরাং তাঁহাকে লইয়াই যখন এ প্রসঙ্গ, তখন এখানে আরও ২।৪টী কথা বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। আজকাল সামান্য ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়াই বালকেরা শিক্ষা করে "God is a spirit, invisible" অর্থাৎ ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাহার পর শিক্ষা করে, God is infinite, all powerful, omnipotent, all pervading ইত্যাদি। খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মীদের নিকট শুনিয়া থাকে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। বেদ সম্বন্ধে শুনিতে থাকে যে, ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, কতকগুলি পশুপালক মধ্যএসিয়ায় বাস করিত। তাহাদের কোন জাতিও ছিল না, কেবল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাহারা এইরূপে পঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণকে দেখিয়া, বালকের মত এক এক আনন্দ অনুভব করিয়াছিল ও এ আনন্দবশে কতকগুলি ছন্দময়ী ভাষায় গান করিত—ইহাই হইল বেদ। তোমাদের বেদের অপৌরুষেয়তা ইহারা এক কথায় উড়াইয়া দিল। তোমাদের পৌরাণিক দেবদেবতাই ছিল না। সুতরাং তীর্থস্থান আর কোথা হইতে আসিবে? এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাহার বিষয় যদি এখানে আরম্ভ করা যায়, তবে যাহা লইয়া এ প্রবন্ধ হইয়াছে, তাহা ধামা চাপা পড়িবে ও ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত আরম্ভ হইবে, এজন্য ইহা বন্ধ রাখিলাম। ক্রমশঃ ইহা পরপর বিস্তারিত হইবে। তবে এইটুকুই বলিব যে, পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয়, ইহা আমাদের নিকট অতি পুরাতন কথা।

শ্রুতি ও স্মৃতির নানাস্থানে ইহা বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—

(১) "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যাঞ্চাভীদ্ধাতপসোহধ্যজায়ত"...ইত্যাদি।

(২) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"

(৩) আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ"

(৪) "যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি,
জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যোভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্মেতি।"

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাগুলি শ্রুতি হইতেই শুনান হইল। এইরূপ স্মৃতিও বলিতেছেন

(১) "ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনং বিভুঃ"...ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৩।৫।২০-২৬

(২) "অজোপি সন্নব্যয়াত্মা ভুতানামীশ্বরোপি সন্" ইত্যাদি গীতা।

বেশ ইহাই যদি হইল, তবে তাঁহার আবার নানামূর্ত্তি পরিগ্রহ কেন? ইহার কারণ আছে, যথা,—

নিত্যৈব সা জগন্মুর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥ (চণ্ডী)

বেশ! শাস্ত্রীয় বহু কথা ত শুনা গেল। একবার শুনাগেল তিনি এক ও অদ্বিতীয়; আবার শুনা গেল, তাঁহার উৎপত্তিও হয়। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও ষড়ভাব বর্জ্জিত হইতে পারে না। তবে এ উৎপত্তি আবার কিরূপ? ইহা যদি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়, তবে ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় সংক্ষেপে এ সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিতে হইবে। তিনি বলিলেন,—

"স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি বলবীর্য্য তেজোভি সদা সম্পন্ন স্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোহব্যয়ো ভুতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বভাবোহপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্নিব লক্ষ্যতে স্ব প্রয়োজনাভাবেপি।"

ইহার বঙ্গানুবাদ দিলেই এ সৃষ্টিরহস্য পরিস্ফুট হইবে। অর্থাৎ সেই ভগবান সদা জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বলবীর্য্য ও তেজ সম্পন্ন বলিয়া ত্রিগুণাত্মিক, স্বীয় বৈষ্ণবী মায়া, মূল প্রকৃতিকে বশীভুত করিয়া, নিজে যদি চ অজ, অব্যয় ও ভুতসমুদয়ের ঈশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব, তথাপি উপরোক্ত নিজ মায়ার দ্বারা "দেহবানের ন্যায়" যেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তবে লোকনিবহের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন, ইহাই যেন লক্ষিত হয়।

এখানে আর অধিক তর্ক না উঠাইয়া এই-টুকু-মাত্র বুঝিয়া লওয়া হউক যে, এরূপ ভাবে শ্রীভগবানের লীলা মনুষ্য চক্ষুর গোচরীভূত হয়। এইরূপ সময়ে সময়ে স্থানবিশেষে এই যে লীলা প্রকট হয়, সেই স্থানবিশেষই হইতেছে, এ "তীর্থস্থান" এবং এ তীর্থস্থানে তাঁহার প্রকট সময়ই হইতেছে এই আবির্ভাবের কাল। এই প্রকটতাই হইতেছে Space ও Timeএ পরিচ্ছন্নতা প্রাপ্তি।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

কংগ্রেসের উৎপত্তি—ভারতবর্ষের একটী ঐতিহাসিক ঘটনা।

কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

"অনেকে অবগত নহেন, লর্ড ডাফরিণ যখন ভারতের বড়লাট সাহেব ছিলেন তখন তাঁহারই কল্পনায় কংগ্রেস গঠিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মিষ্টার হিউমের মনে হয়, যদি বৎসর বৎসর ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফল ফলিতে পারে। তিনি সে সভায় রাজনীতিক আলোচনা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার ধারণা ছিল সে সভায় রাজনীতিক আলোচনা হইলে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের রাজনীতিক সমিতিসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। যেবার যে প্রদেশে সভাধিবেশন হইবে, সেবার সে প্রদেশের শাসককে সভাপতি করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, কারণ, তাহাতে সরকারী ও বে-সরকারী সম্প্রদায়ে সমধিক সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে।

"১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করেন। লর্ড ডাফরিন সব শুনিয়া এ বিষয়ে বিশেষ বিবে-

চনার পর মিষ্টার হিউমকে বলেন,—তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে বিশেষ সুফল ফলিবে না। তিনি বলেন বিলাতে যেমন একদল মন্ত্রী হইয়া শাসন কার্য্য পরিচালন করেন, আর একদল প্রতিপক্ষ থাকেন, এ দেশে তেমন নাই। এ দেশের সংবাদ পত্রে দেশের লোকের মত প্রতিফলিত হইলেও, তাহাতে সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা যায় না। আবার তাঁহাদের ও তাঁহাদের অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের মনোভাব ইংরাজরা জানিতে পারেন না। এ অবস্থায় ভারতীয় রাজনীতিকরা যদি বৎসর বৎসর সভায় সমবেত হইয়া শাসনপ্রণালীর ত্রুটী দেখাইয়া দেন ও সংশোধনের উপায় নির্দ্দেশ করেন, তবে শাসক ও শাসিত সকলেরই উপকার হয়। এরূপ সভায় প্রাদেশিক শাসকের পক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ, তাঁহার সম্মুখে সকলে সরল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেও পারেন।

মিষ্টার হিউম লর্ড ডাফরিনের কথার সারবত্তা বুঝেন এবং তিনি যখন তাঁহার প্রস্তাব ও লর্ড ডাফরিনের প্রস্তাব কলিকাতার, বোম্বায়ের, মাদ্রাজের ও অন্যান্য স্থানের রাজনীতিকদের গোচর করেন, তখন তাঁহারা সকলেই লর্ড ডাফরিনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লর্ড ডাফরিন তাঁহার এ দেশে অবস্থান কালে এই প্রস্তাব-সংশ্রবে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিষ্টার হিউম যাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা জানিতেন।"

ভারতবর্ষে রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উক্ত পরামর্শ সভা সম্ভব হইয়াছিল। ইহার জন্য ইংরাজের নিকট আমরা ঋণী।

সামাজিক ব্যাপারের আলোচনায় মতভেদ সম্বন্ধে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে উমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"কেহ কেহ বলেন, সমাজ-সংস্কার না করিলে আমরা রাজনীতিক অধিকার পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব না। ইহার অর্থ কি? এতদুভয়ে সম্বন্ধ কোথায়? দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন, কংগ্রেস বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করিবার জন্য ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসারের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই দুইটি প্রস্তাবের সহিত সমাজ-সংস্কারের কি সম্বন্ধ বিদ্যমান? আমাদের বিধবারা পুনরায় বিবাহ করেন না; আমাদের দুহিতারা অন্যদেশের বালিকাদিগের অপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহিত হয়; আমাদের পত্নী ও দুহিতারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুগৃহে প্রত্যভিবাদন করিতে গমন করেন না, আমাদের কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার্থ Oxford ও Cambridge-এ প্রেরিত হয়েন না

বলিয়া কি আমরা রাজনীতিক অধিকার লাভের অযোগ্য?"

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন—"এ দেশে বৃটিশ শাসন স্থায়ী হইবে, এই মতের ভিত্তির উপর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত, কাজেই যাহাতে এ দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজারূপে ভারতবাসীরা সুখী ও সমৃদ্ধ হয়, সেইভাবে দেশ শাসনে শাসকদিগের সাহায্য করাই শিক্ষিত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।"

বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। প্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় ৭২ জন ছিল। বাঙ্গালা হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতীত "ইণ্ডিয়ান মিরার" সম্পাদক নরেন্দ্র নাথ সেন (পরে রায়বাহাদুর), "নববিভাকর" সম্পাদক গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস, প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। জানকী নাথ ঘোষালও উপস্থিত ছিলেন। উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করেন।

(১) সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাঁহারা দেশের কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন।

(২) পরিচয়ের কালে জাতিগত, ধর্ম্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা যথাসম্ভব দূরীকরণ এবং লর্ড রিপণের শাসনকালে যে জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার পরিপুষ্টি সাধন।

(৩) আবশ্যক সামাজিক ব্যাপারে শিক্ষিত সমাজের মত নির্দ্ধারণ।

(৪) আগামী দ্বাদশ মাসে ভারতীয় রাজনীতিকদিগের কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ।

উক্ত সভা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই সহরে হয়।

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "প্রচার" লিখিয়াছিলেন,—"আমাদিগের কি দুঃখ, আমরা কি চাই, তাহা পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া কেহ বলা চাই, কেন না, পার্লিয়ামেণ্ট ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা কিছু উপকার হইবার সম্ভবনা নাই। পার্লিয়ামেণ্টই প্রকৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা। ফসেট সাহেব দয়া করিয়া ভারতবর্ষের এই উপকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকৃতপক্ষে ঐ ভার কেহ গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে মিষ্টার বানার্জ্জি, উমেশচন্দ্র ও দাদাভাই, ব্রাডল সাহেবকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন।"

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ফিরোজশা মেটা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ কংগ্রেসের সভাপতি। এই অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা ১৮৮৯ জন হয়। এবার মিষ্টার ব্রাড্‌ল কংগ্রেসে যোগ দিতে আসায় ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধির সমাগম হইয়াছিল। এরূপ জনশ্রুতি, অনেক সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারী এই সভায় মিষ্টার ব্রাড্‌লকে দেখিবার জন্য গোপনে সভায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। মিষ্টার ব্রাড্‌ল তখন বিলাতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিও প্রকাশ করিয়াছেন। যথার্থই ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বিলাতে পালামেণ্টের সদস্যগণের মধ্যে তিনি Henry Fawcettএর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পালামেণ্টে ভারত শাসন-সংস্কার-কল্পে আইন পেশ করিবেন বলিয়া যায়েন। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন এবং সরকারের পক্ষে Lord Cross এক আইন আনিয়া তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করেন। লর্ড ক্রশের আইন ভারতবাসীর আশানুরূপ হয় নাই। মিষ্টার ব্রাড্‌ল বাঁচিয়া থাকিলে, বোধ হয় অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার চেষ্টায় শাসন-সংস্কার আরও অগ্রসর হইত। ইহার পর Lord Minto reform হয়। তৎপরে Montague Chemsford reform হয়। তাহাও ভারতবাসীর মনঃপূত হয় নাই। এক্ষণে Simon Commissionএ কি স্বায়ত্ব শাসন পায় ভারতবাসী তজ্জন্য প্রতীক্ষায় আছেন।

উক্ত ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে William Digbyর নাম কংগ্রেসের কাজের কেন্দ্র স্থানীয় ছিল।

এই অধিবেশনে বিলাতে যাইয়া ভারতের কথা ব্যক্ত করিবার ভার W, C. Bonerjee, Mr. George Yule, Mr. Hume, Mr. Adams, Mr. Norton, Mr. Howard, মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেওয়া হয়।

বিলাতে কংগ্রেসের কাজ চালাইবার জন্য ৪৫,০০০৲ টাকা ধার্য্য হয় এবং Sir William Wedderburn, Mr, Caine, Mr. Elis, Mr. Mac-Laren, দাদাভাই নৌরজী ও Mr. Yuleকে লইয়া বিলাতে এক সমিতি গঠিত হয়। ইহাই Congress British Committee. William Digby ইহার সম্পাদক হয়েন।

কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে উমেশচন্দ্র বিলাতে যাইয়া নিজ খরচায় নানাস্থানে অনেক সভায় ভারতকথা বিবৃত করিয়াছিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কার্য্য সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে বিলাতে কংগ্রেসের কোন মুখপত্র ছিল না। এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাতে India পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য "বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য বিলাতে অজ্ঞাত থাকাতেই বিলাতে ভারতবন্ধুর অভাব হইতেছে। বিলাতের লোক ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার জন্য এবং এই অজ্ঞতা দূরহইলে কংগ্রেসের প্রার্থনা সহজ বোধ্য হইবে ও সংগত বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া এই পত্র প্রবর্ত্তিত হইল। India লোকসান দিয়া চালাইতে হইত এবং সে লোকসান ভারত হইতে যোগান হইত। "Tell the beggars to pay up বলিয়া সমাচার Hum সাহেব Cain সাহেব মারফত বলিয়া পাঠান এবং Caine সাহেব ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা Beadon street Congress ঐ সমাচার প্রচার করেন। এই লোকসান উমেশচন্দ্রকে প্রায়ই বহন করিতে হইত। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে উমেশচন্দ্র বলেন "আমাদের কাজের জন্য এই পত্র পরিচালনা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্রের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন হয়। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ (ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল ছিলেন) নাগপুরের অধিবেশনে (১৮৯১) কংগ্রেসকে এলাহাবাদে আহ্বান করিয়াছিলেন। তখনই তাঁহার শরীর অসুস্থ। অসুস্থ শরীরে গুরুশ্রম কাতর অবস্থায় নাগপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার ঠাণ্ডা লাগে। গৃহে ফিরিয়া কর্ম্মবীর শয্যা লইলেন, Pnuemonia রোগে তিনি পরলোক গমন করেন। অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের কাজে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে উমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"এই মঞ্চে দাঁড়াইয়া এই নগরে বক্তৃতা করিবার সময় যখন অযোধ্যানাথের অভাব লক্ষ্য করা যায়, তখন শোকে বিহ্বল না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।" তিনি বলেন, "১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে এলাহাবাদে আসিয়া তিনি অযোধ্যানাথের সঙ্গে কংগ্রেসের কথার আলোচনা করেন। অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটি দেখান এবং কংগ্রেসের দিবস ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলেন। তাহার পর ডিসেম্বর মাসে তিনি পত্র লেখেন, তিনি কংগ্রেসে যোগদিলেন এবং পর বৎসর কংগ্রেসকে এলাহাবাদে আহ্বান করেন।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বেই দাদাভাই নৌরজী বিলাতে পালামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া ছিলেন। তিনি পার্লামেণ্টে প্রথম ভারতবাসী সদস্য

Central Finisbury কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত। ইতিপূর্ব্বে লালমোহন ঘোষ Deptford কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র Waltham slow হইতে নির্ব্বাচিত হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির লোপ পাওয়ায় তিনি উক্ত অভিলাষ ত্যাগ করেন। প্রকাশ যে তাঁহার কৃতকার্য্য হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। Bhownagree নামক পার্শী Conservative পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পটলডাঙ্গার মল্লিক পরিবারে মন্মথ নাথ মল্লিক পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ইনি সুবোধ চন্দ্র মল্লিকের আত্মীয়। ইহাঁদের পরিবারে বিখ্যাত এটর্ণি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বিবাহ করেন।

যাত্রা।

লেখক—শ্রীযুক্ত উমানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।

৩৯। অস্পষ্ট সে সন্ধ্যালোকে সিন্ধুকূলে তটে
অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি হেরিনু সহসা
সংসর্পিত কেশভার অবেণী সংবদ্ধ
কোকনদ পদমুগ্ধ পড়েছে লুটায়ে।

৪০। বিশাল নয়ন দুটি স্থির স্নিগ্ধোজ্জ্বল
চন্দ্রবর্ণ তনুকান্তি নিসর্গ সুন্দর
নিস্পন্দ নীরব মোরা থমকি দাঁড়ানু
নির্নিমেষ চারিচোখে স্থির চেয়ে থাকা।

৪১। গতিহীন স্পন্দহীন কতক্ষণ মোরা
না জানি চাহিয়াছিনু জনহীন তীরে
সহসা ধ্বনিল তব সুধামাখা বাণী
'হে পথিক! হারায়েছ বুঝি পথ তব?'

৪২। লয়হীন মর্ম্মবীণা হে মানসী মোর!
বাজালে সে সুধামাখা কণ্ঠস্বরে তব,

সহসা এ লক্ষ্যতারা জীবন আমার
পাইল খুঁজিয়া এক অর্থ সুগভীর।

৪৩। সংসার সমুদ্রকূলে পথহারা লাগি
জীবনের ধ্রুবতারা শাশ্বতী রমণী
হে নারি! হে মহীয়সি! অভয়দায়িনি!
জাগিছ করুণাময়ি পুরুষের লাগি।

৪৪। জনম করিতে ধন্য পূর্ণ জীবন
যুগে যুগে আবাহন করিয়াছ দেবি!
সম্পদে বিপদে শোকে আলোকে আঁধারে
শান্তি সুখ সৌন্দর্য্যের দেখায়েছ পথ।

৪৫। আভাসে ইঙ্গিতে তুমি ছিলে মোর প্রাণে
মনের গহন বনে তব অভিসার
কতরূপে কতবেশে দেখা দিলে অয়ি!
আজি কি ধরেছ মূর্ত্তি গোপনচারিণি!

৪৬। কল্পনায় ছিলে তুমি মোর সাথে সাথে
কবির স্বপন বুঝি গড়িয়াছে তোরে!
মানস ভুবন রাণি! এলে কি জীবনে?
বাস্তব স্বপন সনে মিলেছে কি আজি?

৪৭। তব লুকোচুরি ছিল আমার জীবনে
কতবার হেরিয়াছি তোমারে চকিতে
বন-রাজি-শ্যাম ঐ দিগন্তে যেথায়
শ্যামলে চুম্বন করে অসীম নীলিমা।

৪৮। ছিন্ন মেঘাবকাশে গলে যাওয়া চাঁদে
দূরবন গন্ধবহ বসন্ত অনিলে
সুমধুর ধ্বনি দৃশ্যে হৃদয় আমার
অকারণ পর্য্যাকুল করিতে কি তুমি?

(ক্রমশঃ)

গুরু দর্শন।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

গুরুদর্শনের মত পুণ্য কর্ম্ম কিছুই নাই, কিন্তু পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে গেলে গুরুকে বিরক্ত করা হয় এবং দর্শন পাইতে অযথা বিলম্ব ঘটলে শিষ্যের প্রাণেও বিশেষ কষ্ট হয়। সেই কারণ, শাস্ত্রে উপদেশ আছে গুরুকে সর্ব্বদা স্মরণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যেখানে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির কারণ উপস্থিত হইয়া মনকে আলোড়িত করে, সেখানে সাবধান ও সংযত হইতে চেষ্টা করা উচিত। গুরুর সমক্ষে বেশী কথাবার্ত্তা বলাও ঠিক নহে, কারণ তাহাতে হয়তো অতর্কিত ভাবে অনেক প্রিয় অপ্রিয় উভয়বিধ কথার প্রসঙ্গ হইতে পারে। জিহ্বাকে যত বেশী সংযত করিবার চেষ্টা করা যাইবে, ততই মঙ্গলজনক। অনেক সময় বিনা কারণে ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মনে অভিমান উপস্থিত হইয়া সাধন পথের বিঘ্ন করে।

আবার সময়ে সময়ে অনেকের মনে বেশী কম ভালবাসা লইয়া চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে গুরুদেব হয়তো সকলকে সমান চক্ষে দেখেন। অথবা যে যেরূপ সাধন পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাকে তদনুযায়ী দেখিয়া থাকেন এ সকল বিষয় লইয়া শিষ্যের কোন বিচার বা তর্কবিতর্ক করা কোন মতেই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত নহে।

সর্ব্বদা মনে স্মরণ রাখা উচিত—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আমরা অনেক সময় অনেক বিষয়ে বিষম ভুল করিয়া থাকি। তজ্জন্য আমাদিগকে অপরাধগ্রস্ত হইতে হয়। ভবপারের কর্ণধার যে গুরু, মানবদেহধারী বলিয়া আমরা নিজ নিজ মাপকাটি লইয়া বিচার করিয়া থাকি। সেইখানেই আমাদের দারুণ ভ্রান্তি। গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট তিনকে এক করিতে না পারিলে যখন আমরা প্রকৃত সাধনপথের পথিক হইতে পারিব না তখন আমাদের পদে পদে সতর্কতা অবলম্বন করিতেই হইবে। গুরু শব্দের অর্থ যাহা সাধারণতঃ আমরা

বুঝি তাহাতে, যাহাতে গুরুত্ব শ্রেষ্ঠত্ব আছে তাহাকেই বুঝিয়া থাকি সাক্ষাৎ জীবন্ত জাগ্রত দেবতা গুরুদেব। সেই গুরু শব্দের ছায়া লইয়া আমরা ব্যবহারিক জগতে গুরুজন শব্দ ব্যবহার করিয়া তদনুযায়ী মর্য্যাদা করিয়া থাকি। অতএব গুরু লইয়া তামাসা সূচক জল্পনা কল্পনা যাহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা ঘোরতর নিরয়গামী হয়—তাঁহাদের ইহকাল পরকাল নাই।

এই গুরুর প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে যেরূপ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা কোন দেশে কোন স্থানে নাই, কিন্তু কালপ্রবাহে নানাকারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সে সকল কারণের উল্লেখ করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তত্রাপি দুই একটী কারণের কথা উল্লেখ করিলেও নিতান্ত অসঙ্গত ও অশোভনীয় হইবে না।

যে গুরুকে আমরা সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি, যে গুরুকে আমরা প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিয়া থাকি, যে গুরুই আমাদের একমাত্র মুক্তির কারণ, সেই পবিত্র আদর্শ গুরু পথকে কতিপয় তথাকথিত গুরু আখ্যাধারী লোভী ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তি ব্যবসা মনে করিয়া অযথা ব্যবহার দ্বারা লোকের মনে দারুণ আঘাত দিয়া গুরুপথ পঙ্কিলতাপূর্ণ করিয়াছে। সেই ব্যবসাদার গুরু সম্প্রদায় শিষ্যের মঙ্গল কামনা বা শিষ্যকে উপদেশ দেওয়া দূরের কথা সদা সর্ব্বদা কেবল স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত।

এতদ্ব্যতীত আর এক সম্প্রদায়ের গুরু আছেন যাঁহারা অসঙ্কোচে শিষ্যের কুলে কালিমা লেপন করিতে দৃক্‌পাত করেন না! অধিকন্তু অনেক সময় স্বীয় কীর্ত্তির কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ শ্লাঘার পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সকল এবং আরও অনেক কারণে গুরুপথকে লঘুতে পরিণত করিয়া জগতের অশেষবিধ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে এবং সেই কারণে লোকের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

গুরুবংশ হইতে মন্ত্র না লইলে বংশ ধ্বংস হইবে এই আশঙ্কায় কতিপয় অশিক্ষিত কদাচার সম্পন্ন গুরুবংশের লোকের নিকট অনেকে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অধঃপতিত হইতেছে, যতদিন না ইহার প্রতিকার হইবে, ততদিন দেশের প্রকৃত মঙ্গল সুদূরপরাহত। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে গুরুকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং গুরুও শিষ্যকে বিশেষভাবে দেখিয়া শুনিয়া বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন। "উভয় পক্ষ উভয়কে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া না লইলেই বিপদ অনিবার্য্য।

এখানে কথা হইতেছে গুরু নির্ণয় করিবার উপায় কি? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উভয়ের ভাব আদান প্রদান করিয়া উভয়ে সন্তুষ্ট হইলে, গুরু শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। নতুবা একটা ঝোঁকের মাথায় খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাকে তাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া অনুতপ্ত হওয়া কোন মতে উচিত ও সমীচীন নহে। সাধকপ্রবর তুলসীদাস তাই বলিয়াছিলেন,—

"গুরু মিলে লাখে লাখ। চেলা নাহি মিলে এক॥"

উপযুক্ত শিষ্য ও উপযুক্ত গুরু এ জগতে বড়ই দুর্ল্লভ। যে গুরু উপযুক্ত শিষ্য পাইয়াছেন, তিনি ধন্য হইয়াছেন। আবার যে শিষ্য ভাগ্যবলে উপযুক্ত গুরু পাইয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে তিনি কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহার বংশ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহার ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ সদ্গতিলাভ করিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, শুক্র সহ দেহ-বিশিষ্ট মনুষ্যই গুরু নহে। গুরু গোবিন্দ কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এমন পরমারাধ্য, পতিতপাবন, অধমতারন, গুরুদেব যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি বহু পুণ্যবান ও ভাগ্যবান, তাঁহার পদরেণু স্পর্শেও লোক ধন্য হইয়া যায়।

সকল বিষয়ের শিক্ষাদাতা গুরু। সকল আদর্শের শ্রেষ্ঠ আদর্শ গুরু। বিপদে সম্পদে, সুখে, দুঃখে, শান্তিতে, অশান্তিতে ছায়ার ন্যায় শিষ্যের সঙ্গে গুরু বিরাজ করেন। গুরু নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া পরার্থে জীবন মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন।

খোঁজ, অনুসন্ধান কর, ভগবানের নিকট প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা কর, তিনি অবশ্যই মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। বাঞ্ছাকল্পতরু তিনি কাহারও বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। যদি এইরূপ গুরুলাভ করিতে পার, একবার দর্শন করিলে হৃদয়ে চিরদিনের জন্য মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া যাইবে, বারম্বার দর্শনের বাসনা থাকিবে না। সকল ক্ষোভ, সকল দুঃখ, সকল অভিমান দূরে পলায়ন করিবে। পূর্ণানন্দ বিরাজ করিতে থাকিবে। মন নির্ম্মল হইবে, প্রাণ শীতল হইবে, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইবে। তখন অহরহ বলিবে "গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।"

নিঃস্বার্থ পরোপকার।

লেখক—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর

(গল্প)

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। শ্রীযুক্ত রসিকলাল চক্রবর্ত্তী আর আমি পূর্ব্ববঙ্গের একটা ইংরাজী স্কুলে মাষ্টারী করিতাম। রসিক বাবু ছিলেন হেড মাষ্টার, আমি ছিলাম থার্ড মাষ্টার। রসিক বাবু ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন। সে সময় এম-এ পাশের মূল্য এখনকার মত এত কমে নাই; তা'হলেও রসিক বাবু তেমন কোন ভাল চাকুরী জোটাতে না পেরে একশ টাকা বেতনে এই মাষ্টারী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ; একটু চেঁচিয়ে কথাও বল্‌তে পারতেন না; অতি ধীর শান্ত, অর্থাৎ যাকে চলতি কথায় 'গো-বেচারা' বলে—রসিক বাবু ঠিক তাই ছিলেন। স্কুলে হেড মাষ্টারী কর্‌তেন বটে, কিন্তু তাঁর অর্দ্ধেক কর্ত্তব্য—স্কুলের শাসন-সংরক্ষণ আমরা চালিয়ে নিতাম; তিনি শুধু পড়াতেন এবং সে পড়ানোতে ছেলেরা এবং তাঁদের অভিভাবকেরা খুব সন্তুষ্ট ছিল, কারণ ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল।

আমি সেই স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক ছিলাম, এ কথা আগেই বলেছি। আমি বেতন পেতাম পঁয়তাল্লিশ টাকা; কিন্তু আমাকে বল্‌তে গেলে, রসিক বাবুর অনেক কাজই করে দিতে হোতো। তিনি তিন ঘণ্টা পড়িয়েই খালাস; আমাকে স্কুলের সমস্ত কাজ কর্‌তে হোতো। এতে আমি কোন আপত্তি কর্‌তাম না, কারণ রসিক বাবুকে আমি তাঁর স্বভাবের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা করিতাম। আমি বলে কেন, স্কুলের ছাত্রগণ ও স্থানীয় ভদ্রলোকেরা রসিক বাবুর বিনয় নম্র ব্যবহার ও লেখাপড়ায় পারদর্শিতার জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

স্কুলের সকল শিক্ষকের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব ছিল,—আমার সঙ্গে একটু বেশী ঘনিষ্টতা হইয়াছিল। তাঁর অনেক কাজ করে দিতাম বলে, এ ঘনিষ্টতা নয়; আমরা দুইজনেই স্কুলের সীমানার মধ্যে পাশাপাশি দুইটা বাড়ি থাক্‌বার জন্য পেয়েছিলাম। তিনিও পরিবার নিয়ে থাক্‌তেন, আমিও তাই। দুই বাড়ীর মেয়েছেলেদের সর্ব্বদাই দেখা হোতো। এই সকল কারণেই রসিক বাবুর সঙ্গে

আমার একটু বেশী মাখামাখি হয়েছিল। আমরা দুইজনেই এক বয়সী ছিলাম। তিনি তাঁর স্ত্রী ও দুইটী মেয়ে নিয়ে বাস করতেন; আমারও তাই! তবে রসিক বাবুর বাড়ী ছিল পশ্চিম বঙ্গে—শ্রীরামপুরে, আমার বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। তা হোলেও তিনি কখনও আমাকে বাঙ্গাল ব'লে মনে কর্‌তেন না—সে রকম প্রকৃতিই তাঁর ছিল না।

রসিক বাবুর আয় ঐ একশ টাকাই মাত্র। আমার কিন্তু উপরি পাওনা ছিল। আমি প্রাতঃকালে বাসায় ব'সে দুটী ছেলেকে পড়াতাম, তারা প্রত্যেকে দশটী করে টাকা দিত। সুতরাং, এই আয়ে সেই সময় আমার বেশ চ'লে যেত। রসিক বাবু হেডমাষ্টার; তিনি ত আর দশ পনের টাকা নিয়ে ছেলে পড়াতে পারেন না; তাতে তাঁর সম্মানের লাঘব হয়; অথচ যা মাইনে পেতেন তাতে তাঁর খরচ কুলিয়ে উঠত না। মাসে একশত টাকায় তখনকার সময়ে ব্যয় নির্ব্বাহ হ'ত না কেন, তাই বল্‌ছি।

রসিক বাবু তাঁর মাস খরচের আগাগোরা হিসাব রাখ্‌তেন, কোন বারে আধটা পয়সা খরচ করিলেও তা জমা খরচের খাতায় লিখে রাখ্‌তেন।

একদিন তাঁর শোবার ঘরে ব'সে টেবিলে যে সব কাগজপত্র, বই ছিল আমি সেগুলি নাড়াচাড়া কর্‌ছি, সেই সময় একখানি খাতা আমার নজরে পড়ল, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—"এখানি কিসের খাতা রসিকবাবু?"

রসিক বাবু বললেন,—"আমার জমাখরচের খাতা।"

আমি বল্‌লাম,—"আপনি জমা-খরচ রাখেন নাকি? আমি ও সব পারিনে, দরকারও মনে হয় না।"

রসিক বাবু বল্‌লেন,—"জমা-খরচের হিসাব সকলেরই রাখা উচিত, হেমেন্দ্র বাবু, ওতে আমাদের মত অল্প আয়ের মানুষের বিশেষ উপকার হয়, খরচপত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সুবিধা হয়। আমি সর্ব্বদাই হিসাবের খাতাখানি পড়ে দেখি। তাতে এইমাত্র হয় যে, অযথা খরচের দিকে দৃষ্টি পড়ে এবং পরে সাবধান হওয়া যায়।"

আমি হেসে বল্‌লাম,—"আমার ও অভ্যাস নেই। যাক্ আপনার হিসাবের খাতাটা দেখে যদি আমিও সাবধান হ'তে পারি। দেখব খাতাখানি খুলে?

রসিক বাবু বল্‌লেন,—"বেশ দেখুন না। ওর মধ্যে ত গোপনীয় কিছু নেই, সুধু তেল লবণের কথা।"

আমি তখন খাতাখানা খুলে একমাসের হিসাব দেখ্‌লাম। একটা খরচ লেখা

দেখে আমার বিশেষ কৌতূহল হোলো; সেই বাবদটী প্রতিমাসেই আছে কি না দেখবার জন্য পর পর পাঁচছয় মাসের হিসাব দেখলাম। দেখলাম প্রতি ইংরাজী মাসের তিনদিনের দিন একটা খরচ লেখা রয়েছে—"নিঃস্বার্থ পরোপকার—৪০৷৷০

আমি একটু আশ্চর্য্য বোধ করে জিজ্ঞাসা করলাম,—"রসিকবাবু, প্রতিমাসে এই 'নিঃস্বার্থ পরোপকার' বাবদে ৪০৷৷০ খরচটা ত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। মাইনে ত পান মোটে একশখানি মুদ্রা; তার থেকে কি করে প্রতিমাসে ৪০৷৷০ দান করেন?"

রসিকবাবু হেসে বললেন,—"তা যে করতে হয়, হেমেন্দ্রবাবু!"

আমি বল্‌লাম,—"আপনার কথাটা ত বুঝতে পারলাম না।"

তিনি বললেন,—"তা হ'লে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হচ্চে! আপনি জানেন যে, আমার একটী কনিষ্ঠ সহোদর আছেন। আমাদের বাপ-মা অনেক দিন আগে মারা গিয়াছেন। সুরেশকে আমিই মানুষ করেছি। সে এখন কলিকাতার মেডিকেল কলেজে পড়ে, তা আপনি জানেন ত?"

আমি বল্‌লাম,—"সে ত আপনার মামার বাড়ীতে থেকেই পড়ে জানি।"

রসিকবাবু বললেন,—"এফ-এ পাশ করা পর্য্যন্ত বালীতে মামার বাড়ী থেকেই কলিকাতায় পড়ত। শ্রীরামপুরে ত কেউ নেই। বড় মামাই সুরেশের পড়ার খরচ দিতেন। তাঁর অবস্থাও ভাল ছিল, বড় চাকুরী কর্‌তেন। সুরেশ যেবার এফ-এ পাশ করল, সেই বারেই বড়মামা মারা গেলেন। সে আজ তিন বছরের কথা। তখন আমি বালীতেই মাষ্টারী কর্‌তাম। মামা মারা যাবার পর থেকেই সুরেশের মেডিকেল কলেজে পড়ার খরচ আমিই দিয়ে আস্‌ছি। সেই খরচটাই আমি ঐ ভাষায় লিখে রাখি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম,—"এমন আশ্চর্য্য কথা ত কখনও শুনি নাই। ছোট ভায়ের পড়ার খরচ দিচ্ছেন, আর সেটা জমা-খরচে লিখছেন 'নিঃস্বার্থ পরোপকার'। রসিকবাবু, আপনার কাছে এমন কথা শুনব, এ আমি মনে করি নি।"

রসিকবাবু বল্‌লেন,—"তবে কি আপনি লেখাতে চান এই কথা যে, আমি ঐ টাকাগুলি মাসে মাসে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দিচ্ছি।"

আমি বল্‌লাম,—"তা যদি লেখেন, তা হ'লেও যা হোক একটা কিছু বোঝা যায়; কিন্তু ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচটা 'নিঃস্বার্থ পরোপকার' বলে লেখাটা

বিশেষ আপত্তিকর।"

রসিকবাবু একটু চুপকরে থেকে বল্‌লেন,—"দেখুন হেমেন্দ্র বাবু, আপনাকে উপদেশ দেবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু এই কথাটা আপনাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে বলি যে, কাহারও কাছে কোন কিছুই প্রত্যাশা রাখবেন না। তাতে নিরাশাজনিত বেদনা পাওয়া আশ্চর্য্য নয়। ছোট ভাইকে লেখাপড়া শিখাচ্ছ। সে কৃতী হয়ে উপার্জ্জন করে আমার কষ্ট দূর কর্‌বে, আমাকে সাহায্য কর্‌বে, এই আশা যদি পোষণ করি, আর তারপর কার্য্যক্ষেত্রে যদি সে আশা ভঙ্গ হয়, তা হলে মনে যে কি কষ্ট হবে, তা একবার ভেবে দেখবেন। তার চাইতে কোন প্রতিদানের আশা না রেখে কাউকে সে ভাই-ই হোক্ আর মামা-ই হোক, কিছু সাহায্য করা কি ভাল নয়? আমি তাই ভেবেই অমন করে লিখে রাখি। বেশত, সুরেশ যখন উপার্জ্জন কর্‌বে, তখন আমাকে সাহায্য করে, বেশ কথা। আর যদি না করে, তাতে আমার ক্ষোভের কোন কারণই থাকবে না, কারণ আমি যে নি:স্বার্থ ভাবেই পরোপকার করে এসেছি, আমি ত ভবিষ্যতে প্রতিদানের আশা রাখছি নে। এটাকি ভাল কথা নয়?"

আমি বল্‌লাম,—"সে আপনি যাই বলুন, কথাটা যে বিশেষ আপত্তিজনক, এ কথা আমি বলবই। সে কথা যাক্, মাসে ৪০ টাকা সুরেশের খরচ, ১৫ টাকা আপনার লাইফ ইনসিওরেন্সের খরচ—এই দুই দিয়ে যে মোটে ৪৫ টাকা থাকে, অর্থাৎ আমার যা বেতন, আপনিও বলতে গেলে তাই পান। আপনারও পোষ্য যে কয়টি, আমারও তাই। আমার যে ৪৫ টাকায় কুলায় না, ছেলে পড়িয়ে যে কুড়িটে টাকা পাই, তারও বেশীর ভাগ খরচ হয়ে যায়; কিছুই ভবিষ্যতের জন্য জমাতে পারিনে। আপনি ঐ ৪৫ টাকায় চালান কি করে?"

রসিকবাবু বললেন,—"জমেনা কিছু। তবে [illegible] লাইফ ইনসিওরেন্সের চাঁদাটা দিলে একেবারে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে, সেটা জম্‌বে। দেখুন আপনি আমার মত জমা খরচ লিখে রাখবেন, তা হলে আপনারও খরচ কমবে, এই কথা আমি বলে দিচ্ছি!"

* *

পনের বছর পরের কথা। আমি দুই তিন বছর মাষ্টারী করবার পর চাকুরী ত্যাগ করে দেশে চলে গিয়েছিলাম। নিজের জোত জমী ছিল, তাই দেখা শুনা আরম্ভ করি! তাতে সুবিধাই হয়েছে। বিশেষ কোন কষ্ট নাই। রসিকবাবুর সংবাদ কিছুদিন পেয়েছিলাম; তিনি ঐ মাষ্টারীতেই ছিলেন। তার পর আর তাঁর কোনও খবর পাইও না, রাখিও না।"

মধ্যে একবার আমার গৃহিণীর ইচ্ছা হোলো যে, তিনি তারকেশ্বর তীর্থ কর্‌তে যাবেন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে কলিকাতার এক বন্ধুর বাড়ীতে এক রাত্রি বাস করে পরদিন তারকেশ্বর যাত্রা করি। আমাদের গাড়ি যখন শ্রীরামপুর ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন দেখি প্লাটফর্ম্মে রসিক বাবু দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে তিনি এসে আমি যে গাড়িতে ছিলাম, সেই গাড়ীতে উঠলেন এবং পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর, তিনি বল্লেন যে, তিনি বর্দ্ধমানে তাঁর ছোট মেয়েকে দেখতে যাচ্ছেন; সেখানে তার বিবাহ হয়েছে। আমার অবস্থার কথা সবই শুনলেম। তারপর তাঁর বর্ত্তমান অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে তিনি বল্‌লেন যে, তিনি শ্রীরামপুর স্কুলেই মাষ্টারী করেন, এখনও সেই আগেকার মত একশ টাকাই পান। তারপর হেসে বললেন,—"হেমেন্দ্রবাবু! অনেক দিনের পূর্ব্বের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই—সেই "নিঃস্বার্থ পরোপকারের" কথা! শুনবেন, সুরেশ এখন পাটনায় ডাক্তারী করে। খুব পশার হয়েছে; সে মাসে দেড় হাজার দুহাজার টাকা পায়। সেখানে ঘরবাড়ী করেছে, মোটর রেখেছে। আমি কিন্তু সেই মাষ্টারই আছি। সুরেশ কোন দিন ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না; আমিও তার প্রত্যাশাও রাখি না। এই যে ছোট মেয়ের বিয়েতে প্রায় দুই হাজার টাকা ধার হয়েছে, সে কথাও তাকে জানাই নাই, কারণ তার উপর ত আমার দাবী নেই, আমি যে নিঃস্বার্থ পরোপকার করেছি। মনেও কোন ক্ষোভ নাই। আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করেছি, প্রতিদানের আশা ত কোন দিনই রাখি নাই। তখন যে বলেছিলেন হেমেন্দ্র বাবু! কথাটা বিশেষ আপত্তিকর, মনে আছেত? আমি কিন্তু, সে কথাও ভাবিনে, মনেও কোন ক্ষোভ নেই।"

গাড়ী তখন সেওড়াফুলি ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছে। আমরা নেমে পড়লাম। রসিক বাবুর সঙ্গে আর অধিক কথা বল্‌বার সময় পেলাম না। কিন্তু সারাটা পথ শুধুই মনে হইতে লাগ্‌ল, রসিক বাবু ঠিকই জমা-খরচে লিখে-ছিলেন—নিঃস্বার্থ পরোপকার।

জীবনকথা

লালগোলার মহারাজ রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় সি, আই, ই, বাহাদুর।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহারাজ বাহাদুরের চরিত্রের বিশেষত্বের কথা।

(১) মহারাজ বাহাদুর বিশেষ স্থির ধীর প্রকৃতির ও পরিণামদর্শী এবং চরিত্রবান্ মহাত্মা।

(২) বিলাসিতা এ পর্য্যন্ত তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই।

(৩) বর্ত্তমানের উদ্যানবিহারী কুবেরসন্তানগণের ন্যায় তিনি বৎসরের মধ্যে এগার মাস ২৯ দিন পল্লীর জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া কলিকাতার বাসা বাটীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রচুর অর্থের অপব্যবহার করেন না।

(৪) তাঁহার আহার বিহার পরিচ্ছদাদি অতীব সাধারণ।

(৫) সাধারণতঃ জমীদার ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের মামলা মোকর্দ্দমায় বিশেষতঃ ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় প্রতিমাসে অসংখ্য অর্থ অযথা ব্যয়িত হইয়া থাকে; সেই কারণে মহারাজ বাহাদুর এ বিষয়ে চিরসাবধান।

(৬) মহারাজ বাহাদুর নিজের বা পরিবারবর্গের সামান্য সামান্য ব্যাধিতে চিকিৎসার্থ অযথা বহু অর্থ ব্যয়ে কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইবার পক্ষপাতী নহেন। কারণ তিনি বিশেষ ধৈর্য্যশীল পুরুষ।

আমাদের মনে হয় মহারাজ বাহাদুরের এই সকল বিষয়ে ও আরও অনেক ব্যাপারে অযথা বাজে খরচ বা অপব্যয় না হওয়ার জন্যই মহারাজ বাহাদুর স্বীয় অর্থ ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্লাঘাবিবর্জ্জিত নিঃস্বার্থ দানের জন্যই আজ লালগোলার যোগেন্দ্র নারায়ণের যশঃ সৌরভ ভারতব্যাপ্ত হইয়াছে। যে স্থান হইতে যে প্রার্থীই আসুন না কেন, তাঁহার প্রার্থনা পূরণের জন্য পর-দুঃখকাতর, করুণ-হৃদয় যোগেন্দ্র নারায়ণ সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য যোগেন্দ্র নারায়ণকে প্রত্যহ বহু অর্থ দান করিতে হয়। দেশের জন্য দানও তাঁহার নিত্যক্রিয়া।

"ধনেশ-ভাণ্ডার সম বৃটীশ ভাণ্ডারে,
লোকে বলে কত অর্থ দিতেছ রাজন্!—
কত কার্য্যে, (সত্য মিথ্যা নাহি জানি আমি)
মহানদী, অর্পিলে বারীশে বারিরাশি.
কিয়দংশ লভে তার বটে নদ নদী,
কোন কোন সরস দীর্ঘিকা; কিন্তু দেব!
ইন্দারার ভাগ্যে কভু কিছু নাহি ঘটে।"

ভিক্ষার্থীর ধনী গৃহে প্রবেশ অনেক সময় আকাশ কুসুমে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ভিক্ষালাভ দূরের কথা, সময়ে সময়ে তিরস্কৃত হইয়া অনেক অসহায় ভিক্ষুককে অনেক স্থলে বাটী ফিরিতে হয়।

দীর্ঘকাল যাবৎ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াও সে অনেক অর্থবানের হৃদয় বিগলিত করিতে পারে না। আবার পক্ষসমর্থনকারী জুটীয়া গেলে নীরবে তাহার সংকল্প সিদ্ধ হইতে দেখা যায়, তাই প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী জনৈক ভিক্ষুক, উপরোদ্ধৃত কবিতা কয়েক পংক্তির দ্বারা কোন রাজসকাশে আবেদন পূর্ব্বক দাতৃবর্গকে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া সফল মনোরথ হইয়াছিলেন।

উক্ত ভিক্ষুকের আবেদন পত্রের কাতরোক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য ও বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শী এবং দাতৃবর্গের শিক্ষনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। আজকাল প্রত্যহ ধনী গৃহে ভিক্ষুকের সংখ্যা যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি হওয়ায় প্রকৃত ভিক্ষুক নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা পাত্রাপাত্র বিচার পূর্ব্বক যথোপযুক্ত দান করিতে কৃতসংকল্প, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া কঠোর নিয়মের অধীনে দান করিতে হয় এবং দানের সম্বন্ধে সেই কঠোর নিয়ম প্রচার করিয়া না রাখিলে বাস্তবিকই তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। সুতরাং দাতৃবর্গের উপর অযথা দোষারোপ করাও যুক্তিযুক্ত নহে।

আমাদের লালগোলার মহারাজ বাহাদুরের দান ভিক্ষার্থী মাত্রেরই উপভোগ্য। তিনি স্বয়ং নিরহঙ্কার এবং বালক, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, নির্ব্বিশেষে সকলেরই সহিত সাধারণ লোকের ন্যায় কথাবার্ত্তা করিয়া থাকেন। তাহার উপর তিনি সদালাপী বলিয়া সকলেই নির্ভয়ে তাঁহার নিকট গমন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ জন্য (সাহেবী ফ্যাসানের) কার্ড প্রেরণের আবশ্যক হয় না। সুতরাং "ইন্দারা" দূরের কথা পাতকুয়া সদৃশ

ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভিক্ষুকেরও মহারাজ দর্শনের অবারিত দ্বার। তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেই ভিক্ষুকের অভিলাষ পূর্ণ হয়।

মহারাজ বাহাদুরের মনুষত্ব ও দেশের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের কথা।

হৃদয়ের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ না হইলে, মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে শিখে না। "ভালবাসা এক মহা যজ্ঞ, এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, দক্ষিণা মান।" মনুষ্যত্ব পূর্ণ হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তিই আপনার দেশকে ভালবাসে; এমন কি, সমস্ত জগৎটাই তাঁহার ভালবাসার পাত্র। সে ভালবাসা কেবলমাত্র কায়া বা বাক্যের ভালবাসা নহে। মনের ভালবাসা, কোমল হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশের অবক্তব্য আকর্ষণ। ইহা জগতের একমাত্র সার পদার্থ, সংসার জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবোপম দ্রব্য, কমলার প্রিয়পদার্থ—অর্থ; সেই অর্থ পরহস্তে প্রদানপূর্ব্বক জগতে ভালবাসা প্রদর্শন। ধনী ব্যক্তির ত কথাই নাই, অর্থহীন ব্যক্তিও এরূপ হৃদয় প্রাপ্ত হইলে বা এরূপ ভালবাসার অধিকারী হইলে, সে ভিক্ষালব্ধ অর্থও পরহিতকর কার্য্যে দান করিয়া সংসারে ভালবাসারূপ মহাযজ্ঞের উদ্যোগ আয়োজনে আত্মনিয়োগ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়। দেব, দ্বিজ ও অতিথিপরায়ণ, মহারাজ যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া সেই ভালবাসারূপ বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানের উদ্যানবিহারী ধনীর সন্তানগণের অনুকরণে বিলাসিতার প্রবল প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া না দিয়া নিজের ত্রিতল রাজপ্রাসাদ, পালঙ্ক-বিসরিত দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা; রাজভোগ্য আহার্য্য ও বসন ভূষণাদির প্রতি তাদৃশ দৃক্‌পাত না করিয়া অধুনা মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কেবলমাত্র দশের ও দেশের সেবায় সর্ব্বদাই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন।

মহারাজ যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় মহোদয় ভারতাকরের নীলকান্ত মণি, বঙ্গীয় নীলাকাশের নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ শশধর, মুর্শিদাবাদ বারিধির অমূল্য রত্ন এবং লালগোলা রাজবংশের রত্নময় মুকুট। ভগবান, বহু সদ্‌গুণের আকর যোগেন্দ্র নারায়ণের ন্যায় মহাত্মাকে লালগোলার রাজবংশে স্থানদান না করিলে এ বংশ কখনই উজ্জ্বল ও গৌরবময় হইতে পারিত না বলিয়া আমাদের মনে হয়। যোগেন্দ্র

লালগোলার বংশাবতংশ যোগেন্দ্র নারায়ণের হৃদয় অতীব কোমল এবং সর্ব্বদাই দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ। দেশে ও বিদেশে চিকিৎসালয় ও বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা, রথ্যানির্ম্মাণ প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মহারাজ বাহাদুর এই দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশের যে কি মহোপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। স্থানে স্থানে পান্থশালা ও রাজপথের পার্শ্বে ও বহু গ্রামের মধ্যভাগে কূপখননাদি ও পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক লোকের জীবনদানে সাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন ও হইতেছেন।

(ক্রমশঃ)

যৌবন।

লেখক—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নাথ রায়।

দুইধারে দুইজনা সায়াহ্ন প্রভাত,
তরুণ স্বপনে মগ্ন সুখদ সুন্দর,
স্থবিরত্ব জীর্ণ দেহ লভিয়া অপর,
দারুণ বেদন-ব্যথা অশ্রু একসাথ!
প্রমত্ত অনল-তপ্ত লালসা-সমীর,
বিষম কটাক্ষ-তীক্ষ্ণ নয়ন নিশ্বাস,
তাণ্ডব নর্ত্তন ঘোর, তীব্র-তীক্ষ্ণ-হাস
প্রলয় হুঙ্কার—নাদ প্রচণ্ড গভীর
মাঝখানে সবান'য়ে খেলে অনুখন;
ভীষণ মধ্যাহ্ন সেই—দুরন্ত যৌবন!!

শ্রী শ্রীচণ্ডী-মঙ্গল বা কালকেতু।

(নাটক।)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর।

ষষ্ঠদৃশ্য—সঞ্জয়কেতুর গৃহ।

পুরোহিত সোমাই ওঝা ও ধর্ম্মকেতু সঞ্জয়কেতুর কন্যা চাক্ষুষ করিতে আসিলেন।

সঞ্জয়। (সোমাই ওঝাকে প্রণাম করিয়া পদধুলি লইলেন এবং ধর্ম্মকেতুকে নমস্কার করিলেন।)

আসুন, আসুন, দেব! আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে ওঝা মশায়ের শ্রীচরণ পেলেম। আসন গ্রহণ করুন। (ধর্ম্মকেতুর প্রতি) কুলপাবন বংশধরের নির্ম্মল বীর মহিমায় আপনি সর্ব্বদাই মহিমান্বিত; দীন আমি আপনার দর্শনে আজ বড়ই কৃতার্থ হলেম। বসুন দাদা!

ধর্ম্মকেতু। যে আশায় আজ তোমার কাছে এসেছি ভায়া, ভগবান শঙ্করের কৃপায় সে আশাটী পূর্ণ হ'লেই পরিশ্রম সার্থক হবে। মেয়েটি কোথায় তাকে নিয়ে এসো দেখি।

(সঞ্জয় ভিতরে গিয়া ফুল্লরাকে আনিলেন।)

সোমাই। অই দেখ দেখি সাক্ষাৎ মেনকার কন্যা গৌরী! এস ত মা! তোমার বাম হাতখানা দেখি।

(ফুল্লরার হাত দেখিয়া সোল্লাসে) হু বহু মিল হু বহু মিল! করে কোষ্ঠিতে এবঞ্চ আমার দৃষ্টিতে হু বহু মিল! হু বহু মিল! এমনটি আর হয় না। চন্দ্রের যেমন রোহিণী দেবী, ইন্দ্রের শচীদেবী, অগ্নির স্বাহা যেমন, তেমনি বীর কালকেতুর এই ভাগ্যবতী মা আমার! রাজাধিরাজ যোটক। সব সেই মঙ্গলময়ী মঙ্গলার ইচ্ছা।

সঞ্জয়। সব কাজই মা আমার জানে। রাঁধাবাড়া, লোকজনকে পরিবেশন ক'রে খাওয়ান, এ সব ত নিত্যকর্ম্ম। তা ছাড়া ওর মায়ের সঙ্গে

হাট বাজার ক'রে এবং মুখেই হিসাব রাখে।

সোমাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমায় আর বল্‌তে হবে না। অনুমানই প্রমাণ। তাহ'লে শুভকর্ম্ম শীঘ্রই সম্পন্ন কর। আগামী ২৭শে ফাল্গুন বসন্ত বাতাসে কি বল? হয়ে যাক্। শুভস্য শীঘ্রম্।

সঞ্জয়। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। (ধর্ম্মকেতুর প্রতি) আপনার মতামত?

ধর্ম্ম। তোমার মতই আমার মত জেনো। সঞ্জয় ভাই! আজ হ'তে আমাকে সখা বলে' আলিঙ্গন দাও। (আলিঙ্গন)

সোমাই। ওহে ওহে, শুধু কি কোলাকুলিই হবে?

সঞ্জয়। ঠাকুর মশায়! কৃপা করে অনুমতি দিন। আপনার জন্য আহারের ব্যবস্থা করি। আর উনি ত আমার দাদা। শাক ভাত যা আছে আহার করবেন। কেমন দাদা? অমত নাই তো?

ধর্ম্ম। কিছু না। এমন শুভকর্ম্মে কেউ কি অমত করে? কিন্তু অত ব্যস্ত হ'য়োনা ভাই। ঠাকুর মশায়ের ব্যবস্থা কর গিয়ে।

সঞ্জয়। ব্যস্ত হবো না? বল কি? ব্যস্ত হবো না? আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। মা ফুল্লরা! বাড়ীর মধ্যে যাও মা, আমাদের জন্য আহারের যোগাড়কর। যাও মা! (ফুল্লরার প্রস্থান।)

মাতাল অবস্থায় কিঙ্করের প্রবেশ।

কিঙ্কর। খুড়ো সঞ্জয়! তুমি ত গাঁয়ের লোকের খুড়ো, আমারও খুড়ো। কাজে কাজেই খুড়ো, হুড়ো মেরোনা। একটা কথা বল্‌ছি। বলি ফুলিত আমার সঙ্গে একরকম বাক্যদত্তা। আবার তাকে অন্য পাত্রে দিচ্ছ কেন? ব্যাধ হ'লে কি তার জাত বিচার নাই? খুড়ো খুব সাবধানে এ কাজ করবে। নৈলে বিপদ ঘট্‌বে জেনো।

(টলিতে লাগিল)

সোমাই। এ কি অনর্থ। বুদ্ধুর ব্যাটা কিঙ্করটা অতিশয় মাতাল হ'য়েছে ওকে কি কিছু বলেছ সঞ্জয়?

সঞ্জয়। কিছু না কিছু না, তবে মেয়ে ছেলের একটা কথার কথা বলেই থাকে, তা হ'লে তাই কি ধরে নিতে হবে? কিঙ্কর! সুস্থ হ'য়ে বাড়ী যাও বাবা। এঁরা সব এয়েছেন, মনে কি করবেন? যাও যাও!

কিঙ্কর। আরে "যাও যাও" ত সবাই বল্‌তে পারে। "আও আও" বলেন ক'জন? খুড়ো! অবিচার ক'রোনা। আমার কি নাই? বলত খুড়ো; দশটি ভেড়া, দশটি ছাগল, বিশটা হাঁস, বিশগণ্ডা শূয়র, আর পঁচিশ গণ্ডা ভঁইস। আর কি চাও তুমি? দশটা মরাই এ ধান বাঁধা আর—কত বল্‌বো?

সোমাই। তবে তোমার বিয়ের ভাবনা কি? আমি ত তোমাদেরই গুরু। যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির তোমারও একটা বিয়ে দিতে পারি, তার জন্য চেষ্টা করি। তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন কিঙ্কর?

কিঙ্কর। হ্যাঁ চেষ্টা করুন; যাতে ফুলির সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে যায়। একটা হরিণ দেব ঠাকুর! আর কি চাই?

সোমাই। আর কিছু না বাবা, তোমার জন্যে ভাল কনে দেখছি। এখন বাড়ী গিয়ে একটু শোও গে।

কিঙ্কর। যাই, কিন্তু একা আর কতদিন শোব বাবা! বালিসের সঙ্গে কথা কইব কত? (গুণ গুণ করিতে করিতে প্রস্থান)

সঞ্জয়। এই পাজিটাকে আমার বড় ভয় হয়! ছেলেরা সব মাঠে যায়; আর ঐ হতভাগা তেঁতুল গাছের ওপর চড়ে গান গায়। ঠাকুর মহাশয়! যত শীঘ্র পারেন শুভ-কার্য্য সমাধা করুন। (নেপথ্যে "বাবা আসুন" শুনিয়া) "যাই মা"! চলুন দাদা, ভিতরে চলুন; সব প্রস্তুত। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

কিঙ্কর ও তাহার পিতা বুদ্ধু আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া।

বুদ্ধু। তোকে তেজ্য পুত্র করবো। লোকের কাছে আমার মুখ দেখান ভার হলো। এমন কুলাঙ্গার হয়ে জন্মেছিস্।

কিঙ্কর। বাবা তুমি না হয় অনেক সম্পত্তিই করেছ, ছেলে তৈরি ত করতে পারনি? আমি মাতাল, চোর, লম্পট, সে ত তোমারই দোষ।

বুদ্ধু। তা ঠিক্। হায় অন্ধ পুত্রস্নেহ! তুমি যখন চলে যাও, তখন কাঁটা খোঁচা মান না, সাপ খোপ দেখ না, জলস্রোতের মত বন্ধনহীন

—বৃষ্টিহান। নৈলে এর এমন দশা কেন? মায়ের বাপের অত্যধিক আদরেই ছেলে নষ্ট!

কিঙ্কর। বাবা! ভাবছো কি? আজ গোটাকতক ধান বেচবো, নৈলে মদের কি হবে? খোঁয়ারির সময় - খেনো মদে সামাবে না কিন্তু।

বুদ্ধু। দূর হ হতভাগা! ব্যাধের ঘরে জন্মেছিস্ বলে কি, লাজের মাথাও খেয়েছিস্। দেখ্‌দেখি কালকেতুর কেমন স্বভাব! যেমন বিদ্যাশিক্ষা, তেমনি অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা, তেমনি নির্ম্মল চরিত্র। একটু মদও খায় না তামাক গাঁজার ত কথাই নাই। কুলপাবন বংশধর, ধর্ম্মকেতু বৃদ্ধ বয়সে এই পুত্ররত্ন লাভ করে, কি শান্তিতেই কাল যাপন কচ্ছে। আর তোমা হেন কুলাঙ্গারের মদের দাম দিতে দিতে আমি প্রাণান্ত।

কিঙ্কর। প্রাণ যে তোমার কবে অন্তে যাবে, তাই ভেবে ভেবে আমিও প্রাণান্ত। আর প্রাণান্ত কৃতান্ত করে কাজ নেই বাবা, ঘরে গিয়ে পান্তা খেয়ে শান্ত হও গে। আমিও আপাততঃ মায়ের বাক্সটার চাবি খুঁজিগে। (কিঙ্করের প্রস্থান।)

বুদ্ধু। (কাতর স্বরে) ওরে কিঙ্কর! চাঁদ আমার! বাক্সটি ভেঙ্গ না বাপ! (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

শিবপূজায় নিরত ধর্ম্মকেতু ও নিদয়া।

ধর্ম্মকেতু সচন্দন পুষ্প বারি লও দেব ত্রিপুরারি!
হর হর, ভবেশ, শঙ্কর!
দূর্ব্বা, গন্ধ, বিল্বপত্র আনি অকিঞ্চন পুত্র
লহ পিতা তুষিয়া কিঙ্কর!
তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, তারা আকাশ বাতাস ধারা
জগন্মাতা তারা তব প্রিয়া।
অগ্নি, ক্ষিতিরূপী তুমি, তোমার চরণে নমি
নিবারহ সংসারের মায়া।

নিদয়া। (করযোড়ে) (আমি) না জানি পূজিতে

না জানি ভজিতে
অধম জাতিতে হর হে !
রেখেছ তামারে
মায়া কূপে ধরে
কৃপায় উদ্ধার কর হে !
মানব হইয়া
তোমা না ভজিয়া,
যেবা করে কালপাত হে
বৃথা অন্ন জল
ঘৃণ্য সে সকল
শিরে তার শূলাঘাত হে !

(পুষ্পাদি লইয়া) এই ফুল ফল, ত্রিপত্র সকল,
নদী জল নিরমল ।
লহ পঞ্চানন, অধম তারণ,
ভক্তি দাও অবিরল ॥ (প্রণাম)

"ধর্ম্মকেতু ধর্ম্মকেতু" বলিতে বলিতে সোমাই ওঝার প্রবেশ ।

ধর্ম্মকেতু । (বাহিরে আসিয়া) আসুন দেব ! তাপসিদ্ধ যোগিগণের ইষ্টদেব দর্শনের ন্যায়, আপনার শ্রীচরণ দর্শন পেলেম ! (প্রণাম) কি আদেশ ?

সোমাই । ধর্ম্মকেতু ! কৃতাহ্নিক হ'য়েছ ? বেশ হ'য়েছে । এখন নান্দিমুখ শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন ক'রে, কালকেতুর মঙ্গলাচরণ কর । নিদয়া ! সন্ধ্যা-রাত্রেই লগ্ন । যেন যথাসময়ে বিবাহটি সুসম্পন্ন হয় ।

(নিদয়ার প্রস্থান)

ধর্ম্মকেতু । সকল কার্য্যভার আপনার উপর ন্যস্ত ক'রে আমি নিশ্চিন্ত । শ্রীমানের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করে আমার সংসারের কর্ম্ম শেষ ! অনুক্ষণ সংসার মায়ায় জড়িত হ'য়ে অনাদি নিধন পঞ্চাননের শ্রীপাদ-পদ্ম স্মরণ কর্ত্তে পারি না । তাই সংকল্প আছে যে, আপনার শ্রীপদে সংসার বন্ধন সমর্পণ করে কাশীধামে যাত্রা কর্‌বো ।

(ক্রমশঃ)

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫ শ বর্ষ } ১৩৩৬ সাল, ফাল্গুন । { ১১শ সংখ্যা ।

শ্রীমন্মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী
ও
তাঁহার উপদেশাবলী

লেখক— শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভাল কথা, ইহাও যেন বুঝা গেল যে, সময় বিশেষে ঐ ঐ স্থানে নানারূপে লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের মাহাত্ম্য কি ? ইহার উত্তর, এই ব্যবহার-জগতের কার্য্যাবলি হইতেই বুঝান যাইবে । একবার চিন্তা করুন, কোন মহাপুরুষ বা প্রতিভাবান্ ব্যক্তি কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে নানা শুভানুষ্ঠানের ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন । এক্ষণে ঐ সমস্ত স্থানে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনরূপ স্মারক চিহ্ন সংস্থাপন অপরে করে কি না ? ইহা নিশ্চয়ই করে । ইহার কারণ, উক্ত প্রতিমূর্ত্ত্যাদি দেখিবার জন্য অনেকে সেই স্থানে আসিবেন এবং আসিয়া এগুলি দেখিবার পর, তাঁহার মহদনুষ্ঠানের কার্য্যাবলী স্মরণ করিবেন । ইহা করিয়া সকলে এক পরমানন্দানুভোগ করিবেন ও নিজেরাও কেহ কেহ ঐরূপ সৎকর্ম্ম করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন । যদি উক্ত মহৎব্যক্তি সম্বন্ধে কোন পরিদর্শকের কিছু জানা না থাকে, তবে স্মারক গুলি দেখিয়া অপরকে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা আরম্ভই করিবেন এবং এরূপ জানিবার সময় সেই পূর্ব্বোক্ত সদনুষ্ঠানের আলাপ পরিচয় হইবে —ইহাই হইল সংপ্রসঙ্গ । আর ইহা যদি ব্যবহার জগতের ঘটনা হয়, তবে স্থান বিশেষে

শ্রীভগবানের প্রকটলীলার যে চিহ্ন আছে, সেই সব তীর্থস্থানে যাইয়া হিন্দুগণ যে এক পরম অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তীর্থ পর্য্যটনের ইহাই এক মহৎ কারণ। অর্থাৎ ভগবৎ প্রসঙ্গ জনিত তাঁহার সৎ-প্রসঙ্গ লাভ।

আবার ইহাও দেখা যাইবে যে ঐ সমুদয় তীর্থস্থানে বহু সাধু ও মহাত্মাগণ সর্ব্বদাই আগমন, অবস্থান ও পরিদর্শন করিতেছেন। সাধুসঙ্গের ফল অতি মহান্, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তীর্থ দর্শনে যাইয়া, এই সব সাধু দর্শন ও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ ও কার্য্যাবলী পরিদর্শন সহজেই লাভ হয়। সুতরাং তাঁহাদের মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়। কারণ,—

"সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভুতা হি সাধবঃ।
কালেন ফলতে তীর্থং সদ্য সাধুসমাগমঃ॥"

আরও দেখা যায় যে, উপরোক্ত তীর্থস্থানগুলিতে সর্ব্বদাই নানারূপ পুণকর্ম্মে অনুষ্ঠান হইতেছে। দেখা যাইবে অতি প্রত্যুস হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক রাত্র পর্য্যন্ত শঙ্খঘন্টা নিনাদ হইতেছে, ধূপ, চন্দন ও কুঙ্কুমাদির সুগন্ধ প্রসারিত হইতেছে, স্তবস্তোত্রাদির পাঠ শ্রুতিগোচর হইতেছে, বিধিপূর্ব্বক দেবদেবীর পূজা হইতেছে, নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্রদিগকে দান কার্য্য চলিতেছে। সুতরাং এইসকল দেখিয়া ও শুনিয়া হৃদয়ে যে এক মহান্ সত্বভাবের উদয় হইবে, তাহার কি কিছু সন্দেহ আছে ?

আরও বিবেচনা করিবে যে, এ তীর্থ পর্য্যটন করিতে যাইলেই, হিন্দুদিগকে নানারূপ শারীরিক ক্লেশ ও নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। শম দম তিতিক্ষাদি সাধন হইতেছে সাধনমার্গের ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং এ তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া উপরোক্ত সাধনগুলি যেন আপনাপনিই তাঁহাদের হইয়া আসিবে। এ বিষয়গুলি পরে আরও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

এক্ষণে যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এ তীর্থস্থানের যে মহিমা বর্ণনা শাস্ত্রকারেরা করিয়াছেন, উহার বাহ্যিক পরিদৃষ্ট স্থানগুলি উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহারা বলেন নাই। উক্ত বর্ণনাগুলি রূপকভাবে দেহতত্ত্বের সাধনারূপেই বলিয়াছেন। তাঁহারা গীতাশাস্ত্রের "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" এই বচনটীকে এই দেহরূপেরই বর্ণনা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। উহাকে কেহ কেহ গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এরূপ দেহতত্ত্বের বিচার ইহা সামান্য জ্ঞানীদের জন্য নহে। ইহা পূর্ণ যোগীগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। অর্থাৎ যে

সমুদয় যোগী স্থূলত্বকে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই অন্তর্মুখে সূক্ষ্মতত্ত্বে অভিনিবেশ করেনবা এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাদের করতলগত হইয়াছে, উহা তাঁহাদের প্রতিই প্রযোজ্য। এ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গ তাঁহারা উঠাইয়া থাকেন, উহা আমাদের শাস্ত্রের অতি পুরাতন কথা। এজন্য দুই চারিটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া ইহা শুনাইতেছি।

"দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরু সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ
... ... পুণ্য তীর্থানি পীঠানি" ইত্যাদি
শিবসংহিতা ২য় পটল ১।২

"শিবশক্তি মমাত্মনো পিণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডমেবচ" ইত্যাদি
জীবন্মুক্তি গীতা ১৮

অর্থাৎ এ দেহ ও মন সংবলিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং বাহ্যদৃশ্য এ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এ উভয়ই এক পদার্থ।

(৪) ঈড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী
... ... শাস্ত্র বিদ্যা কুলাক্ষরা" ইত্যাদি
উত্তর গীতা (১৪-১৫)

(৪) "ঈড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী
ঈড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী"
জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র

(৫) "ব্রহ্মাণ্ড লক্ষণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতং
সাকারাশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি"
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র

(৬) "কাশীক্ষেত্র শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুধ্যানযুক্তঃ প্রয়াগঃ
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ং সকলজনমনোসাক্ষীভূতাত্মা
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যং কিমস্তি॥
(৭) দেহঃ দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেব সদাশিবঃ
ত্যজেদজ্ঞান নির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ।

এ সমুদয় ভাষা অতি সরল, এ জন্য বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা আর দেওয়া হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহা উন্নত তত্ত্বদর্শী যোগীগণেরই ভাষা। ইহাতেও কেহ কেহ প্রশ্ন উঠাইয়া থাকেন যে, পরমজ্ঞানী পরমহংস যতিগণ কেন তীর্থদর্শন করেন ? ইহার উত্তর এই যে, যদিও তাহাদের এইরূপ করিবার কিছুমাত্র আবশ্য-

কতা নাই, তথাপি তাঁহারা অজ্ঞ লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই ঐরূপ করেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, স্থূলভূত হইতে ক্রমে সূক্ষ্মভূতের জ্ঞানলাভ হয়, সাকার উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে নিরাকারের উপলব্ধি হয়। সেইরূপ এ তীর্থস্থানের পরিদর্শনেও অজ্ঞলোকের সমূহ উপকার লাভ হয়। যাহা কিছু সাধন করিতে হইবে, তাহা দেহ লইয়াই করিতে হইবে বা দেহবান্ হইয়াই করিতে হইবে। বীজের উপরের ত্বক অংশ বা খোসাটী ত্যাগ করিয়া কেহ বীজ বপন করিলে তাহা হইতে অঙ্কুরের উদ্গম হয় না। হঠযোগের ও রাজযোগের অনুষ্ঠান, একটী অপরটীকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। সেইরূপ এই তীর্থদর্শন হইতেছে এই দেহ লইয়া। যেমন যোগমার্গে শমদমাদি হঠযোগের সাধন হইতে থাকে, অমনি তাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধনপথে উন্নতিলাভও করেন। আবার এ ভক্তি সাধন হইতেছে, জ্ঞানের কপাটস্বরূপ। এইজন্ত অদ্বৈততত্ত্বের শিরোমণি ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন, —

"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"

বিপক্ষবাদীরা যাঁহারা তর্ক উঠাইয়া থাকেন যে, তীর্থস্থানে যাইলে কেবল যে পুণ্যের উৎকর্ষতা হইবে, ইহা কি করিয়া বলা যাইবে? সেখানে পুণ্যাচারের সহিত নানা পাপাচারও ত দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহার কালিমাও ত অবশ্য লাগিবে। এ সম্বন্ধে এই উত্তর যে, মানুষের প্রবৃত্তি ভাল ও মন্দ এই দুইভাব লইয়া যে গঠিত, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আর প্রবৃত্তির সংস্কার তাহাদের যেরূপ দৃঢ় অর্জ্জিত, তাহা হইতে তাঁহাদের অব্যাহতি লাভ করা অতি দুঃসাধ্য। এই সংস্কার অনুসারে মধুমক্ষিকা বিষাক্ত পদার্থ হইতেও মধু সংগ্রহ করে, আর বিষ-মক্ষিকা, সর্ব্বদাই বিষ্ঠা, পুরীষ ও ক্ষতেরই অনুসন্ধান করে। এই সম্বন্ধে শিবসংহিতার সামান্য একটু বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

"অরিমিত্রমুদাসীনং ত্রিবিধং স্যাদাদিং জগৎ
ব্যবহারেষু নিয়তং দ্রব্য দৃশ্যতে নান্যথা পুনঃ
প্রিয়াপ্রিয়াদি ভেদস্তু বস্তুষু নিয়ত স্ফুটম্
আত্মোপাধি বশাদেবং ভবেৎ পুত্রোহপি নান্যথা"

[শিবসংহিতা ২য় ৬৭-৬৮

অর্থাৎ এ জগৎ প্রপঞ্চ শত্রুমিত্র ও উদাসীন এ ত্রিবিধ ভাবাপন্ন। ব্যবহার দ্বারাই ইহার পার্থক্য হয়। পুত্র ত নিজ আত্মস্বরূপ—কিন্তু এ পুত্রও তাহার ব্যবহার জন্য কখনও মিত্র, কখনও শত্রু ও কখনও উদাসীনের পাত্র হইয়া থাকে।

সুতরাং তীর্থস্থানে যাইয়া, যদি কেহ পাপের কলুষতাই গ্রহণ করেন, সে তাহার প্রকৃতিগত দোষ বলিতে হইবে। তবে বলিয়া রাখি যে, তীর্থস্থানের শক্তিও এত প্রবল যে অতিশয় পাপাচারী ব্যক্তিও এখানে যাইয়া তাঁহাদের চিত্তের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

আর একটী প্রশ্ন আছে যে, গৃহে বসিয়া ও কোন একস্থানে আসন গ্রহণ করিয়া যদি চিত্তের একাগ্রতা বা প্রসন্নতা লাভ করা যায়, তবে অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া তীর্থপর্য্যটনের আবশ্যকতা কি? ইহা অতি উচ্চদরের কথা। এ উচ্চাধিকারী সম্বন্ধে গীতা এরূপ বলিয়াছেন,—

"যস্তাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চমানবঃ
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥"

এজন্য মহাত্মাগণের ব্যবহার বা আচরণ অজ্ঞ বা অল্প জ্ঞানীগণের কোন কালেই অনুকরনীয় নহে।

তীর্থস্থানের যে কি অপার মহিমা, তাহা গীতাশাস্ত্র পাঠেই অবগত হওয়া যায়। যখন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে (কারণ "কুরুক্ষেত্রং বৈ দেববজনং" —শতপথশ্রুতি) কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধার্থে সৈন্যসমাবেশ হইয়াছিল, তখন ধৃতরাষ্ট্রের মনে হইল হয়ত এ ধর্ম্মক্ষেত্রের শক্তিবলে উভয় দলের মধ্যে ধর্ম্মভাব উদিত হইয়া যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইবে। এজন্য গীতার আরম্ভ হইয়াছে "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" এই বলিয়া। আবার দেখাও গেল অর্জ্জুনের হইয়াছিল এক মহান্ ধর্ম্মভাব! তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"গুরূনহত্বা হিং মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপীহলোকে"

এজন্য অস্ত্র ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া রথে বসিয়া পড়িয়াছিলেন! ইহা এক অপূর্ব্ব তীর্থমাহাত্ম্য।

পাঠকগণ! এতক্ষণে এ তীর্থমাহাত্ম্য শেষ করিলাম ও বৈদ্যনাথের মহিমা অবগত করাইলাম। সুতরাং এ স্থানে বসিয়া যে আনন্দানুভব হইতেছে, আশা করি আপনারা এ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উহার কিঞ্চিৎমাত্র স্বাদ আস্বাদন করিবেন।

(ক্রমশঃ)

যাত্রা।

লেখক—শ্রীযুক্ত উমানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।

৪৯। কেন বাতায়ন আঁখি রহিতাম চাহি
কোকিল কুহরি যেত কাননে আমার
শিহরিত হিয়া মোর, আমি অন্য মনে
কতক্ষণ উদাসীন র'তাম দাঁড়ায়ে।

৫০। কোথায় ভাসিয়া যেত হৃদয় আমার
বকুলতলার ঘাটে ভরা ঘট ল'য়ে
কবে কোন বরষার স্নিগ্ধ দিনশেষে
হেরেছি নির্ম্মলা বালা যায় গৃহে ফিরি।

৫১। তাহারি চরণরেখা চিহ্নিত সোপানে
আকুল পরাণ মোর মরিত ঘুরিয়া
সে তুমি কি সেই তুমি আসিছ আজিকে
আমারি জীবন মাঝে বল মোর প্রিয়া!

৫২। কতদিন জ্যোৎস্নায় ভরে যেত ধরা
বাঁশরীর অশরীরী বেদনা মূর্চ্ছনা
গভীর নিশীথে মোরে করিত আকুল।
শুনি প্রতিবাসী গৃহে বিবাহের বাণী।

৫৩। কি অজ্ঞাত বেদনায় ভরিত হৃদয়
যাহার পায়নি দেখা তাহারি বিরহ
কাড়ি নিত আঁখি হ'তে সুখনিদ্রা মোর
না পাওয়ার ব্যাকুলতা ছাইত অন্তর।

৫৪। কি স্বপন রচিতাম আপনার মনে
কি প্রতিমা গড়িতাম মানসী মায়ায়

সে কি চিত্র আঁকিতাম মিশায়ে যতনে
গলায় বিরহানলে মনের মাধুরী।

৫৫। হৃদয়ের সে ব্যথায় ফুটেছে কমল
তা'রে লয়ে গাঁথিয়াছি অনুপম মালা
সার্থক হউক সেই কণ্ঠহার মম
তব কণ্ঠে উপহার প্রদানিব তা'রে!

৫৬। তাই আজি চলিয়াছি অপূর্ব্ব রথেতে
এমনি গিয়াছি দেবি! যুগে যুগে আমি
পূজেছ অতিথিজনে সর্ব্বহৃদি দিয়া
কতবার তব গৃহে মনের মন্দিরে!
আজি আর বার তবে বর মোরে দেবি!
অতিথি তোমার দ্বারে বাদল বাসরে।

অভিমান ও উপবাস।

লেখক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে।

দেশের দারিদ্রতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন,—

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধরশিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

কবি গাহিলেন, কিন্তু কেহই ত জাগিল না। জাগিল না—ইহাই সমস্যা, সমস্যার সমস্যা! যাহারা জাগিয়া ঘুমায়, তাহাদিগকে কেহই জাগাইতে পারে না। কর্ম্মতৎপরতা না থাকিলে নিদ্রাবেশ পুনঃ পুনঃ চক্ষুদ্বয়কে পাষাণবৎ চাপিয়া ধরে, আমাদের আজ সেই দশা আসিয়াছে। দেশে এত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু যে সকল "পরদেশী" বাঙ্গালায় আসিয়া ধনোপার্জ্জনে লক্ষপতি বা ক্রোড়-

পতি হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বদেশে সুখে স্বচ্ছন্দে পুত্রকলত্রাদি লইয়া বাস করিতেছে, তাহারা কাজ কোথায় পায়? বাঙ্গালা দেশ তাহাদের স্বদেশ নহে, কিম্বা এ দেশে তাহাদের আত্মীয় স্বজনও নাই, রাশীকৃত অর্থ লইয়াও তাহারা এ দেশে আসে না। তাহারা অতি দীনভাবেই আসিয়া সম্মুখে যে কোন কাজ পায় তাহাতেই তাহারা আত্মনিয়োগ করে, ফলতঃ তাহারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়। কিছুদিনের পর তাহারা ধনাঢ্য হইয়া কোন কারবার স্থাপন করিলে আমরাই আবার তাহাদের দ্বারস্থ হইয়া সামান্য চাকরীর জন্য উমেদার হই। আমরা সামান্য কাজে যাইতে চাহি না, ইহার মূলে অভিমান অভিমানই বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। ভিক্ষায় আমাদের অভিমান থাকে না, নিকৃষ্ট চাকরীতে আমাদের অভিমান থাকে না! যত অভিমান তথাকথিত ক্ষুদ্র বা নীচ ব্যবসায়ে এবং শারীরিক পরিশ্রমে!

সকলে চাকরীর প্রত্যাশী, কিন্তু অসংখ্য নরনারীর জন্য এত চাকরী কোথায় পাওয়া যাইবে? ধরিয়া লইলাম সকলের ভাগ্যে চাকরী জুটিল, কিন্তু চাকরীতে কি আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে? চাকরীর আয় সামান্য, সুতরাং আমাদিগকে ব্যয় করিতে হয়—চাকরীর আয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অতি সঙ্কীর্ণভাবে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। আধপেটা আহার, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস, রোগে চিকিৎসাভাব, সন্তানসন্ততিদিগকে যথাযোগ্যভাবে সুশিক্ষা দানে অক্ষমতা, তন্নিবন্ধন অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসঙ্গ এইরূপ অনেক বিষয়ে আমরা সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, অধিক কি, ধর্ম্মবিষয়েও দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছি। সহধর্ম্মিণীর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে অর্থ আসে না। ঘরে অর্থ না আসিলে সহধর্ম্মিণী যতই সুন্দরী হউন, যতই লাবণ্যবতী হউন, তাঁহার সে রূপ, সে লাবণ্য মলিন হইয়া যায়।

দুঃখকে তাড়াইতে হইবে, তজ্জন্য যাহা কিছু করণীয়, তৎপ্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। আলস্যকে বিমুখ করিতে হইবে, তবেই সুখের দিন দেখা দিবে। এস্থলে একটী গল্প মনে পড়িল এবং তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন পল্লীগ্রামে এক ব্রাহ্মণ পত্নীসহ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ কোন বিষয়কর্ম্ম করেন না, যজমানরা যাহা কিছু দেয়, তাহাতেই তাঁহাদিগকে অতি সঙ্কীর্ণভাবে দিন যাপন করিতে হয়। ব্রাহ্মণের পৈতৃক যে কিছু জমি জমা ছিল, তাহার কোনও সুবন্দোবস্ত করেন না, তাঁহার কাজের মধ্যে কেবল তামাক সেবন। তবে ব্রাহ্মণ স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে বড় ভাল বাসিতেন, সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণীর

আশে পাশে ঘুরিতেন, ব্রাহ্মণী চুলায় আগুন দিতেন—ব্রাহ্মণ তামাক খাইতে খাইতে ব্রাহ্মণীর পাশে বসিয়া গল্প করিতেন, ব্রাহ্মণী নদী হইতে জল আনিতে যাইতেন, ব্রাহ্মণ তামাক খাইতে খাইতে ব্রাহ্মণীর অনুসরণ করিতেন, ব্রাহ্মণী প্রত্যূষে সম্মার্জ্জনী হস্তে আঙ্গিনা সংমার্জ্জিত করিতেন, ব্রাহ্মণ কখনও উক্ত সম্মার্জ্জনী লইয়া স্বয়ংই লাগিয়া যাইতেন। এইরূপ প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করায় ব্রাহ্মণী একদিন বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"ঠাকুর, সর্ব্বদা আমার পাছে পাছে ঘুরিলে কি হইবে? যাহাতে দু' পয়সা রোজগার করিতে পার, তাহা করিলে সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর হয়।" ব্রাহ্মণীর উপদেশ ব্রাহ্মণের হৃদয় আকর্ষণ করিলে ব্রাহ্মণীকে কহিলেন,—"ব্রাহ্মণী, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার সবই ঠিক, কিন্তু রোজগার যে করিব, কাজ কোথায় পাই? কে আমায় কাজ দিবে?" তদুত্তরে ব্রাহ্মণী কহিলেন,—"কাজ রাস্তায় পড়িয়া আছে, রাস্তায় বেরুলেই কাজ পাওয়া যায়।" পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণ সদর রাস্তায় এক ধনাঢ্য মহাজনের অট্টালিকার সম্মুখে দেখিলেন রাশিকৃত হাঁড়ি, সরা, মালসা প্রভৃতি পড়িয়া আছে। এই সকল দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, ব্রাহ্মণী ত ঠিক কথা বলিয়াছে, এই ত রাস্তায় কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হৃষ্টচিত্তে সেই হাঁড়ির স্তূপ রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে আবার অন্য পার্শ্ব হইতে পূনরায় পূর্ব্ব পার্শ্বে আনিতে আনিতে ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গে দরবিগলিত ধারে ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল। এদিকে সূর্য্যদেব মস্তকোপরি উঠিয়া প্রখর কিরণে মেদিনী উত্তপ্ত করিতেছেন। ব্রাহ্মণ স্বীয় কোঁচার খুঁট দ্বারা মস্তকের ঘর্ম্ম মোচন করিতে করিতে দেখিলেন অদূরে একটী দীর্ঘকায় পুরুষ সুদীর্ঘ দণ্ড হস্তে আসিতেছে। উক্ত পুরুষ যে, সেই অট্টালিকারই দ্বারবান, ব্রাহ্মণের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। দ্বারবান ব্রাহ্মণের গলদেশে সুদীর্ঘ উপবীত দর্শনে বিস্মিত হইল এবং বলিল, ব্রাহ্মণকে তাহার প্রভু আহ্বান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ভীত ও কম্পিত কলেবরে তৎপশ্চাতে চলিলেন। দ্বারবান প্রভুকে গিয়া সংবাদ দিলে তিনি বহির্দ্দেশে আসিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"ঠাকুর, দেখছি আপনি ত ব্রাহ্মণ, সকালে আসিয়া উচ্ছিষ্ট হাঁড়িকুঁড়ি নাড়াচাড়া করিতেছেন কেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"মশাই, আমাকে পল্লীস্থ সকলে নিন্দা করে যে, আমি কোন কাজ করি না, বিশেষতঃ বাড়ীতে গঞ্জনার চোটে অস্থির হইয়া এক কাজ সম্মুখে পাইয়াছি, তাই কাজ করিতেছি।" গৃহস্বামী স্বয়ং ব্যবসায়ী, তাঁহার বিস্তৃত কারবার আছে এবং কারবার হইতে যথেষ্ট আয় হয়, তাহারই ফলে সুরম্য অট্টা-

লিকা, বাগবাগিচা, গাড়ী, ঘোড়া, দাসদাসী চারিদিকে আমলাবর্গ অবস্থান করিতেছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"ঠাকুর, তোমার কে আছেন? ঠাকুর উত্তর করিলেন, আমার স্ত্রী আছে, আর কেহ নাই। অতঃপর বাবু বলিলেন, "যাও ঠাকুর, আমি তোমাকে দশটী টাকা দিলাম। এই টাকায় এক মাসের উপযোগী চাউল ডাউল প্রভৃতি বাড়িতে কিনিয়া দাওগে, আর আট আনা দিলাম এই আট আনার তামাক কিনিয়া গ্রামের ভিতরে গিয়া বেচিয়া আসিবে এবং আমাকে বারো আনা দিবে। ব্রাহ্মণ তাহাতেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বাবুকে সদাশয়তার জন্য ধন্যবাদ করিয়া বাটিতে গিয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণী এতবেলা অবধি ব্রাহ্মণ অনাহারে কোথায় গিয়াছিলেন সেই ভাবনাতেই উৎকণ্ঠীতা হইয়াছিলেন! ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ তাবৎ বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া স্নানাদি করিতে চলিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে ব্রাহ্মণী যাহা রন্ধন করিয়াছিলেন, তদ্বারা ব্রাহ্মণের সেবা করিলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণ যথাসময়ে বাজারে গিয়া আট আনার তামাক ক্রয় করিয়া পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিয়া পল্লীস্থ বাসিন্দাদিগকে খুচরা দরে তামাক বিক্রয় করিয়া যেই বারো আনা হইল অমনি ব্রাহ্মণ সেই বারো আনা এবং বাকী তামাকটুকু লইয়া সেই বাবুর বাড়ী গিয়া বাবুকে সকল কথা নিবেদন করিলেন এবং বিক্রয়লব্ধ বারো আনা এবং অবশিষ্ট তামাক ফেরৎ দিলেন। উক্ত ব্যক্তি "দাস মহাশয়" নামে খ্যাত। দাস মহাশয় ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"আখ, ঠাকুর, কাল আবার এই বার আনার তামাক কিনিয়া অন্য পল্লীতে গিয়া বেচিয়া এবং ষোল আনা করিয়া আনিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কাহাকেও তিলমাত্র ঠকাইবে না। আরও এক কথা শুনিয়া রাখ, যতক্ষণ তোমার তামাক সব বিক্রয় না হয় ততক্ষণ ঘুরিবার চেষ্টা করিবে, যদি নিতান্ত ক্লান্তি বোধ কর, তাহা হইলে রাস্তায় বসিয়া এক পয়সার চিঁড়ে আর আধ পয়সার বাতাসা খাইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিবে। কোথাও বসিয়া গল্প করিয়া দিন কাটাইও না। ব্রাহ্মণ "যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে' বলিতে বলিতে প্রস্থানকালে ভাবিতে লাগিলেন যে, দাস মশাই ত ষোল আনা করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন, অথচ দেড় পয়সার চিঁড়ে বাতাসা খাইতে বলিলেন কিন্তু এই দেড় পয়সা ত ষোল আনা হইতে কমিয়া যাইবে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ পুনরায় ফিরিয়া মহাজন দাস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই দেড় পয়সার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, দাস মহাশয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ক্লান্তি নিবারণের জন্য দেড় পয়সা চিঁড়ে বাতাসা খাইতে

বলিয়াছি, তাহা অপব্যয় নহে, অধিকন্তু অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যয়। যথেষ্ট আহার না পাইলে মানুষের; কেবল মানুষের কেন, সকল জীবেরই শক্তি অল্পাধিক ক্ষয় হয়, এইরূপে শক্তি ক্ষয় পাইলে সহজেইরোগে আক্রান্ত হয়, রোগভোগ হেতু পরমায়ু ক্রমে কমিয়া যায়। এইজন্য যথেষ্ট পরিমাণে আহার প্রয়োজন। কলের-জাহাজ, কলের গাড়ীতে মধ্যে মধ্যে জল ও কয়লা যোগান দিতে হয়, না দিলে আগুন নিবিয়া যায়, তখন আর জাহাজ বা গাড়ী চলে না, কল বন্ধ হইয়া যায়। সেইজন্য মানুষের শক্তি সামর্থ্য বজায় রাখিবার জন্য পানাহারের প্রয়োজন; ইহাতেই শরীরে মধ্যে মধ্যে যে উত্তাপ জন্মে তাহারই বলে মানুষ বলবান জীবজন্তুগণ, চলাফেরা করে, শরীরে শক্তির সঞ্চার হয় সমধিক শ্রম করিতে পারে, শরীর নীরোগ হয়। এখন বুঝলে?" ব্রাহ্মণ আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে হাঁ, বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে তামাক বিক্রয়লব্ধ আয় ক্রমে তিন মাস মধ্যে ২৫৲ টাকায় দাঁড়াইলে দাস মহাশয় ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর এখন তোমার যে মূলধন হইয়াছে—তাহাতে বাজারে একখানি ছোট ঘর লইয়া একখানি দোকান কর। তদনুসারে ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। প্রতিদিন বাজারের মহাজনের নিকট হইতে দোক্তা, চিটেগুড় ও অন্যান্য মসলা ক্রয় করিয়া আনিয়া, একজন ঠিকা লোক সাহায্যে তামাক প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে থাকায় উত্তরোত্তর লাভ বাড়িতে থাকিল। ব্রাহ্মণও তামাকের ব্যাপারে দিন দিন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নিজেই এমন ভাগ্য সৃষ্টি করিলেন যে, সকলে 'ব্রাহ্মণের তামাক' কিনিবার জন্য ব্যগ্র হইল, 'ঠাকুরের তামাক' নাম হাটে বাজারে, ভদ্রমহলে ব্রাহ্মণের তামাক সুবিখ্যাত হইয়া পড়িল, তামাকের কাটতিও অধিক পরিমানে বাড়িয়া গেল। কেবলই যে স্থানীয় বিপণীতে 'ঠাকুরের তামাক' প্রতিষ্ঠা লাভ করিল তাহা নহে, নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে 'ঠাকুরের তামাক' খ্যাতি লাভ করিলে ঠাকুর একজন লোক নিযুক্ত করিয়া উৎসাহ সহকারে তামাকের দোকান চালাইতে লাগিলেন। একদিন ব্রাহ্মণ দোকানে বসিয়া তামাক মাখিতেছেন, এমন সময় একজন তামাক কিনিতে আসিয়া বিস্মিতভাবে বলিল,—"দাদা যে এখানে?" ঠাকুর উত্তরে বলিলেন, "হাঁ, ভাই! এই দোকানখানি করিয়াছি, এই দোকান হইতে যে আয় হয়, তাহাতেই আমার সংসার যাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হয়, আর পুরোহিতগিরি করিয়া আর কিছু হয় না, যজমানরা আর পূর্ব্বেকার মত ঠাকুর দেবতার জন্য তাদৃশ ব্যয় করিতে চাহে না, এখন আর পুরোহিতের কাজে কিছু

হয় না। ভাই উমেশ, তুমি আজ কাল কি কর?" উমেশ বলিল,—"আমি আজ কাল ট্রাম গাড়ীর কণ্ডাক্টারি করি, টাকা ২৫৲ মাহিনা পাই, প্রতি মাসে ২৫৲ টাকা ঘরে আসে না।" ঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন?" "কেন?" ভুলচুকের দরুণ প্রতি মাসেই দুই চারি টাকা মাহিনা কাটা যায়। তা' হলেও গড়ে ১৫৲ আসে, কিন্তু তাহাতে সুশৃঙ্খলে দিনপাত হয় না, কিন্তু দাদা, তোমার তামাকের ব্যবসা, তামাকের দোকানদারী করা ভাল হয় নাই, একে জাতে ব্রাহ্মণ, বৃত্তি-পূজারিগিরি. ভদ্র সমাজে যেতে হয়, সকলে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তুমি ঐ উঞ্ছ-বৃত্তিতে মান ইজ্জত সব খোয়াইলে। ছি, ছি, দোকান উঠাইয়া দিয়া বাপ পিতামহ যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়াছেন, তাই করগে, দোকান তুলে দাও, পয়সা কি সঙ্গে যাবে? তোমার এই উঞ্ছবৃত্তি দেখে, তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমিয়া গেল।" এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে উমেশ চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ এক দিবস মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিতেছেন। ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, তুমি ত দোকান পাতিয়াছ, আমি মুড়ি ভাজিয়া দিলে, তুমি তাহা বিক্রয় করিলে দু'পয়সা আয় বাড়িতে পারে, কি বল?" ব্রাহ্মণ বলিল "তা বেশ।" পরদিন ব্রাহ্মণ পাঁচ সের মুড়ীর চাল, কিছু বালী এবং একখানা খোলা আনিয়া দিলে ব্রাহ্মণী আনন্দ সহকারে প্রতিদিন মুড়ী ভর্জ্জন কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। নিকটে টাট্‌কা গরম মুড়ী পাইয়া প্রতিবেশিগণ প্রতিদিন জলযোগের জন্য মুড়ী ক্রয় করিতে থাকায় মুড়ীর কাট্‌তি বাড়িয়া গেল। মুড়ীর কাট্‌তি বৃদ্ধি হইতে থাকায় ব্রাহ্মণী বেগুনী, ফুলুরী প্রভৃতি তেলেভাজা মুখরোচক জিনিষ ভাজিতে সুরু করিয়া দিলেন। তৎসমুদয় জিনিষের যথেষ্ট কাট্‌তি হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর উভয়ের উপার্জ্জনে শীঘ্রই পুঁজি বাড়িয়া গেল, ফলতঃ ব্রাহ্মণ একখানি মসলার দোকান খুলিলেন। ধনে, হলুদ, জীরেমরিচ, লঙ্কা প্রভৃতি নানাবিধ মসলা আনিয়া দোকানে সজ্জিত করিল, সেই সঙ্গে বিক্রয়ও আরম্ভ করিলেন। দাস মহাশয় বাড়ীতে শুনিলেন যে, ঠাকুর একখানি মসলার দোকান খুলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া দাস মহাশয়ের বড় আনন্দ হইল। তিনি একদিন সকালে ব্রাহ্মণের দোকান দেখিতে আসিয়া আরও আনন্দিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"ঠাকুর, কাজ, কাজ আনিয়া দেয়। তুমি একটা তামাকের সামান্য কাজ আরম্ভ করিয়াছিলে, তাহা হইতে তোমার পুঁজি

বাড়িয়া গেল, তুমি আর একখানি দোকান করিলে। যে কুড়ে তাহার আলস্য ভাল লাগে, সে অলসভাবে দিন কাটাইয়া আরাম পায়। আর আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া মান অভিমান ত্যাগ করিয়া তামাকের পরে মসলার দোকান করিয়াছেন, ইহাতেই আপনার ঘরে মা লক্ষ্মী আসিয়াছেন।"

এইরূপে কিছুদিন গেলে ব্রাহ্মণের হাতে কিছু টাকা সঞ্চিত হইলে ব্রাহ্মণ একখানি পাকা কোঠা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ব্রাহ্মণের একটী পুত্র সন্তান জন্মিল, ক্রমে যথাসময়ে সেই পুত্রের অন্নপ্রাসনদিন সমাগত হইলে, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বলা বাহুল্য উমেশও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। উমেশ তখনও সেই পঁচিশ টাকা বেতনের কণ্ডাক্টারী করিতেছে, কিন্তু দিন দিন তাহার সংসারের অর্থকষ্ট বাড়িতেছে, এমন কি সময় সময় সকলে উপবাসে থাকে। এতদ্বারা বেশ বুঝা যায়, ঠাকুরের অভিমানহীনতা, উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতিই উন্নতির কারণ, আর উমেশের অভিমানাধিক্য হেতু তাহার এই দুর্দ্দশা।

মায়াবির মায়া।

লেখিকা—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ।

একি মায়া খেলা আজি খেলিয়াছ।
কুহকী চিন্তার ঘোরে টানিয়া আনিয়া মোরে
একি নিরুপায়ে বল ফেলিয়াছ।
যে-সুরে গাহিতে চাই কণ্ঠে সে-সুর নাই
বেসুর হ'তেছে বাঁশরী;
এ কি তব খেলা এ কি অবহেলা
মানস কুহকে আবরি'?
দাও হে ফিরায়ে সুর কণ্ঠ'পরে ভরপুর
হে কুহকি হে মায়াবি! কেন হেন
বাঁধিবারে মায়াজাল মেলিয়াছ?

শ্রী শ্রীচণ্ডী-মঙ্গল বা কালকেতু।

(নাটক।)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর।

সোমাই। গৃহস্থের ধর্ম্ম এই ই—ত ?
উপযুক্ত পুত্র করে সঁপিয়ে সংসার
সস্ত্রীক তাপস ধর্ম্ম করিবে আচার।
জীর্ণ বসনের প্রায়, মায়া জাল কাটি হায়
যে পারে সন্ন্যাস ধর্ম্ম করিতে পালন
সেই সুখী ধরাবাসে, শান্তি তার হৃদাকাশে
মুক্ত সেই নীলাম্বরে বিহঙ্গ যেমন !
সাধু ধর্ম্মকেতু ! তোমার সাধু সংকল্প !

(জনৈক বৃদ্ধার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)

বৃদ্ধা। বাবা ধর্ম্ম ! আমার নাতিটি বাবা, বনে শিকার কর্ত্তে গিয়ে বাবা বাঘার মুখে পড়েছে বাবা। তুমি বাবা আমার নাতিটিকে এনে দাও। ওরে বাবারে এতক্ষণ সে বেঁচে নাই রে !

(রোদন করিতে লাগিল)

ধর্ম্ম। সে বনে কার সঙ্গে গিয়েছে ?

বৃদ্ধা। কালুর সঙ্গে শিকার কর্ত্তে গিয়াছে বাবা। ওরে বাবারে এতক্ষণ সে বেঁচে নাইরে।

ধর্ম্ম। কোনও চিন্তা নাই মা ! সে যখন কালকেতুর সঙ্গে গেছে তখন কোনও ভাবনা নাই। সে আপনার প্রাণ থাকিতে কখনই তোমার নাতিকে ফেলে আসবে না। ঐ যে, ঐ যে, সর্ব্বাঙ্গ শোণিতলিপ্ত কালু আমার বিজয়ী বীরের ন্যায় সদর্প পাদ প্রহারে ধরণীকে কম্পিত করে এই দিকেই আসছে। আর কেঁদ না মা ! তোমার নয়নমণি মণিকে আমার কালু বুকে করে আন্‌ছে, ঐই দেখ।

বৃদ্ধা। কৈ কৈ মনিরে ! বাবারে। ভায়রে ! তুই কোথায় আছিস রে!

(কালকেতু মনিকে বক্ষে লইয়া আসিলেন)

বৃদ্ধা। কালু কালু ভায়ারে ! মণিকে আমার কোলে দে রে ! (কোলে লইয়া) একি একি সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত মাখা ! আয় মণিরে ! তোকে আবার ফিরে পাব, সে ভরসা আমার ছিলনা রে। চল চল তোকে আমানি গরম ক'রে খাওয়াইগে। (বৃদ্ধার প্রস্থান)

সোমাই। কালকেতু ! কালকেতু ! "বীর শ্রেষ্ঠ হও" এই আশীর্ব্বাদ। কিরূপে বাঘের মুখ থেকে এই বালকটিকে রক্ষা কর্‌লে বল দেখি ? এ যে আশ্চর্য্য কাণ্ড।

কালকেতু। (পদধূলি লইয়া) ও পদ প্রসাদে দেব ! শার্দ্দুলে না গণি,
শিশুগণ মিলি মোরা গেলাম শিকারে
পশ্চাতে মণিরে হেরি।
"যাও ভাই ফিরি গৃহে" কহিনু তাহারে
কিন্তু মণি বলে,—"তোমরা সকলে যাবে,
বীর হবে বাঘেরে মারিয়া
আমি শুধু ব্যাধকুলে জনম লভিয়া
গৃহে বদ্ধ রব ?
আমিও শিকারে গিয়া
পাব সবা ঠাঁই—অতুল সম্মান।

ধর্ম্ম। সাধু সাধু ! ক্ষুদ্র বালকের বালককালেই উচ্চাশা ! তারপর ?

কালকেতু। তারপর ক্ষুদ্র শিশু হরিণের মত
অগ্রে যায় লাফাইয়া, ধনুঃশর দিয়া
মারে ক্ষুদ্র পাখীগণে।
আপনার মনে করে কত গান
শিকারের গর্ব্বে তার উৎফুল্ল পরাণ।
শেষে উপনীত হৈনু মোরা ধীরে ধীরে
গভীর কানন মাঝে,
সিংহ শার্দ্দুলের দল আছে সেই বনে
ভয়ঙ্কর সিংহ এক আসিল ধাইয়া
পদভরে মেদিনী কাঁপিয়া উঠে।

ভীষণ চপেটাঘাত করিল আমার বুকে
বজ্র মুকুট আমি নিমেষেতে মারিলাম নাকে।
শোনিত নিকলে গল গল,
তবু নাহি হ'ল হীন বল
দশন বিকাশি রোষে করিল দংশন
ধনুকের ব্যাড়ি দিয়া ভাঙ্গিনু দশন।

সোমাই। ধন্য ধন্য কালকেতু! তারপর কি বল?

কালকেতু। ধনুকের প্রহারেতে দুর্ব্বল হইয়া
পলাইল সিংহ। হেরি পশ্চাতে ভীষণ
বাঘ্র এক শিশু লয়ে করে পলায়ন।
আর্ত্তনাদে পূরিল কানন;
মুহূর্ত্তে বিষাক্ত শর জুড়িনু ধনুকে
উঠিলাম উচ্চ বৃক্ষে, লক্ষ্য স্থির করি'
এড়িলাম শর
গতপ্রাণ ব্যাঘ্র পড়ে ভূমির উপর।

ধর্ম্ম। সাধু বৎস! সাধু
বৃদ্ধার নয়নমণি বাঁচালে যেমন
সেই মত রক্ষা তোমা করুন শঙ্কর।

সোমাই। শুনি তব মুখে তব বীরত্ব কাহিনী
শীতল শোণিত মম উঠিছে জ্বলিয়া।
শিশুমাঝে "মণ্ডল" বলিয়া
যেই খ্যাতি লভিয়াছ তুমি
আশীর্ব্বাদে মম
সমস্ত মানব জাতি তোমার বিক্রমে
যশোমাল্যে বিভূষিত করিবে তোমারে।
কিরাত জাতির রত্ন হে কুলপাবন!
দয়া, মায়া, ক্ষমা, মৈত্রী করিয়া ভূষণ
পালিবে সংসার ধর্ম্ম। বীরত্ব হীরকে
ঐ চারি স্বর্ণকণ্ঠি ঝুলিবে গলায়।

কালকেতু। (প্রণাম করিয়া) আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য তব।

(জনৈক বালিকার প্রবেশ)

কে তুমি! কি চাও?

বালিকা। (রোদনস্বরে) বুদ্ধুর ব্যাটা কিঙ্কর।

কালকেতু। বুদ্ধুর ব্যাটা কিঙ্কর কি করেছে?

(বালিকা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল)

আহা হা ভগিনি! কিঙ্কর তোমার সর্ব্বনাশ করেছে। তাই আমার কাছে নালিশ কর্ত্তে এসেছ? একি! বালিকার যে চৈতন্য নাই! পুরোহিত মশায়! আপনারা একে দেখুন। আমি জল আনি।

(প্রস্থান)

সোমাই। কি সর্ব্বনাশ! ধর্ম্মকেতু! দিনে দুপুরে বালিকার সর্ব্বনাশ! কিঙ্করের নিতান্তই স্পর্দ্ধা হয়েছে। এখন এর প্রতিকার কি?

ধর্ম্ম। বালিকা যখন কালুর কাছে নালিশ করেছে, তখন এর প্রতিকার হবেই।

(কালকেতু জল লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং বালিকার চোখে মুখে দিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন)

কালকেতু। ভগিনি! আর কোনো ভয় নাই। আমার পানে তাকাও।

(বালিকা উঠিয়া বসিল। এমন সময় বালিকার বৃদ্ধা মাতা ও পড়শীগণ আসিল)

(বৃদ্ধা বালিকার গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছে)

বৃদ্ধা। ওরে মারে কেনে তোকে সাঁজের বেলায় জল আন্‌তে পাঠানু রে! ওরে মা রে, কে তোর সর্ব্বনাশ কর্‌লে রে। ওগো মাগো, তোকে আর কে বিহা কর্‌বে মারে। (রোদন)

কালকেতু। তুমি স্থির হও মাসীমা, আজই মঙ্গলার বিবাহ দিয়ে দিচ্ছি। চল একে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে চল। অনেক লোকের সাম্‌নে ওর লজ্জা হচ্ছে। চল ভগিনি, ভিতরে চল।

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

জীবনকথা

লালগোলার মহারাজ রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় সি, আই, ই, বাহাদুর।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহারাজ বাহাদুরের দানের কথা।

মহারাজ যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের সমুদায় সদ্দান ও যাবতীয় দানের কথা, পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইলে, একখানি বিরাট গ্রন্থ হইয়া পড়ে, তজ্জন্য এস্থলে আমরা সংক্ষেপে তাঁহার মোটামুটি কতকগুলি দানের বিবর উল্লেখ করিব।

তাঁহার দানের স্তর প্রধানতঃ ৪টী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শিক্ষা. (২) স্বাস্থ্য, (৩) ধর্ম্ম, (৪) বিবিধ বিষয়ে দান। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে তিনি যেরূপ অসাধারণ দান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে অনন্যসাধারণ।

মহারাজ যোগেন্দ্র নারায়ণের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা কাল হইতে, ইহার স্থায়িত্ব; উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য তিনি কত ভাবে যে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দশ হাজার টাকা ব্যয়ে তিনি, পরিষদের দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার ও প্রচারের জন্য তিনি প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঠাগার, পাঁচ হাজার টাকা বায়ে ক্রয় করিয়া, তাহার সমুদয় স্বত্ব পরিষদকে দান করিয়াছেন। পরিষদে "সাহনামা" নামক প্রাচীন গ্রন্থ ও কয়েক সহস্র টাকা ব্যয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে তিনি অনেকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি ও প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দান করিয়াছেন। "সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম" "কী... নানন্দ" প্রভৃতি বহু বাঙ্গলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহার ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক দুঃস্থ মনস্বী কবির গ্রন্থ তাঁহারই ব্যয়ে বাহির হইতেছে। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক।

(২) জঙ্গীপুর হাইস্কুলের ছাত্রাবাস, তাঁহার প্রদত্ত সাত হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৩) বহরমপুরের গ্রান্টহল (Grant Hall & Edward recreation Club) ও রিক্রিয়েসন ক্লাব, বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ও (৪) লালবাগে, তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর নামে "শ্যামাসুন্দরী বার লাইব্রেরী" ছয় হাজার টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে।

(৫) "লালগোলা বালিকা বিদ্যালয়," "জুনিয়ার মাদ্রাসা" ও "ভগবানগোলা" বালিকা বিদ্যালয় ও মাইনর স্কুল, গৃহ নির্ম্মাণ জন্য তিনি অনেক জমী নিষ্কররূপে দান করিয়াছেন।

(৬) স্বর্গীয় পিতৃদেব, রাও মহেশ নারায়ণ রায়ের স্মৃতি চিরস্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত তিনি লালগোলায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে "মহেশ নারায়ণ একাডেমি" স্কুল গৃহ ও তৎসংলগ্ন মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া স্কুল পরিচালনার নিমিত্ত কমিটির হস্তে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ছাত্রদের সুবিধার জন্য, হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রাবাসে, মাসিক ২০০্ টাকা হিসাবে দান করিতেছেন।

(৭) এম্, এন্, একাডমীর নিকট আট হাজার টাকা ব্যয়ে সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া একটী সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সাধারণ পাঠাগারে (Public Libraryতে) প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকার গ্রন্থ রহিয়াছে। উক্ত পাঠাগারের পরিচালন ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্কুল ও লাইব্রেরীর টাকা চ্যারিটেবল এনডাউমেণ্ট ফণ্ড অর্থাৎ (Charitable Endowment fund), সাধারণ দাতব্য সম্পত্তি জমা রাখিয়া তাহারই সুদ হইতে স্কুল ও লাইব্রেরী চলিবে এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পেও তাঁহার দান বড় কম নয়।

(৮) বহরমপুর দাতব্য চিকিৎসালয় প্রধানতঃ মহারাজ যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের ব্যয়েই পরিপুষ্ট। এ যাবৎ তিনি উহার বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসার গৃহ নির্ম্মাণ, রোগীর খরচ, যন্ত্রাদি ক্রয়, চিকিৎসিত হইবার জন্য দুঃস্থ ভদ্র ব্যক্তির অবস্থান গৃহ, (Cottage ward) নির্ম্মাণ প্রভৃতিতে তিনি প্রায় ৫॥০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, চক্ষুচিকিৎসা ১ লক্ষ, মহিলা হাসপাতালের জন্য ১ লক্ষ, বাহিরে রোগীদের ঔষধ দিবার গৃহ নির্ম্মাণ জন্য অর্দ্ধলক্ষ, সাধারণ বিভাগে ১ লক্ষ ইত্যাদি।

(৯) লালগোলায় তাঁহারই নির্ম্মিত গৃহে তাঁহারই ব্যয়ে পরিচালিত একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

(১০) পাবনা ডিস্পেন্সারীর জন্য তিনি কতক ভূমি ও ভগবানগোলার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রস্তুত জন্য জমী ও ১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

(১১) সমগ্র মুর্শীদাবাদ জেলার জলকষ্ট নিবারণ ও উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সরবরাহ জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের হস্তে ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাহার সুদ হইতে প্রতি বৎসর ৪টী ইন্দারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, তিনি নিজ ব্যয়ে লালগোলা ও মুর্শীদাবাদের অন্যান্য স্থানে কত যে ইন্দারা ও পুষ্করিণী খনন ও পঙ্কোদ্ধার করাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

(১২) বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রেরাও তাঁহার দত্ত জলপানে বঞ্চিত নহে

(১৩) মুর্শীদাবাদের বিভিন্ন স্থানের জীর্ণ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত লালগোলার মহারাজ বাহাদুর স্বীয় স্বর্গীয়া পত্নীর নামে গভর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

লালগোলার মহারাজ বাহাদুর চরিত্রবান্ ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তাঁহার ন্যায় কঠোর সংযমশীল ব্যক্তি অতি অল্পই লক্ষিত হয়। বৎসরের কয়েকমাস তিনি ব্রতোপবাসে কাটাইয়া থাকেন। তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য, ৺কাশীধামের ধর্ম্মমণ্ডলী ইঁহাকে "বঙ্গরত্ন" উপাধি দিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় অনাসক্ত ও ত্যাগী পুরুষ জমীদার শ্রেণীতে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও সাম্প্রদায়িকতা ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সকল ধর্ম্মেই ইনি উদারতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। লালগোলায় ইনি অনেকগুলি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সেবা পূজার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

(১৪) ইনি বিভিন্ন স্থানে যে সকল দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ ও জীর্ণ মন্দির নিজ ব্যয়ে সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) কৃষ্ণপুরে ৺তারা মন্দির, ব্যয় ১৬ হাজার টাকা। (২) ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিষ্ণুপুরের (কাশীমবাজার ষ্টেশনের নিকট ৺কালী মন্দির (৩) ২ হাজার টাকা ব্যয়ে গদাইপুরের ৺কালী মন্দির, (৪) এক হাজার টাকা ব্যয়ে কাটোয়ার "বহুলাক্ষী মন্দির", (৫) ব্যাসপুরের শিবমন্দির ও বালুচরের ভগবতী মন্দির, মাড়ায় শিবমন্দির ইত্যাদি।

(১৫) বহরমপুর ও লালবাগে মৃতদেহ সৎকারের সুবিধার জন্য, মহারাজ বাহাদুর ২টি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

(১৬) জঙ্গীপুরের "মেকেঞ্জি পার্ক" "মহেশ নারায়ণ সরাই" ও কান্দীতে "রামেন্দ্র পান্থশালা" তাঁহার পুণ্য স্মৃতি রক্ষার ও লোক হিতৈষণার উজ্জ্বল কীর্ত্তি।

(১৭) সাধারণের গতায়াতের সুবিধার জন্য কয়েকটি বৃহৎ রাস্তাও মহারাজ বাহাদুর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

(১৮) কান্দী মহাকুমার মধ্যে, রণগ্রামের নিকট দ্বারকা নদীর উপর সাঁকো না থাকায়. বর্ত্তমানে নৌকা পারাপারের সময় পথিকগণের বিশেষ কষ্ট হইত, সেই কষ্ট নিবারণ জন্য মহারাজ বাহাদুর উক্ত নদীর উভয় পারে দুইটি স্বতন্ত্র পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া পথিকগণের বিশেষ অসুবিধা (বিশেষতঃ বর্ষায়) দূর করিয়াছেন। উক্ত সৎকার্য্যে মহারাজ বাহাদুর ৩৪০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। একধারে রণগ্রামের ধারে ২০০০৲ টাকা ও পরপারে ১৪০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

লালগোলার মহারাজ বাহাদুর নীরবকর্ম্মী। তিনি কোনরূপ হৈ চৈ না করিয়া স্বগৃহে একটি "টেক্‌নিকাল স্কুল" স্থাপন করিয়াছেন। তথায় বিনা ব্যয়ে ক্বাক বালকেরা চরকার সুতা কাটা, বস্ত্র বয়ন, প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছে। মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং সেই মোটা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১৯১৩ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "কৈসার-ই-হিন্দ" সুবর্ণ পদক প্রদান করেন। সম্প্রতি ইনি সি, আই, ই উপাধিভূষিত হইয়াছেন।

মহারাজ বাহাদুরের হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা আছে। তাঁহার ভবনে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ, কালী ও মদনদেবের নিত্যসেবা প্রকাশিত রহিয়াছে। পর্ব্বাদি উপলক্ষে উক্ত দেব মন্দির সমূহে সমারোহের সহিত পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়া থাকে।

লালগোলার রাজধানীতে মহারাজের ব্যয় ও তত্ত্বাবধানে প্রতিবৎসর মহা-সমারোহে রথযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবং যাত্রা নাচাদি দর্শন জন্য বহুদূর হইতে বহু লোকের সমাগম হয়।

ইনি দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য মহা ধুমধামের সহিত যথা নির্দ্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

সময়ে সময়ে উৎসবাদি উপলক্ষে লালগোলার মহারাজ প্রাসাদে জনভোজনের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। মহারাজ বাহাদুর স্বহস্তে পরিবেশন পূর্ব্বক নিমন্ত্রিত ও সমাগত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইতে অতিশয় ভালবাসেন।

ন্যূনাধিক ১৫।১৬ বৎসর হইল, (রাজকুমারদ্বয়ের বিবাহোপলক্ষে) মহারাজ

বাহাদুর বহু ভদ্রাভদ্র জনগণকে স্বীয় ভবনে ভোজন করাইয়াছিলেন। বঙ্গের যে অঞ্চল যে সকল মিষ্টান্ন বা পকান্ন এবং ফলমূলাদির জন্য প্রসিদ্ধ, মহারাজ বাহাদুর বহু অর্থ ব্যয়ে সেই সকল স্থান হইতে সেই সকল দুষ্প্রাপ্য খাদ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক নিমন্ত্রিত জনমণ্ডলীকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন।

বৎসরের মধ্যে অনেকবার লালগোলার রাজধানীতে কাঙ্গালী বিদায় ও দরিদ্র ভোজন হইয়া থাকে। দরিদ্র দলকে পরিধেয় বস্ত্র কম্বলাদি শীতবস্ত্র প্রদান, মহারাজ বাহাদুরের বাৎসরিক বহু সদনুষ্ঠানের অন্যতম।

আশ্রিত বাৎসল্য মহারাজ চরিত্রের অন্যতম সৎ-গুণ। যে সকল কর্ম্মচারী মহারাজ বাহাদুরের সংসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি মহারাজের অপার করুণা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ব জীবনের সঞ্চিত মহাপুণ্যের ফলে আজ দানবীর হইয়া, মহারাজ যোগেন্দ্র নারায়ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ইহ-জ বনে যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সে সকল তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সোপান, সন্দেহ নাই।

উপসংহার।

লালগোলার মহারাজ বাহাদুরের দুই বিবাহ, কান্দীর অনতিদূরে, ফতেসিংহের অন্যতর অধিপতি, বাঘডাঙ্গা রাজের বাটীতে মহা সমারোহের সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সেই বিবাহ উপলক্ষে একটী গ্রাম্য সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। তাহার কিয়দংশ এখনও ফতেসিংহ পরগনার জেমোকান্দা প্রভৃতি স্থানে লোকের মুখে মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য সঙ্গীতের কিয়দংশ এই :—

"লালগোলা করেছে বাবুর (রাজার ?) মোহন বাগানে।
নাইকো জায়গা তিল পরিমাণ পথের মাঝখানে॥
বোঝাই কান্দী হাতি ঘোড়া পাল্কী গাড়ী যানে।
এমন ধূমের বিয়ে রে ভাই হয় না কোনখানে॥
লালগোলা করেছে বাবুর মোহন বাগানে।"

ভগবানের নির্ব্বন্ধে, কিছুকাল পরেই মহারাজ বাহাদুরের উক্ত সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করায়, তিনি পুনরায় জেমোকান্দীর অদূরে দুর্গাপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে মহারাণী মুনীন্দ্র মোহিনীর পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে হেমেন্দ্র নারায়ণ ও সত্যেন্দ্র নারায়ণ নামে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন।

কয়েক বৎসর গত হইল পুণ্যশীলা সতীসাধ্বী মুনীন্দ্র মোহিনী, হিন্দুরমণীর চির-কাম্য পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক, পুণ্যধাম, স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল, তদীয়া কন্যাও তিনটী সৎপুত্র রাখিয়া মাতৃ পন্থার অনুসরন করিয়াছেন। কুমারদ্বয় বিশেষ সৎস্বভাবসম্পন্ন ও বিনয়ী।

যে করুনাময় বিশ্ববিধাতার করুনায় মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সমাকীর্ণ জগতের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতেছি; যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিকনার সমবায়ে সুবিশাল মহাসমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার কৃপায় অন্ধের চক্ষুতেও নির্ম্মল দৃষ্টিশক্তি প্রকটিত হইতে পারে। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি গ্রহনিচয় যাঁহার নিয়মে প্রত্যহ যথাবিধানে জীবলোচনের গোচরীভূত হইতেছে, সেই অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন পরম কারুনিক ভগবানের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই আমাদের যোগেন্দ্র নারায়নের মস্তকে বর্ষিত হৌক। সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা, বিশ্বনিয়ন্তার পরমাশীর্ব্বাদে মহারাজ বাহাদুর পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাদি সহ পরম সুখে ও শান্তিতে নীরোগ দেহে অমরত্ব লাভ করিয়া দশের ও দেশের হিতসাধন পূর্ব্বক, স্বীয় পুণ্যময় ও ধর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করুন, ইহাই আমাদের জগদীশ্বর সমীপে সর্ব্বদাই প্রার্থনা। হিমগিরি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার যে যশঃ-গৌরব সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহা সমগ্র পৃথিবীতে স্থান লাভ করুক এবং সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে মহারাজের জয় হৌক।

শোকগীতি।

লেখিকা—শ্রীমতী সরসীবালা রায়।

(খাম্বাজ—একতালা)

চির অজানার দেশে
চলে গেছ সখা,
লভিতে চির বিরাম।
করেছ প্রয়াণ,
আসিবে না আর
জুড়াতে আমার প্রাণ।

কল্পশেষে যেথা
যায় রে পথিক
আসে না আর সে ফিরে,
ওগো কি মধুর স্থান,
সেথা নাহি অভিমান।
এসো না সখা হে !
এসো না গো ফিরে।
নদী গিরি বন, গহন কানন
যেথায় ফিরাই আঁখি,
তব রূপরাশি, সেই মধু-ভাষা
ভেসে যে বেড়ায়, ফিরিতে না পারি।
করেছ প্রয়াণ,
এ মহাপ্রস্থান—
সকলি তোমার হয়েছে নির্ব্বান।

———○———

অশান্ত জীবন।

লেখিকা—শ্রীমতী সরসীবালা রায়।

কে গায় ঐ ?—কে গায় মধুর স্বরে ?—নক্ষত্রশোভিত আকাশমণ্ডলে চাঁদ হসে। ফুলদল কম্পিত কণ্ঠে স্বায় প্রনয়গীতি পান করে। শস্য-শ্যামল-ধরনী কাহার মহিমা গায় ? চারিদিকে হাসি. চারিদিদে আনন্দেরধারা ! রাজপথে পথিক চলিয়াছে সে গায়, তাহার মুখে আনন্দের হাসি সে হাসি তাহাকেই প্রলুব্ধ করে। সে হাসে সে গায়. সে নাচে। কৈ দুঃখ ত' তাহার হৃদয় অলোড়িত করে না। সকলই আনন্দময়—প্রকৃতি সুষমা-মণ্ডিত। ঐ চন্দ্র বহু প্রাচীন, অথচ চির নবীন, চিরশান্ত, চির স্নিগ্ধ, চির মধুর। তাহার স্নিগ্ধ কিরন ধরনীবক্ষে বিকীর্ণ করে—সেও হাসে, সেও গায়। সেত' আমার মত কাঁদে না। কুসুমিত কাননে কাননে কাহার হাসি কাহার গীতি মুগ্ধ করে মানব হৃদয় ?—কাহার স্মৃতি

থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠে তাহার মধুর হিল্লোলে—কে বলে ওগো আমি চির পুরাতন, তবু চির নবীন—চির মধুময়—তবু চির তীব্র চির শান্ত আমার হৃদয়ে। তটীনার তারে কাহার মধুর হাসি সমীরের তালে নাচিয়া বলে, কেবল সুষমা মণ্ডিত সে রূপরাশি—সকলই মধুর। তটিনী গাহিয়া বলে, ওগো সুখ হেথা নিত্য বিরাজে, দুখ নাহি আসে আমার তীরে। চন্দ্রকিরণ নাচে আমার বক্ষে, তারাদল শোভে আমার হৃদয়ে [illegible] হাস্যময়ী—স্নিগ্ধ সুষমা মণ্ডিত। তবে দুঃখ কেন আমার হৃদয়ে ?—[illegible] হারাইয়াছে আসিবে না আর, তাহা কভু পাইব না, তবে কেন কাঁদি হয়ে দিশেহারা। ওগো প্রভু ! দেও স্থান চরণে তোমার, মুছে ফেল মোর যত জ্বালা. হৃদয়ে উঠুক ভাসি মধুর আলোক।

———

দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

দৃশ্যতে জ্ঞায়তে অনেন এই করণ ব্যুৎপত্তি দ্বারা জ্ঞানোপায় শাস্ত্রই দর্শন পদের প্রতিপাদ্য। ঐ দর্শনশাস্ত্র নাস্তিক-বৌদ্ধ-জৈন-আস্তিকাদি ভেদে নানা-প্রকার, তন্মধ্যে আস্তিকদর্শন, ছয় প্রকার,—গৌতম-প্রণীত ন্যায়দর্শন, কণাদ-প্রণীত বৈশেষিকদর্শন, কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলি-প্রণীত যোগদর্শন জৈমিনি-প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা, ব্যাস-প্রণীত বেদান্তদর্শন। যেরূপ একজন বুদ্ধ উপদেশক হইলেও ছাত্রগণের বুদ্ধিবৈচিত্র্যনিবন্ধন স্ব স্ব বুদ্ধ্যনুসারি-পদার্থ-কল্পনা দ্বারা যোগাচার-মাধ্যমিক-বৈভাষিক-সৌত্রান্তিক-ভেদে নানাপ্রকারে উপনীত হইয়াছে, সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্র একজন বেদব্যাস-প্রণীত হইলেও বিদ্বদ্‌গণের দ্বৈতা দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-শুদ্ধাদ্বৈত-মতভেদে নানাপ্রকারে উপনীত হইয়াছে।

ব্যাসসূত্রের শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেক ব্যাখ্যাতা-কোনও ব্যাখ্যাতা অদ্বৈত বাদ অবলম্বন করিয়া, কোনও ব্যাখ্যাতা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তিনি বলেন, শাখাপ্রশাখাদিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃক্ষকে দেখিলে শাখাপ্রশাখা হইতে বৃক্ষ ভিন্ন বলিয়া অনুভূত হইয়াথাকে, কিন্তু শাখাপ্রশাখাদি হইতে অবিচ্ছিন্ন

ভাবে যখন বৃক্ষকে দেখিবে তখন বৃক্ষ অদ্বৈত ভাব ধারণ করিবে; তখন বৃক্ষ ভিন্নরূপে শাখাপ্রশাখাদি দ্রষ্টার উপলব্ধির বিষয় হইবে না। সেইরূপ শাখাপ্রশাখাদি স্থানীয় জীবগণকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যখন দ্রষ্টা দেখিবেন তখন ব্রহ্ম দ্বৈত ভাবেই উপনীত হইবে, কিন্তু যখন জীব হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি হইবে তখন ব্রহ্ম অদ্বৈত ভাবে উপনীত হইবে, ইহাই বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ। রামানুজ এই পক্ষকেই অবলম্বন করিয়া ব্যাস-সূত্রের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাস-সূত্রের সর্ব্বতোমুখী বৃত্তি, যিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহার সেই পক্ষই সূত্র হইতে পরিস্ফুর্ত্ত হইয়াছে। 'চারুঃ আপাততো মনোরঞ্জনকরঃ বাক্যে বাক্যং যস্য' ইহাই চার্ব্বাক পদের ব্যুৎপত্তি। যেরূপ ব্যুৎপত্তি কার্য্যেও তাহাই দেখা যায়, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিব" এই চার্ব্বাকের উপদেশ, পরিশোধ কর বা না কর ঋণ করিয়া ঘৃত ভক্ষণ কর। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষমাত্রপ্রমাণবাদী, অনুমানাদি প্রমান স্বীকার করেন নাই, যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না সেই বস্তু নাই ইহাই চার্ব্বাকের মত। সুতরাং অদৃষ্টের প্রত্যক্ষ হয় নাই অদৃষ্ট নাই, ঈশ্বরের ও লোকান্তরস্বর্গাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় উহাও নাই, অতএব পরলোকানঙ্গীকর্ত্তৃ চার্ব্বাক নাস্তিকপদ প্রতিপাদ্য। তাঁহার দর্শন নাস্তিক দর্শন পদে অভিহিত। ঈশ্বর না মানিলেই নাস্তিক হয় না, পরলোক না মানিলেই নাস্তিক হয়, এইজন্যই মীমাংসক-বৌদ্ধ-দিগম্বর-কপিল, ইঁহারা ঈশ্বর না মানিলেও পরলোক মানেন বলিয়া নাস্তিক পদে অভিহিত নহেন। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষমাত্রপ্রমাণবাদী, অনুমানাদির প্রমাণত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই।

প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষমাত্রপ্রমাণবাদী কণাদ ও বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়বাদী। কপিল উক্ত প্রমাণদ্বয় ও শব্দ এই প্রমাণত্রয়বাদী, ন্যায় প্রণেতা গৌতম উক্ত প্রমাণত্রয় ও উপমান এই প্রমাণ চতুষ্টয়বাদী। এই গৌতম মতানুবর্ত্তী হইয়া গঙ্গেশোপাধ্যায় পরিচ্ছেদ-চতুষ্টয়াত্মক তত্ত্বচিন্তামণি প্রণয়ন করিয়াছেন, প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুমান পরিচ্ছেদ, তৃতীয় উপমান পরিচ্ছেদ, চতুর্থ শব্দ পরিচ্ছেদ। রঘুনাথ শিরোমণি তত্ত্বচিন্তামণির অন্তর্গত প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যাচ্ছলে অভিনব ন্যায়শাস্ত্রের অবতারণ করিয়াছেন, ইহা রঘুনাথ শিরোমণির বাক্যদ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাঁহার বাক্য এই :—

বিদুষাং নিবহৈরিহৈকমত্যাদ্ যদদুষ্টং নিরটঙ্কি যচ্চ দুষ্টং।
ময়ি জল্পতি কল্পনাবিনাথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব ॥"

পূর্ব্বে অনেক বিদ্বান্ একমত হইয়া যে সকল পদার্থ অদৃষ্ট বলিয়া এবং যে সকল পদার্থ দৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, রঘুনাথের সময় তাহার বৈপরীত্য ঘটীয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা অদৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাই দৃষ্ট, এবং পূর্ব্বে যাহা দৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাই অদৃষ্ট।

মীমাংসক বিশেষ প্রভাকর প্রাগুক্ত প্রমাণ চতুষ্টয় ও অর্থাপত্তি এই প্রমাণ পঞ্চকবাদী মীমাংসক বিশেষ ভট্ট ও বেদান্ত মতাবলম্বিগণ প্রাগুক্ত পঞ্চ ওঅনুপলব্ধি এই প্রমাণষট্‌কবাদী, পৌরাণিকগণ প্রাগুক্ত ষড়বিধ ও সম্ভব এবং ঐতিহ্য এই প্রমাণাষ্টকবাদী। অনুমান প্রামাণ্যানঙ্গীকর্ত্তৃ চার্ব্বাকের মত যে সমীচীন নহে ইহা বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে সংক্ষেপে দেখাইয়াছেন, সেই সংক্ষেপ বাক্যের মর্ম্মার্থ এই। "যদি কোন অধ্যাপক কোনও শিষ্যের প্রতি উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উপদেশ দেবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে, শিষ্যের সে বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় অথবা মিথ্যা জ্ঞান আছে কি না। ইহা না জানিয়া উপদেশ দিলে সেই উপদেশ বিফল হইবে, পুরুষান্তরগত অজ্ঞানাদি প্রত্যক্ষদ্বারা জানিবার সামর্থ অর্ব্বাগ্‌দর্শিদিগের নাই; অতএব শিষ্যের অজ্ঞানাদি শিষ্যের চেষ্টা বিশেষ দ্বারাই হউক বা বাক্য বিশেষ দ্বারাই হউক উপদেশকের একমাত্র অনুমাতব্য। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও চার্ব্বাক অনুমান প্রমাণ মানিতে বাধ্য। ইহা দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চার্ব্বাকের উপদেশগুলি আপাততঃ রমণীয় হইলেও পরিণামে উহার উপাদেয়তা নাই। বৌদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ স্বীকার করিলেও ঐ সর্ব্বজ্ঞ ক্ষণিক, উহার স্থায়িত্ব নাই; সুতরাং বৌদ্ধও এক প্রকার ঈশ্বরে বিপ্রতিপন্ন। ঐ বৌদ্ধ মাধ্যমিক-যোগাচার-সৌত্রান্তিক-বৈভাষিক এই চারি ভাগে বিভক্ত। মাধ্যমিক মতে সকল বস্তুই শূন্য অর্থাৎ অলীক, যোগাচার মতে বিজ্ঞানই বস্তু তদ্ব্যতিরিক্তের সত্তা নাই, সৌত্রান্তিক মতে অনুমিতির গোচর যে সকল বিষয় তাহারই অস্তিত্ব, তদ্ব্যতিরিক্তের অস্তিত্ব নাই। বৈভাষিক মতে প্রত্যক্ষ বিষয় বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকরণীয়, অন্যথা অনুমান হইবার উপায় নাই, 'পর্ব্বতো অগ্নিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমানে প্রত্যক্ষ স্থল মহানসই দৃষ্টান্তরূপে উপাদেয় হইয়া থাকে। সকল বস্তুই ক্ষণিক। ইহা "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ" এই অনুমানসিদ্ধ। যে বস্তু ভাব সে বস্তুই ক্ষণিক, যেরূপ জলধরপটল। জলধরপটল প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলেও "সোঽয়ং জলধরঃ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয়। সেইরূপ ঘটাদি বস্তু প্রতিক্ষনে ভিন্ন হইলেও "সোঽয়ং ঘটঃ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয়, তত্ত্বতঃ সকল বস্তুই প্রতিক্ষনে ভিন্ন। বৌদ্ধমতে ভাবনা

চতুষ্টয়ই পরম নির্ব্বানের উপায়, ভাবনা চতুষ্টয় এইরূপ "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং, সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং, সর্ব্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং, সর্ব্বং শূন্যং শূন্যং।" দ্বিতীয় ভাবনা 'সর্ব্বং দুঃখং' ইহার অর্থ 'সর্ব্বং দুঃখ জনকং'। তৃতীয় ভাবনা 'সর্ব্বং স্বলক্ষনং সর্ব্বং দুঃখ স্বরূপং স্বমেব দুঃখমেব লক্ষণং স্বরূপং যস্য ইতি ব্যুৎপত্তি সিদ্ধং'। সকলেই আত্মার স্থিরত্ব মনে করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সকলেই মনে করে যে আমি এক্ষণে আছি পরেও সেই আমি থাকিয়া সকল কার্য্যের ফল ভোগ করিব। যদি মনে করে যে আমি এক্ষণে আছি পরক্ষণে সে আমি থাকিব না, তাহা হইলে পরের জন্য দুঃখ্যসাধকার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত হইবে না, এইরূপে প্রবৃত্তির অপায় কর্ম্মাপায় কর্ম্মাপায়ে জন্মাপায় তদপায়ে দুঃখাপায় দুঃখাপায়ে জীবের পরম নির্ব্বান লাভ হইয়া থাকে ইহা বৌদ্ধাধিকারে দীধিতিকারের সন্দর্ভ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। সন্দর্ভ এই "যদি পুনরমী কিমপি নাহং নাহমাস্পদমস্তি বস্তুস্থিরং নিশ্চিন্বপি ক্ষণভঙ্গুরমলীকং বেত্যাকলায়েরন্ ন কিঞ্চিদপি কাময়েরন্' ইত্যাদি। ইহাই সংক্ষিপ্ত বৌদ্ধ মত, বাচস্পতি মহাশয় এই মতের পক্ষপাতী নহেন, তিনি বলেন বীজ নাশের পর যখন অঙ্কুর উৎপত্তি দৃষ্ট হইতেছে তখন বীজ নাশই অঙ্কুর উৎপত্তির প্রতি কারণ বলিয়া বৌদ্ধকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অন্যান্য দার্শনিক মতে বীজাবয়বই অঙ্কুরের প্রতি কারণ বীজ নাশকালেও বীজাবয়বের সত্তা তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন, "যদ্দ্রব্যং যদ্দ্রব্যধ্বংসজন্যং তৎ তদুপাদানোপাদেয়ং যথা মহাপটধ্বংসজন্যঃ খণ্ডপটঃ মহাপটোপাদানতন্তুপাদেয়ঃ।" বৌদ্ধগণ ইহা বলিতে পারেন না, যেহেতু বীজ নাশকালে বীজাবয়বেরও নাশ তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য, তাহা না করিলে ক্ষণিকত্ববাদ ঐ স্থানেই ব্যভিচারিত হইবে, বীজকালে তাহার অবয়বের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য, আবার বীজনাশ কালেও যদি অবয়বের সত্তা থাকে তাহা হইলে বীজাবয়বেই ক্ষণিকত্ববাদ ব্যভিচারিত হইবে। যদি অভাব কারণ হয় তাহা হইলে অভাব সর্ব্বত্র সুলভ সর্ব্বত্র ভাব কার্য্যের উৎপত্তি অনিবার্য্য হইবে। "একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন তু বস্তু সৎ" এই বেদান্ত পক্ষও বাচস্পতিমিশ্র মতে সমীচীন নহে, বিবর্ত্তবাদী 'রঙ্গে রজতত্ব জ্ঞান মিথ্যা' এই দৃষ্টান্তে ব্রহ্মেতে প্রপঞ্চের জ্ঞানও মিথ্যা, এই দৃষ্টান্ত দ্রাষ্টান্তিক সমান নহে, রঙ্গে রজতত্ব জ্ঞানমূলক রজতানয়নে যে প্রবৃত্তি হয় উহার বৈফল্য দেখিয়া রঙ্গে রজতত্বের বাধ নিশ্চয় হয়; বাধ নিশ্চয়ের উত্তর কালে রঙ্গের রজতত্ব জ্ঞানের মিথ্যাত্ব স্থিরীকৃত হয়; ব্রহ্মেতে প্রপঞ্চ জ্ঞানের উত্তর কালে যখন বাধাদির প্রতি সন্ধান হয় না তখন প্রপঞ্চ জ্ঞানত্বাবচ্ছেদে

মিথ্যাত কল্পনা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বলেন যে, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই অদ্বৈত শ্রুতিই সর্ব্বত্র বাধিকা তাহাও বলা যায় না, যেহেতু ঐ শ্রুতিকে কপিল জাতিপর বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ অদ্বৈতশ্রুত সজাতীয় বহুজীবপর, দ্বৈতনিষেধপর নহে। এবং অদ্বৈতশ্রুতির অন্য তাৎপর্য্যও বর্ণিত হইয়াছে, যথা "অভেদ ভাবনায়াং যতিতব্যং" এই শ্রুতিবলে অদ্বৈতশ্রুতিকে অভেদভাবনাপর বলিয়া মীমাংসিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা এই, উপাসনা কালে জীবকে ব্রহ্ম হইতে আত্মাকে অভিন্নত্বরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তত্ত্বতঃ অভেদ নহে এই পক্ষে "ন চ সন্নপি তৎপরঃ" এই উদয়ন কারিকাংশের ইহাই তাৎপর্য্য; উক্ত আগম আপাততঃ অভেদ বোধক হইলেও তৎতাৎপর্য্যক নহে, উপাসনাপর, দ্বৈতনিষেধপর নহে। "নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ" এই শাস্ত্রানুসারে জৈনদিগের উপাস্যদেব আবরণশূন্যত্বরূপে উপাসনীয়। ঐ আবরণ অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ, মোহ, অভিনিবেশভেদে পাঁচ প্রকার। দিগম্বর মতাবলম্বীগণ নিরবারণ শব্দ দেখিয়া মনে করেন তাঁহাদের উপাস্যদেব আভ্যন্তরিক আবরণ শূন্যের ন্যায় বাহ্য আবরণ বস্ত্রাদি শূন্য; এইজন্য ইদানীন্তন প্রতিষ্ঠিত জৈন মূর্ত্তি বস্ত্রশূন্যত্ব রূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। জৈন মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিলেও তাঁহার প্রমাকর্ত্তৃত্ব ও প্রমাকরণত্ব কিছুই নাই, তাঁহাদের মতে অগৃহীতগ্রাহিত্বই প্রমার লক্ষণ। পূর্ব্বে যে সকল বস্তু অগৃহীত সেই সকল বস্তুর গ্রহণই প্রমা এবং তাহার উপায়ই প্রমাণ। ঈশ্বর জ্ঞান নিত্য ও সর্ব্ব বিষয়ক, তাঁহার কোন বিষয়ই অগৃহীত নহে। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের উক্তরূপ প্রমাত্বের সম্ভাবনা নাই; অতএব অপ্রমাণ পুরুষের বাক্যকে কোন মহাত্মা শ্রদ্ধা করিবেন? উদয়নাচার্য্য এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি বলেন যদি অগৃহীতগ্রাহিত্বই প্রমার লক্ষণ হয় তাহা হইলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলে দ্বিতীয় প্রত্যক্ষে প্রথম প্রত্যক্ষ গৃহীত বিষয়ের গ্রাহিত্ব থাকায় দ্বিতীয় প্রত্যক্ষের প্রমাণ ব্যাঘাত হয়, সুতরাং অগৃহীতগ্রাহিত্ব প্রমার লক্ষণ নহে, যথার্থানুভাবত্বই প্রমার লক্ষণ। এই লক্ষণ ঈশ্বরপ্রত্যক্ষসাধারণ, সুতরাং ঈশ্বর প্রত্যক্ষও প্রমা। ঈশ্বর ঐ প্রমার আশ্রয় হওয়ায় প্রমান, তাঁহার বাক্য প্রমান পুরুষের বাক্য বলিয়াই সকলেরই শ্রদ্ধেয়। উপাস্যত্বরূপে গুরূপদিষ্ট মন্ত্রাদিই পরমেশ্বরপদে অভিহিত, এতদ্ব্যতিরিক্ত সার্ব্বজ্ঞাদিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের অস্তিত্বে কোনও প্রমান নাই। ইহাই মীমাংসক সম্মত। মীমাংসক পরলোকবাদী। অতএব নাস্তিক পদের প্রতিপাদ্য না হইলেও পরমেশ্বরে বিপ্রতিপন্ন, এইজন্য কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকে উদয়নাচার্য্য তাঁহার মতের খণ্ডন

করিয়াছেন। চার্ব্বাক, মীমাংসক, সৌগত, দিগম্বর, কপিল এই পাঁচজন ঈশ্বরে বিপ্রতিপন্ন। উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলির প্রথম স্তবকে চার্ব্বাক মত, দ্বিতীয় স্তবকে মীমাংসক মত, তৃতীয় স্তবকে বৌদ্ধ মত, চতুর্থ স্তবকে দিগম্বর মত. পঞ্চম স্তবকে কপিল মত খণ্ডন করিয়াছেন। যথা মীমাংসক বলেন, ঈশ্বরের সত্তা না থাকিলেও পরলোক সাধন যাগাদ্যনুষ্ঠানে কোনরূপ ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু যাগাদির স্বর্গ সাধনত্ব "স্বর্গ কামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিগম্য, নিত্যনির্দ্দোষত্ব নিবন্ধই শ্রুতির প্রামান্য, আপ্তোচ্চরিতত্ব নিবন্ধন নহে, সুতরাং বেদকর্ত্তৃত্বরূপে ঈশ্বর সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহাই মীমাংসকের যুক্তি। উদয়ন মতে ঐ যুক্তির সমীচীনতা নাই, তাঁহার যুক্তি এই, প্রমাত্মক জ্ঞান গুনজন্য; ভ্রমাত্মক জ্ঞান দোষজন্য ঘটবিশিষ্ট ভূতল এইরূপ প্রত্যক্ষ তাহা হইলেই যথার্থ হয়। যদি বাস্তবিক ঘটবিশিষ্ট ভুতল চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব ঘটবিশিষ্ট ভুতলে চক্ষুঃসন্নিকর্ষই গুন। নয়ন যখন পিত্তদোষে দুষ্ট হয় তখন শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট বস্তুতে পীতত্ব বুদ্ধি হয়, ঐ বুদ্ধিভ্রম যে হেতু চক্ষুর পিত্তদোষজন্য। এইরূপ বাক্যজন্য জ্ঞান তাহা হইলেই যথার্থ হয় যদি ঐ জ্ঞান, বক্তার যথার্থ বাক্যার্থ জ্ঞানরূপ গুন জন্য হয়। বেদবাক্যজন্য জ্ঞান পরমেশ্বর রূপ বক্তার যথার্থ বাক্যার্থ জ্ঞানরূপ গুন জন্য বলিয়াই যথার্থ হয়, অতএব ঐ গুনের আধার বলিয়াই ঈশ্বর সিদ্ধি হইবে। এবং উৎপন্নাকার ইত্যাদি প্রতীতি দ্বারা যখন বর্ণের অনিতত্ব সিদ্ধ হইয়াছে তখন বর্ণ কদমাত্মক বেদের কিরূপে নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে? সুতরাং নিত্য নির্দ্দোষত্বরূপেও বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কপিল পরলোকবাদী হওয়ায় নাস্তিক না হইলেও ঈশ্বরে বিপ্রতিপন্ন। তিনি বলেন ঈশ্বর সিদ্ধিতে অব্যভিচরিত প্রমান না থাকায় ঈশ্বর অসিদ্ধ। উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে ঈশ্বর সিদ্ধি বিষয়ে অনেক অব্যভিচরিত প্রমানের উদ্ভাবন করিয়া ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। পতঞ্জলি-দর্শনে যোগের বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কপিল যেরূপ প্রকৃতি মহদাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, পতঞ্জলিও তাহাই করিয়াছেন, সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে উভয়ের কোনরূপ মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু কপিলমতে জীবাতিরিক্ত সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর নাই, পতঞ্জলিমতে তাহা আছে, এই মাত্র বিশেষ। এই জন্য কপিলদর্শন নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন পদ বাচ্য। পতঞ্জলি-দর্শন সেশ্বর সাংখ্যদর্শন পদবাচ্য। কপিল ও পতঞ্জলি উভয়েই প্রকৃতিবাদী। 'প্রকৃতি প্রভবং বিশ্বং' এই শ্রুতিই প্রকৃতিবাদের ভিত্তি। উভয়েই পরিণামবাদী দুগ্ধ যেরূপ দধ্যাকারে পরিণত হয় সেইরূপ প্রকৃতিই স্থূলপ্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়,

প্রলয়কালে স্থূলপ্রপঞ্চ প্রকৃতিতে সুক্ষ্মভাবে অবস্থিত হয়, সংসারাবস্থায় ঐ প্রপঞ্চ স্থূলভাবে আবির্ভূত হয়, এই মতে আবির্ভাবই উৎপত্তি তিরোভাবই লয়, তত্ত্বতঃ বস্তুর উৎপত্তি বিনাশ হয় না। যদি যবাঙ্কুর যববীজে অসম্বদ্ধ থাকিয়াই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে মুদ্গবীজ হইতে যবাঙ্কুর উৎপন্ন না হইবার কারণ কি? উভয় বীজই অসম্বদ্ধ তুল্য, ইহাতে গৌতম বলেন, যবাঙ্কুর যববীজেই সম্বদ্ধ হয় মুদ্গবীজে সম্বদ্ধ হয় না ইহার কারণ কি? তাহাতে যদি বাদী বলেন যে কার্য্য কারণেই সম্বদ্ধ হয় অকারণে হয় না, সুতরাং মুদ্গবীজ কারণ না হওয়ায় উহাতে যবাঙ্কুর সম্বদ্ধ হয় না, উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্যের সম্বন্ধানুসন্ধান ব্যয়সদর্শনানুসন্ধানের সমান। উভয় মতেই প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞানের পর জীব নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হয়। বৈদান্তিকগণ "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই অদ্বৈত শ্রুতি বলবত্তা স্থির করিয়া দ্বৈত শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনাদ্বারা অদ্বৈতবাদেই উপনীত হইয়াছেন, ইঁহারা মায়াবাদী "যন্মায়া প্রভবঃ বিশ্বং" এই শ্রুতিই মায়াবাদের ভিত্তি স্বরূপ। তন্মতে ব্রহ্মই সৎ সমস্ত জগৎ রজ্জু সর্পবৎ মিথ্যা যেরূপ রজ্জু হইতেই মিথ্যা রজত উৎপন্ন হয় সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অলীক জগৎ উৎপন্ন হয়, মিথ্যা জগতের পরমার্থিক সত্তা না থাকিলেও ব্যবহারিক সত্তা আছে। সেই ব্যাবহারিক সত্তা দ্বারাই অলীক জগৎ লৌকিক ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। তত্ত্বমসি এই মহাবাক্যার্থ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানই জীবের নির্ব্বাণ লাভের উপায়। ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিকদর্শন উভয়ই সমান তন্ত্র, ঐ দর্শনদয় প্রণেতা গৌতম ও কণাদ উভয়েই দ্বৈতবাদী "দ্বে ব্রাহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ"। এই শ্রুতিই মুখ্যার্থপর, অদ্বৈত শ্রুতি অভিন্নত্বরূপে উপাসনাপর তত্ত্বতঃ অদ্বৈতপর নহে। এই বিষয় অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বিষিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, এক একজন ঋষি এক এক বাদের পক্ষপাতী, পরন্তু সকলেরই তত্ত্বজ্ঞান উদ্দেশ্য যে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জীব নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে। সকলেরই মূলমন্ত্র এক, কেহ অদ্বৈতবাদ পক্ষকে অবলম্বন করিয়া কেহ দ্বৈতবাদ পক্ষ অবলম্বন করিয়া গম্য স্থানে উপনীত হইয়াছেন, অবলম্বনের প্রকার ভেদমাত্র তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। এইজন্য উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলীর প্রথম স্তবকার্থ সংগ্রাহক শ্লোকে দার্শনিকদিগের মতের সমন্বয় করিয়াছেন, সমন্বয় এই :—

"ইত্যেষা সহকারিশক্তিসমা মায়াত্বরুন্নীতিতো
মূলাত্ত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধ ভয়তোঽবিদ্যেতি যস্যোদিতা।
দেবোঽসৌ বিরতপ্রপঞ্চরচনাকল্লোলকোলাহলঃ

সাক্ষাৎ সাক্ষিতয়া মনস্তভিরতিং বঘ্নাতু শান্তো মম।”

যে ঈশ্বরের অসমা সহকারিশক্তিরূপা এই অদৃষ্টশক্তি দুর্জ্ঞেয়ত্ব নিবন্ধন মায়া-পদে অভিহিত, প্রপঞ্চমূলত্ব নিবন্ধন প্রকৃতিপদে অভিহিব, বিদ্যা হে তত্ত্বজ্ঞান ইহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ নাশ্য বলিয়া অবিদ্যাপদে অভিহিত, অবিদ্যার অন্তর্গত যে নঞ্, উহার অর্থ বিরোধ সেই ঈশ্বর আমার মনে চিকাল বাস করুন। এইরূপ সমন্বয় না করিলে “যন্ময়া প্রভবং বিশ্বং” “অকৃতি প্রভবং বিশ্বং” এই শ্রুতিদয়ের পরস্পর বিরোধ হইবে, যেহেতু, এক শ্রুতিতে মায়ার উল্লেখ আছে, অপর শ্রুতিতে প্রকৃতির উল্লেখ আছে। ইত্যলমধিকেন॥

সাধক সঙ্গীত।

লেখক—ঠাকুর শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বেন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বাসে গেঁথেছি মালা, পরবো মাগো আপন গলে।
আত্মা সহ দিব গো মা, দিব তোমার চরণ তলে॥
ভক্তি পুষ্পে গাঁথিয়াছি, প্রেম চন্দন মাখাইয়াছি,
বিবেক সূতে গাঁথি মালা, দিছি মাগো আপন গলে।
ঈশা মুদা ধ্রুব প্রহ্লাদ বসেছে মা যেই কোলে
নিবি না কি আমায় সেথা, আমি যে তোর অবোধ ছেলে।
মা বলে মা ডাকবো যখন দেখবো মাগো থাকিস কেমন
বাছা বলে ধরে তুলে নিবি যে মা আপন কোলে
নিজে ভুই কি আসিস তারা ভক্তে তোরে আনে ডেকে
আনবো তোরে আত্মবলে দেখবো কেমন থাকিস ভুলে।
কোলে নিবি বলে ছিলি ফাঁকি দিয়ে কোথার গেলি
ফাঁকি আর খাটবে না মা ডাকছি এই যে মা মা বলে॥
মা মা বলে ডাকবো যখন, দেখ্‌বো মা তুই থাকিস্ কেমন
ডাকার মত ডেকে এনে লাফিয়ে উঠ্‌বো ঐ কোলে॥

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”

৩৫শ বর্ষ | ১৩৩৬ সাল, চৈত্র। | ১২শ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী ও তাঁহার উপদেশাবলী

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুতত্ত্ব।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অধৈর্য্য হইতেছেন তাহা বুঝিতেছি। তাঁহারা বলিতেছেন যে মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী শুনাইবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক এত বাগাড়ম্বর বিস্তার করিয়া কেন আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতেছেন। ইহা যথার্থই বটে, তবে এই মহাত্মার জীবনী শুনাইবার পূর্ব্বে ২।৪টী বিষয় নিবেদন করা আবশ্যক হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এ মহাত্মার শরীর বঙ্গদেশের নহে। তথাপিও ইনি বাঙ্গালীর প্রতি বড়ই কৃপাপরায়ণ। অনেক সময়ে ইনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী জাতি অতি বুদ্ধিমান ও সত্য অনুসন্ধিৎসু। এই সকল গুণের সহিত যদি ইহারা সদাচারসম্পন্ন হইয়া সুস্থ দেহ ও বলশালী হইতে পারে তবে ইহারা ব্যবহার মার্গের সহিত পরমার্থমার্গে অতিশয় উন্নত হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

এ মহাত্মার নৈষ্ঠীক ব্রহ্মচারী শিষ্যের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। ইহা ভিন্ন দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্যগণের মধ্যেও অধিকাংশ বাঙ্গালী। এই শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে

উকিল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণি, ডাক্তার ও বহু ধনাঢ্য জমীদার ও ব্যবসাদার আছেন। তদ্ভিন্ন ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, সবজজ, কলেজের অধ্যাপক, পোষ্টাফিস, ইন্‌কমট্যাক্স, পুলিস, আবগারী ও রেলওয়ে বিভাগীয় পদস্থ ব্যক্তিগণ এই শিষ্য শ্রেণীভুক্ত আছেন। বিহারী, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী ও অন্যান্য প্রদেশীয় শিষ্য সংখ্যা বাঙ্গালী হিসাবে অতি কম। অনেক মান্যগণ্য ও ধনশালী ব্যক্তিরাই শিষ্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়া কেহ সময়ে সময়ে কটাক্ষপাৎ করিয়া থাকেন। মহারাজ বুঝাইয়াছেন যে "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।" এ সকল ব্যক্তিরা ব্যবহার জগতে সম্পদ ও মান্য পাইবার হেতু হইতেছে তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফল। এজন্য এ জীবনে যদি তাঁহাদিগকে পুনরায় পুণ্যধারা সংযুক্ত করা যায় তবে তাঁহাদের নিজ নিজ পরমার্থোন্নতির সহিত এ ব্যবহার জগতের নানাবিধ উন্নতি তাঁহাদের দারা অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষিত শিষ্যমণ্ডলী ভিন্ন মহারাজের ভক্ত বাঙ্গালীর সংখ্যাও প্রচুর।

এ জীবনী বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়া বাঙ্গালীর জন্যই প্রকাশিত হইতেছে। অপরের নিকট ইহা যদি চ চিত্তাকর্ষক না হয়, তথাপি লেখকের আশ্বাস যে ইহা তাঁহার গুরুভ্রাতা ও ভগিনীসমূহের চিত্তাকর্ষণ করিবে। এজন্য এ "গুরুতত্ত্ব" বিষয়টি লেখক নিজের চিত্তরঞ্জনের জন্য লিখিলেও ইহা তাঁহার প্রিয়বর্গকে অগ্রে উপহার দিয়া তবে "জীবনী" ও "উপদেশাবলী" আরম্ভ করিবেন।

লেখক পূর্ব্বেই জানাইয়াছেন যে, তিনি তিনটি আনন্দে বিভোর আছেন। ইহার মধ্যে দাসত্ব জীবন হইতে মুক্তি ও তীর্থস্থানের বিষয় পূর্ব্বে জানাইয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় আনন্দটি হইতেছে শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণের সমীপে অবস্থান। লোকে "গঙ্গাবারানসীর" পূর্ব্বে "গুরু" শব্দ যোগ করিয়া "গুরুগঙ্গাবারানসী" রূপে গুরুদেবের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করে। সে "গুরুতত্ত্ব"টা কি?

তবে এ তত্ত্ব জানাইবার পূর্ব্বে, (লেখকের এ সম্বন্ধে যে আজ্ঞা তাহাই প্রথমে জানাইতেছেন) কারণ, এ গুরুতত্ত্ব কি, তাহার যথার্থ অনুভূতি এখনও তাঁহার হৃদয়ে হয় নাই। এ জীবনে যে ইহার যথার্থ অনুভূতি হইবে এতদূর দুরাশাও লেখকের নাই। এ কথা কেন বলিতেছেন. তাহা শ্রবণ করুন। শাস্ত্র শুনিয়াছেন,—

"ঈশ্বর গুরুরাত্মেতি মূর্ত্তিভেদ বিভাসিনে"

অথবা, "যো গুরু স শিবঃ প্রোক্তো যঃ শিবঃ স গুরুস্মৃত।"

সুতরাং ইহা হইতে এই বুঝিতে হইবে যে যাহার আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতি

যথার্থরূপে হইয়াছে, সেই, এ গুরুতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে। এরূপ অবস্থা যখন হইবে তখন লেখনী ধারণ করিয়া আর কাহারও সমীপে আসিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

আর "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।"

এ গুরু কে? তুমি বহুশত পূর্ব্বজন্মে ভক্তির সহিত যদি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করি তবে সেই আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া—"সন্তুষ্টঙ্গশঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্রীগুরুরমেত্য কৃপয়া দৃগ্‌গোচরঃ মনং"—তোমাকে সংসার দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মানব দেহধারী হইয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

এই গুরু হইতেছেন—

(১) শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ।
গুরোর্গুরুতরো নাস্তি সংসার দুঃখ সাগরে॥
উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্॥

(২) মন্ত্র বক্ত্রাদ্বিনির্গতং বর্ণ ব্রহ্মময়ং বপুঃ।
তারয়েন্নাত্র সন্দেহো নরকার্ণবতো ধ্রুবম্॥

(৩) গুরুরেকো জগৎ সর্ব্বং, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মকং।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সংপূজয়েৎ গুরুং॥

(৪) গুরু র্ব্রহ্ম গুরু র্বিষ্ণু গুরুরেব মহেশ্বরো।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই কয়েকটী শাস্ত্রীয় বচন হইতেই বুঝিবেন যে, এ তত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন। মুখে গুরুদেব গুরুদেব করিলেই ইহার যথার্থ অনুভূতি হইবে না।

কেন শ্রীগুরুর এত মাহাত্ম্য? সাধারণ বুদ্ধিতে দেখা যায় যে, সংসারে যত প্রকার ব্যবহারিক শিক্ষা আছে, যথা—চিকিৎসা, স্থপতি, চিত্রকলা, সঙ্গীত, আইন, রাজ্যনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিদ্যা সকলই প্রথমে গুরুমুখে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। ইহা সকলদেশে সর্ব্বসময়েই চলিয়া আসিতেছে। এ সমুদয় ব্যবহারিক বিদ্যা সম্বন্ধে যখন এইরূপ নিয়ম, তখন

"যল্লাভান্নাপরোলাভো যৎ সুখান্ন পরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং, তদ্ ব্রহ্মেত্যেব ধারয়েৎ॥"

অথবা, "যস্মিন্‌ভাবে বিজ্ঞাতে, সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং॥

অর্থাৎ এরূপ একটী জ্ঞান লাভ করিবার আছে, যাহা লাভ করিলে সর্ব্ব-বিদ্যাই লাভ হয়। তাহা যাঁহার নিকট শিক্ষালাভ হয়, ভাবিয়া দেখুন তাঁহার আসন কত উচ্চ? এরূপ জ্ঞান যাঁহার নিকট লাভ হয়, তিনি মূর্ত্তিধারী শঙ্কর। ইহা কেন বলা হয়, না,

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥"

অথবা—"যো গুরুঃ সর্ব্বদেবানাং" বা "শিব এব গুরু সাক্ষাৎ গুরুরেব শিবঃ স্বয়ং।" মনুষ্য মূর্ত্তিধারী এইরূপ শিবস্বরূপ মহাপুরুষ হইতে যদি কাহারও জ্ঞান লাভ হয়, তবে তাহার সর্ব্বপ্রাপ্তিই হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। আর এরূপ মহাপুরুষ লাভ যদি কাহারও ভাগ্যে হইয়া থাকে, ও উক্ত পুরুষকে যদি কেহ প্রসন্ন রাখিতে পারেন, তবে তাহার আর কিছুমাত্র ভয় বা চিন্তা নাই। কারণ,

"গুরুঃ পিতা গুরুঃ মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন॥"

কিন্তু আমাদের মত অজ্ঞানীরা এই গুরুদেবকে আমাদের মতই হাত পা ধারী সামান্য মনুষ্য বলিয়াই হয় ত ভাবিয়া থাকেন। তাহাদিগকে পূর্ব্বে এই বলিয়া সাবধান করিতেছি যে,

(১) "গুরৌ মানুষ বুদ্ধিং তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকং
প্রতিমাষু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণোনরকং ব্রজেৎ"

(২) "যজ্ঞ ব্রত তপো দান জপ তীর্থানুসেবনম্
গুরুতত্ত্ব মবিজ্ঞায় নিস্ফলং নাত্র সংশয়ঃ"

(৩) "গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যদেবতাং
স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ"

আর যদি কেহ এ মনুষ্যদেহধারী শ্রীগুরুদেবকে নিজ নিজ অভিষ্টরূপী ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিয়া লইতে পারেন তবে,

(১) "কাশীক্ষেত্রে নিবাসশ্চ জাহ্নবী চরণোদকম্"

ইহা তাহার সদ্যঃ প্রাপ্তি হয়। কারণ সে,

(২) "সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃপাদসেবনাৎ
সর্ব্ব তীর্থাবগাহস্য ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং"

ইহার কারণ,

"গুরোঃসেবা পরং তীর্থমন্যতীর্থং নিরর্থং

সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্‌গুরোশ্চরণাম্বুজম্।"

এবং এরূপ যে করে, সেই যথার্থ সন্ন্যাসী কারণ,

"শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তারিতরে বেশধারিণঃ।"

ভাই সব! পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি প্রথমেই হৃদয়ে বেশ করিয়া আঁকিয়া রাখিবেন। এক্ষণে শাস্ত্রকারেরা এ গুরুকরণ কেন আবশ্যক ও কোন সময়ে আবশ্যক, ইহার কি উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সামান্য সামান্য অংশ শুনাইয়া যাইতেছি।

(১) "মুমুক্ষরঃ পুরুষা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাবন্তং ... ... শ্রোত্রীয়ং ... ... সর্ব্বভূতহিতকরং ... ... সদ্‌গুরুং বিবিসুপসঙ্গ" ... ইত্যাদি মুক্তিকোপনিষৎ।

(২) "নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বস্বগুং প্রণম্য" ... ইত্যাদি কৈবল্যোপনিষৎ।

(৩) তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেঃসমিৎপাণিঃ শ্রোত্রীয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" মুণ্ডকোপনিষৎ॥

শ্রুতি হইতে আর উঠাইবার প্রয়োজন নাই। যাহা উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতেই এ গুরুকরণ যে অতি আবশ্যক তাহা সকলেই বুঝিয়া লইবেন।

এদিকে অদ্বৈততত্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কি বলিতেছেন একবার শুনিয়া রাখুন।

(৪ "ভাবদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন বর্হি চিৎ
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ॥"

ইনি সকলকে এই বলিয়া সাবধান করিলেন যে, নিরন্তর অদ্বৈতরূপে ঈশ্বরের চিন্তা করিবে, সদসৎ ক্রিয়াকে কখনও অদ্বৈতজ্ঞান করিও না; ত্রিলোকেই অদ্বৈতজ্ঞান করিবে। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের সহিত নিজের অদ্বৈত চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

এজন্য এই আচার্য্যদেব যে গুরুষষ্ঠকরূপ স্তোত্র রচনা করিয়াছেন তাহা সকলকে নিত্যপাঠ করিতে বলিয়া শেষে উপদেশ দিয়াছেন যে,—

"গুরুরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী
যতির্নৃপতি ব্রহ্মচারী চ গেহী
লভেদ্ বাঞ্ছিতার্থং পরং ব্রহ্মসজ্ঞং
গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নং।"

ইহার সহজ অর্থ সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

এরূপ গুরুকরণ না হইলে কি হয়, এতদ্‌সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ বলিতেছেন।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভংসুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধি ন তরেৎ স আত্মহা ॥"

অর্থাৎ এ মানব শরীর এক তরণীস্বরূপ। এরূপ তরণী পাইয়াও আমার স্বরূপ গুরুরূপী কর্ণধার লাভ না করিয়া যদি কেহ ভবসিন্ধু পার হইতে চেষ্টা না করে, সে একজন আত্মঘাতী। উক্ত গুরুরূপী কর্ণধার হইতেছেন সর্ব্বফল প্রাপ্তির মূল; ইহা সুদুর্লভ হইলেও ইহা সুলভও বটে। আর এ মনুষ্য দেহ প্রাপ্তিই হইতেছে পরম ভাগ্যের বিষয়। এরূপ অবস্থায় আমার স্বরূপ এ গুরু লাভ যে না করে, সে আত্মঘাতী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইহার পর আর অধিক বচন উত্থান নিষ্প্রয়োজন। তবে হয়ত কাহারও মনে এরূপ ভাব উদয় হইতেছে যে, এ মনুষ্যদেহধারী গুরু কি সদাসর্ব্বদাই মিলিয়া যাইবে? এ গুরুদেবকে চিনিয়া লইবার কি কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই? ইহাতে বলিব অবশ্যই আছে, যথা,—

"শান্ত দান্ত কুলীনশ্চ বিনীত শুদ্ধবেশবান্
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠ শুচির্দক্ষ সুবুদ্ধিমান্
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ
নিগ্রহানুগ্রহশক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে।"

ইহার অর্থ অতি সহজ, এজন্য অনুবাদ দেওয়া হইল না। শিষ্য কিরূপ অবস্থায় এরূপ গুরুলাভ করিবে? ইহার সঙ্কেতও মহাত্মারা দিয়াছেন। যখন শিষ্য অনুভব করিবে,—

"দুর্ব্বার সংসারদাবাগ্নিতপ্তং দোধুয়মানং দুরদৃষ্টমেতৈঃ
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ, শরণ্যমন্যদ্ যদহং ন জানে।"

অর্থাৎ যখন কেহ ভাবিবে যে সে সাসারের দাবাগ্নিতে পড়িয়া যেন অনবরত দগ্ধ হইতেছে; ইহা তাহার অতিশয় দুরদৃষ্ট বশতই হইয়াছে। এজন্য সে অতিশয় ভীত হইয়াছে। মস্তকে অগ্নি জ্বলিত থাকিলে যেমন শীতল জলরাশিতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হয়, এরূপ আমি আপনার নিকট শীতল হইবার জন্য

শরণাপন্ন হইতেছি—এরূপ ভাব যখন শিষ্যের হয় ও তজ্জন্য একান্ত হৃদয়ে অনুসন্ধান করিতে থাকে, তখনই গুরুপ্রাপ্তি হয়।

কিন্তু কালবশে আজকাল গুরুকরণ অন্যরূপ হইতেছে। বড় লোকের ভাল ভাল হাতি ঘোড়া প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য যেমন তাহাদের ধনমানের পরিচয়, সেইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আজকাল অনেকেই বড় বড় নামজাদা পুরুষকে গুরুরূপে অর্থব্যয় করিতে পারিলে যেন মহা গৌরব মনে করেন।

যাহা হউক, যাঁহাদের প্রতি মহাপুরুষের কৃপা হইয়াছে, সে সব ভাগ্যবান্‌দিগকে কিছু শুনাইবার আছে। তাঁহারা শিষ্যভাবে কিরূপ করিবেন তাহাই প্রথমে জানাইতেছি। ব্রহ্ম মূহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া এরূপ শিষ্যগণ, আসনে উপবেশন করিয়াই, প্রথমতঃ শ্রীগুরুর এইরূপ ধ্যান করিবেন। এ সব ধ্যান অনেকেরই জানা আছে, তথাপি একত্রে সবগুলি পাইবেন বলিয়া যাঁহাদের জানা নাই, তাঁহাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই ধ্যান হইতেছে যে শ্রীগুরুদেবের শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীদেহ শিষ্যের শিরোপরি ও হৃদয়ে বরাভয়কর সহিত বিরাজিত আছে এই ধ্যানগুলি হইতেছে এইরূপ :—

(১) প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভূজং গুরুং।
প্রসন্ন বদনং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকং ॥
নমোঽস্তু গুরবে তস্মায়িষ্টদেব গুরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি, বিষং সংসার সংজ্ঞিতং ॥

(২) শিরঃ পদ্মে সহস্রারে চন্দ্রমণ্ডল মধ্যগে
অকথাদি ত্রিড়েথিয়ে হংসমন্ত্র সুপীঠকে
ধ্যায়েৎ নিজ গুরুং ধীরো রজতাবল সন্নিভং
পদাসীনং স্মিতমুখং বরাভয়করাম্বুজং
শুক্লাম্বর পরিধানং শুক্লগন্ধানু লেপনং
বামোরুস্থিতয়ারক্তা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্
ততো স্বদক্ষ হস্তেন ধৃতচারু কলেবরম্
বামেনোৎপলধারিণ্যা নূরক্তবসনস্রজা
স্মিতরক্ত প্রভাবিভ্রৎ শিবদুর্গাস্বরূপিনম্"

(৩) ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতপদে সহস্রদলসন্নিভে
শ্রীগুরুং পরমাত্মনং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরং
দ্বিনেত্রং, দ্বিভুজং, পীতং, ধ্যায়েদাহিলসিদ্ধিদম্"

(৪) হৃদম্বুজে কর্ণিকমধ্যস্থ সংস্থম্
সিংহাসন সংস্থিত দিব্যমূর্ত্তিম্
ধ্যায়েদ্ গুরুং চন্দ্রকলাবতম্ সং
সচ্চিৎ-সুখাভীষ্টবরংপ্রদানম্
শ্বেতাম্বরং শ্বেত-বিলেপ যুক্তং
মুক্তাকলাভুষিত দিব্যমূর্ত্তিম্
বামাঙ্গপীঠস্থিত দিব্য শক্তিং
মণ্ডস্মিতং পূর্ণকৃপা নিধানম্
আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নম্
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্
যোগীন্দ্রমিড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহম্ ভজামি

(৫) ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্
কুণ্ডলীবিবরকান্তমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ সরসীরুহোভজে।
তস্য কন্দলিত কর্ণিকাপুটে, ক্লপ্তরেখম্ কথাদিরেখয়া।
কেন লক্ষিতহলক্ষ মণ্ডলী ভাববক্ষ্যঅবলালয়ংভজে॥
তৎপুটে পটুতড়িৎ কড়ারিম স্পর্দ্ধমান মণি পটলপ্রভং।
চিন্তায়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপু নদিবিন্দু মণিপীঠে মণ্ডলং॥
উর্দ্ধমস্য হুতভুক্ শিখাত্রয়ং তদ্বিলাস পরিবৃংহণাস্পদম্।
বিশ্বমম্বর মোহচিচন্মেংকটং ব্যামুষ্যামি যুগমাদিহংসয়ে॥
তত্রনাথ চরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুমাসবপরীমরন্দয়োঃ।
দ্বন্দমি মকরন্দন্দূ শীতলং, মানসংস্বয়াতিমঙ্গলাস্পদম্॥
নিঃশঙ্কমণিপাদুকা নিয়মিভাবকোলাহলম্।
স্ফুরম্ কিশলয়ারুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকম্॥
পরামৃত সরোবরোদিত সরোষ সদ্রোচিতম্।
ভজামি শিরসিস্থিতম্ গুরুপদারবিন্দদ্বয়ম্॥

(৬) "ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদম্ কেবলম্ জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দাতিতম্ গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যম্ বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভুতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্‌গুরুম্ তং নমামি"॥

ভাইগণ! উপরোক্ত শেষ ধ্যানটী পরমহংস বা যোগীগণের উপযুক্ত। ইহার অর্থ অতি সহজ, কিন্তু ভাব অতি কঠিন। ইহা অতি সূক্ষ্ম ধ্যান। এজন্য ইহা বাদ দিয়া, প্রথম হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত যে ধ্যানগুলি লিখিত হইল, তাহা কিরূপ, ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঘেরণ্ড সংহিতা হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়া নিম্নে দিতেছি।

"ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্থাৎ আমাদের এ মস্তকের অভ্যন্তরে যেখানে সুষুম্না নাড়ী যাইয়া শেষ হইয়াছে, সেখানে সহস্রার নামে সহস্রদল মহাপদ শোভিত আছে। ঐ কমলের বীজকোষ মধ্যে আর একটী দ্বাদশদলবিশিষ্ট কমল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ দ্বাদশদল পদ শ্বেতবর্ণ ও পরমতেজ সম্পন্ন। ঐ দ্বাদশদলে যথাক্রমে হং সং ক্ষং মং লং বং রং যুং, হং সং খং মেং এরূপ দ্বাদশ বীজ বিন্যস্ত আছে। ঐ দ্বাদশদল পদের মধ্যে কর্ণিকাতে অ, ক, নদি এই বর্ণমালার রেখাত্রয় ও হ, ল, ক্ষ এ বর্ণত্রয় সংলগ্ন রহিয়াছে এবং মধ্যস্থলে প্রণব (ওঁ) বিদ্যমান আছে। ঐ স্থলে সুমনোহর নাদবিন্দুময় একটী পীঠ শোভিত রহিয়াছে। ঐ পীঠের উপরে দুইটী হংস বিদ্যমান আছে ও ঐ স্থলেই পাদুকা বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে গুরুদেব বিরাজ করিতেছেন। তিনি দ্বিভুজ, দ্বিনেত্র, শ্বেতাম্বর ও শ্বেতগন্ধধারী, তাঁহার দেহ শুভ্র গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত। তিনি পদ্মাসনে আসীন আছেন। তাঁহার বাম-ভাগে রক্তবর্ণা শক্তি বিরাজ করিতেছেন ও উভয়ের রূপ যেন শিবদুর্গার ন্যায়।

এরূপ নিজের ধ্যানগম্য ও যোগীদিগের সদা ধ্যানগম্য। এই সদা প্রসন্ন ও আনন্দময় মূর্ত্তি ধ্যান করিলে ভবরোগ নাশ হয় ও পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

উপরোক্ত ধ্যান হইল "সহস্রারে" ধ্যান। আর এরূপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুমূর্ত্তির ধ্যান হৃদয়েও করিতে হইবে। এখানে অনাহত বা হৃদয়স্থ দ্বাদশদল পদের সহিত সংলগ্ন যে আর একটি পষ্ঠদল পদ বিরাজিত আছে, তাহার কর্ণিকা মধ্যস্থ মনোহর সিংহাসনে পূর্ব্বোক্ত রূপবিশিষ্ট হইয়া গুরুদেব শক্তি সহ বিরাজিত আছেন। এ অষ্টদল পদ হইতেছে অং কং চং টং তং পং যং শং বা অষ্টবিভূতি সমাকীর্ণ।

এইরূপ ধ্যানের যে কোনটী হউক করিয়া পরে মনে মনে তাঁহাকে এই বলিয়া প্রণাম করিতে হইবে।

১। নমামি সদ্‌গুরুং শান্তং প্রত্যক্ষং শিবরূপিণং
শিরশি যোগপীঠস্থং মুক্তি কামার্থ সিদ্ধিদং।

২। অচিন্ত্যব্যক্তরূপায় নির্গুনায় গুণাত্মনে
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মনে নমঃ।

৩। যস্যদেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথাগুরৌ
তস্যৈতা কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

৪। যো গুরুঃ স শিব প্রোক্তঃ যঃ শিব স গুরুস্মৃতা
বিকল্পং যস্তু কুর্ব্বীত স নরো গুরুতল্পগঃ।

৫। কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বদারাধয়েদ গুরুং
দণ্ডবচ্চ নমস্কৃত্য নির্লজ্জো গুরুসন্নিধৌ।

৬। গুরুরেকো জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মকং
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সং পূজয়েদ্ গুরুম্।

৭। সংসার বৃক্ষমারঢ়াং পতন্তি নরকার্ণবে
যস্তানুদ্ধরতে সর্ব্বান্তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

৮। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

৯। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

১০। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

১১। ধ্যানমূলা গুরুমূর্ত্তিং পূজামূলং গুরোঃপদং
মন্ত্রমূলং গুরোবাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃকৃপা।

১২। নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্মং নমাম্যহং॥

১৩। সর্ব্বশ্রুতি শিরোরত্নং বিরাজিত পদাম্বুজম্
বেদান্তম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

১৪। গুকারশ্চান্ধকার স্যাদ্রুকারস্তেজা উচ্যতে
অজ্ঞান নাশকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়।

১৫। ত্বমেব মাতাচ পিতাত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখাত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।

এইরূপ ধ্যান ও প্রণামের পর, নিত্যক্রিয়াদি করিয়া অন্যান্য দেবতার পূজা করিবার পুর্ব্বে, এ গুরুদেবের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিতে বা পটাদিতে ও ফুল চন্দনাদির দ্বারা বাহ্যিক পুজা করিবার বিধি নহে। বাহুল্য ভয়ে উহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা গেল না। নিত্য গুরুগীতা পাঠ করিলে, মহান্ ফল লাভ হয়, উহা উক্ত গীতা

হইতেই সকলে অবগত হইবেন। এ গুরুগীতা আমাদিগকে যাহা স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ উপরে দেওয়া হইয়াছে।

আসার আশায়।

লেখক—শ্রীযুক্ত ভবানী চৌধুরী।

আসার আশায় শুধু
পথ চেয়ে ব'সে থাকি আমি ;
বিরহ অনল-শিখা
দহে মোর আকুল পরাণী।
পারিনা বসিতে আর,
করি ছলা পড়িবার
পাড়ি এনে বই খাতা
কত কি যে—যাহা পাই টানি।
ভালবাসা লাগি হৃদি
বিদরিবে এত কি গো জানি।

শুয়ে পড়ি চক্ষু মুদে,
আশা—এসে দেখিবে শয়নে,
অলক্ষ্যে জাগায়ে মোরে
কত কথা কহিবে নয়নে।
কখনো বা চ'লে যাই,
দূর—দূর বহু ঠাঁই।
ভাবিবে সে, "কোথা গেল"।—
আশা করি পাগল পরাণে।
পারি কোথা ?—ওগো সখা !
হ'য়ে পড়ি ব্যর্থ যে প্রয়াণে।

তুমি সখা কি দিয়ে যে
মাতায়েছ, ভুলায়েছ মোরে,
ভাষা হীন ভাব মম
কি দিয়ে গো বোঝা'ব তোমারে !
কি মহান্ তুমি প্রিয় !
ক্ষুদ্র কি আমি হেয় !
ধাই বেগে ডুবিবারে
তোমারি সে প্রেম পারাবারে,
আ ধিক্ ! যাইতে পথে
থেমে পড়ি থমকি অন্তরে।
ব'সে থাকি কায়মনে
তব শুভ-দরশন মাগি',—
তারাবলী ব্যাকুলিত
ব্যোম তলে যথা চাঁদ-লাগি',
বিরহ ব্যথিত প্রাণে,
কত শত শেল হানে,
তথাপি দিবস-যামী
তব পথ চেয়ে রহি জাগি।—
কবে তুমি আসিবে হে !
প্রিয় সখা পরাণের ভাগি !

শ্রী শ্রীচণ্ডী-মঙ্গল বা কালকেতু।

(নাটক।)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর।

নবম দৃশ্য—কিঙ্করের আড্ডা।

অনেকগুলি সঙ্গী সহ কিঙ্কর মদ খাইয়া বিকৃতস্বরে গান গাহিতেছিল

গান।

কিঙ্কর। যখন ভোরের বাতাস ফুর্ ফুরে বয় কোকিল ডাকে কু।
বেলার ঝোপে শিয়াল গুলো ডাকে হুক্কা হুয়॥
(সকলের হাস্য)
তখন বেগুন পোড়ায় কাঁচা লঙ্কা কেয়া মজেদার
দেখ পাড়ের কি বাহার।
সকলে। জানিতে পারিবে সভাই কর্লে ব্যবহার॥
কিঙ্কর। ঢাকার শাড়ী চক্‌মকে ভাই মানায় সুন্দরী
যেমন সাঁঝের বেলায় জল আন্‌তে
গেলো মঙ্গলী ! (হায়, হায় !)

(এই সময় লাঠি হস্তে কালকেতু আসিয়া একবার থেকে ঠেঙ্গাইতে লাগিলেন)

কালকেতু। পাষণ্ডের দল ! আজ তোদের ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গছি। (প্রহার)

কিঙ্কর প্রভৃতি মার খাইয়া "দোহাই বাবা, মেরনা বাবা," বলিয়া পলায়নে উদ্যত হইল। অনেকে কাছা খুলিতে খুলিতে "বাপ" বলিয়া পলায়ন করিল।

কালকেতু কিঙ্করের হাত ধরিয়া ক্রোধে বলিতে লাগিলেন।

কালকেতু। ওরে পশু ! ওরে ছাগাধম ! মানবের আকার ধারণ করে পশুর ন্যায় আচরণ কর্ত্তে তোর লজ্জা হ'লোনা। ধিক্ তোকে, ধিক্ তোর মানবনামে। এই নরদেহ, যা দেবগণেরও বাঞ্ছিত, যে দেহে ইচ্ছা কর্‌লে দেবত্ব শেষে ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত লব্ধ হ'তে পারে। সেই অমর বাঞ্ছিত দেহে কামকর্দ্দম মেখে পশুবৎ বিহার কর্‌ছিস্। ওরে পাষণ্ড ! এই দেহের পরিণাম কি ? কেবল মাটী। এই মাটি মাটিতেই মিশিয়ে যাবে। অই সুন্দর বদন, নয়ন, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, হস্ত, পদ সকলেরই পরিণাম ঐ মাটি ছাই ভস্ম। আরো দেখ্ ! যে রমণীর রমণীয় লাবণ্য পূর্ণ সুন্দর বদন দর্শনের জন্য তোর ওষ্ঠাধর এত পিপাসিত, সেই রমণীমুখের পরিণামও অই ভস্ম। হায় কামান্ধ কুকুর ! এই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য মানুষ হ'য়ে কি দুষ্কর্ম্মই না করেছিস্ এর প্রায়শ্চিত্ত কি জানিস্ ? উত্তপ্ত লৌহ শলাকার দ্বারা—

কিঙ্কর। (পদধারণ করিয়া) আমায় ক্ষমা কর দাদা, আমায় ক্ষমা কর। আমি যে মহাপাপী ! আমাকে এমন ক'রে কেউ কখন উপদেশ দেয়নি। আজ হ'তে তোমার পদ স্পর্শ করে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম

যে, জীবনে এমন কাজ আর কখনই করবোনা।

কালকেতু। আমার কথা শুনবি ?

কিঙ্কর। তোমার সব কথাই শুন্‌বো। আমি তোমার কিঙ্কর।

কালকেতু। তবে শোন কিঙ্কর! এখনি যার সর্ব্বনাশ করেছিস্ তাকে শাস্ত্র সম্মত বিবাহ করে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ কর। আর প্রতিজ্ঞা কর যে, মঙ্গলী ছাড়া অন্য কোন নারীর মুখ দর্শন করবি না। নে, কাণ মলা খা; আর বল্ যে, "পরদার করবো না।"

(কিঙ্করের তথাকরণ)

বেশ। এই তোর যথেষ্টই শাস্তি হ'লো। এতেও যদি তোর চৈতন্য না হয়; তাহ'লে যতদিন কালকেতু জীবিত থাক্‌বে ততদিন তোর শত্রু। এই জেনো।

কিঙ্কর। আমি মঙ্গলীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। তুমি এখনি তার ব্যবস্থা করে দাও। কিন্তু কালুদাদা, আমার ন্যায় ঘোর পাষণ্ডকে কি স্বামী বলে গ্রহণ করবে ?

কালকেতু। সে ভার আমার। তোমার কাজ আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করা। যাও, তোমার পিতাকে ডেকে আন। এই যে বুদ্ধু খুড়ো! এস, এস, এখনি তোমাকে ডাক্‌তে বল্‌ছিলাম। বুদ্ধু খুড়ো! তোমার দুর্বিনীত পুত্র—লম্পট মদ্যপায়ী পুত্র,—কিঙ্করকে আজ সুশীল ও বিনীত করে তোমায় দিচ্ছি। পূর্ব্বের কিঙ্কর আর নাই। তার পরিবর্ত্তে তোমার সচ্চরিত্র পুত্রের নাম রাখ্‌লেম "রামকিঙ্কর।" এতদিন সে যম কিঙ্কর "রাবণ" ছিল। আজ হতে সে "রামকিঙ্কর" হয়ে জানকীগণের উদ্ধার কর্ম্মে ব্রতী হ'লো। কেমন রামকিঙ্কর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে ?

কিঙ্কর। (অবনত হইয়া) তোমার আজ্ঞা শিরে ধর্‌লাম।

বুদ্ধু। (কালকেতুর মাথায় হাত দিয়া) বাবা কালু! আমি তোমায় কি বলে যে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, তা ভেবে পাইনা। আমার চির জ্বলন্ত দগ্ধ হৃদয় ক্ষেত্রে যে শান্তি বারি প্রদান কর্‌লে, এর লক্ষ গুণ শান্তি লাভ কর, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

কিঙ্কর। (পিতার নিকটে গিয়া) বাবা! বাবা! আজ আমার দিব্য জ্ঞান হ'য়েছে। এতদিন তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি। সে সকল মনে

পড়ে আমাকে অসংখ্য বৃশ্চিক দংশন যাতনা প্রদান কর্‌ছে। আজ এই মহাপুরুষের কৃপায় আমার জ্ঞানের নয়ন খুলে গিয়েছে। বাবা! অপরাধী পুত্রকে নিজগুণে ক্ষমা কর। (পদতলে পতিত হইল)

(সোমাই ওঝা প্রবেশ করিয়া সোল্লাসে বলিলেন)

সোমাই। বলিহারী বাপ কালু! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার চরিত্রবল। তুমি কোন্ মহামন্ত্র বলে একটা কামান্ধ ছাগকে সংযত সুশীল সুন্দর মানুষে পরিণত কর্‌লে তাই ভাবছি। তুমি অকৃষ্য ঊষর ও অকর্ম্মণ্য ক্ষেত্রকে কৃষ্যমান ও উর্ব্বর করেছ। একটা মহারণ্যের দাবাগ্নি ফুৎকারে নির্ব্বাণ করে, শীতল স্নিগ্ধ মন্দাকিনীর সলিলধারা সেচন করেছ। অই অনুতপ্ত পুত্র' আলিঙ্গন আকাঙ্খায় ব্যগ্র বাহু পিতার চরণতলে নিপতিত হ'য়ে, অনুতাপের উষ্ণ জলে পিতার চরণ ধৌত কর্‌ছে। আর "সুশীল পুত্র আবার ফিরে এসেছে" এই মহানন্দ-নন্দিত জনকের মার্জ্জনা জলে আত্মজের শিরোদেশ অভিষিক্ত হচ্ছে; এ দৃশ্য কি মনোহর! কি হৃদয়দ্রবকর! চমৎকার। (কিঙ্করের প্রতি) বাপ কিঙ্কর! "রামকিঙ্কর"! তুমি তোমার পিতৃদেবকে আলিঙ্গনে তৃপ্ত কর। আমরা ধন্য হই।

কিঙ্কর। (ব্যগ্রভাবে) বাবা! বাবা! (হাত বাড়াইল)

বুদ্ধু। (ব্যগ্রভাবে) বাবা! বাবা! (আলিঙ্গন করিল)

দশমদৃশ্য।

কালকেতুর বিবাহ সভায় ব্যাধরমণীগণ গান করিতেছে। বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে। ধর্ম্মকেতু, নিদয়া ও সোমাই ওঝা উপবিষ্ট। ফুল্লরা ও কালকেতু গাঁটছড়া বন্ধনে দণ্ডায়মান।

সোমাই। (ধান দূর্ব্বা লইয়া) চতুর্ম্মুখ ধাতা যিনি হংস বাহনেতে।
বিরাজিত ব্রহ্মলোকে প্রণতি পদেতে॥
রক্ষণ করুন তিনি নবীন দম্পতি।
জয় জয় পিতামহ ত্রিলোকের গতি॥

(উলু উলু ধ্বনি) (আশীর্ব্বাদ করিলেন)

চক্রপাণি প্রজাপতি দেব নারায়ণ।

কমলা সহিত যিনি বৈকুণ্ঠ ভবন ।।
রক্ষা কর ত্রিলোকেশ হে রমাবল্লভ !
দম্পতিরে দাও প্রভু ! সকল বিভব ।।

(উলু উলু ধ্বনি) (আশীর্ব্বাদ)

কৈলাসে পার্ব্বতী সনে পিনাকী শঙ্কর ।
আছেন আনন্দে সদা সহিত কিঙ্কর ।।
রক্ষা কর উমাকান্ত শান্তিময় শিব !
দম্পতিরে দাও প্রভু সকল বিভব ।

(উলু উলু ধ্বনি) (আশীর্ব্বাদ)

এস নিদয়া, এস ধর্ম্মকেতু ! তোমরা একত্রে আশীর্ব্বাদ কর। কুল-স্ত্রীগণ মঙ্গল সঙ্গীত গাও।

নিদয়া ও ধর্ম্মকেতু ধান দূর্ব্বাদি প্রদানে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। কুলস্ত্রীগণ গান ধরিলেন।

গান।

ব্যাধবণিতাগণ। দুটী নীড়ের দুটি পাখীর আঁখি মিলিল।
(আজি দুষ্টী বোঁটার দুটি কুসুম একত্র হ'লো ।।
দোঁহার অধর মৃদুহাসে,
চাঁদের রেখায় তমঃ নাশে
ব্যগ্র বদন প্রতিশ্বাসে কথা কি ফুটিল ?
তবু কথা কি ফুটিল।
(অই) কোকিল কোকিলা গাইছে গান
কুহু কুহু কুহু মধুর তান
বুলবুলি বলে "আয় আয় আয়"
এমন সুখের রাতি যে পোহালো—
ওলো রাতি যে পোহালো।

(নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান)

গীতকণ্ঠে ব্যাধবালক ও ব্যাধবালিকাগণের প্রবেশ এবং দুই পাশে দাঁড়াইয়া গান

ব্যাধবালকগণ। আয়রে ভাই ! দেখতে যাবি কালু দাদার বিয়ে।
বর দাঁড়ালো ছেঁড়া তলায় ধুচুনি মাথায় দিয়ে।

বালিকাগণ। অই দেখ্ ফুল্লরা হাসে।
মেঘের কোলে সৌদামিনী আঁধার বিনাশে।

বালকগণ। মোদের কালুদাদা কালো মেঘে রেখেছে ছেয়ে।

বালিকাগণ। ফুল্লরা ফুল্ল শতদল
কালো তোদের কাল্‌ভোমরা

বালকগণ। আচ্ছা বল্ বল্—
মোদের কালো ভ্রমর গুণগুণিয়ে যাবে লো খেয়ে।

সোমাই। বালকগণ, বালিকাগণ, তোমাদের গান শুনে বড়ই আনন্দ লাভ কর্‌লেম। এই নাও তোমরা সন্দেশের জন্য যৎকিঞ্চিৎ (অর্থ দান) আজ তোমাদের সকলেরই ধর্ম্মকেতুর গৃহে নিমন্ত্রণ রৈল। যাও তোমরা গৃহে যাও। ধর্ম্মকেতু ! আজ তোমার বড়ই আনন্দের দিন বহু ভাগ্যে পুত্রবধূর মুখকমল দর্শন কল্লে। নাও কালকেতুকে কোলে নাও। নিদয়া ! তুমি ফুল্লরা মাকে কোলে নাও। সকলে উলুধ্বনি কর আর শঙ্খবাদ্য সহ জলধারা দিয়ে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে যাও

(ধর্ম্মকেতু কালকেতুকে এবং নিদয়া ফুল্লরাকে কোলে লইয়া উলুধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেলেন)

(জনৈক খোঁড়া উড়ে ও কানা মেরুয়াবাদীর প্রবেশ)

মেরুয়াবাদী। আরে ভেইয়া ঠারো ঠারো। কাঁহা যাতো হুঁ ? হামলোক ভি যায়েঙ্গে। আরে তামাম্ আঁবিয়ার হো গয়া (হাতড়াইতে হাতড়াইতে খোঁড়ার ঘাড়ে গিয়া পড়িল)

উড়ে॥ অরে শড়া অন্ধা ! মানুষ না দেখিচু ? শড়া অন্ধা তু ঘাড় ভাঙ্গিবি, মুই তোরে ঠাহরিমু ?

মেরুয়াবাদী। আরে খঞ্জ লেংড়া, "শালা" কাহে বল্‌তা, তু হামরা বহিনকো সাদী কিয়া শালা কমবখত্ ? এক পাঁও বিগড় গিয়া, লেংড়া তেরা দোসরা পাঁও তোড়েঙ্গে (ঠেঙ্গাইতে উদ্যত)

উড়ে। (কাতর ভাবে) আরে অন্ধা, আরে বন্ধা, আমারে মারিবি ? আমায়ে মারিবি ? কি দোষ করিছু মুই ? মুই খঞ্জ। মুই গরীব। দয়া কর দয়া কর। অবধর। বাবা জগন্নাথ তোমার মঙ্গল করিবেন।

মেরুয়া। আরে কোন শালে লোক তোমকো ঠেঙ্গায়ে গা ? হাম তেরা বন্ধু।

কাঁহা যাতে হো ভাইয়া ?

উড়ে। ধরমকেতুর পুত্র কালকেতুর বিবাহ। মোরে নিমন্ত্রণ করিলুঁ। তাই হাইছি ভাই! তাই যাইছি।

মেরুয়া। হামলোক কো ভি নেউতা দিয়া। হাম তো অন্ধা। আঁখে না সুঝে। ক্যা করকে যায়েঙ্গে ভেইয়া ?

উড়ে। আরে হ। তোমারে নিমন্ত্রণ করিলুঁ ? অতি পুণ্যবান। অতি পুণ্যাত্মা। ভাই মেরুয়াবাদী! এক কর্ম্ম কর। মঙ্গল হইবেন। প্রভু মঙ্গল করিবেন।

মেরুয়া। ক্যা ভেইয়া ?

উড়ে। মুই খঞ্জ, তুমি অন্ধ। আমারে স্কন্ধে কর। মুই বাট দেখিমু। ঘাট দেখিমু। তোমারে চালাইমু। আন্ধারে পান্দারে পড়িমুনা কুশলে চলিয়া যাইমু।

মেরুয়া। আচ্ছা বাত্। আচ্ছা মতলব কিয়া। লেকিন্ তোম্লোক ওজনসাহী। হামলোক হাল্কী।

উড়ে। আরে হঃ! মুই ওজনসাহী ? মু তো শোলাস্কন্ধ কর। বুঝি-বুনা যে স্কন্ধে মানুষ আছে।

মেরুয়া। আচ্ছা রহো হাম্ জেরা এসা দেখেঙ্গে। (উড়েকে তুলিতে অসমর্থ হইয়া ফেলিয়া দিল। উড়ে অসহ্য হন্ত্রণায় চেঁচাইতে লাগিল।)

উড়ে। আরে মরিচি, মরিচি, চরণ দুটী ভাঙ্গিল। হা জগড়্নাথ! প্রভু জগড়্নাথ! জনমের মত কটক না জাইমু। তোমার মুখ চন্দ্র না দেখিমু। হা শড়া অন্ধা, হা প্রভু জগড়্নাথ!

মেরুয়া। আরে কাহে রোয়াতা ? হামলোক তেরা দোনো গোড় ঠিক্ঠাক বানায় দেঙ্গে। ওঠ্ মেরা ঘাড় পর। নেউতা দিয়া। খানেকে বখত্ জানা চাহিয়ে। ওঠ্ ভাইয়া লেংড়া! (উড়েকে কাঁধে লইয়া) হামরা শির ধরকে ঠিকঠিক বৈঠো। যাঁহা যাঁহা রাস্তা-পর খানা, ডোবা, আউর কণ্টক জঙ্গল হ্যায় হাম্কো বাতায় দিজিয়ো ভেইয়া—খবরদার। (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

নিবেদন।

লেখক—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র।

করে ধরি' নিয়ো মোরে প্রভু!
দুখে কিবা সুখে—ভয়ে কিবা আশে,
বুঝিবারে দিও—তুমি আছ পাশে ;
করে ধরি' নিয়ো মোরে প্রভু! (১)

এ অধম ভুলে যদি কভু,—
তব করুণায় আশাহীন হয়,
আর প্রাণে তব নাম নাহি লয় ;
করে ধরি' নিয়ো মোরে প্রভু! (২)

করে ধরি' নিয়ো মোরে প্রভু!
যে কর আমার পুলকের তরে,
সংখ্যাতীত কত মন্দ কাজ করে ;
তারে ধরি' নিয়ো তুমি প্রভু! (৩)

আর,

আঁখি যবে হবে অন্ধকার—
বাহু মোর শীতলতা পাবে,
কারো স্নেহ-কর ধরিবারে চাবে,—
করে ধরি' নিয়ো তুমি প্রভু! (৪)*

---

*"Hold thou my hands" By Mr. William Canton,
a living poet of England.

মনের কথা।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

মন অনেক দিন হইতে ঘোর সন্দেহে কাটিতেছে, সব যেন কেমন কেমন মনে হইতেছে। কোথায় যেন কি ছিল, খোয়া গিয়াছে, খুজিয়া পাইতেছি না। পাইবার আশায় খুজিতে যাই, পাই পাই যেন পাই না। কেন এমন হলো—কে এমন করিল—এই চিন্তায় দিন রাত কাটে, কিন্তু কোন কারণ নির্ণয় হয় না। সেই জন্য অশান্তি ভোগ করিয়া জীবন যেন ভারবহ হইয়াছে। মনের কথা বলিয়া মন খুলিয়া হাসিবার যো নাই। কাঁদিবার যো নাই। কে যেন কোথা হইতে হাসি কান্নার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। বিষম সমস্যা, ভয়ঙ্কর অবস্থা। এমন মনের অবস্থা লইয়া বেশীদিন বাঁচা অসম্ভব। তবে কি করা উচিত? কে বলিবে কি করা উচিত। এই ভাবে কি জীবনের অবশিষ্ট অংশ মৃত্যুবৎ কাটিবে? যদি তাই হয়, তবে কেন ভগবান তুমি আমাকে সৃষ্টি করিলে? কেন এমন ভাঙ্গা মন দিয়া ভবে রাখিলে? আমার দ্বারা তোমার লীলার কি অভিনয় সম্পন্ন হইবে ভগবান?

যাহার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, যাহাকে জগতের লোক উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া উপহাস করিবে, তাহার তো জগতে কোন স্থান নাই। প্রেম, ভালবাসা সুখ শান্তিদাতা কোথায় তোমার সেই সুকুমার কোমল ভাবপুঞ্জ। যাহা লইয়া যাহা পাইয়া মানুষ মানুষ বলিয়া পরিচিত হয়। তোমার নির্ম্মল সৃষ্টির অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা সেই সুমধুর সুন্দর ভাবনিচয় কে হরিয়া নিল দয়াময়! কি কর্ম্মের ফলে এমন হলো। ইহার চরম পরিণতি কোথায় দীনবন্ধো! বলিয়া দাও প্রভো! জানিয়া শান্তি বলিলে নির্মজ্জিত হইয়া, সকল জ্বালা যন্ত্রণা ক্লেশের হাত হইতে নিস্তার লাভ করি।

এমন ভাব দাও, যাতে তোমার নামে বিভোর হয়ে দিন রাত সমান ভাবে আনন্দধারা বহিতে থাকে প্রাণারাম প্রাণময় প্রভো! আর পারি না। সংসারের চির পঙ্কিলময় সলিলে প্রাণময় বিকলিত, কি করিব দয়াময়! শান্তিদাতা, শান্তি দাও। মনের কথা তুমি ভিন্ন কে শুনিবে কে বুঝিবে?

বিবিধ।

১। যত দিন বায়ু দেহে ততই জীবন।
বায়ু শেষ হলে পরে জানিবে মরণ॥
দেহ মধ্যে বায়ু স্থির চিত্ত অচঞ্চলে।
দৃষ্টি স্থির ভ্রু মধ্যে কি ভয় তার কালে?

২। যদুপতি কোথা তাঁর মথুরা নগরী?
রঘুপতি কোথা তাঁর সে অযোধ্যাপুরী?
ইহা মনে চিন্তা করি বুঝিও সুস্থির।
সৎ নহে এ জগৎ সকলি অস্থির॥

৩। আশা দান করিয়া যে নাহি করে দান।
অপরের দানে বাধা যে করে প্রদান॥
স্বয়ং করিয়া দান যে করে হরণ।
ততোধিক পাপী হয় জানিবে সে জন॥

৪। খোলা হাতে আসে জীব খোলা হাতে যায়।
বিষয়ের বিষে ডুবে শান্তি নাহি পায়॥

৫। সুমিষ্ট সে শান্তিপূর্ণ আপন আলয়।
অপরের অট্টালিকা হয় বিষময়॥
আপন ইচ্ছায় কাজ আপন ভবনে।
পরের ইচ্ছায় কাজ হয় অন্যস্থানে॥
সে কারণ স্বাধীনতা আছে নিজালয়ে।
পরাধীন হয়ে কাজ হয় ভিন্নালয়ে॥
বিধাতার প্রিয় সৃষ্টি নিজের সদন।
যথায় বিরাজে শান্তি যখন তখন॥
একবেলা খাও বা না খাও নিজালয়ে।

তথাপি মনের সুখ নিশ্চয় মিলয়ে ॥
অতএব মনে বুঝে দেখহ সুজন।
বটে কিনা বটে শান্তি নিজের সদন ॥

৬। সত্য যুগে বিষ্ণু ধ্যান করিবে মানবগণ।
ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা পূজা আচরণ ॥
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা মুক্তির কারণ।
কলিকালে মহাযজ্ঞ নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥

ব্যথার ব্যথী।

লেখক—শ্রী—

সেই গত শরৎকাল। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে আকাশ তখন নির্ম্মল, জ্যোৎস্না-স্নাত; সেই উন্মুক্ত আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল, তারকারাজি ধরণীর প্রতি অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া যেন প্রীতি বর্ষণ করিতেছিল। তটিনী কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া আকুল হৃদয়ে কাহার উদ্দেশে ছুটিতেছিল? উভয় পার্শ্বে বাপীতটে নিবিড় কুন্তলা বৃক্ষরাজি কাহার আগমনী গীতি গাহিতেছিল? গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে, মন্দিরে মন্দিরে মানব কাহার দর্শনাকাঙ্খায় প্রতীক্ষা করিতেছিল? সকলেই জড় জগতের সহিত ঐক্যতানে যেন বলিতেছিল—"ওগো, আমাদের সেই বিশ্বরূপিণী, সন্তাপ হারিণী, চিরশান্তি-দায়িনী মা আসিতেছেন।

সকলই আনন্দময়। কিন্তু আমার আনন্দ কোথায়? আমার হৃদয় এত ভারাক্রান্ত কেন? ঠিক্ ষষ্ঠীর পূর্ব্ব রাত্রে রজনীর মধ্যভাগে কাহার কোমল মধুর শান্তদৃষ্টি, কোন্ শিশুর চন্দ্রবদন আমার সরলা ভয়বিহ্বলা পত্নীর হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছিল? তখন বালিকা ভাবিয়াছিল যে প্রকৃত স্বর্গ বুঝি এই ক্ষুদ্র গৃহখানি। চিরসৌন্দর্য্য বুঝি ঐ শিশুর মুখে। সে সৌন্দর্য্য বুঝি কভু বিনষ্ট হইবার নহে। আমার পত্নী বলিয়াছিল—"ওগো! দেখ কি সুন্দর আমার খুকুমণি আমাদের ঘর আলো করিয়া আছে।" আমার হতভাগিনী পত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর কোলও

শিশু আলো করিয়াছিল। সেও বলিয়াছিল—"আমি আমার হারাণ মাণিক ফিরিয়া পাইলাম।" সেই হতভাগিনীর একমাত্র স্নেহপুত্তলী অকালে কালকবলিত হইয়াছিল। আমাদের চিরসাধনার ধন, নয়নের মণিকে করুণাময় জগদীশ্বর বাঁচাইয়া রাখুন। শিশুর আগমনে আমাদের ক্ষুদ্র গৃহখানি আনন্দে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল।

সহসা সেই নির্ম্মল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। আমাদের আনন্দরাশি কোন্ নিভৃত অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। দিদি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন —"বাবা গো! খুকু আমাদের এ কেমন হইয়া গেল!" ছুটীয়া গিয়া দেখিলাম সেই সৌন্দর্য্য বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। খুকুর মুখে আর সে হাসি নাই। তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছে। শয্যাস্থিতা আমার রুগ্না পত্নী চীৎকার করিয়া উঠিল— "ওগো! তবে কি আমার খুকু নাই? আমার খুকু কি সত্যই নাই?" তখন খুকু সত্যই মহাপথের যাত্রী হইয়াছে। সব মায়া জাল ছিন্ন করিয়া, জন্মের মত আমাদের কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

দিদি কাঁদিলেন, পত্নী কাঁদিল, আত্মীয়স্বজন সকলেই কাঁদিল। কিন্তু খুকুত আর ফিরিল না। শীতের পর গ্রীষ্ম আসে, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ— ষড়ঋতুর আসিবার ব্যতিক্রম হয় না, দিনের পর রাত্রিও আসে, কিন্তু খুকু আর ফিরিয়া আসে না। সে মহাশূন্যের পাখী মহাশূন্যে উড়িয়া গিয়াছে। তাহার অবিনশ্বর আত্মা এই নশ্বর পূতিগন্ধময় পাঞ্চভৌতিক দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে। সে জগৎপিতার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে। সে আর আসিবে না, আসিতেও চাহে না। সেখানে চিরবসন্ত বিরাজ করে। সেখানে দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, আছে কেবল অবিচ্ছিন্ন শান্তি। আমাদের খুকুমণি সেইখানেই রহিয়াছে। তোমরা আর কাঁদিও না। আমরা কবে এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর জগৎ ছাড়িয়া আমাদের খুকু মণির ন্যায় জগৎপিতার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইব?

সেই মধুর শরৎকালে সমস্তই মধুর। প্রকৃতি হাস্যময়ী,—দুঃখের যেন লেশ-মাত্র কোথাও নাই। সেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্যে দুঃখের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ যেন আমার হতভাগিনী বালিকাবধূ ও ভাগ্যহীন আমি! এই অশান্ত জগতে আমাদের ব্যথার ব্যথী শান্তিময় জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ বা আছে? তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তিনি আমাদের অশান্ত জীবনে তাঁহার মধুর করস্পর্শ দ্বারা শান্তি ও মাধুর্য্য আনয়ন করুন।

বৃহস্পতি-কথা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

অনন্তমূর্ত্তি বিশ্বেশ্বর নারায়ণের ইচ্ছায় তাঁহার নাভি হইতে একটি কমল উদ্গত হইল। তখন এই ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ান্ধকারে ব্যাপ্ত ছিল, জল বিনা এ সংসারে আর কোনই পদার্থ ছিল না। এ কার্ণবীকৃত জগতে অপার জলধিহৃদয়ে অনন্ত শয়নে শায়িত ছিলেন। নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে তাঁহারই অন্য মূর্ত্তি ভগবান ব্রহ্মার উদয় হইল।

শ্রীভগবান নারায়ণ ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আত্মবদৃশ মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা নারায়ণে সংন্যস্ত মানস ছিলেন, আত্মার পরম সার্থকতা কি প্রকারে হয়, তাঁহারা তাহা বিভুর কৃপায় জানিতে পারিয়া সৃষ্টিকার্য্যে মনোযোগী হইলেন না। তখন চতুরানন আবার সপ্ত ঋষির সৃষ্টি করিলেন। এই সপ্ত ঋষির নাম ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, ভৃগু। অবার পুলহ পুলস্ত্য কশ্যপ নারদাদিও তাঁহার মানস পুত্র। বিষ্ণু পুরাণে নয় জন সৃষ্টিকর্ত্তার (ব্রহ্মা) উল্লেখ আছে, যথা :—

ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথ,
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্।
নব ব্রহ্মাণে ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।
সনন্দাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা॥

(প্রথমাংশে ৭ম অঃ)

ব্রহ্মজা সনকাদিকে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে অনাসক্ত দেখিয়া ব্রহ্মার মহান্ ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তাঁহার কপাল হইতে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় অর্দ্ধনারী-বপু অতিকায় প্রচণ্ড "রুদ্র" সমুৎপন্ন হইলেন।

ভগবান সূর্য্যদেবের স্তবে "গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্ব দেবঃ নমস্কৃতঃ" এই কথা থাকায় সূর্য্যদেবের সহিত ব্রহ্মার অভিন্নত্বই প্রতিপন্ন হয়। রুদ্রের তেজঃ "রৌদ্র" শব্দ বিশেষভাবে প্রচলিত।

প্রজাপতি দক্ষ, প্রসূতির গর্ভে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে ধর্ম্ম ত্রয়োদশটি কন্যা গ্রহণ করেন। আর একাদশ কন্যার মধ্যে "স্মৃতি" নাম্নী কন্যাকে অঙ্গিরা গ্রহণ করিলেন। এই অঙ্গিরার পুত্রই বৃহস্পতি ও উতথ্য।

বৃহস্পতি বেদ-বিদ্যাবিশারদ হইয়া দেবগুরুর পদ অলঙ্কৃত করেন। বৃহস্পতির পত্নীর নাম তারা। তারার হরণ বৃত্তান্ত ঘটিত একটি উপন্যাস পুরাণে আছে, কিন্তু উহা রূপক। মল্লিখিত "রূপক" ও "উপমা" নামক প্রবন্ধে তাহার বিস্তার করিয়াছি। বৃহস্পতি গ্রহ চন্দ্র অপেক্ষা বহুগুণে বড় এবং উজ্জ্বলতায় ও আকৃতিতে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেইজন্য লোকে বৃহস্পতিকে "তারানাথ" বলে। আবার চন্দ্রেরও তুষার-ধবল স্নিগ্ধ কিরণে সন্তুষ্ট হইয়া বুধগণ চন্দ্রকেও "নিশানাথ", "তারানাথ" "সুধাকর" প্রভৃতি নাম দিলেন। গ্রহ-দ্বয়কে মানুষীভাবে কল্পনা করিয়া কোনও উপন্যাসকার চন্দ্রের তারাহরণ সংক্রান্ত একটি উপন্যাস গ্রথিত করিলেন। এদিকে "দেবগুরু বৃহস্পতি" ও "আত্রেয় চন্দ্র" এই দুই দেবকে গ্রহের সহিত মিশাইয়া ফেলিয়া উপন্যাসকে আরও ঘোরাল করিয়া ফেলিলেন।

অত্রিনেত্রসম্ভূত চন্দ্র দক্ষ প্রজাপতির সপ্তবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, ইহারা নক্ষত্র। ইহাদের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী ইত্যাদি। ইহারা সকলে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, খগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, দানবাদির প্রসূতি। চন্দ্র এই-জন্যই "তারানাথ"। বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ দেখি যে, বেণপুত্র পৃথু। তাঁহার দুইপুত্র অন্তর্দ্ধি ও পালী। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনীর গর্ভে হবির্দ্ধান জন্মগ্রহণ করেন। হবির্দ্ধানের ঔরসে আগ্নেয়ীর গর্ভে ধিষণা, প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্র, গয়, রজ ও অজিন এই ষট্‌পুত্র জন্মে। প্রাচীনবর্হিঃ মহাবল মহীপতি ছিলেন, তাঁহার সময় পৃথিবী তাঁহার অমনোযোগ হেতু) কুশে আস্তৃত হয়। তপস্যার পর প্রাচীনবর্হিঃ সমুদ্রের কন্যা সবর্ণাকে বিবাহ করেন। সামুদ্রী সাবর্ণাতে প্রচেতা নামে তাঁহার দশ পুত্র হয়। ঐ দশ পুত্র অপৃথক ধর্ম্মাচরণ ও সমুদ্র সলিল মধ্যবাসী হইয়া দশ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারা তপস্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, পৃথিবী বৃক্ষাদিতে পূর্ণ হইয়াছে। তখন তাঁহারা ক্রোধে মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নির সৃষ্টি করিলেন। বায়ু ও অগ্নি বৃক্ষ ক্ষয় করিতে থাকিলে বৃক্ষের অধিপতি সোম (চন্দ্র) বলিলেন, "হে রাজগণ! কোপ সংবরণ কর আমার কথা শুন। এই বৃক্ষগণের কন্যা বার্ক্ষেরা মারিষা তোমাদের বংশবর্দ্ধিনী হইবেন। ইহার গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ উৎপন্ন হইবেন।" পরে তাহাই হইল প্রচেতাগণ হইতে মরিষার গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহা

হইলে প্রজাপতি দক্ষ সোমের দৌহিত্র হইলেন।

এ সম্বন্ধে মৈত্রেয় মুনি পরাশরকে বলিয়াছিলেন যে, "হে ব্রহ্মণ! আমার বড় সন্দেহ হইতেছে যিনি সোমের দৌহিত্র তিনিই আবার শ্বশুর হইলেন।" তখন পরাশর বলিলেন, "হে সত্তম! ভূতগণের মধ্যে উৎপত্তি ও নিরোধ নিত্য। দিব্য চক্ষু ঋষিগণ এ বিষয়ে মুগ্ধ হন না।" এই দক্ষাদি মুনিসত্তমগণ, যুগে যুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এবং পুনশ্চ নিরুদ্ধ (লীন) হন। এ বিষয়ে জ্ঞানীরা মুগ্ধ হন না ইহাঁরা নিত্য। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে দক্ষ একটি উপাধি মাত্র, নাম নহে। পূর্ব্বে ব্রহ্মার মনঃ হইতে "দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ" হইতে প্রজাপতি দক্ষ হইয়াছিলেন। এক্ষণে মারিষার গর্ভে প্রচেতাগণের ঔরসে দক্ষ উৎপন্ন হইলেন। এই দক্ষের ষাট্ কন্যার মধ্যে ধর্ম্ম দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি অরিষ্ট নেমিকে চার এবং বহুপুত্রকে, আঙ্গিরসকে (ইনি কি অঙ্গিরা তনয় বৃহস্পতি ?) ও কৃশাশ্বকে দুইটী দুইটী কন্যা দান করেন।

যে সপ্তবিংশতি সুব্রতা সোমপত্নীর কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা নক্ষত্র যোগিনী এবং তন্নাম্নী। তাঁহাদের অমিততেজা দীপ্তিমান অনেক অপত্য হইয়াছিলেন। এই নক্ষত্রগণের অধিপ বলিয়া চন্দ্রকে "তারাকান্ত" বলে। বৃহস্পতির পত্নী তারার সহিত মিশাইয়া "তারাহরণ" সংক্রান্ত অদ্ভুত গল্পটীর সৃষ্টি। বস্তুতঃ উহা রূপক। এই চন্দ্রেরই উৎপত্তি চারিপ্রকার। প্রথম অত্রিনেত্র সম্ভব, দ্বিতীয় ক্ষীরাব্ধিজাত তৃতীয় ভগবানের মনঃ হইতে "মনসশ্চন্দ্রমাজাতঃ", চতুর্থ রুদ্রের অন্য রূপ চন্দ্র। এই সমস্ত চন্দ্রের সামঞ্জস্য বিধান করিবার উপায় শাস্ত্রেই রহিয়াছে।

অত্রিনেত্রজলে চন্দ্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া চন্দ্রের নামান্তর অম্ভোজ। ঐ চন্দ্রেরই আবার ক্ষীর-সমুদ্রে উৎপত্তি হয় বলিয়া নাম অম্ভোজ। কল্পের প্রথমে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টী-কার্য্যে অসম্মত পুত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হন তখন নীল লোহিত রুদ্রের জন্ম হয়। তাঁহার অষ্ট মূর্ত্তি ও অষ্ট নাম। "মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে নমঃ" শিবপূজায় এই মন্ত্র বলা হয়। দেবগণ যদি প্রকৃত মানবগণের ন্যায় কামুক হন, তবে আর মানুষের অপরাধ কি ? অনন্ত শাস্ত্রসাগরের মধ্যে কোথায় যে কোন ইঙ্গিত লুকান আছে কে বলিতে পারে ? বস্তুতঃ ইন্দ্র, মনু, দক্ষ, ব্যাসাদি এক একটি উপাধি মাত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আকারে অবতীর্ণ হন। বস্তুতঃ দেবগুরু বৃহস্পতি ও অত্রিপুত্র চন্দ্র ইহারা বিভিন্ন দেব। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি অনেক কন্যার প্রসূতি। তন্মধ্যে সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি। ইহারা তিথি বিশেষ। পৌর্ণমাসী দুই প্রকার রাকা ও অনুমতি। যে তিথিতে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান

তাহাকে রাকা এবং যাহাতে চন্দ্র এক কলাহীন তাহাকে অনুমতি বলে। ঐরূপ অমাবস্যার দুই নাম যথা—সিনীবালী ও কুহূ। দৃষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম সিনীবালী ও নষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম কুহূ। এক্ষণে নক্ষত্র বিচারে গ্রহদেব বৃহস্পতির সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ কি প্রকার হয় দেখুন। পৃথিবী অপেক্ষা চন্দ্র ছোট। চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্য বড়। সূর্য্যাংশু সমূহ চন্দ্র মণ্ডলে পতিত হইলে উহা শীতলতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই চন্দ্র "শীতপ্ত" নামে খ্যাত। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ২৮দিনে চন্দ্র তাহাকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করে। ভ্রমণ করিতে করিতে যখন এমন অবস্থায় পড়ে যে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমণ্ডলকে ঢাকিয়া ফেলে তখনই অমাবস্যা হয়। বস্তুতঃ সূর্য্যকিরণ সর্ব্বকালেই পৃথিবীতে পড়িতেছে। পৃথিবীর গতির পার্থক্য অনুসারে প্রতিপদাদি তিথি এবং অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অবস্থার নামই সিনীবালী কুহু রাকা ও অনুমতি। উহারাই কি দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিনী ? দেবগুরু বৃহস্পতির এক ভগিনীর নাম বরস্ত্রী। ইনি প্রজা সৃষ্টী বিষয়ে অসক্তা হইয়া সমুদায় জগৎ বিচরণ করেন। বিষ্ণুপুরাণে ইহার উল্লেখআছে

"বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।
যোগসিদ্ধা জগৎ কৃৎস্নমসক্তা বিচরত্যুতে॥" (১মঅং ৫মঅঃ)

অর্থাৎ যোগসিদ্ধা ব্রহ্মচারিণী বরস্ত্রী, বৃহস্পতির ভগিনী ; অসক্তা হইয়া সমুদায় জগৎ বিচরণ করেন। বৃহস্পতির পুত্র ভুবন বিখ্যাত কচ। ইনি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভার্থ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মুনির নিকট গমন করিয়া বহু কষ্টে ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করেন। শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী কচের অনুপম রূপলাবণ্য দর্শনে এবং নানা সদ্‌গুণের সমাবেশ দর্শনে তাঁহার প্রণয়-প্রার্থিনী হইলে ধার্ম্মিক কচ, গুরুপুত্রীকে সহদরার ন্যায় উপদেশ প্রদান করেন এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। কচের অসামান্য সহিষ্ণুতা ও সংযম, গুরুভক্তি ও পিতৃভক্তি অনুকরণীয়। উপেক্ষিতা দেবযানীর প্রদত্ত বিদায় অভিশাপবাণী স্বীকার করিয়া ইনি তাঁহার মানরক্ষা করিয়াছিলেন। একদা ইন্দ্রপত্নীর আকাঙ্খায় দেবরাজ নহুষ প্রমুগ্ধ হয়েন। পুরন্দর তখন সুমেরু শিখরে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট শচীদেবী কাঁদিয়া পড়িলেন। বৃহস্পতি বলিলেন, "ভয় নাই। তুমি সপ্তঋষি দ্বারা বাহিত শিবিকায় আসিবেন" এই কথা বলিবে। শেষে মুগ্ধ নহুষ ঋষিগণ বাহিত শিবিকায় শচীর নিকট গমন করিলেন। ঐ শিবিকায় অগস্ত ঋষি ছিলেন। তাঁহার গাত্রে নহুষের পদস্পর্শ হওয়ায় তিনি অভিশাপ দিলেন, "রে দাম্ভিক! তুই অচিরাৎ স্বর্গভ্রষ্ট হ।" নহুষ স্বর্গভ্রষ্ট হইলেন। দেবরাজ

বৈজয়ন্তা ধাম পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। শচীরও ভয় দূরীভূত হইল। চন্দ্রবংশীয় আয়ঃ রাজার পুত্রগণের মধ্যে নহুষ ও রজির নাম বিখ্যাত। দুইজনেই ইন্দ্রত্বপদ পাইয়াছিলেন। কোনও সময় দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দেবগণ ও অসুরগণ ভগবান ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের এই বিরোধে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে?" ব্রহ্মা বলিলেন, "যাঁহাদের জন্য রজি যুদ্ধ করিবেন তাঁহারাই জয়ী হইবেন। অনন্তর দৈত্যগণ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে রজি বলিলেন, "যদি আপনারা ইন্দ্রত্ব প্রদান করেন তাহা হইলে যুদ্ধ করিব।" দৈতাগণ বলিলেন, "আমরা এক প্রকার বলিয়া অন্যরূপ আচরণ করিব না। প্রহ্লাদই আমাদের নিরূপিত ইন্দ্র। তাঁহার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ। অতএব আপনার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পারিব না।"

অনন্তর দেবগণ রজির কথায় স্বীকৃত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যগণকে পরাস্ত করেন। ইন্দ্র স্বীয় মস্তক দ্বারা নিপীড়ন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার মহৎ ভয় দূর করিয়াছেন বলিয়া পিতা। ত্রিলোকেন্দ্র আমি আপনার পুত্র।" রজিও হাস্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক।" ইন্দ্রই দেবরাজ থাকিলেন। কালক্রমে রজি স্বর্গে গমন করিলে রজিপুত্রগণ নারদের মন্ত্রণায় ইন্দ্রের নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র অসম্মত হইলে রজিপুত্রগণ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া নিজেরাই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ত্রৈলোক্য যজ্ঞভাগ হারাইয়া নিতান্ত দুঃখিতভাবে কহিলেন, "কুল ফলের প্রমাণ ঘৃত প্রদান করিয়া কি আমার তৃপ্তি করিতে পারিবেন?" বৃহস্পতি বলিলেন, "তুমি যদি পূর্ব্বেই আমার নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে তোমার জন্য কোন্ কর্ম্ম আমার অকরণীয় হইত? এক্ষণে অল্প দিনের মধ্যেই তোমাকে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রজিপুত্রগণের বুদ্ধি মোহের জন্য প্রতিদিন অভিচারাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ইন্দ্রের হস্তে রজিপুত্রগণ নিহত হইলেন, ইন্দ্রও হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

এক্ষণে গুরু ও পুরোহিতগণ সমাজের শীর্ষস্থানে আসন পাইতেছেন না, ইহা কালের ধর্ম্ম। কিন্তু সর্ব্বকালেই সকল দেশে গুরু পুরোহিতগণ সমাজের মাথা হইয়া আছেন। দেব সমাজে দেবগুরু বৃহস্পতি, দৈত্য সমাজে শুক্রাচার্য্য, চিরকাল আছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি দেবশস্ত্র না ধরিয়াও বীর, গুণের সাগর, বুধগণ এই জন্যই তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোককে "বুদ্ধিতে বৃহস্পতি" বলিয়া সম্মানিত করেন।

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲ প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র

গোল্ড্ সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে. পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ২ নং বন ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

PRINTEDBY N[illegible] THE JANMABHUMI PRESS,
39, MANICK [illegible] EET, CALCUTTA.